উপনিবেশ আমলে লেখ্য-বাংলার রূপ ও রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাচিন্তা

মো. গোলাম আজম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

সেপ্টেম্বর ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মো. গোলাম আজম কর্তৃক উপস্থাপিত **উপনিবেশ আমলে লেখ্য-বাংলার রূপ ও রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাচিন্তা** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

আনিসুজ্জামান
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
এমিরিটাস অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০
বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ১-১৬

প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৭-৮১

বাংলায় উপনিবেশায়ন

তৃতীয় অধ্যায় ৮২-১৩৩

উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া ও বাংলা ভাষা

চতুর্থ অধ্যায় ১৩৪-১৮০

উনিশ শতকে বাংলা গদ্য ও বাংলা ভাষাচর্চার ধারা

পঞ্চম অধ্যায় ১৮১-২২২

রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা: বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত ধারণা

ষষ্ঠ অধ্যায় ২২৩-২৬১

রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা: বাংলা ভাষা-বর্ণনার কিছু সূত্র ও প্রণালি-পদ্ধতি

সপ্তম অধ্যায় ২৬২-২৯৮

বাংলা ভাষাচর্চার ধারা ও রবীন্দ্রনাথ

অষ্টম অধ্যায় ২৯৯-৩৩৬

বাংলা ভাষার প্রায়োগিক দিকগুলোতে রবীন্দ্রচিন্তার উপযোগিতা

নবম অধ্যায় ৩৩৭-৩৪১

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি ৩৪২-৩৫৩

প্রথম অধ্যায়
প্রস্তাবনা

১.১

সাধারণভাবে বলা যায়, উপনিবেশ হল দখলকৃত ভূমি ও সম্পদ। দখলে আনা ভূমি, সম্পদ ও জনগোষ্ঠীর ওপর সার্বিক আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়াই উপনিবেশায়ন। এ অর্থে উপনিবেশ নতুন কোনো ব্যাপার নয়। রোমান সাম্রাজ্য, চেঙ্গিস খাঁর রাজ্য বা অটোমান সাম্রাজ্যে দুনিয়ার একটা বড় অংশ এ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু ষোড়শ শতক-পরবর্তী ইউরোপীয় উপনিবেশে এমন সব ঔপনিবেশিক চর্চা দেখা গেছে, এবং তা পুরো দুনিয়াকে এমন মাত্রায় বদলে দিয়েছে, যে, গুণগত বা মাত্রাগতভাবে আগের কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গেই তার তুলনা চলে না (Loomba 2001: 3)। উপনিবেশায়নশাস্ত্রের প্রধান তাত্ত্বিকেরা – ফ্রাঁৎস ফানো, আলবেয়ার মেমি, এইমে সেজায়ার, এডওয়ার্ড সাইদ প্রমুখ – এই পর্বেরই আলোচনা করেছেন। *The New Encyclopaedia Britanica*-য় Colonialism-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে (2010: 464):

> The exercise of political and economic sovereignty by a country on a country or territory outside its borders. Colonies have often been established by military conquest followed by an occupation and settlement that places the colonized peoples in a subservient position.

এ সংজ্ঞায় উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর দাসত্বের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক দিক অনুল্লিখিত থেকে গেছে। অবশ্য অপরাপর উল্লেখ – যেমন উপনিবেশক-উপনিবেশিত দুই পক্ষের অবস্থা ও অবস্থানগত শনাক্তকরণ, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আধিপত্য বনাম দাসত্ব, সামরিক শক্তির জোরে দখলদারিত্ব কায়েম, বসতি স্থাপন ইত্যাদি – ‘আধুনিক’ উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়াকে মোটের উপর যথার্থভাবেই চিহ্নিত করে। গত কয়েকশ বছরের উপনিবেশায়ন এক প্রচণ্ড বাস্তবতা, যা পৃথিবীর দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বহু বদলের প্রধান নিয়ামকশক্তি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে উপনিবেশক শক্তিগুলো কোনো-না-কোনোভাবে ভূভাগের অন্তত নয়-দশমাংশ নিয়ন্ত্রণ করত; এর মধ্যে ব্রিটেনের শাসনাধীনে ছিল মোট ভূমির এক-পঞ্চমাংশ আর জনগোষ্ঠীর এক-চতুর্থাংশ (Young 2003: 2)। এ তথ্য থেকে উপনিবেশের পরিমাণগত বিস্তার বোঝা যায়। এর মাত্রাগত তাৎপর্য চিহ্নিত হয়েছে রবার্ট জে. ইয়ুঙের নিম্নোল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বয়ানে:

> … the long, violent history of colonialism, which symbolically began over five hundred years ago, in 1492: a history which includes histories of slavery, of untold, unnumbered deaths from oppression or neglect, of the enforced migration and diaspora of millions of peoples – Africans, Americans, Arabs, Asians and Europeans, of the appropriation of territories and of land, of the institutionalization of racism, of the destruction of cultures and the superimposition of the other cultures. (Young 2003: 4)

প্রায় সকল তাত্ত্বিকই ইউরোপের পুঁজিবাদী বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে এই উপনিবেশায়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলেছেন।[১] কারণ, পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদের বিকাশের সমান্তরালে আধুনিক উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। আধুনিক ঔপনিবেশিক শক্তি কেবল সম্পদ, অর্থ আর পণ্য লুটে নেয়নি, উপনিবেশিত রাষ্ট্রের পুরো অর্থনৈতিক সম্পর্ককেও বদলে দিয়েছে; উপনিবেশের সঙ্গে গড়ে তুলেছে এক জটিল সম্পর্ক, যাতে ঔপনিবেশিক শক্তি ও উপনিবেশিতের মধ্যে মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিনিময় নতুন মাত্রা পেয়েছে। এ বিনিময় দ্বিমুখী – দাস ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক আর কাঁচামাল গেছে কেন্দ্রে, অপরদিকে উপনিবেশগুলি হয়ে উঠেছে ইউরোপীয় পণ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজার। বিনিময় যেমনই হোক না কেন কেন্দ্রই হয়েছে মুনাফার ভাগীদার। কার্যত ক্ষমতাসম্পর্কের এই অসাম্যের ভিত্তিতেই বিকশিত হয়েছে ইউরোপীয় পুঁজিবাদ আর শিল্পবিপ্লব। বলা যায়, উপনিবেশ ইউরোপীয় পুঁজিবাদ ও শিল্পবিপ্লবের ধাত্রীর কাজ করেছে (Loomba 2001: 4; Mcleod 2007: 7)।

'আধুনিক' উপনিবেশের সঙ্গে পুঁজিবাদের বিকাশকে মিলিয়ে পড়ার রেওয়াজ জনপ্রিয় হয়েছে মূলত মার্কসবাদীদের লেখালেখিতে। সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক লেনিন *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism* (1947) বইতে দেখিয়েছেন, পশ্চিমা দুনিয়ায় 'লগ্নিপুঁজি' ও কলকারখানার প্রবৃদ্ধির ফলে 'পুঁজির অভূতপূর্ব বাড়তি জোগান' ঘটে। শ্রমিক-স্বল্পতার কারণে ইউরোপে এ উদ্বৃত্ত পুঁজি লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। উপনিবেশে পুঁজির ঘাটতি ছিল, কিন্তু শ্রমশক্তি আর মানবসম্পদের জোগান ছিল অফুরান। ফলে বাইরে গিয়ে নিজ প্রবৃদ্ধির স্বার্থেই শিল্পে-অনুন্নত দেশগুলোর দখল নেওয়া পুঁজির জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। এই যুক্তিতেই লেনিন অনুমান করেছিলেন, ইউরোপীয় লগ্নিপুঁজি ক্রমশ বাকি দুনিয়া নিজের আয়ত্তে আনবে। তিনি এই বিশ্বব্যবস্থার নাম দিয়েছেন 'সাম্রাজ্যবাদ'। পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার একটা স্তরের সঙ্গে ব্যাপারটা যুক্ত, লেনিনের মতে, যে স্তর এর 'সর্বোচ্চ' স্তর:

> Imperialism emerged as the development and direct continuation of the fundamental attributes of capitalism in general. But capitalism only became capitalist imperialism at a definite and very high stage of its development. (Lenin 1947: 107)

পুঁজিবাদ-উত্তর উপনিবেশকে যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন তাঁরা অনেকসময়ে 'সাম্রাজ্যবাদ' ও 'উপনিবেশবাদ' ধারণা দুটি সমার্থে ব্যবহার করেন। আদতে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সাম্রাজ্যবাদ একটি ভাবাদর্শ, যা এক জাতির ওপর অন্য জাতির অর্থনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণকে বৈধতা দেয়। এদিক থেকে উপনিবেশ সাম্রাজ্যবাদের এক ধরন মাত্র (Mcleod 2007: 7)। সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক, আইনি বা সামরিক দখলদারি মারফত ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগ তৈরি করে বটে; কিন্তু এর জন্য বসতি-স্থাপন জরুরি নয়। বাস্তবে কার্যকর উপনিবেশ পৃথিবীতে এখন খুব কমই আছে; কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষত আমেরিকা, সাম্রাজ্যবাদী কর্মকাণ্ডে খুবই তৎপর। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি উপনিবেশ স্থাপন করেছে খুব কম ক্ষেত্রে; কিন্তু বিশ্বব্যাপী তার সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব ও শোষণ বিশ-একুশ শতকের প্রধান বিশ্বব্যবস্থা। বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ স্থাপন না করেও কার্যকর থাকতে পারে, কিন্তু উপনিবেশের জন্য দখলকৃত ভূমির ওপর আধিপত্য আবশ্যক।

বর্তমান সন্দর্ভে 'আধুনিক' কালের প্রত্যক্ষ উপনিবেশকেই 'উপনিবেশ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে; আর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার ওপর। এই প্রক্রিয়ার একদিকে আছে উপনিবেশক পক্ষের

সক্রিয়তা, অন্যদিকে আছে উপনিবেশিতের ওপর তার প্রভাব। উপনিবেশকের নিজস্ব বাস্তবতায় সে প্রভাব কিভাবে বিশিষ্ট আকার পায়, আর নতুন বাস্তবতার মধ্যে নানামাত্রিক প্রতিরোধ-প্রবণতা কিভাবে সক্রিয় থাকে – তাও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে।

১.২

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উপনিবেশকে বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করা জরুরি। কারণ, ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও এখানে দৃশ্যত শত শত বছরের 'বিদেশি' শাসন চলছিল। সেই শাসনের সঙ্গে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফারাক অনেকসময়েই অস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়। নিজেদের শাসনের বৈধতা তৈরির স্বার্থেই ঔপনিবেশিক ইতিহাসতত্ত্ব এ দুইয়ের ফারাক যথাসম্ভব মুছে দিতে চেয়েছে। স্থানীয় প্রভাবশালী ইতিহাসতত্ত্বও কার্যত তা মেনে নিয়েছে (Guha 1988; পার্থ ২০০১)। ঔপনিবেশিক শাসনের একটা সামান্য লক্ষণ হল, 'নিজ' ও 'অপরে'র জটিল বিন্যাসে উপনিবেশিতের প্রভাবশালী অংশ কেন্দ্রের সঙ্গেই একাত্মবোধ করে। ভারতের পুরোনো শাসকগোষ্ঠী ছিল 'বহিরাগত' মুসলমান, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ছিল হিন্দু – জনমিতির এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে এই একাত্মতার পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্ভবত দুনিয়ার অন্য যে কোনো উপনিবেশিত-অঞ্চলের তুলনায় বেশি। এর প্রতিফলন ঘটেছে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে, সাম্প্রদায়িক অস্থিরতায় আর বিশেষভাবে ইতিহাসচর্চায়।

গত কয়েক দশকে উপনিবেশ-পূর্ব ভারত এবং বিশেষত মুসলমান-শাসনাধীন ভারতের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পুরোনো ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে (গৌতম ১৯৯৪, ২০১১; গৌতম ও পার্থ ২০০১; দেবেশ ১৯৯০; সুরজিৎ ১৪০৯; মৃণাল ১৯৯৪; Bayly 2002; Bose and Jalal 2002; Chatterjee 1998; De 1974; Guha 1988; Joshi 1975; Sarkar 1997, 2000; Sen 1977)। তাতে দেখা যায়, ক্ষমতা-সম্পর্কের যে অসম-দশা ঔপনিবেশিক শাসনের মূল বৈশিষ্ট্য, 'মধ্যযুগে'র ভারতবর্ষে মোটেই সে অবস্থা ছিল না। পরবর্তী 'বিদেশি' শাসনের সঙ্গে এর সুস্পষ্ট পার্থক্য সম্পদ-পাচারের ক্ষেত্রে। তাছাড়া, প্রশাসনিক কাঠামো, শিক্ষা, জ্ঞানতত্ত্ব, বর্ণবাদ ও সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা – সব মিলিয়ে শাসনাধীন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শাসকপক্ষের যে অসাম্য ঔপনিবেশিক শাসনে তৈরি হয়েছিল, আগের শাসনের সঙ্গে তা মোটেই তুলনীয় নয়।

পরবর্তী ইংরেজ-শাসনামলের তুলনায় পূর্ববর্তী শাসনামল 'স্বর্ণযুগ' ছিল এমন নয়; কিন্তু কোনো অর্থেই অন্ধকার যুগও ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের পতন এবং ইংরেজের ক্ষমতারোহণের মধ্যবর্তী কালে অর্থাৎ আঠার শতকে ভারতে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল – এরকম একটা মত উনিশ শতকে খুব প্রচারিত হয়েছিল, এবং পরেও অনেকদিন তা অব্যাহত থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় এ মত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।[২] এ প্রসঙ্গে বেইলি লিখেছেন:

> The darkness of eighteenth-century India was in large part the shadow cast by the massive historiographies of earlier and later periods. New analyses of the political systems of the period have led to the view that the conflict which contemporaries saw signalled the emergence of powerful 'successor states' which gained a closer control over rural resources and inherited the political style of the Mughal Empire. Studies of the regional principalities of Bengal, Hyderabad and Awadh suggest that the turbulent events of the century heralded

> not the final dissolution of the Mughal polity as much as the emergence of the regional dynastic rulers who initiated new cycles of growth and regeneration. (Bayly 2002: 35-36)

তবু ঔপনিবেশিক শক্তি যে ভারতকে পদানত করতে পেরেছিল তা নিঃসন্দেহে তার যোগ্যতর অবস্থারই প্রমাণ। এ যোগ্যতা মূলত 'টেকনলজি'র – বাষ্পীয় জাহাজ ও রেল থেকে শুরু করে সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী, দক্ষ প্রশাসন আর জ্ঞানগত অগ্রসরতা পর্যন্ত সবকিছুই এ তালিকায় পড়বে (সিরাজুল ১৯৮৫: ২৭১-৮৩)। কিন্তু অগ্রসরতা মানেই ঔপনিবেশিক শাসনের ছাড়পত্র নয়, আর যুদ্ধে পরাস্ত হওয়া মানে কোনো জনগোষ্ঠীর সার্বিক পতিত-দশা নয় – এ দুই সত্য উপনিবেশিত ভারতের পঠন-পাঠনের 'নৈর্ব্যক্তিকতা' প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি।

১.৩

উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার পাঠ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটা বাস্তব সমস্যা এর বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য। আরবের কিছু অংশ, ইরান, আফগানিস্তান, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড, চিন ও জাপান ছাড়া বাদবাকি দুনিয়া সরাসরি ইউরোপীয় সরকার দ্বারা শাসিত হয়েছিল (Loomba 2001: xiii)। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের শাসনপ্রণালিও সমরূপ ছিল না। শাসনের ফলও হয়েছে বিবিধ। তাই উপনিবেশ সম্পর্কে কোনো সামান্য সিদ্ধান্ত নেওয়া কার্যত অসম্ভব।

উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার অর্থনৈতিক-সামরিক দিক খুবই প্রত্যক্ষ। এর সঙ্গে প্রশাসনিক দিকও যুক্ত হতে পারে। কৌশলে বা বলপ্রয়োগে ভূমি ও জনগোষ্ঠীর দখল নেওয়া, দৃশ্যমান সম্পদ আত্মসাৎ করার বন্দোবস্ত করা, কেন্দ্রের উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে উপনিবেশের উৎপাদনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, খাজনা বা লভ্যাংশ-আকারে সম্পদ সংগ্রহ ও নানা পন্থায় তা কেন্দ্রে পাচার করা – এই ক্রমে উপনিবেশের সামরিক-প্রশাসনিক-আর্থিক কর্মকাণ্ডকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু এ ধরনের পাঠে উপনিবেশক-উপনিবেশিতের জটিল সম্পর্ক এবং পরিবর্তন-পরম্পরার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোই অকথিত থেকে যায়। বিশেষত যে প্রক্রিয়ায় উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর একটা অংশ ঔপনিবেশিক শাসনকে শুধু মেনেই নেয় না, কাঙ্ক্ষিতও মনে করে – ঔপনিবেশিক ইতিহাস-পাঠের এই ধরনের মধ্যে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এ কারণেই উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার সামগ্রিকতার দিকে নজর দিতে হয়,[৩] যার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আশিস নন্দী উপনিবেশায়নের সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক দিকটিতে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়েছেন:

> Modern colonialism won its great victories not so much through military and technological powers as through its ability to create secular hierarchies incompatible with the traditional order. These hierarchies opened up new vistas for many, particularly for those exploited or cornered within the traditional order. To them the new order looked like – and here lay its psychological pull – the first steps towards a more just and equal world. (Nandy 1989: ix)

নন্দীর এই বিবরণে নতুন শাসনে সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। উন্নত শাসন, সভ্যতার প্রসার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ইত্যাদি যেসব দাবি উপনিবেশক পক্ষ তাদের বৈধতা হাসিলের জন্য প্রচার করে, মূলত এঁদের কাছেই তা প্রথম গ্রহণযোগ্যতা পায়। তাই উপনিবেশক-উপনিবেশিতের আসল পরিচয় ও কার্যকর সম্পর্কটি এত সহজে আড়ালে চলে যেতে পারে।[৪] নন্দী বিশ্বদৃষ্টির কথাও বলেছেন, যার সঙ্গে 'সভ্যতা'র মতো প্ররোচক ধারণাগুলো

যুক্ত। স্বভাবতই এতে বহু মানুষের সায় থাকে। উপনিবেশের সঙ্গে পুঁজিবাদের সম্পর্কই বলে দেয়, ইতিহাসের অন্য-সব দখলের সঙ্গে এর মিল নেই; বরং তা ইউরোপীয় পুঁজিবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এ থেকে পুঁজিবাদী ও মার্কসবাদীদের একটা বড় দল উপনিবেশায়নকে ইতিহাসের উৎপীড়ক কিন্তু দরকারি অধ্যায় বলে গণ্য করেন। মার্কসীয় চিন্তাধারায় এটা ইতিহাসের অনিবার্য পর্ব, যা পেরিয়ে পৌঁছাতে হবে সমাজতন্ত্রে। একদিক থেকে 'প্রগতি'র এ ধারণার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদীদের ধারণাও প্রায় অনুরূপ। প্রগতি বলতে তাঁরা বোঝেন শিল্পায়নের উঁচু স্তর, প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে আধুনিক ইউরোপীয় ধারণা। উপনিবেশিতের কাছে উপনিবেশ যেমন এই প্রযুক্তি পৌঁছে দিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রগতিশীল ধ্যানধারণাও সরবরাহ করেছে। মার্কস নিজেই উপনিবেশায়নকে চিহ্নিত করেছেন এশিয়ার উন্নতির জন্য নৃশংস কিন্তু জরুরি পূর্বশর্ত হিসাবে:

> England, it is true, is causing a social revolution in Hindostan, was actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is, can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? If not, whatever may have been the crimes of England she was the unconscious tool of history in bringing about the revolution. (Marx 1979: 132)

উনিশ ও বিশ শতকের বহু লেখক মনে করতেন ঔপনিবেশিক শাসন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ও যুক্তির বিজয়। উপনিবেশিতদের একটা অংশও এটা বিশ্বাস করত। উনিশ শতকে ব্রিটিশদের সরকারি-বেসরকারি বহু দলিলে একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে স্থানীয়দের লেখায়ও। ১৮২৩ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড অ্যামহার্স্টকে লেখা রামমোহন রায়ের বিখ্যাত পত্রে এ মনোভাবের পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে (Roy 1906: 472-73)। এভাবে ঔপনিবেশিক আবহের মধ্যে ইউরোপীয় প্রযুক্তি ও শিক্ষা প্রগতিশীল ব্যাপার বলেই গৃহীত হয়েছিল।

বস্তুত গত দু-তিন শতক ধরে প্রভাবশালী যেসব মতাদর্শিক উপাদান দুনিয়া শাসন করেছে – যেমন, পুঁজিবাদ, মুক্তবাজার অর্থনীতি, উদারনীতি, গণতন্ত্র, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পশ্চিমা ধারণা, সর্বোপরি আধুনিকতা – তার সব-কটিই উপনিবেশিত অঞ্চলে সঞ্চারিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্য দিয়ে। তাত্ত্বিকেরা পশ্চিমের বাস্তবতায় বিকশিত এ উপাদানগুলোর বিশ্বজনীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জনকল্যাণ ও জীবনমান উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত ধারণাগুলো কার্যকরভাবে সঞ্চারিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনকে দেখেছেন বড় বাধা হিসাবে। ঔপনিবেশিক শক্তি এসবকে ব্যবহার করেছে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে হীনমন্যতার বোধ চাঙ্গা করে নিজেদের আধিপত্য দৃঢ় করার কাজে। শাসকসুলভ আধিপত্যের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতি উপনিবেশে অর্জিত হয়েছে মূলত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। ক্ষমতাসম্পর্কের এহেন অসম দশায় 'উন্নত' ভাবাদর্শ বা জ্ঞান জনগোষ্ঠীর মধ্যে খুব সামান্যই সঞ্চারিত হতে পারে।[৫] এ কারণেই ঔপনিবেশিক শাসনের মতাদর্শিক প্রচারণাগুলো শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিরই অংশ:

> Colonialism can be seen both as a historical moment – specified in relation to European political and economic projects in the modern era – and as a trope for domination and violation. Culture can be seen both as a historically constituted domain of significant concepts and practices and as a regime in which power achieves its ultimate apotheosis.

> Linked together, colonialism and culture can be seen to provide a new world in which to deploy a critical cartography of the history and effects of power. (Dirks 2007: 59)

শাসন, জ্ঞানতত্ত্ব আর সংস্কৃতির পারস্পরিকতায় ঔপনিবেশিক ক্ষমতা দরকারি মহিমা অর্জন করে। উপনিবেশিত সংস্কৃতির যে কোনো পাঠের ক্ষেত্রে তাই পুরো ক্ষমতাসম্পর্কের বিবেচনা জরুরি। কিন্তু ক্ষমতাসম্পর্কের সঙ্গে এর যোগ-বিয়োগ মোটেই যান্ত্রিক নয়[৬], আর ভালো-মন্দের কোনো পূর্ব-নির্ধারিত ছকে আবদ্ধ না থেকে প্রক্রিয়াগত দিকগুলো খতিয়ে দেখাই উপনিবেশিত সংস্কৃতি-পাঠের কার্যকর পন্থা।[৭]

১.৪

উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার সামগ্রিক সূত্রায়ণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিশেষ স্থান-কালের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বায়নের বিশিষ্টতাও দরকার হয়। কেউ কেউ মনে করেন, স্থানীয় বিশিষ্টতাভিত্তিক তত্ত্বের আলোকে স্থানীয় বাস্তবতার পাঠই এক্ষেত্রে একমাত্র কার্যকর পাঠ হতে পারে: 'Only localized theories and historically specific accounts can provide much insight into the varied articulations of colonizing and counter-colonial representations and practices.' (Thomas 1994: ix) বাংলা অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। শুধু পৃথিবীর অন্য অঞ্চল নয়, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের তুলনায়ও এ অঞ্চলের ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। উত্তর ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলের প্রায় এক শতাব্দী আগে এবং বোম্বাই-পাঞ্জাবের প্রায় পাঁচ দশক আগে বাংলা অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসনের দীর্ঘ মেয়াদ, শাসনকেন্দ্র হিসাবে কলকাতার প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদনব্যবস্থার ওপর শাসকপক্ষের নজিরবিহীন নিয়ন্ত্রণ বাংলা অঞ্চলের ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিকে ভারতের অন্য অঞ্চল থেকে আলাদা করেছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্তরবিন্যাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উৎপাদনসম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলার অনন্য বৈশিষ্ট্য সূচিত করেছিল। স্বভাবতই পশ্চিমা চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির প্রভাবও বাংলা অঞ্চলেই সবচেয়ে গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, যাকে উপনিবেশায়নতত্ত্বে সাধারণভাবে ঔপনিবেশিক প্রভাবই বলতে হবে।

পশ্চিমের সমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ধারাগুলোর সঙ্গে পরিচয় কলকাতার বাঙালি সমাজে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। আধুনিক ও উদারনৈতিক মানবতাবাদী ধারণাগুলো নিপুণভাবে আত্মস্থ করা এবং সেগুলোর সৃষ্টিশীল পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর একাংশ বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছে। একদিকে দুনিয়ার অন্যতম সফল ঔপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্র, অপরদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃষ্টিশীলতার নানা লক্ষণ ও সাফল্য – বাংলা অঞ্চলের উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে জটিল করেছে।

উনিশ শতকের বাংলাকে বিশ্লেষণের অন্তত তিনটি ধারা শনাক্ত করা যায়। প্রথম ও সবচেয়ে শক্তিশালী ধারাটি রেনেসাঁসকেন্দ্রিক। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এ ধারার উদ্ভব জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের অংশ হিসাবে:

> It was in the age of nationalism that the story of our renaissance was invented. Our nationalism required not only the ennobling memory of an ancient and glorious civilization, it also needed to affiliate itself with a more recent tradition of the authentic rediscovery and reinterpretation of that ancient heritage. For us, the renaissance had to be a modern, and for that reason historically authentic, re-creation of our memory of the nation's glorious past. (Chatterjee 1998: 7)

রাজনারায়ণ বসুর *আত্মচরিত* (১৯৬১) এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৯৫৭) এ ধারার প্রথম দিকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। অবশ্য, মার্কসবাদীদের রচনার একটা উল্লেখযোগ্য অংশও এ ধারায় পড়বে। যেমন, সুশোভন সরকারের *Bengal Renaissance and other Essays* (1981), নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত *উনিশ শতকের বাঙ্‌লার জাগরণ: তর্ক ও বিতর্ক* (১৯৯৭) ইত্যাদি। এর জনপ্রিয়তার মূল কারণ 'আধুনিকতা'র সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া। কিন্তু 'আধুনিকতা' শব্দের আড়ালে এই ধারার আলোচনায় সাধারণত ঔপনিবেশিক শাসনের বীভৎসতা হারিয়ে যায়:

> The key concept needing more precise definition in this context, is 'modernization'. Western historians of under-developed countries have become terribly fond of 'tradition'-'modernization' polarity, under cover of which the grosser facts of imperialist political and economic exploitation are very often quietly tucked away in a corner. (Sarkar 2000: 26)

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় কেনীয় ঔপন্যাসিক নগুগি ওয়া থিওঙ্গো বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই মর্মে যে, এখনো নানা জায়গায় উপনিবেশের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত না করেই ইউরোপীয় 'রেনেসাঁস' বা 'এনলাইটেনমেন্ট' প্রভৃতি সম্পর্কে পড়ানো হয় (Loomba 2001: 64)। উপনিবেশিত বাংলার রেনেসাঁসপন্থী বয়ানের ক্ষেত্রে এ কথা আক্ষরিক অর্থে সত্য। ইতিহাসতত্ত্বের দিক থেকে একে বলা যায় উপনিবেশিত ইতিহাস (রণজিৎ ২০০১: ২৫)। ইউরোপে বুর্জোয়াদের অভ্যুদয়ের সময় থেকে যে ইতিহাস রাজা-জমিদার-পুরোহিতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছিল, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির চাপে সেই ইতিহাসতত্ত্বই বিকৃত হয়ে যায় – উপনিবেশে প্রভুশক্তির সমালোচক হওয়ার বদলে তা হয়ে ওঠে স্তাবক। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার বৃহত্তর আবহে 'রেনেসাঁস'কে স্থাপন করতে না পারাই এ ইতিহাসধারার মূল সীমাবদ্ধতা।

বাংলা অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে উনিশ শতক-পাঠের দ্বিতীয় ধারা প্রথমটির ঠিক বিপরীত। ভবানী সেন, সুপ্রকাশ রায়সহ মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের একাংশের রচনা এ ধারায় পড়বে (নরহরি ১৯৯৭: ৩-৫)। অপেক্ষাকৃত কম প্রচারিত এই ধারায় সাধারণত 'রেনেসাঁসে'র ধারণা পুরোপুরি বাতিল করা হয়। মধ্যবিত্তের জনবিচ্ছিন্নতার বাস্তবতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; আর ওই সময়ের প্রধান নায়কদের বিরুদ্ধে বিদেশি শাসনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের অভিযোগ তোলা হয়। এ ধারায় ভিত্তি-কাঠামো আর উপরি-কাঠামোর যান্ত্রিক বিভাজন করে দুইয়ের পারস্পরিকতাকেও বিবেচনা করা হয় যান্ত্রিকভাবে। ফলে উনিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ বহু বাস্তবতা অধরা থেকে যায়। উনিশ শতকের কলকাতা নিঃসন্দেহে 'ঔপনিবেশিক সৃষ্টি'; কিন্তু জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনযাপন, উপনিবেশ-পূর্ব বাস্তবতা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন আর মানুষের স্বাভাবিক সৃষ্টিশীলতা উপনিবেশের ছকের বাইরে অন্য বাস্তবতাও তৈরি করেছিল। নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক শক্তি যেভাবে চেয়েছে, ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব তার সীমায় বদ্ধ থাকেনি। উক্ত দ্বিতীয় ধারায় এসব বাস্তবতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রথম ধারায় যেমন উপনিবেশিতের কর্তাসত্তায় চূড়ান্ত স্বাধীনতা কল্পিত হয়, দ্বিতীয় ধারায় তেমনি কর্তাসত্তার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। দুই ক্ষেত্রেই উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী তার নিজস্বতা হারায়:

> Eulogy and denunciation can become mirror images, inversions of each other. What they can had in common at times is an assumption of effective and total acculturation that tends to eliminate the autonomy and agency of the colonial subject. (Sarkar 1997: 188-89)

তৃতীয় আরেকটি ধারা বিকশিত হয়েছে বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে (Sarkar 2000: 72; পার্থ ২০০১: ১০)। এ ধারায় উনিশ শতককে দেখা হয় সামগ্রিক বাস্তবতার সাপেক্ষে। এই বাস্তবতার প্রধান দিক ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি হওয়ায় 'অতি-বাম' ঘরানার 'রেনেসাঁস'-মিথ খারিজ করার সঙ্গে বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে এই ধারার। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতার প্রতি মনোযোগ, রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো মানুষদের এমনকি সীমাবদ্ধতা উন্মোচনের ক্ষেত্রেও বাস্তবতার দিকে নজর রাখা, আর যে কোনো 'ব্রিটিশ-বিরোধী' বা 'জনপ্রিয়' আন্দোলনের ইশারা পেলেই রোমান্টিক ভাবালুতায় আক্রান্ত না হওয়া – এই বৈশিষ্ট্যগুলো খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, পূর্বোক্ত খারিজিপন্থার সঙ্গে এর সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। এঁদের প্রশ্ন-উত্থাপনের ধরন আর বিবেচনা-পদ্ধতি প্রকাশ পেয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে:

> The argument therefore was that while there were elements of modernity in the new cultural and intellectual movements in nineteenth-century India, these cannot become meaningful unless they are located in their relation, on the one hand, to the changing socio-economic structure and, on the other, to the crucial context of power, that is to the reality of colonial subjection. (Chatterjee 1998: 10)

রণজিৎ গুহ, অশোক সেন, বরুণ দে, সুমিত সরকার, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, গৌতম ভদ্র, আশিস নন্দী প্রমুখ ঐতিহাসিকের সংশ্লিষ্ট কাজ এই ধারায় পড়ে।[৮]

বর্তমান সন্দর্ভে মূলত এই তৃতীয় ধারার অনুসরণে উনিশ শতকের বিচারবিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হবে।

১.৫

ভাষার উপনিবেশায়ন সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়নেরই অংশ। বিশ্বব্যাপী উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার প্রভাবে স্থানীয় ভাষাগুলোর অন্তত তিন ধরনের প্রত্যক্ষ পরিবর্তন ঘটেছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় ভাষা ব্যবহারিক জগৎ থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়েছে; কোথাও বিদ্যমান ভাষা-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে; আর সর্বত্রই বদল ঘটেছে মর্যাদার – উপনিবেশকের ভাষা উপনিবেশিতের ভাষাকে হটিয়ে দিয়ে দখল করেছে প্রভাবশালী ময়দানগুলো। শেষোক্ত দুটি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ভাষার বিকাশ সবসময়ে যান্ত্রিকভাবে সামাজিক বিকাশের সমান্তরালে হয় না। তবু বাংলা ভাষার, বিশেষত বাংলা গদ্যের, ইতিহাসকে উপনিবেশিত সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ:

> পৃথিবীর অন্য সব ভাষার যে বিকাশপ্রক্রিয়া থেকে গদ্যবিচারের সর্বজনীন পদ্ধতিগুলো তৈরি হয়ে উঠেছে, বাংলা গদ্যের বিকাশপ্রক্রিয়া তা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় প্রায় হাজার বছরের সাহিত্য ইতিহাস সত্ত্বেও গদ্য তৈরি হয়ে ওঠেনি একটি সাম্রাজ্যশক্তির অভিঘাতের ফলে। ভারতেরও অন্য ভাষায় তা ঘটেনি। কিন্তু কলকাতাই যেহেতু হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবিস্তারের আরম্ভস্থান, বাংলাভাষাকে তাই হয়ে উঠতে হয়েছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিপূরক বাহন। সেখানে সাম্রাজ্যবিস্তারের এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ভাষাবিকাশের পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাহত করেছে। আবার, সাম্রাজ্যশক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার সামাজিক প্রক্রিয়াও ভাষানির্মাণের পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। (দেবেশ ১৯৯০: ৬-৭)

'সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া'র দিক থেকে বাংলা ভাষার সংগঠনে সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদান জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক মনস্তত্ত্বে জেঁকে বসা হীনমন্যতাবোধ। এর প্রভাবে একদিকে 'উন্নত' ভাষা সংস্কৃত ও ইংরেজির অনুকরণে 'অনুন্নত' বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ করে নেওয়ার এক গভীর-ব্যাপক প্রক্রিয়া চলতে থাকে[৯]; অন্যদিকে 'মার্জিত' হয়ে ওঠার পরেও উচ্চশিক্ষা ও অফিস-আদালতের মতো 'উঁচু' জায়গাগুলোতে ইংরেজিকে বাংলা স্থানচ্যুত করতে পারে না। 'সামাজিক প্রক্রিয়া'র দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর বিশিষ্ট স্তরবিন্যাস – সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষিত শ্রেণির সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতার মতো বাংলা ভাষাচর্চাও ব্যাপকার্থে জনবিচ্ছিন্ন থেকে যায়। বর্তমান সন্দর্ভে বাংলা ভাষার এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়ে 'লেখ্য-বাংলা'র রূপ ও রূপান্তর পরীক্ষিত হয়েছে।

এখানে 'লেখ্য-বাংলা' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে দুই ধরনের রচনা বোঝাতে: এক. সাহিত্য ও সাহিত্য-বহির্ভূত গদ্যরচনা; দুই. ভাষা-সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনা। গদ্যে ভাষার 'স্বাভাবিক' গড়ন অনেকাংশেই অটুট থাকে; কিন্তু কবিতায় অনেকসময়ে সেই নিয়মের স্বেচ্ছাকৃত ব্যতিক্রমই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই কবিতার ভাষা এই আলোচনায় আকর-উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়নি। ভাষা-সম্পর্কিত আলোচনা, বিশেষত ব্যাকরণ ও অভিধান, ভাষার মান্যরূপ নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাকরণ-অভিধান স্বয়ং বিদ্যমান রুচি ও প্রবণতার নির্দেশক, আবার রুচি ও প্রবণতার নির্মাতাও বটে। উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের গঠনপর্বে এ সত্য বারবার প্রমাণিত হয়েছে। 'লেখ্য-বাংলা' সম্পর্কে আরো বলা দরকার, বর্তমান আলোচনা কোনো অর্থেই লিখনরীতির আলোচনা নয়।[১০] বরং সাহিত্য ও সাহিত্য-বহির্ভূত রচনার ভাষা, শিক্ষা ও অফিস-আদালতে নিত্য-ব্যবহার্য ভাষা লিখিত আকারে যেভাবে গঠিত ও ব্যবহৃত হয়, তা-ই মূল বিবেচ্য। অর্থাৎ, 'মান' বা 'প্রমিত' বাংলা থেকে লেখ্য-বাংলাকে আলাদা ধরা হয়নি। এদিক থেকে 'মুখের বাংলা' গুরুত্ব পেয়েছে কেবল এই অর্থে যে, প্রচলিত কথ্য ভাষার সঙ্গে অব্যাহত বিনিময়েই কেবল লেখ্য ভাষা কার্যোপযোগিতার দিক থেকে প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে।

১.৬

উপনিবেশ আমলে বাংলা ভাষাচর্চার যে রূপ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল, তার বিরোধিতার নজির পাওয়া যায় উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে। ওই শতকের শেষাংশে তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক দুই দিক থেকেই এই বিরোধিতা শক্ত ভিত্তি অর্জন করে। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় উপনিবেশিত বাংলা ভাষার সংকট আর এ থেকে মুক্তির পথ নির্দেশিত হয়েছিল বিস্তারিতভাবে। পরে মূলত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অভিভাবকত্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এ কাজে নেতৃত্ব দেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষা-আলোচনা শুরু করেছিলেন খুব অল্প বয়সে – ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে। তাঁর কাজ প্রবন্ধ-আকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮৫ সালের মধ্যেই। ১৯৪১ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ কাজে তিনি কমবেশি সক্রিয় ছিলেন। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* ও *বাংলাভাষা-পরিচয়* তাঁর ভাষা-বিষয়ক গ্রন্থ। এর বাইরে বহু প্রবন্ধে ভাষা-সম্পর্কিত তাঁর মত-মন্তব্য পাওয়া যায়। এসব রচনার মূল লক্ষ্য দুটি: এক. বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করা; দুই. বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা – উচ্চশিক্ষা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা। এই দুই লক্ষ্য অর্জনের প্রধান উপায় হিসাবে তিনি বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিরামহীন

লড়াই চালিয়েছিলেন – স্বাতন্ত্র্য-স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে প্রধানত সংস্কৃতায়নের বিরুদ্ধে আর মর্যাদার প্রশ্নে প্রধানত ইংরেজির সঙ্গে। তাঁর রচনায় এই দুই উল্লেখ এত বেশি আর জোরালো যে, এই সিদ্ধান্তের জন্য আভ্যন্তর সাক্ষ্য খোঁজারও প্রয়োজন হয় না। আভ্যন্তর লক্ষণের দিক থেকে বাংলা ভাষা-আলোচনায় উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার বিপরীত প্রক্রিয়া পাওয়া যায় তাঁর অবলম্বিত প্রণালিপদ্ধতির মধ্যে। যে কোনো আরোপিত ছকে ভাষা-আলোচনার বদলে তিনি সর্বত্র বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার অনুগামী বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য সাফল্য সর্বজনীন স্বীকৃতিও পেয়েছে। এসব কারণে উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার বিপরীত প্রক্রিয়া হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ভাষাচর্চার নতুন ও কার্যকর পাঠ সম্ভব।

উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া এক জটিল ও সর্বগ্রাসী প্রক্রিয়া, যার সামান্য অংশই প্রকাশ্য ঘটনাবলির আলোচনায় ধরা পড়ে।[১১] প্রত্যক্ষ উপনিবেশ শেষ হওয়ার পরেও এ প্রক্রিয়া থেমে যায়নি, বরং নয়া-ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। বিপরীতে, একেবারে শুরু থেকেই উপনিবেশিত সমাজে বি-উপনিবেশায়নের নানা প্রক্রিয়াও চলমান থেকেছে:

> The immensely prestigious and powerful imperial culture found itself appropriated in projects of counter-colonial resistance which drew upon the many different indigenous local and hybrid processes of self-determination to defy, erode and sometimes supplant the prodigious power of imperial cultural knowledge. (Ashcroft, Griffiths and Tiffin 2007: 1)

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা ভাষাচর্চার প্রভাবশালী ধারা এই অর্থে বি-উপনিবেশায়নের এক আকর্ষণীয় উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ এই ধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক। পাশাপাশি তখন উপনিবেশিত আদর্শের ভাষাচর্চাও চলছিল – জোরালোভাবেই চলছিল। তাই বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য-স্বায়ত্তশাসন আর মর্যাদার প্রতিষ্ঠা – রবীন্দ্রনাথের এই দুই দাবি গত এক শতাব্দীতেও অর্জিত হয়নি। উপনিবেশায়নের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের ভাষাচর্চার পাঠ এদিক থেকে বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থারও পর্যালোচনা।

১.৭

বাংলা গদ্যের এবং ভাষাচর্চার ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁদের বিপুল অধিকাংশই – যেমন, সুকুমার সেন (১৯৯৮), শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৩৬৬), মনোমোহন ঘোষ (১৯৪১), নির্মল দাশ (২০০০), হুমায়ুন আজাদ (২০০১, ২০০২) প্রমুখ – ঔপনিবেশিক বাস্তবতাকে একেবারেই উল্লেখযোগ্য মনে করেননি। সুশীলকুমার দে (1962) এবং গোলাম মুরশিদের (১৩৯৯) মতো কেউ কেউ ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে নতুন বাংলা গদ্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন; কিন্তু উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার নানা জটিল হিসাব-নিকাশে মনোযোগ না দিয়ে তাঁরা প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রাপ্ত গদ্যরূপ ও ভাষাবোধের মূল্যায়ন করেছেন। সজনীকান্ত দাস (১৩৫৩) বা সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৭২) আলোচনায় উপনিবেশিত গদ্যের এমন বয়ান পাওয়া যায়, যাতে খোদ ঔপনিবেশিক শাসনকে উপনিবেশিত ভারতবর্ষ বা বাঙালির জন্য পরম প্রাপ্তি বলে মনে হয়। অপেক্ষাকৃত গৌণ একটি ধারা পাওয়া যায় মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (1982), এস. এম. লুৎফর রহমান (২০০৪, ২০০৫) প্রমুখের লেখায়, যেখানে নতুন গদ্যের সঙ্গে উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার গভীর বিনিময়ের সংবাদ আছে; কিন্তু গদ্য ও ভাষাচিন্তার নতুন প্রবণতাকে

উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে ব্যাখ্যা না করে জোর দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-ইংরেজ আঁতাতের ওপর।[১২] ফলে তাঁদের আলোচনার অন্য অনেক মূল্য থাকলেও ঐতিহাসিক সত্যের ন্যায্যতা রক্ষিত হয়নি। মনে রাখা দরকার, হ্যালহেড, ফরস্টার এবং উইলিয়াম কেরি সমকালীন ভাষাবিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁরা পর্যাপ্ত আগ্রহ ও পরিশ্রমে অভিধান-ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছেন। ভাষার শুদ্ধতা ও বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁরা যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, সেগুলো তাঁদের জ্ঞান, প্রবণতা, সমকালীন বাস্তবতা আর প্রয়োজন দিয়েই বিচার করতে হবে। কোনো ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব এই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

ঔপনিবেশিক বাস্তবতার নানা জটিলতা ও প্রভাবের বিচিত্রগামিতা যথাসম্ভব আমলে এনে বাংলা গদ্য ও ভাষাচর্চার ইতিহাস রচনা বিরল হলেও দুর্লভ নয়। এ ক্ষেত্রে দেবেশ রায় (১৯৯০, ২০০৩) তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করেছেন। তাঁর কাজের (দেবেশ ১৯৯০) ঘোষিত সীমা প্রথমদিকের সংবাদ-সাময়িকপত্র হলেও দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিকতা তাতে রক্ষিত হয়েছে। বাংলা গদ্যের গড়ন-যুগে সংস্কৃত ও ইংরেজির আধিপত্য এবং সেই আধিপত্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি তাঁর আলোচনায় সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হয়েছে।

উপনিবেশিত সমাজ ও সংস্কৃতি-অধ্যয়নের একটা প্রধান সংকট উপনিবেশ-পূর্ব উপাদানগুলোর সঙ্গে পরিবর্তিত বাস্তবতার সম্পর্ক নির্ধারণ। কারণ, ‘খাঁটি’ অতীত বা ‘খাঁটি’ সংস্কৃতি বলে আসলে কিছু নেই – কোনো কালেই ছিল না:

> We have never been as aware as we now are of how oddly hybrid historical and cultural experiences are, of how they partake of many often contradictory experiences and domains, cross national boundaries, defy the *police* action of simple dogma and loud patriotism. Far from being unitary or monolithic or autonomous things, culture actually assume more ‘foreign’ elements, alterities, differences, than they consciously exclude. (Said 1994: 15)

এমনকি কোনো ধরনের প্রতিরোধ-সংগ্রামই – সে জাতীয়তাবাদী প্রকল্পই হোক আর সাংস্কৃতিক বি-উপনিবেশায়নই হোক – সাম্রাজ্যবাদী ভাবকল্প থেকে মুক্ত থাকে না।[১৩] এ কারণে তাত্ত্বিকদের অনেকেই উপনিবেশ-পূর্ব অতীত এবং স্থানীয় সংস্কৃতির রোমান্টিক মূর্তি তৈরি করে অতি-প্রশংসার তত্ত্বীয়-ব্যবহারিক বিপত্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন (Loomba 2001: 17-18)। কিন্তু একথাও সত্য, একদা-উপনিবেশগুলোর পরবর্তী বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের ফল হিসাবে দেখাও বিপজ্জনক। তাতে অতীত যেমন পুরোপুরি বাদ পড়ে, তেমনি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয়তার ব্যাপারটি চাপা পড়ে গিয়ে ঔপনিবেশিক সক্রিয়তাই একমাত্র নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষার পঠন-পাঠনে দুয়ের কার্যকর মেলবন্ধন ঘটানো অতি জরুরি। এখানকার অতীত যেমন পর্যাপ্ত লিখিত উপাদানে সমৃদ্ধ, ঠিক তেমনি উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার দীর্ঘ-গভীর প্রভাবে পরিবর্তিত। এ ক্ষেত্রে বর্তমান বাস্তবতা আর চাহিদার নিরূপিত সীমাই কেবল করণীয়ের সীমা নির্ধারণ করতে পারে।

১.৮

এ অভিসন্দর্ভে উপনিবেশায়ন ও বি-উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার পটভূমিতে বাংলা ভাষার ইতিহাসের কিছু দিক পরীক্ষিত হয়েছে। উপনিবেশায়ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর নতুন গড়নকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। উৎপাদন-

সম্পর্কের নতুন বিন্যাস, সামাজিক স্তরবিন্যাস, নিয়ন্ত্রক ধারণা ও মতাদর্শের উৎপাদন-পুনরুৎপাদন ইত্যাদির নিরিখে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষতায় গড়ে ওঠা বাস্তবতা বাংলা ভাষা, বিশেষত বাংলা গদ্যের, পরিবর্তিত রূপের গড়ন ও চর্চার ধরনে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, তা বিশ্লেষিত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। উনিশ শতকের শেষাংশে বাংলা ভাষাচর্চার চলমান ধারা ও প্রবণতা সম্পর্কে কেউ কেউ তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তার আগে পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের সমান্তরালে গড়ে ওঠা তত্ত্ব ও মতাদর্শের একচ্ছত্র ছায়ায় চর্চিত হয়েছে বাংলা ভাষা। সেই চর্চায় রকমফের আছে, মতবিরোধ আছে, আছে সৃজনশীল চর্চার স্বাভাবিক নানা অর্জন। কিন্তু বাংলা ভাষার ওই পর্বের প্রধান চর্চাকারীরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ভাষা-সম্পর্কিত ঔপনিবেশিক মতাদর্শকেই কমবেশি মেনে চলেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা গদ্য, ব্যাকরণ ও অভিধানের উনিশ শতকীয় চর্চার কিছু প্রধান ধারা পরীক্ষিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। একত্রে এ তিন অধ্যায়ের শিরোনাম হতে পারে ‘বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন’।

পরের চার অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা-বিষয়ক রচনাবলি অবলম্বনে বাংলা ভাষার বি-উপনিবেশায়নের কিছু প্রক্রিয়া এবং সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে রবীন্দ্রনাথের ভাষাদৃষ্টির পর্যালোচনা। উপনিবেশিত বাংলা ভাষার সংকট আর তা থেকে উত্তরণের উপায় নির্দেশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলোতে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাংলা ভাষার আভ্যন্তর-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেগুলো সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য এবং কৃতিত্বও নির্দেশিত হয়েছে। উপনিবেশায়নের মতো বি-উপনিবেশায়নও চলমান প্রক্রিয়া। তাতে যেমন ধারাবাহিকতা আছে, তেমনি আছে ছেদ, আকস্মিকতা ও উল্লম্ফন। বাংলা ভাষার বি-উপনিবেশায়নের যে পর্বটি বর্তমান অভিসন্দর্ভের কেন্দ্র, তার প্রধান ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ হলেও আরো অনেকের সক্রিয়তা তাতে কার্যকর ছিল। তাছাড়া উপনিবেশিত ভাষাদর্শনের প্রতাপও সর্বত্র ক্রিয়াশীল ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তম অধ্যায়ে একদিকে বি-উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার অন্য কয়েকজন তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষিত হয়েছে, অন্যদিকে গদ্য-ব্যাকরণ-অভিধানে উপনিবেশিত তত্ত্ব ও আদর্শের প্রবল প্রতাপ চিহ্নিত হয়েছে। মানভাষা, ব্যাকরণ, বানান, অভিধান ও পরিভাষা-প্রণয়ন – ভাষাচর্চার এসব প্রায়োগিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মত ও দৃষ্টিভঙ্গির সারসংক্ষেপ প্রণীত হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে।

উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া বাংলা অঞ্চলের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক নানাদিকের মতো বাংলা ভাষার সামগ্রিক চর্চাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সে প্রভাব কেবল অতীতের বাস্তবতা নয়, বরং ভাষাচর্চার বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গেও যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা-বিষয়ক রচনাকে বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পাঠ করা এই সন্দর্ভের অন্যতম লক্ষ্য।

টীকা

১. ইউরোপীয় নানা জাতির উপনিবেশ স্থাপনের আরো কিছু কারণও শনাক্ত করা যায় (Young 2003: 22-23)। মিশনারি কার্যক্রম পরিচালনা অন্তত স্পেনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কারণ ছিল। বস্তুত ক্যাথলিক-প্রটেস্টান্ট বিরোধ পুরো ইউরোপের ক্ষেত্রেই উপনিবেশ স্থাপন বা কব্জা করার প্রণোদনা জুগিয়েছে। তাছাড়া 'সভ্যকরণ প্রকল্প' বরাবরই উপনিবেশ স্থাপনের যুক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ অন্তত ব্রিটেনকে উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগী হতে বাধ্য করেছে। তবে লাভজনক বাণিজ্য, লুটতরাজ আর সম্পদ আহরণই যে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার আসল কারণ – তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

২. নতুন গবেষণাকর্মের আলোকে উপনিবেশ-পূর্ববর্তী আঠার শতকের ভারতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন সুগত বসু ও আয়েশা জালাল (Bose and Jalal 2002: 48-55)। এ পরিচয়ের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

আঠার শতকে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হয়েছে। কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি ও সমাজে তেজিভাব আর উৎপাদনশীলতা ছিল প্রবল। কৃষি, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও নগরায়ণের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। মারাঠা রাজ্যে আঠার শতকের শেষদিকে কৃষির উন্নতি ঘটে, কিন্তু রাজস্বের হার ছিল খুবই কম। হায়দার আলির মহীশূর বর্ণিত হত আস্ত বাগিচা হিসাবে। ষোড়শ শতকে কৃষির যে উন্নতি লক্ষ করা গেছে আঠার শতকেও তা অক্ষুণ্ণ থাকে। কৃষিনির্ভর পণ্য থেকে রাষ্ট্র পর্যাপ্ত কর আদায় করত; আর ওই পণ্যের দৌলতে গ্রামগুলো বাণিজ্যিক সচলতা আর বিনিময়ের বিস্তৃত জালে যুক্ত ছিল। এই ধরনের তেজি 'tributary commercialism' ই ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর কাছে ভারতকে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। ১৭০২-০৪ সালের দক্ষিণ ভারতের খাদ্যাভাব বাদ দিলে ওই শতকের সাত দশক ছিল দুর্ভিক্ষমুক্ত। ১৭৭০ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং ১৭৮৩ সালের উত্তর ভারতীয় দুর্ভিক্ষ পরবর্তীকালের ঘটনা। জমি ও কৃষিশ্রমিকের অনুপাত কৃষক ও উপজাতি কৃষিশ্রমিকদের অনুকূলে থাকায় জমির মালিকদের সঙ্গে দরকষাকষি ভালোই চলত। সাধারণভাবে বলা যায়, জনসংখ্যা, উৎপাদন, দ্রব্যমূল্য ও মজুরি আঠার শতক জুড়ে ক্রমোন্নতির দিকেই ছিল।

মোগল শাহেনশা সার্বভৌমত্বের সর্বোচ্চ প্রতীক হিসাবে থাকলেও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকেন্দ্রীকরণ জনজীবনে প্রভূত সজীবতার কারণ হয়েছিল। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে সমরূপতার জায়গায় বৈচিত্র্য ও জটিল সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। হিন্দু ও ইসলাম – দুই ধর্মের ক্ষেত্রেই ধর্মতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। আওয়াধে শিয়া আইনের যুক্তিবাদী ধারা উশুলি উঁচু-মাপের মার্জিত রূপে পৌঁছায়। জনজীবনে সচলতা থাকায় দক্ষিণের ব্রাহ্মণেরা অনেক বেশি হারে বেনারসে যায়, যা হিন্দু-দর্শনে নতুন জীবন সঞ্চার করে। কর্ণাটকের রাজদরবারগুলোতে দক্ষিণী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত মার্জিত রূপ লাভ করে। বিভিন্ন জায়গায় মোগল মিনিয়েচারের বদলে নতুন চিত্রকলার বিকাশ ঘটে। শিয়া-সুন্নি, শিখ-মুসলমান এবং হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছিল বটে, কিন্তু মোটের উপর আঠার শতকের পরিচয় শত্রুতার নয়, বন্ধুত্বের।

৩. আলবেয়ার মেমি এই সামগ্রিকতার কথাই বলেছেন: 'I first had to understand the colonizer and the colonized, perhaps the entire colonial relationship and situation.' (Memmi 1976: vii)
ঔপনিবেশিক সম্পর্কের সর্বব্যাপ্তি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত: 'The colonial relationship which I had tried to define chained the colonizer and the colonized into an implacable dependence, molded their respective characters and dictated their conduct.' (Memmi 1976: ix)

৪. উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে মেমির অভিজ্ঞতা স্মরণীয়:

As I stated repeatedly, a man is a product of his objective situation; thus I had to ask myself if I would have condemned colonization so vigorously if I would actually benefited from it myself. I hope so, but to have suffered from it only slightly less than the others did has made me more understanding. (Memmi 1976: xvi)

৫. উপনিবেশিত ভারতের বিপরীতে চিন ও জাপান এর ভালো উদাহরণ। ভারতীয়রা পশ্চিমা জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসেছে অনেক আগে এবং জনগোষ্ঠীর একটা ছোট অংশ তা রপ্তও করেছে। কিন্তু সমগ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার ও ভোগের বিবেচনায় চিন ও জাপান যে সাফল্য দেখিয়েছে, ভারতের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। জ্ঞানের বিশ্বজনীনতা আর অনুন্নত জনগোষ্ঠীর উন্নত জনগোষ্ঠীকে অনুসরণ অতি প্রাচীন ব্যাপার। কিন্তু উপনিবেশায়নের ইতিহাস প্রমাণ করে, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে এ অনুসরণ সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে সুমিত সরকার লিখেছেন:

In countries which escaped political conquest either completely or for a fairly long period – Japan, of course, but also to a much more limited extent Ottoman Turkey and Egypt under Muhammad Ali – the pattern of modernist change was significantly different from that witnessed in British India. … the whole approach was far more pragmatic. The intellectuals learnt less of Shakespeare and Mill and very much more of modern technology and science – and from the very beginning attempts were made to assimilate the latter into the language of the country. (Sarkar 2000: 27)

৬. এডওয়ার্ড সাইদ তাঁর *Orientalism* গ্রন্থ প্রসঙ্গে এ ধরনের যান্ত্রিক ও নির্ধারিত সম্পর্কের ধারণা বাতিল করে দিয়েছেন:

If we eliminate from the start any notion that 'big' facts like imperial domination can be applied mechanically and deterministically to such complex matters as cultures and ideas, then we will begin to approach an interesting kind of study. (Said 1995: 12)

৭. সংশ্লিষ্ট পাঠের ক্ষেত্রে হোমি কে ভাবার প্রাসঙ্গিক মন্তব্য:

My reading of colonial discourse suggests that the point of intervention should shift from the ready recognition of images as positive or negative, to an understanding of the processes of subjectification made possible (and plausible) through stereotypical discourse. (Bhabha 2006: 95)

৮. এ ধারার প্রতিনিধিস্থানীয় নমুনা হিসাবে বহু-উদ্ধৃত দুটি গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। একটি ভি. সি. জোশি সম্পাদিত *Rammohun Roy and the Process of Modernization in India* (1975); অন্যটি অশোক সেনের *Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones* (1977)। প্রথমটির ভূমিকায় বলা হয়েছে:

The object of this publication is neither to bring out another volume of eulogy nor to debunk 'Rammohun Roy myth'. … The volume also includes a historiographical study which helps to discover Rammohun Roy's favourable image at different times and explains how he became 'Father of Modern India'.

রেনেসাঁসের প্রবক্তা রামমোহন নাকি অন্য কেউ, কিংবা এর মাহাত্ম্য বা ঊনতা কতটা – সেই বিচারের পরিবর্তে বইটির প্রবন্ধগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ওই কালের পরিস্থিতিকে, যা এর মুখ্য নিয়ন্ত্রক। পার্থ চট্টোপাধ্যায় যাকে বলেছেন 'সাবজেক্টিভ এজেন্সি', তার গড়ন ও কার্যকরতার ধরনের দিকেও সমান নজর রাখা হয়েছে, যেন, উপনিবেশায়ন বিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রক ও একমাত্র সক্রিয় সত্তা হয়ে স্থানীয় সক্রিয়তাকে মুছে না দেয়।

অশোক সেন বিদ্যাসাগরের পাঠ-প্রসঙ্গে বলেছেন, এটি বিশেষভাবে বিদ্যাসাগরের মূল্যবিচার নয়। বরং তাঁর কালের সংকটগুলো আজকের সংকট বুঝতে কিভাবে সাহায্য করতে পারে তারই বিচার-বিশ্লেষণ:

> The story points to a broader effects of imperialism than are usually considered in settling profit and loss accounts of our so-called modernity. In this sense the power of colonial darkness did not cease with the country's political independence. Time and again, the cause of reason, enlightenment and even socialism has met with reverses in its inability to reach deep into the roots of our society and people. This is where Vidyasagar's experience has contemporary meaning. (Sen 1977: xiv)

বরুণ দে এই 'আধুনিকতা' প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'The belief that modernity is replicated in modernization is a fallacy that flaws the understanding of the real modernization process itself.' (De 1976: 124)

রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক ইতিহাসতত্ত্বের মূল গলদ চিহ্নিত করে নতুন ইতিহাসের জন্য করণীয় নির্ধারণ করেছেন এভাবে:

> To assert the autonomy of Indian historiography amounted, therefore, to challenging that right – Britain's right to rule India. In other words, *no historiography of colonial India would be truly Indian except as a critique of the very fundamentals of the constitutive power relationship of the colonialism itself*. If with all the help it had from a maturing Bengali prose, historiography in that language still continued to be tied to the colonial model, it was because of its failure to develop a critique of colonialism in any *fundamental* sense. (Guha 1988: 50)

পূর্ব-বর্ণিত তৃতীয় ধারার ইতিহাস এই অর্থে 'নিজস্ব' ইতিহাস ও ইতিহাসতত্ত্বেরই বাস্তবায়ন।

৯. ভাষার শুদ্ধতার ধারণা অতি প্রাচীন। ঠিক কোন রূপে ভাষা সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়, সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট মত তৈরি করা অসম্ভব। তবু দেখা যায়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবার মধ্যে এই শুদ্ধতার ধারণা আছে। এর বিপরীতে আছে ভাষার বিকৃতির ধারণা। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রশ্রয়ে এবং নতুনভাবে সংস্কৃত ভাষার মহিমা আবিষ্কৃত হওয়ার প্রেক্ষাপটে কলকাতার বাঙালি হিন্দুসমাজে এই শুদ্ধাশুদ্ধির ধারণা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। যা কিছু প্রচলিত তার প্রায় সবই আখ্যা পেয়েছিল অশুদ্ধির। এমতাবস্থায় ভাষিক শুদ্ধিকরণের এক বিকট কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে যেতে হয়েছিল।

১০. লিখনরীতি সম্পর্কে ব্লুমফিল্ডের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য: 'Writing is not language, but merely a way of recording language by means of visible marks. … In order to study writing, we must know something about language, but the reverse is not true.' (Bloomfield 1967: 21)

১১. উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া উপনিবেশিতের বাস্তবতাকে কত গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় ভারতের বর্ণপ্রথার ইতিহাসে। নৃবিজ্ঞান বা সমাজবিদ্যায়, বা ভারতের সমসাময়িক রাজনৈতিক বাস্তবতায়, ভারতীয় সংস্কৃতি সবসময়েই বর্ণিত হয়েছে বর্ণের সাপেক্ষে। বর্ণই ভারতীয় ঐতিহ্যের আকর হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, এবং এখনো – ঔপনিবেশিক আমলের মতোই – বর্ণপ্রথাকে দেখা হয় ভারতের আধুনিকায়নের প্রধান বাধারূপে। কিন্তু সম্প্রতি একজন গবেষক এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন:

> Much of what has been taken to be timeless tradition is, in fact, the paradoxical effect of colonial rule, where culture was carefully depoliticized and reified into a specially colonial version of civil society. In ethnographic fieldwork, in the reading of texts traditionally dismissed as so much myth and fabulous legend, in reconstructing the precolonial history of Indian states and societies, in regarding colonial texts, and in charting the contradictory effects of colonial rule, I found that the categories of culture and history subverted each other opening up supplemental reading of ‘caste’ that made it seem more a product of rule than a predecessor of it. (Dirks 2007: 61)

এমন দৃষ্টান্তের পর তাঁর এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলেই মনে হয়: ‘This reference to anthropology reminds us that Western scholarship has consistently been part of the problem rather than the solution.’ (Dirks 2007: 61)

১২. মুহম্মদ সিদ্দিক খানের *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা* এ দৃষ্টিভঙ্গির আরেক উদাহরণ। তিনি লিখেছেন: ‘আরবী-ফারসীবর্জিত সংস্কৃতগন্ধী বাংলা ভাষার উন্নয়নে ইংরেজদের এই উৎসাহ ছিল বাঙ্গালী মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু করার বহুবিধ কারসাজির অন্যতম’ (মুহম্মদ সিদ্দিক ১৩৭১: ২৮)। এ গ্রন্থের এক সমালোচনায় আনিসুজ্জামান সঙ্গত কারণেই এ ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব বাতিল করে দিয়েছেন (আনিসুজ্জামান ১৩৭৩: ২৬৬)।

১৩. এডওয়ার্ড সাইদের মতে: ‘That is the partial tragedy of resistance, that it must to a certain degree work to recover forms already established or at least influenced or infiltrated by the culture of empire. This is another instance of what I have called overlapping territories.’ (Said 1994: 253)

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলায় উপনিবেশায়ন

২.১ ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু: দ্বিধা, অগ্রগতি ও সাফল্য

পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ ও গভীর[১] যে ঔপনিবেশিক শাসনের শিকার হয়েছে বাংলা অঞ্চল, ১৭৬৫ সালেই তার কার্যকর সূচনা। ওই বছরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা সুবার রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পায় (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৩৯)। রণজিৎ গুহের মতে, এই ঘটনা 'দেওয়ানি' নামে চিহ্নিত হওয়ায় এর প্রকৃত তাৎপর্য বহু পণ্ডিতের চোখ এড়িয়ে গেছে।[২] কার্যত নবাবের পক্ষে ফৌজদারি কায়কারবার চালানোর দায়িত্বও পেয়েছিল কোম্পানি। ফলে উপমহাদেশে ইংরেজ ঔপনিবেশিক দখলদারির প্রধান হাতিয়ারগুলো – বলপ্রয়োগ, উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র জমির উপর দখল, আর নিজেদের শাসন-শোষণকে বৈধ করার জন্য নানামুখী প্রপাগান্ডার সুযোগ – কোম্পানির কব্জায় চলে আসে। এশিয়ার অন্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর তুলনায় ইংরেজদের নীতি ছিল আলাদা। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আইনের এক চতুর সমন্বয় ছিল তাদের উপনিবেশায়নের ভিত্তি। ১৭৬৫ সালেই এই ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এর উপর ভর করে প্রশাসনিক ও ভাবাদর্শিক কাঠামোগুলো আস্তে আস্তে মজবুত করা সম্ভব হয়েছে (Guha 1988 : 4)।

একভাবে বলা যায়, বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল অনেক আগে – ১৬০০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে (সিরাজুল ২০০২: ৯-১২)। কোম্পানি বাংলা অঞ্চলের প্রথম কুঠি স্থাপন করে হুগলিতে ১৬৫১ সালে। ১৬৯০ সালে সুতানুটিতে কুঠি স্থাপনের পর স্থানীয় গোলযোগের সুযোগে আত্মরক্ষার অজুহাতে ১৬৯৬ সনে নির্মাণ করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। এ দুর্গকে কেন্দ্র করে প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় সামরিক বাহিনী দেশের ভিতরে ঢোকে। ১৬৯৮ সালে কোম্পানি সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা মৌজার জমিদারি সনদ লাভ করে। এখানে তারা গড়ে তোলে কলকাতা নগরী। এ নগরীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে কোম্পানির হাতে এবং এই সুরক্ষিত নগরীকে ঘাঁটি করেই ইংরেজরা পরবর্তীকালের রাজনৈতিক আধিপত্যের ছক কাটতে থাকে। বলা যায়, পরবর্তীকালের ঔপনিবেশিক বঙ্গ তথা ভারতরাজ্য ছিল কলকাতা-বসতিরই পরিকল্পিত সম্প্রসারণ।

দেশীয় রাজশক্তির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান শক্তিপরীক্ষা, দেশীয় বণিকশ্রেণির সঙ্গে নানামুখী আঁতাত এবং ক্রমশ বাণিজ্যের একচেটে অধিকার প্রতিষ্ঠা – এই ধারায় পরের আধা শতকের ঘটনাবলি বর্ণনা করা যায়। এরই একটা আপাত পরিণতি ঘটে পলাশির আমবাগানে।

সাধারণত ১৭৫৭ সালে সিরাজউদ্দৌলার পতনকেই বাংলার ইতিহাসে ইংরেজ শাসনের সূচনা হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু যাকে বলা যায় 'ঔপনিবেশিক শাসন' তা তখনো শুরু হয়নি। এমনকি ইংরেজদের নথিপত্রেও এ ধরনের দাবির কোনো আলামত চোখে পড়ে না। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের লেখা এবং সমকালীন দলিল থেকে সুশীলকুমার দে দেখিয়েছেন, সমকালে ইংরেজরা বড়জোর এই ভাবত যে, পলাশির বিজয়ে তারা কলকাতায় নিজেদের পূর্ব-অবস্থান

ফিরে পেয়েছে (De 1962: 6)। এতে করে অবশ্য ঘটনা হিসাবে পলাশির গুরুত্ব মোটেই কমে যায় না। পরদেশ দখলের জন্য যে মনোবল আর কৌশলগত নির্দেশনা দরকার হয়, কোম্পানির বেনিয়ারা নিশ্চয়ই পলাশির ঘটনা থেকে তা পেয়েছিল।

১৭৬৫ সাল থেকে কোম্পানি বাংলার সর্বময় ক্ষমতা ভোগ করলেও তারা কোনোভাবেই সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেয়নি। ক্লাইভ এ সময়ের শাসননীতি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন: 'The Company's sovereignty should be masked.' (Stokes 1959: 1) 'British Empire in India' কথাটা ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ১৭৭২ সাল থেকে চালু হয় (De 1962: 6)। হেস্টিংস অবশ্য সার্বভৌম শাসকের মতোই আচরণ করেছেন। তবু ১৭৭৩ সনের রেগুলেটিং অ্যাক্ট শুধু কলকাতা শহর এবং শহরতলির উপর ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে। ১৭৮৪ সালের ভারত আইনেও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি অনুক্ত থেকে যায় (সিরাজুল ২০০২: ২০৯)। শেষে ১৮১৩ সনে কোম্পানির চার্টার নবায়নের সময়ে প্রথমবারের মতো ব্রিটেনের রানিকে ব্রিটিশ ভারতের সার্বভৌম কর্তা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণা পরে এলেও শাসকপক্ষ নিজেদের ক্ষমতার ধরন সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। হেস্টিংসের সব সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর কাজের ধরনও ছিল স্বাধীন নৃপতির মতো (Sinha 1996: 76-77)। তিনি বাদশাহ শাহ আলমের বাৎসরিক বরাদ্দ বন্ধ করে দেন। বাদশার কাছ থেকে কোনো উপহার বা খেলাত গ্রহণ করতেও অস্বীকৃতি জানান। তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন লর্ড কর্নওয়ালিশ। ১৭৯০-৯৩ সনে তিনি যে আইন প্রণয়ন করেন, তাতে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়, দেশের সার্বভৌম কর্তা ইংরেজ (সিরাজুল ২০০২: ২০৯)। তাই বলা যায়, ১৮১৩ সালের ঘোষণা একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। কোম্পানি আগের প্রায় পাঁচ দশক ধরেই সার্বভৌমত্ব ভোগ করছিল।

দেখা যাচ্ছে, সার্বভৌমত্ব ঘোষণার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দ্বিধা ছিল। এ থেকে অনেক ঐতিহাসিক ভাবতে প্রলুব্ধ হয়েছেন, কোম্পানির এদেশ দখলের পেছনে কোনো পূর্বপরিকল্পনা কাজ করেনি; তারা উদ্ভূত পরিস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু দুনিয়া জুড়ে উপনিবেশায়নের ধারা পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে, এহেন সিদ্ধান্ত উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক না থাকারই ফল।[৩] বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অঞ্চলে আধিপত্য অর্জন, ঘাঁটি তৈরি, সামরিক বাহিনীর পত্তন এবং প্রয়োজনে সামরিক অভিযান মোটেই অপরিচিত ছিল না। বরং এটাই ছিল স্বাভাবিক রীতি। এশিয়ায় অঞ্চলবিশেষের দখল নিয়ে বাণিজ্য করাও ইউরোপীয় জাতিগুলোর পৌনঃপুনিক কৌশল। ফলে ক্লাইভদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা বাংলার দখল পেয়ে গেছে – এ প্রচারণা ভিত্তিহীন বলেই মনে হয় (Kulke and Rothermund 1999: 210)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করতে গিয়ে যে পন্থা অবলম্বন করে, সে একই পন্থায় এশিয়ার অন্যান্য দেশে, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে অগ্রগামী দল হিসাবে প্রবেশ করে ব্যবসায়ী ও ধর্মযাজকগণ, পরে আসে সশস্ত্র বাহিনী। ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করা আধুনিক উপনিবেশবাদের একটি কৌশল। এর আরেক কৌশল বারে বারে ঘোষণা করা যে, বিদেশি বণিক হিসাবে তাদের উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য, রাজ্যবিস্তার নয় (সিরাজুল ২০০২: ২০২-৩)। সব দেশেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই ঘোষণা দিয়েছে, আবার সর্বত্র ওই বণিক সংগঠনই ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলা বা ভারতে ভিন্ন কিছু ঘটেনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অন্তত শুরুতে বাণিজ্যিক সংগঠনই ছিল। কিন্তু নানা বাস্তব অবস্থায় সায় দিয়ে এর চরিত্রবদল হচ্ছিল। একটি নিরীহ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে হয়ে উঠছিল এক সাম্রাজ্যলিপ্সু শক্তি (Majumdar, Raychudhuri and Datta 1970: 630)। এ বদল যে অচেতনভাবে হচ্ছিল তা-ও

নয়। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির ডাইরেক্টররা মাদ্রাজ কুঠির প্রধানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'to establish such a politie of civil and military power, and create and secure such a large revenue to secure both … as may be the foundation of a large, well grounded, secure English dominion in India for all time to come.' (Majumdar, Raychudhuri and Datta 1970: 631)

বস্তুত কোম্পানি এগিয়েছিল 'ধীরে চল' নীতিতে। উপনিবেশগুলোর মধ্যে ভারত ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নত এবং রাজনৈতিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ। এ ধরনের একটি অঞ্চলে তড়িঘড়ি ক্ষমতাগ্রহণের বিপদ সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল। মোগল কর্তৃপক্ষকে সামনে রেখে দায়িত্বমুক্ত থেকে তারা আশাতীত মুনাফা লুটছিল। সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে দায় ও দায়িত্বের চাপে এই মুনাফা হারানোর ঝুঁকি তারা নিতে চায়নি। দেশীয় ভাষা, আইনকানুন, প্রথাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোম্পানির কর্মচারীদের জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। স্থানীয় কোনো সহায়ক শক্তি তখনো বিকশিত হয়নি। নিজেদের লোকবলও ছিল যৎসামান্য। ১৭৫৭ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় (Ghosh 1998: 1), কোম্পানির নিজস্ব কর্মচারীর সংখ্যা তখন মাত্র ৭৬ জন, ফোর্ট উইলিয়ামে ইউরোপীয় অফিসার আর সৈন্য মিলিয়ে সাকুল্যে ২৬০ জন, সারা অঞ্চলে কোম্পানির ঘাঁটিগুলোতে ছড়ানো-ছিটানো আরো ২৪০ জন – এই ছিল মোট লোকবল। এর বাইরে কোম্পানির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় এমন ইংরেজের সংখ্যা শখানেক। দীর্ঘ সময় ধরে বেনামিতে শাসনকাজ চালানোর বাস্তব কারণ হিসাবে এই পরিসংখ্যানই যথেষ্ট।[৪]

শাসনকর্তা হিসাবে গুছিয়ে বসার আগে কোম্পানি আশাতীত মুনাফাও পেয়েছে, আবার প্রস্তুতিরও পর্যাপ্ত সময় পেয়েছে। ১৭৬৫ সালের পর মোটামুটি তিন ধাপে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারা নিজেদের জন্য উপযুক্ত পন্থায় পৌঁছায় (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৩৯-৪১)। প্রথম পর্যায়ে (১৭৬৫-৭২) নায়েব দেওয়ান নাম দিয়ে মহম্মদ রেজা খাঁকে সামনে খাড়া রেখে রাজস্ব কিভাবে বাড়ানো যায়, সে চেষ্টা চলে। পরীক্ষামূলকভাবে নিলাম করে স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহের ভার ইজারা, জেলায় রেভিনিউ সুপারভাইজার নিয়োগ (১৭৭০), মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় রেভিনিউ কাউন্সিল আর কলকাতায় কন্ট্রোলিং কমিটি নিয়োগ (১৭৭১) ইত্যাদি করা হয়। এ ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। শাসনকর্তা নবাব, আর রাজস্ব সংগ্রাহক কোম্পানি – এই কুখ্যাত দ্বৈতশাসন এক ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে। জেলায় যে গোরা সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়, তারা ছিল সব অর্থেই আনাড়ি। রাজস্ব ও ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে তারা খুবই কম জানত। পালটাপালটি অভিযোগ আনার সুযোগ থাকায়, অর্থাৎ রেজা খাঁকে দোষ দেওয়ার সুযোগ থাকায় এবং নিজেদের বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাদের পক্ষে খাজনা আদায়ের কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ অব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ – বিশেষত অনাবৃষ্টি – মিলে নিয়ে আসে কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ১৭৭২-৮৬ দ্বিতীয় পর্যায়। এসময়ে 'নেটিভ' নায়েব দেওয়ান বাদ দিয়ে কোম্পানি দেওয়ানির ভার নেয়, রাজস্ব জমার কেন্দ্রীয় খাজাঞ্চিখানা মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় সরানো হয়। আর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয় প্রধানত পুরোনো জমিদারদের, কারণ রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তারা ভুঁইফোড় ইজারাদারদের চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ। ১৭৮৬ থেকে একটা নতুন পর্যায় শুরু হয়, যার শেষ ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্তে। ১৭৮৯ সালে কর্নওয়ালিশ একটা দশ-সালা বন্দোবস্ত করেন জমিদারদের সঙ্গে, এবং এ বন্দোবস্তই ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বলে ঘোষিত হয়।

এভাবে ঔপনিবেশিক শাসন প্রবেশ করল দ্বিতীয় পর্বে। আগের অব্যবস্থিত লুটতরাজের বদলে এল পরিকল্পিত 'শাসন'।

২.২ প্রথম পর্বের লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ

আঠার শতকের প্রথমার্ধে নবাবি শাসনে বাংলা অঞ্চল আর্থিকভাবে সচল ও সমৃদ্ধ ছিল (সুশীল ১৯৯২)। কোম্পানি-শাসনের তিন দশকের মধ্যে শুধু এই সমৃদ্ধিই নষ্ট হয়নি, অর্থনৈতিক গতি ও প্রবাহ ধ্বংস হয়ে এই অঞ্চল নজিরবিহীন দুর্দশায় পতিত হয়। বেশি হারে রাজস্ব আদায়, একচেটে বাণিজ্য কায়েম, দেশি শিল্প ধ্বংস এবং অর্থপাচারই এই দুরবস্থার কারণ। 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পলাশি-উত্তর কর্মকাণ্ডকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ঐতিহাসিকগণ নাম দিয়েছেন 'Plassey Plunder'। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লুটতরাজ এবং বিনা শুল্কে বাণিজ্য করে কোম্পানির লোকেরা রাতারাতি ক্রোড়পতিতে পরিণত' হয় (সিরাজুল ২০০২: ৩২)। এ সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, 'The year following Plassey and Buxar were a heyday of plunder and corruption.' (Ghosh 1998: 12) শাসকগোষ্ঠী যখন শাসনক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে শোষণে লিপ্ত হয় তখন শাসিতের অবস্থা কতটা শোচনীয় হতে পারে, আঠার শতকের শেষাংশের বাংলা ছিল তার উৎকৃষ্ট নমুনা।

খাজনা আদায়ের সুযোগ পাওয়ার পর কোম্পানির লক্ষ্য ছিল এই আয় থেকে সমস্ত খরচ নির্বাহ করা। বড় খরচ ছিল দুটি – ব্যবসার পুঁজি জোগানো, আর যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটানো। কোম্পানি এই দুই লক্ষ্য হাসিল করতে পেরেছিল। দিল্লির বাদশাকে ২,৬০,০০০ পাউন্ড আর বাংলার নবাবকে ৫,৩০,০০০ পাউন্ড দেওয়ার পর ১৭৬৫ নাগাদ কোম্পানির হাতে উদ্বৃত্ত আয় ছিল অন্তত ৩০,০০,০০০ পাউন্ড (Muir 1923: 79-85)। দেওয়ানি লাভের গুরুত্ব জানিয়ে রবার্ট ক্লাইভ কোর্ট অব ডাইরেক্টরসকে জানান, এর ফলে 'নবাব এখন বস্তুত কোম্পানির পেনশেনর মাত্র, বাদশাহও তাই। সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে ... দিউয়ানির ফলে কোম্পানির যে আয় হবে তা দিয়ে কোম্পানির সমস্ত খরচ মিটিয়ে ব্যবসায় সমস্ত পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব' (সিরাজুল ২০০২: ৫৪)। হয়েছেও তাই। ১৭৬৫-র পর কোম্পানিকে আর পণ্য কেনার জন্য ইউরোপ থেকে ধাতুপিণ্ড আমদানি করতে হয়নি। বাংলার রাজস্ব কেবল বাংলার পণ্য কেনার কাজই করেনি, ভারত জুড়ে দীর্ঘসময় ধরে চলা ঔপনিবেশিক যুদ্ধেরও খরচ জুগিয়েছে (Bose and Jalal 2002: 60)। বাড়তি খাজনার দাবি আগের শাসনামলেও ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে আগের শাসনের পার্থক্য ছিল কৃষক-তাঁতির কাছ থেকে সম্পদ শুষে নেওয়ার নিপুণতায় আর দায়িত্বহীন নিষ্ঠুরতায়।[৫]

এই 'নিপুণতা' আর 'দায়িত্বহীন নিষ্ঠুরতা'র নগ্ন পরিচয় মেলে দুর্ভিক্ষকালীন খাজনা আদায়ে। দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রায় এক কোটি লোক মারা গেলেও কোম্পানির রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে প্রায় আগের মতোই। লেনদেনের ভারসাম্য ভেঙে পড়ায় – অর্থাৎ উচ্চহারে খাজনা আদায় করে বিনিময়ে কৃষির উন্নতির কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় – বাংলার কৃষি ও কৃষক ধ্বংস হয়েছিল। আর পুরোনো ব্যবসায়ী সমাজ ধ্বংস হয় কোম্পানির একচেটে ব্যবসার চাপে। সমকালীন ঐতিহাসিক গোলাম হোসেইন খান লিখেছেন: 'The English have deprived the inhabitants of these countries of various branches of commerce and benefit, which they had ever enjoyed heretofore.' (Khan 1926: 201) যেখানেই লাভের সম্ভাবনা দেখেছে, সেখানেই কোম্পানি এই ধরনের একচেটে বাণিজ্য কায়েম করেছে। আর কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা তো ছিলই। পলাশির আগে নবাবের সঙ্গে কোম্পানির বিরোধের প্রধান কারণই ছিল কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা। এই ব্যবসা কেবল অবৈধই ছিল না, এর উপায়ও ছিল অসাধু এবং নিপীড়নমূলক। কোম্পানির কর্তৃত্বে এই নিপীড়ন সব সীমা ছাড়িয়ে যায়। খুব কম বেতনে নিযুক্ত হয়ে এসে

কোম্পানির কর্মচারীরা মূলত ব্যক্তিগত ব্যবসায় লিপ্ত থাকত। এতে যে বিপুল অর্থাগম হত তার আদর্শ নমুনা উইলিয়াম বোল্টস। ১৭৬০ সালে বোল্টস কোম্পানির চাকরিতে যোগদান করেন বাৎসরিক দুইশ টাকা বেতনে। ছয় বছর ব্যক্তিগত ব্যবসা করে তিনি উপার্জন করেন নয় লক্ষ টাকা (সিরাজুল ২০০২: ৫৭)। সিরাজুল ইসলাম মন্তব্য করেছেন, বোল্টস মোটেই সর্বোচ্চ মুনাফাখোরদের একজন ছিলেন না। আর কোম্পানি বা এর কর্মচারীরা এই বিপুল মুনাফা মোটেই দক্ষ ব্যবসায়ী হিসাবে আয় করেনি। সমকালীন প্রায় সব নথিপত্রেই দেখা যায়, শাসক হওয়ার 'সুবিধা' আর বলপ্রয়োগই তাদের বাণিজ্যের সারকথা। উল্লেখ করা দরকার, বাণিজ্য ও উৎপাদনের একচেটে অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও কৌশলে পুরো উনিশ শতক জুড়েই বহাল ছিল (২.৪ দ্রষ্টব্য)।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পর্বে স্থানীয় বণিকশ্রেণির সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আঁতাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বণিকশ্রেণি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পুরোনো ঐক্য তারা নষ্ট করে দেয়। এর ফলে দেশীয় রাজ্যগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধের শেষ সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু একবার ক্ষমতায় আরোহণের পর ভারতীয় পুঁজি ইংরেজদের কাছে কোনো সুযোগ তো পায়ইনি, বরং সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে ব্রিটিশরা অল্পদিনের মধ্যেই এই পুঁজিপতি শ্রেণিকে পথে বসিয়ে দিয়েছে। এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া এবং পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থানীয় পুঁজি যে সুযোগ পেয়েছিল এখানে তাও পায়নি (Bose and Jalal 2002: 65)।

কোম্পানি-শাসনের প্রথম পর্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিল্পখাত। ইংল্যান্ডের শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা এ খাত পায়নি, পাওয়ার কথাও নয়। ফলে বাংলায় শিল্পোদ্যোগের পরবর্তী দশা হয়েছিল শোচনীয়। কিন্তু যা আগে ছিল, তাও অল্পদিনের মধ্যে গতি ও পথ হারিয়ে ফেলে।[৬] ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে এই অবশিল্পায়ন অবশ্য খুবই সংগতিপূর্ণ। উপনিবেশের ইতিহাসে সবসময়েই দেখা গেছে, ঔপনিবেশিক শক্তি নিজের অনুকূলে উপনিবেশের অর্থনীতি পুনর্বিন্যস্ত করেছে, এবং এর ফলে সব ক্ষেত্রেই দেশীয় শিল্প ধ্বংস হয়েছে।

কোম্পানির শাসনে বাংলার বিপর্যয়ের চিত্র পাওয়া যায় মূলত ইংরেজ ভাষ্যকারদের রচনায়। তাই এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করার সুযোগ কম।[৭] এদেরই একজন আলেকজান্ডার ডাউ। তাঁর মতে (উদ্ধৃত, সিরাজুল ২০০২: ৯৮-৯৯), মোগল সাম্রাজ্যের পতন বাংলার অর্থনীতি ধ্বংসের কারণ নয়। স্বাধীন নবাবদের আমলে বরং বাংলা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। নবাবদের নীতি ছিল, 'মধুর চাকের মধু খাওয়া, চাক ধ্বংস করা নয়'। কিন্তু ইংরেজরা করল তার বিপরীত। এরা মধু খেয়ে মধুর চাক পর্যন্ত ধ্বংস করে দেয়। তিনি বলেন, বাংলার অর্থনীতির অবনতি শুরু হয় সেই দিন থেকে, যেদিন বিদেশি বণিকেরা দেশের ক্ষমতা কেড়ে নেয়। গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে স্থায়ী সুবিধা লাভের চেষ্টা না করে কোম্পানির লোকেরা তৎপর হয়ে ওঠে কিভাবে রাতারাতি নিজেদের ভাগ্যোন্নতি করা যায়। ডাউ মন্তব্য করেন, বাংলাদেশ থেকে ব্রিটেন প্রতি বছর প্রায় দেড় কোটি টাকা গ্রহণ করে এবং এ বিপুল অর্থের বিনিময়ে বাংলাদেশ এক কপর্দকও লাভ করেনি। এটাই বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ।

এই বিপর্যস্ত অর্থনীতি থেকে কোনো দীর্ঘমেয়াদি মুনাফা আশা করা যায় না। তাই দরকার হয় দীর্ঘমেয়াদি লাভের উপযোগী আর্থিক-প্রশাসনিক সংস্কার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সে চেষ্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

২.৩ ঔপনিবেশিক শাসনের তিন ভিত

ভারতের ইংরেজ উপনিবেশকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে: 'One of the world's stablest and most subtly-managed colonial polities of all time.' (Nandy 1989: 30) এ উদ্যোগ শুরু হয়েছিল আয়ের প্রধান উৎস জমির ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে। বাংলা অঞ্চলের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত এই ব্যবস্থা অবশ্য শুধু জমির বন্দোবস্ত ছিল না। এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল আইন ও বিচারব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্র। একটি অবৈধ শাসন – যা জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় – সফল হতে পারত কেবল এই তিনের জনবিরোধী কিন্তু নিপুণ সমন্বয়ে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন তা সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছিল।

২.৩.১ ভূমি-ব্যবস্থাপনা

কোম্পানি-সরকার অন্তর্গত চরিত্রে এক বিদেশি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। লাভ-ক্ষতির নিরিখেই এর প্রশাসনিক নীতি নির্ধারিত হয়েছে। এ নীতির মূলকথা সবচেয়ে কম খরচে সর্বাধিক মুনাফা নিশ্চিত করা। চলতি অবস্থায় আয়ের কোনো নিশ্চয়তা তো ছিলই না, বরং তা দিন দিন কমছিল। তাই দরকার হয় সংস্কারের। এমন সংস্কার যা দেশের আর্থিক অবনতি ও অনিশ্চয়তা রোধ করে কোম্পানির আয় নিশ্চিত করবে। সব কুল রক্ষা করে, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সুবিধাজনক ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনা চলছিল দীর্ঘ দুই দশক ধরে। সমকালীন অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণার প্রায় সবগুলোই কোনো না কোনোভাবে একে প্রভাবিত করেছিল। রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন, ইউরোপীয় অর্থবিদ্যার আধুনিক কালের প্রথম একটি ঘরানা, যাদের ফিজিওক্রাট বলে, এ ব্যাপারে বেশ প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছিল (Guha 1963:18)। কিন্তু ফিজিওক্রাটরা এক পক্ষ মাত্র। এ বিতর্কে শামিল হয়েছিল আরো নানা মত ও ধারণার পক্ষ।[৮] তাদের রাজনৈতিক ও স্বার্থগত সংশ্লিষ্টতায়ও ছিল বিস্তর ফারাক। কিন্তু ঔপনিবেশিক বাস্তবতা ও দরকার অনুযায়ী সম্পত্তির ব্যবস্থাপনাই যে সরকারের মূলনীতি হওয়া উচিত, তাতে কারো সন্দেহ ছিল না। আলেকজান্ডার ডাউ এবং পেট্রুল্লো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রূপরেখা আঁকেন। একে সরকারি মহলে পরিচিত করে তোলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। ডাইরেক্টরসভা এর অনুকূলে মত দেয়। কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে উপস্থাপন করেন তাঁর 'কৃষিবিপ্লব তত্ত্ব'। বাংলার কৃষিকাঠামোয় পশ্চিমা মুক্ত-অর্থনীতি কতটা কাজ করবে – এই সন্দেহই ছিল প্রতিপক্ষ শোরের যুক্তি-তর্কের প্রধান দিক। ডাইরেক্টরসভা অবশ্য দুজনের নথিপত্র দেখে মত প্রকাশ করে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-প্রশ্নে কর্নওয়ালিশ ও শোরের মধ্যে নীতিগত কোনো পার্থক্য নেই। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য শুধু পদ্ধতি ও সময়ের প্রশ্নে। কর্নওয়ালিশের কৃষিবিপ্লবের ধারণায় বিমুগ্ধ হয়ে কোর্ট পরিতাপ প্রকাশ করে বলে:

> এহেন ব্যবস্থা যদি বিশ বছর আগে গ্রহণ করা হত তবে নিঃসন্দেহে দেশ এখন কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে অনেক বেশি উন্নত থাকত। অভূতপূর্ব নতুন সুযোগ-সুবিধা ও সমৃদ্ধি সম্ভোগে দেশবাসীর চরিত্র উন্নত হত, এবং ব্রিটিশ শাসনকে তারা আশীর্বাদস্বরূপ গ্রহণ করত। (সিরাজুল ২০০২: ১১৫)

এ 'ভুলে'র মাশুল যেন আর দিতে না হয় সেজন্য কোর্ট অনতিবিলম্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করার পক্ষে রায় দেয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে গিয়ে ইংরেজপক্ষ যে বিচারবিশ্লেষণ ও তত্ত্বচর্চার পরিচয় দিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে সমকালীন ইংল্যান্ডের সাবালকত্বের নিদর্শন। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতের ক্ষেত্রে দুটি প্রত্যক্ষ কারণ তাদের সিদ্ধান্তকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল। এক. খাজনা আদায়ে অপারগতা এবং নগদ অর্থের সংকট। রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করতে কোম্পানি ১৭৬৫ সাল থেকেই নাজেহাল হচ্ছিল। আর ঔপনিবেশিক লড়াইয়ের খরচ চালানোর জন্য কর্নওয়ালিশের দরকার বিস্তর নগদ টাকা। এ সমস্যা থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।[৯] উল্লেখ্য, টিপুর পতনের পর ভারতবর্ষের আর কোথাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো কোনো বন্দোবস্ত করা হয়নি। দুই. শাসন চালানোর জন্য স্থানীয়দের মধ্য থেকে 'নিজস্ব লোক' তৈরি: 'They believed, and the history of British rule in India has eminently confirmed them, that this would make it possible for the Raj to strike its roots deeply into the loyalty of its beneficiaries, the new landowning class.' (Guha 1963: 18)[১০] এর বাইরে আরেকটি ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল জমির উপর জমিদারদের চিরস্থায়ী মালিকানা নিশ্চিত করে কৃষিবিপ্লবের পথ সুগম করা। কিন্তু ইংল্যান্ডের এই অভিজ্ঞতা খুব স্বাভাবিক কারণেই – যে কারণগুলো শোর অনুমান করেছিলেন – উপনিবেশিত বাংলার ক্ষেত্রে কাজ করেনি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রকল্প। এরিক স্টোকসের মতে, 'The Permanent Settlement of Bengal (1793) was a frank attempt to apply the English Whig philosophy of government.' (Stokes 1959: 5) কর্নওয়ালিশের বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো, পুলিশ, আইন-আদালত সবই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফলে বাংলার পরবর্তী ইতিহাসের প্রধান ধারার প্রায় সকল দিক সম্বন্ধেই এটি ছিল এক নির্ধারক সিদ্ধান্ত। ভূমি ও শাসনের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার স্বার্থে কর্নওয়ালিশের লক্ষ্য ছিল বৃহৎ ভূস্বামী পরিবারগুলো – যেগুলো দেশের প্রায় অর্ধেক ভূমি নিয়ন্ত্রণ করত – ধ্বংস করে ছোট ও মাঝারি জমিদার তৈরি করা। সরকারের গৃহীত নীতির ফলে দশ বছরের মধ্যেই বাংলার শ্রেষ্ঠ জমিদারেরা অতি নগণ্য বা নিঃস্ব হয়ে যায় (সিরাজুল ২০০২: ১৪৮)। নতুন ছোট-বড় জমিদারি কিনে নেয় নগদ অর্থের মালিকেরা, যারা ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সহযোগে ওই অর্থের মালিক হয়েছিল। পরবর্তী দীর্ঘ শাসনকালে যে অন্তত বিত্তবান শ্রেণির মধ্যে কোনো 'রাজদ্রোহ' দেখা যায়নি, তার মূল এখানেই রচিত হয়েছিল। সহজেই অনুমান করা যায়, এ ব্যবস্থা জমিদার-তোষক এবং কৃষক-বিরোধী।[১১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের যে প্রত্যয় ছিল তা মোটেই বাস্তবায়িত হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। প্রচলিত রীতিরেওয়াজ ও জনগণের চাওয়ার সঙ্গে এর কোনো যোগ ছিল না। ফলে অনবরত গোলমাল তৈরি হয়েছে। অনবরত এর ধারাগুলো সংশোধন করতে হয়েছে। এর সবগুলো পরিবর্তনই ছিল রায়তের স্বার্থের পরিপন্থি। জমিদারদের দাবি ও কৌশলের কাছে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য ছিল। তারা সহজেই ক্ষমতার কাছে পৌঁছতে পারত, আর ক্ষমতাও ছিল তাদের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রবর্তনের মাত্র ছয় বছরের মধ্যে ১৭৯৯ সালে ৭ নং রেগুলেশনের মাধ্যমে জমিদার-রায়ত সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন আনা হয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম কালাকানুন বলে পরিচিত এই 'হফতম' আইন জারির পর মাটিতে প্রজার অধিকার বলে আর কিছুই থাকেনি (সিরাজুল ২০০২: ১২৮-২৯)। ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন এবং ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন ব্যাপক কৃষক-অসন্তোষ আর কৃষক-বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে গৃহীত দুটি বিলম্বিত পদক্ষেপ। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, 'প্রজাদরদি' বলে পরিচিত এই

দুই আইন আসলে প্রান্তীয় ভূমিহীন কৃষকদের খুব সামান্যই উপকার করেছে; উপকৃত হয়েছিল মূলত শহুরে মধ্যবিত্তের অনুপস্থিত 'রায়ত'-অংশ (২.৭.৪ দ্রষ্টব্য)।

ঔপনিবেশিক শাসন তার নিজস্ব যুক্তিতেই জনবিচ্ছিন্ন। এর অর্থনৈতিক কায়কারবার সেই একই যুক্তিতে স্থানীয় অভিজাতগোষ্ঠীর সঙ্গে বিপুল জনমানুষের দুর্মর বিচ্ছেদ তৈরি করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত খুব নিপুণভাবে দীর্ঘমেয়াদি এই বিচ্ছিন্নতা সম্পন্ন করেছে, যার দ্বিতীয় নজির বাংলার বাইরে এমনকি ভারতের অন্য অঞ্চলেও পাওয়া যায় না।

২.৩.২ আইন ও বিচারব্যবস্থা

> সভ্যতার যে স্তরে ভারত আছে সেখানে 'প্রগতি'র বোধ গেলানোর সহজ উপায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তৈরি করা কড়া বিধি। আইন ও তার অর্থ বিধিবদ্ধ করবে রাষ্ট্র, প্রথার সারাৎসার নিষ্কর্ষণ করে তালিমি কিতাব লিখবেন প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদরা, তবেই এতকালের অপশাসনে পতিত সমাজ প্রগতির পথে এগোবে, প্রাচীন গৌরবের ও ঐতিহ্যের হদিশ পাবে, সভ্যতার দরবারে ভারতের কক্ষে জুটবে। আইন ও বিধিবদ্ধ শাসন হচ্ছে চূড়ান্ত, সেখানেই তাবত তর্কের ফয়সালা করা আছে। আইন প্রণয়ন থেকে কর সংগ্রহের মাধ্যমে যাবতীয় ভূমিরাজস্বের উপর সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব কায়েম করার তত্ত্বে যে রাষ্ট্রের জন্ম হল, সে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারী, আমলাতান্ত্রিক; সেখানে নাগরিকের কথা ওঠে না, ভারতীয়রা হচ্ছে প্রজা, পেনাল কোডই হচ্ছে শেষ কথা। এই অনুশাসন পর্বে দেশজদের বয়ান হলঃ 'তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু'। (গৌতম ১৯৯৪: ৩০৪-০৫)

– এভাবে উপনিবেশিত ভারতের আইন ও বিচারব্যবস্থার সারসংক্ষেপ করেছেন গৌতম ভদ্র। এই বর্ণনায় 'কাব্য' আছে; কিন্তু খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে ইংরেজের ভারতশাসন আইনের মূল সুর ও প্রায়োগিক বাস্তবতার দিকে যদি নজর দেওয়া হয়, তাহলে বলতেই হবে, এ বয়ান যথার্থ। আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য ছিল ন্যায়বিচারের একটা আশ্বাস তৈরি করা, যা সুদূর, অচেনা, কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর যোগ্যতা আর ন্যায়পরায়ণতার নির্ভরযোগ্য নিদর্শন (Kulke and Rothermund 1999: 240)। এই আইন ও বিচারব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল হেস্টিংসের আমলে। বিচারব্যবস্থাকে তিনি অনেকটা ইংল্যান্ডের অনুকরণে ঢেলে সাজান। কাজি-নির্ভর বিচারের বদলে প্রতিষ্ঠা করেন আদালতের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। নিজেদের অভিজ্ঞতা আর সুবিধার অনুকূলেই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল, কোনো জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ হিসাবে নয়ঃ 'This was by no means an altruistic measure: it helped to strengthen the foundation of British rule and it contributed to state finance, because the court fees were quite high.' (Kulke and Rothermund 1999: 228) হেস্টিংসের শুরু করা কাজগুলো সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যান কর্নওয়ালিশ। প্রশাসন থেকে আদালতকে আলাদা করা ১৭৯৩-এর কর্নওয়ালিশ কোডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই কাজ হেস্টিংস ১৭৮০ সাল থেকেই শুরু করেছিলেন (Aspinall 1987: 167)।

হিন্দু-মুসলমানের মূল আইন বদলানোর বিপদ সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। সেজন্য হেস্টিংস এবং পরে কর্নওয়ালিশ হিন্দু-মুসলিম মূল আইনে বিশেষ হস্তক্ষেপ করেননি। কেবল ফৌজদারি বিধিতে কিছু পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু লক্ষ্যের দিক থেকে এবং প্রয়োগের ধরনের দিক থেকে আগের মোগল আইন আর নতুন ব্রিটিশ আইনের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিরাট। সিরাজুল ইসলাম (২০০২: ১৯৩) এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এইভাবে: নতুন ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল চুক্তি, জন্মাধিকার নয়; খোলা প্রতিযোগিতা, সরকারদত্ত সুবিধা নয়; জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা,

গণ বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা নয়। সাধারণভাবে আগের জমানার তুলনায় ইংরেজ আমলে বিচারব্যবস্থায় যতটা ছেদ ঘটেছিল বলে মনে হয় – এবং ইংরেজ পক্ষও নিজেদের কীর্তি প্রচারের উছিলায় যে ছেদের দাবি করে থাকে – আদতে ততটা ঘটেনি। অন্তত কাঠামোর দিক থেকে কোম্পানির প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে মোগল প্রশাসনের নানা মিল ছিল। কিন্তু লক্ষ্যের দিক থেকে এবং বাস্তবায়নের পদ্ধতির দিক থেকে মোগল আর ব্রিটিশদের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিরাট। সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন:

> মোগল আমিলের দায়িত্ব ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রায় শান্তিশৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, আর কালেক্টরের উপর নির্দেশ ছিল এমনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করা যেন সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহে তা অবদান রাখে। মোগল বিচার সংস্থাপন ছিল অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত। গ্রামপঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জেলা আলি পর্যন্ত অসংখ্য ব্যক্তির ভূমিকা থাকত সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু প্রশাসনে জনগণকে সংশ্লিষ্ট করা ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থের পরিপন্থি। (সিরাজুল ২০০২: ২২৪)

বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম হোসেইন খান তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পুরোনো কাজির বিচার আর নবপ্রবর্তিত বিচারব্যবস্থার তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, এই বিচারব্যবস্থা জনগণের দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ (Khan 1926: 182-83; 199; 211)। বস্তুত, কী আইন বানানোর ক্ষেত্রে কী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে – আর যাই থাকুক, জনসংশ্লিষ্টতা ছিল না। ব্রিটিশ-ভারতের আইন ছিল খুব গভীর অর্থে ঔপনিবেশিক আইন – চাপানো, অচেনা আর ভীতিপ্রদ। জনগণ সম্পর্কে একেবারেই না জেনে বা সামান্য আধা-খেঁচড়া পরিচয়ে ব্যক্তিবিশেষ এই আইন রচনা করেছে:

> রানির শাসন শুরু হওয়ার আগে ভারত পার্লামেন্টের অধীন ছিল না বলে এর জন্য পৃথক আইনপ্রণেতা দরকার ছিল। কার্যত ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলের রেগুলেশনের মাধ্যমেই এই উপনিবেশ শাসিত হয়েছে। ওই বছর থেকে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে আইন-বিষয়ক একজন সদস্য যুক্ত হন। ১৮৬১ সালের আইনসভা গঠিত হওয়া পর্যন্ত এই একজনই আইনসভার কাজ করতেন। ১৮৬১-র আইনসভার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ইংরেজ আমলা, যদিও তাতে কিছু সংখ্যক দেশি অভিজাতেরও স্থান হয়েছিল। (Kulke and Rothermund 1999: 240; ইংরেজি থেকে অনূদিত)

কলকাতা সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইলিয়া ইম্পে এবং তাঁর উত্তরসূরি উইলিয়াম জোন্স থেকে শুরু করে পরবর্তী আইনপ্রণেতারা আইনের বিধিবদ্ধকরণ[১২] এবং নিখুঁতকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের জন্য যা দরকার – আইনের ব্যাপারে জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত করার মধ্য দিয়ে রাজস্ব আদায় ও অপরাপর আর্থিক কর্মকাণ্ডের গতি অবাধ করা – সে দাবি মেনে বিধির উৎকর্ষ সাধনই ছিল এসব আইন প্রণয়নের লক্ষ্য। এর সঙ্গে জনগণের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্ক ছিল নিতান্তই গৌণ।

এই বিচারব্যবস্থা কাজও করেনি। শুরুর দশকগুলো বিশৃঙ্খল অবস্থাতেই কেটেছে। কিন্তু গুছিয়ে বসার পর বিচারসংক্রান্ত জটিলতা আরো বেড়ে যায়। ১৭৯৫ সনে বর্ধমান জেলার বিচারক রিপোর্ট দেন, তাঁর আদালতে এত মামলা বিচারাধীন আছে যে, যদি নতুন কোনো মামলা গ্রহণ করা না হয়, আর দৈনিক দশটি করেও মামলার চূড়ান্ত রায় দেওয়া হয়, তবু সব অমীমাংসিত মামলা শেষ করতে লাগবে ত্রিশ বছর (সিরাজুল ২০০২: ১৫৩)। ১৮১২ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, বাংলার আদালতে বকেয়া মামলার সংখ্যা ১,৬৩,০০০ (Spear 2004: 184)। আইনি

প্রক্রিয়া ছিল অতি জটিল। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো পরিচয় ছিল না। খরচ মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় বেশির ভাগ মানুষ এর কাছেও ঘেঁষতে পারত না। বিচারের বড় অংশ হত হিন্দু ও মুসলিম আইন অনুসারে। কিন্তু কোর্টের পরিচালনা-পদ্ধতি এবং আইনের ব্যাখ্যা ছিল ব্রিটিশ আইনানুগ। আর বিচারকের অনভিজ্ঞতা ও অপটুতার সমস্যা তো ছিলই। তাই 'It is not surprising that the average suitor was bemused by the intricacy of the whole legal machine and saw in the legal process a lottery rather than the working of remote and passionless justice.' (Spear 2004: 184)[১৩]

কেবল অশিক্ষিত গরিব মানুষের ক্ষেত্রেই যে এমন ঘটত তা নয়। শিক্ষিত ধনী মানুষেরাও এই গোলমেলে অবস্থা থেকে রেহাই পায়নি। উনিশ শতকে কলকাতার পত্রপত্রিকায় ন্যায়বিচারের দুরবস্থা নিয়ে অসংখ্য প্রতিবেদন ও চিঠি ছাপা হয়েছে। ১৮২৯ সালে *সমাচার দর্পণে* লেখা হয়েছিল, দুর্গোৎসবে আর অত ঘটা হয় না। এর কারণ, 'কলিকাতাস্থ অনেক বড় বড় ঘর এখন দরিদ্র হইয়া গিয়াছে'। এই দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ, ধনীদের মকদ্দমা করবার শখ। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রীমকোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই'। (ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৩৯: ১৮০)[১৪]

ধনী-দরিদ্র কারো জন্য ন্যায়বিচারের বন্দোবস্ত করতে না পারলেও সুশাসনের প্রপাগান্ডা কিন্তু সবসময়েই ছিল। ঔপনিবেশিক বিচার ও কারাগার-ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে খাজনা আদায় এবং আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার দরকারের সঙ্গে যুক্ত। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কখনো শিথিলতা দেখায়নি। কিন্তু এ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এমন এক ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করা হয় যে, ব্রিটিশ শাসনের আগের আর পরের পরিস্থিতি মোটেই এক নয়। আগের অমানবিক ও অনিয়ন্ত্রিত শাসনের বদলে এখন যৌক্তিক ও মানবিক শাসন কায়েম হয়েছে। স্থানীয় সমাজে চালু শিশুকন্যা-হত্যা, সতীদাহ, জগন্নাথের রথের সামনে আত্মবলিদান ইত্যাদির উল্লেখ করে ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতীয় সভ্যতার কদর্য দিকগুলো বারবার মনে করিয়ে দেয়। আর এর মধ্য দিয়ে আসলে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এই সত্য যে, ভারতীয়দের কদর্য ধর্ম, সামাজিক অনাচার আর কুশাসনের তুলনায় ইউরোপীয়দের মানবিক ও যুক্তিকামী শাসনই অধিক কাঙ্ক্ষিত (Arnold 2005: 159-60)।

কোম্পানি-শাসনের প্রথম জমানায় বিচারের পূর্বতন 'বর্বর' রেওয়াজই চালু ছিল। ইউরোপে এ ধরনের শাস্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে ভারতের শাসকদের মধ্যেও 'বর্বর' প্রথাগুলো দূর করার চাপ তৈরি হয়। ১৭৯০ সালে কর্নওয়ালিশ অঙ্গচ্ছেদের বদলে সশ্রম কারাবাসের বিধান করেন। পরে এই বিপুল কারাভোগী শ্রমিকই ব্রিটিশদের রেল ও রাস্তা তৈরির মতো কাজের অন্যতম শ্রম-উৎস হয়ে ওঠে। ব্রিটিশরা সর্বদা দাবি করেছে, পূর্বতন বিচার ও শাস্তি-ব্যবস্থা রদ করে তারা ব্যাপকভাবে মানবিক ও যৌক্তিক প্রথা প্রবর্তন করেছে। কিন্তু দাবি মোতাবেক মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তি কমেছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এক হিসাবে দেখা যায় (Arnold 2005: 160), বাংলা অঞ্চলে ১৮১৬-২৭ সালের মধ্যে মোট ৯০০২ জন অভিযুক্তের অন্তত ৯ শতাংশ নিজামত আদালতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, ৩০ শতাংশের দ্বীপান্তর আর ১৯ শতাংশের বিভিন্ন মেয়াদে সাত থেকে চোদ্দ বছরের সাজা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ১৮৩৬-৪২ সালের মধ্যে কয়েদিদের অন্তত ৫-১৬ শতাংশ প্রতি বছর মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে 'বর্বর' শাস্তির বিধানকে একটি কার্যকর ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স হিসাবে ব্যবহার করলেও কার্যত মৃত্যুদণ্ডের হার কমেনি।

বিভিন্ন প্রশাসনিক দলিলপত্রে দেখা যায়, ভারতে ইংল্যান্ডের মতো বিচারব্যবস্থা কায়েমের অন্তরায় হিসাবে কর্তাব্যক্তিরা দুটি ওজর পেশ করেছেন। এক. উপনিবেশিত ভারতে কেন্দ্রের মতো শাসন সম্ভব নয়, কারণ, এরা এই শাসনের উপযুক্ত নয়। দুই. এ কাজের জন্য যে অর্থ দরকার, তা জোগানো সম্ভব নয়।

উপনিবেশ ও সুবিচার একসঙ্গে যেতে পারে না। উপনিবেশিত বাংলায় আলাদা কিছু ঘটেনি।

২.৩.৩ আমলাতন্ত্র

কোম্পানির যে রাষ্ট্র আঠার শতকের শেষাংশে গড়ে উঠেছিল, মর্মের দিক থেকে তাকে বলা যায় সামরিক স্বৈরতন্ত্র (Bose and Jalal 2002: 66)। এর এক হাতে ছিল সদাপ্রস্তুত ভাড়াটে সেনাবাহিনী, আরেক হাতে কেন্দ্রীভূত বেসামরিক আমলাতন্ত্র। ভারতীয়দের কাছে এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন। ১৭৭২ সালের পর থেকে এই আমলাতন্ত্র গড়ে উঠতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে এর কাঠামোগত ভিত্তি চূড়ান্ত হয়। ১৭৮৩ সালের দিকে গোলাম হোসেইন খান ইংরেজ প্রশাসনের জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা আর জনসাধারণের সঙ্গে অমোচনীয় দূরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন (Khan 1926: 195-99; 206)। পরবর্তীকালের দীর্ঘ সময়-পরিসরে এ অবস্থার সামান্যই পরিবর্তন হয়েছিল। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও ক্ষমতাবান এই আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণেই ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইংরেজের বিদেশি শাসনের প্রভাব পড়তে থাকে। 'ইংরেজরা ভারতবর্ষকে প্রথম যে ভাষায় সম্বোধন করেছে তা তার শিল্পসাহিত্যের ভাষা নয়, ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসির দক্ষ পরিভাষা'। (দেবেশ ১৯৯০: ৭০)

এই দক্ষতা ও ক্ষমতা এসেছে অবশ্য ভারতীয়দের টাকায়। শুরুর দিকে ভারতীয়দের বাদ দিয়ে আমলা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল কোম্পানির পুরোনো কর্মচারীদের। আশা করা হয়েছিল, তারা সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কোম্পানির অল্প বেতনের কর্মচারীরা – ইতিমধ্যেই ব্যাপক লুটপাট করে যারা কুখ্যাতি অর্জন করেছিল – ভারতীয়দের তুলনায় সৎ হবে, এই চিন্তাই তো গলদপূর্ণ (Aspinall 1987: 175)। এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয় ১৭৯৩-এর পর। আরো পরে ১৮০১ সালে ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বানিয়ে আমলাদের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করেছিলেন। এ প্রকল্প ডাইরেক্টররা অচিরেই বাতিল করে দেন; কিন্তু আমলাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তখন এতই সর্বগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল যে, তারা হেলিবারিতে ফোর্ট উইলিয়ামের বিকল্প তৈরি না করে পারেনি (Spear 2004: 179)। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের চাকরি এভাবে ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছিল। কিন্তু আসল কাজটা হয়েছিল ওই ১৭৯৩ সালেই – কর্মচারীদের বেতন বিস্ময়কর পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়ায়। ১৭৫০ নাগাদ কোম্পানির কর্মচারীরা মাগনা থাকা-খাওয়ার বাইরে বেতন হিসাবে বছরে পেত ১০ থেকে ৪০ পাউন্ড। ১৭৯৩-এর পরে এদেরই বেতন দাঁড়ায় – তিন বছর চাকরির পর ৫০০ পাউন্ড, ছয় বছর পর ১৫০০, বার বছর পর ৪০০০। কাউন্সিল-সদস্য হলে ১০০০০, আর গভর্নর জেনারেল হিসাবে ২৫০০০ পাউন্ডের হাতছানি তো ছিলই (Ghosh 1998: 2-3)। কোম্পানির আমলাতন্ত্র ছিল 'the best paid civil service in the world' (Spear 2004: 179)। ফলে এই চাকরি ইংল্যান্ডের সচ্ছল ও মেধাবীদের কাছেও লোভনীয় হয়ে ওঠে।[১৫]

প্রশাসন থেকে ভারতীয়দের আগেই বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের জায়গায় দরকারমাফিক পর্যাপ্ত ইউরোপীয় অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়নি। প্রথমদিকে এ ধরনের চাকরিপ্রার্থীরও অভাব ছিল। তারচেয়ে বড় কথা, পর্যাপ্ত সাদা অফিসার নিয়োগ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিবেচনায় অবাস্তব। তাতে খরচ বেড়ে মুনাফায় টান পড়ার সম্ভাবনা। ফল

হয়েছে এই: খুব অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় অফিসারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় বিপুল ক্ষমতা। জনগণের নাগালের বাইরে বহুদূরে এক-একটি ক্ষমতাকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ আমলারা, যেখানে ক্ষমতার গতি শুধুই উপর থেকে নিচে – কোনো ছকেই নিচ থেকে উপরে নয়। সেই ক্ষমতাকেন্দ্রগুলো এসে মিলেছে গবর্নর জেনারেলের পদে – কর্নওয়ালিশের আমল থেকে কার্যত যিনি ছিলেন ভারতের 'Great Mughal' (Spear 2004: 178)।

ঔপনিবেশিক প্রশাসন স্বভাবতই স্বৈরতন্ত্রী ও ফ্যাসিস্ট।[১৬]

২.৪ অর্থনৈতিক রূপরেখা

ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের আর্থিক নীতি গড়ে উঠেছে উপনিবেশের নিজস্ব নিয়মে। এ নিয়মের মূলকথা উৎপাদন ও বণ্টনের উপর পূর্ণ দখল কায়েম রাখা, বর্তমান ও ভবিষ্যত মুনাফা নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি কেন্দ্রের সুবিধা নিশ্চিত করে আর্থিক কারবারের নকশা আঁকা। ঔপনিবেশিক শাসনের পদক্ষেপগুলো খেয়াল করলেই বোঝা যায়, কেন্দ্রের বিকাশমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে সুবিধাজনক মৈত্রী গড়ে তোলাই ছিল তাদের লক্ষ্য (Kumar 1983: 284)। এতে কখনো কখনো উপনিবেশের কোনো অংশে তেজিভাব দেখা গেছে, কিছু মানুষ লাভবান হয়েছে – কিন্তু সামগ্রিক ভারসাম্য কখনো উপনিবেশিতের অনুকূলে আসেনি।

কোম্পানি-সরকারের প্রধান আয় ছিল রাজস্ব। ১৭৬৫ সালে বাংলার রাজস্ব থেকে কোম্পানির বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড। ১৮১৮ সালে মারাঠাদের পরাজয়ের পর এই আয় দাঁড়ায় দুই কোটি বিশ লক্ষ পাউন্ড (Bose and Jalal 2002: 71)। স্বভাবতই কোম্পানি এই সময়ে তার সামরিক এবং আমলাতান্ত্রিক কাঠামো এমনভাবে গড়ে তোলে যাতে এই আয় নিশ্চিত করা যায়। আয় বাড়ানোর লক্ষ্যেই ভারতের বিভিন্ন অংশে জমির বন্দোবস্ত হয় ভিন্ন ভিন্ন – বাংলায় চিরস্থায়ী জমিদারি, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে ৩০ বছরের অস্থায়ী রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত, উত্তর ভারতে ৩০ বছরের মহালওয়ারি। মহালওয়ারি ব্যবস্থাই স্থান-কাল-পাত্রের হেরফেরের খাতিরে একটু অদলবদল করে পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে কায়েম করা হয়। লক্ষ করার বিষয়, অস্থায়ী বন্দোবস্তগুলি ৩০ বছরের, কিন্তু অনগ্রসর প্রদেশে শীঘ্র আবাদ ও খাজনা বাড়বার আশায় বন্দোবস্ত ২০ বছরের বেশি হত না। সারা ভারতে এ তিনটি ব্যবস্থার প্রসার কেমন দাঁড়িয়েছিল তার একটা হিসাব ১৯২৮-২৯ সালে পাওয়া যায়: মোট আবাদি জমির ১৯ শতাংশ জমিদারি বন্দোবস্তে, ২৯ শতাংশ মহালওয়ারি বন্দোবস্তে, ৫২ শতাংশ রায়তওয়ারি বন্দোবস্তে (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৪৭)। বাংলা অঞ্চলে বিশেষ বাস্তবতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছিল; কিন্তু সরকারের জন্য এ ব্যবস্থা ছিল কম লাভজনক। ১৯৩৩-৩৪ সালের একটা হিসাব অনুসারে বাংলা প্রদেশে এক একর আবাদি জমির উপর রাজস্ব মাত্র শূন্য দশমিক বিরানব্বই টাকা, যখন মাদ্রাজে রাজস্ব গড়ে একর প্রতি দুই দশমিক বাষট্টি টাকা (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৪৯)। নানা কারণে পরেও কেউ কেউ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। কিন্তু আয় কমে, এমন কোনো ব্যবস্থায় যাওয়া ইংরেজ শাসকের পক্ষে সম্ভব ছিল না।[১৭]

উনিশ শতকের প্রথমাংশের আর্থিক কারবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক বাণিজ্যের উদারীকরণ এবং অর্থকরী ফসলের বাণিজ্য। বাণিজ্যের উদারীকরণ বা মুক্তবাণিজ্যকে সাধারণত একটি প্রগতিশীল ব্যাপার বলেই ভাবা হয়। উনিশ শতকে এর পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিলেন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। এই প্রচারণাকে সচেতন ও প্রগতিশীল 'রেনেসাঁসীয়' মনোভাব হিসাবে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা খুবই জোরালো। আসলে মুক্তবাণিজ্যের প্রসার বা একচেটে

বাণিজ্যের অবসান পুরোপুরি ইউরোপীয় বাস্তবতা, যার বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই (Kulke and Rothermund 1999: 232)। ১৮১৩ সালে একচেটে বাণিজ্যের আইনি অবসানের অনেক আগে থেকেই কোম্পানির বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত কমছিল – ১৮০০ সালের ১৪ লক্ষ পাউন্ড থেকে ১৮০৯ সালে দাঁড়ায় মাত্র ৯ লক্ষ পাউন্ড (Kulke and Rothermund 1999: 232)। এই বাণিজ্য-বিতর্কের সবচেয়ে কাজের কথা এই: বাণিজ্য মুক্ত হোক আর বাঁধা হোক, সবক্ষেত্রেই তা ইউরোপীয়দের মামলা – ভারতীয়রা এই 'মুক্তবাণিজ্যে'র ভাগ পায়নি।[১৮] আগে কোম্পানির কেন্দ্রীয় গুদামগুলো দূরের প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী গুদামের সঙ্গে নিখুঁত জালে সম্পর্কিত থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক শর্তে মাল কেনার সুযোগ পেত। নতুন বাস্তবতায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে 'এজেন্সি হাউস'গুলো চরম একচেটে কারবার প্রতিষ্ঠা করে। এরা আমদানি-রফতানি থেকে শুরু করে অর্থলগ্নি, দেশের ভিতরের খুচরা ব্যবসা, অর্থকরী ফসলের সামগ্রিক কারবার – সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করত। এই হাউসগুলো, বিশেষত কলকাতায়, বাণিজ্যের এমন একচেটে অবস্থা তৈরি করেছিল, ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে যার তুলনা মেলা ভার (Kumar 1983: 286)। পুরো ছকের মধ্যে দেশীয়রা কেবল ওই অংশে সুযোগ পেত, যে অংশ ইংরেজরা নানা কারণে নিতে চাইত না। ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এক ওলন্দাজ অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন, একটা দোতলা অর্থনীতি তৈরি হয়েছিল। এ ছবি ভারতের বেলায়ও সত্য (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৯৩)। উপরের তলায় জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলি, শেয়ার বাজার, ম্যানেজিং এজেন্সি, ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, বিলাতি জাহাজ, আমদানি-রফতানির সওদাগরি অফিস, ডবল এন্ট্রি হিসাব, বণিকসমিতি, গভর্নরের বাড়িতে ভোজ, সাদা-চামড়া ক্লাবে অনুগ্রহের আদান-প্রদান – এ এলাকায় ইংরেজপুঁজির আধিপত্য। নিচের তলাটা দেশি: ব্যক্তিগত ব্যবসা, ব্যাংকের জায়গায় মহাজন বা অন্যান্য কুশীদজীবী, ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় ও সুতা বিক্রি, কাঁচামালের রফতানির খুচরা ও পাইকারি কারবার, পাইকার-ফড়ে-আড়তদারের ভিড় আর সাহেবদের কাছে পিটিশন।

ঔপনিবেশিক নীতির ফলেই ভারতে শিল্প বিকশিত হয়নি। বস্ত্রখাতের উদাহরণ দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। ১৮৭০-এর আফগানযুদ্ধের কালে প্রবল সঙ্কটের মধ্যেও ভারত সরকার লাঙ্কাশায়ার লবির চাপে কর বাড়াতে পারেনি। ১৮৮২ সালে এই কর পুরো প্রত্যাহার করা হয়। ১৮৯০ সালে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে যখন ভারত সরকার আবার করারোপে বাধ্য হয়, তখন লন্ডন ভারতের উৎপাদিত বস্ত্রে আভ্যন্তর-কর আরোপের বিষয়টি আগে নিশ্চিত করে। এর ফলে বোম্বাই ও আহমেদাবাদে বিকাশমান বস্ত্রশিল্প প্রাথমিক কালের অতি প্রয়োজনীয় সংরক্ষণনীতির সুবিধা না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (Bose and Jalal 2002: 102)। কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবি করেছেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ চাহিদা এত বেশি ছিল যে, লাঙ্কাশায়ারের পাশাপাশি ভারতীয় বস্ত্রখাতও বিকশিত হতে পারত। কিন্তু এ দাবি অযৌক্তিক। কারণ, শতাব্দীর শেষ নাগাদ ব্রিটেনের ৫২ পাউন্ডের বিপরীতে ভারতের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ২.৫ পাউন্ড বা ৪০ টাকা। এই ক্রয়ক্ষমতায় চাহিদার পরিমাণ খুব বেশি হওয়ার কথা নয় (Bose and Jalal 2002: 102)।

পূর্বভারত ও তার কেন্দ্রস্থল কলকাতায় পুঁজির বিনিয়োগ হয়েছে উনিশ শতকীয় খাস ঔপনিবেশিক ধারায়। এ প্রবণতা হচ্ছে এমন সব বিনিয়োগ, যেগুলো উপনিবেশের অর্থনৈতিক বিশেষত শিল্পের বিকাশে তেমন সাহায্য করে না,[১৯] যেগুলি রফতানি এবং বিদেশি চাহিদার মুখাপেক্ষী এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরাসরি সরকারি আনুকূল্যে সাধিত। এক হিসাব অনুযায়ী (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৮৮) প্রায় অর্ধেক পুঁজি ব্রিটিশ-ভারত-সরকারকেই ঋণ দেওয়া হয়েছে। প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

৩৯% পুঁজি গেছে রেলকোম্পানিতে, যা সরকারের সঙ্গে চুক্তির ফলে – লাভ-ক্ষতি যাই হোক – বাঁধা ৫ শতাংশ হারে সুদ পায়। তারপর চা বাগিচা ইত্যাদিতে ৭% পুঁজি; কয়লা, পেট্রোল ইত্যাদি নিষ্কাশনে ২% বিনিয়োগ। ইংরেজরা এখানে এমন কোনো খাতে বিনিয়োগ করতে চায়নি, যা নিজ দেশের শিল্প বা পুঁজির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে।

ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে অর্থনীতির আঁতাতের এক নির্ভুল নমুনা নীলচাষের ইতিহাস (Bose and Jalal 2002: 102)। ভারতীয় বস্ত্রখাত ধ্বংসের পর চিনের চা লাভজনক পণ্য হিসাবে আবির্ভূত হয়। চা কেনার টাকা আসে ভারতীয় আফিম থেকে। আফিমের একচেটে বাণিজ্য কোম্পানির মোট আয়ের প্রায় পনের ভাগের জোগান দেয়। আর কেন্দ্রের রাজস্বদাবি মেটানোর ব্যবস্থা হয় চাষিদের জোরপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করে। নীলচাষ ইউরোপীয়রা ব্যক্তি-উদ্যোগে করাত ১৮০২ পর্যন্ত। পরে অন্তত অর্ধডজন বড় 'এজেন্সি হাউস' এ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। তখন এ ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক ছিল। ১৮৩০-এর কাছাকাছি সময়ে ইউরোপে নীলের চাহিদা কমে যাওয়ায় ব্যবসায় ধস নামে। ১৮৩৩-এর মধ্যে বড় এজেন্সি হাউসগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এরপরও নীলের ব্যবসা চলতে থাকে। প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে ব্যাপক নিপীড়নের কারণে বিনা আয়েই কৃষকেরা নীলচাষে বাধ্য হয়। এদিকে বাজারে ধান ও পাটের দাম বাড়ার প্রেক্ষাপটে কৃষকেরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নীল-বিদ্রোহের ফলে ১৮৫৯-৬০-এ বাংলায় নীলচাষ বন্ধ হয়।

আর ঔপনিবেশিক ঘরানার বিনিয়োগরীতির উদাহরণ মেলে রেলখাতে (Bose and Jalal 2002: 102)। বিখ্যাত ভারতীয় রেল, যাকে প্রায়শই আধুনিকতার ক্ষেত্রে উপনিবেশের দান হিসাবে বর্ণনা করা হয়, পরিকল্পিত ও বিন্যস্ত হয়েছিল কেন্দ্রের কৌশলগত ও আর্থিক চাহিদামাফিক। ১৯০০ সাল নাগাদ প্রায় ৫০০০ মাইল রেললাইন বসানো হয়। এতে সৈন্যদের যাতায়াত, ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি আর প্রান্ত থেকে বন্দরে কাঁচামাল রফতানিই মূলত সুবিধা পেয়েছে। রেলের যাবতীয় যন্ত্রাংশ ইংল্যান্ড থেকে আমদানি হওয়ায় এখানে কোনো সহায়ক শিল্পও বিকশিত হয়নি। এ খাতে ব্রিটিশ পুঁজির নিয়োগ পাবলিক ঝুঁকিতে প্রাইভেট বিনিয়োগের এক চমকপ্রদ উদাহরণ – লাভ-ক্ষতি যাই হোক, বিনিয়োগকারীরা নির্ধারিত মুনাফা পাবেই।

এভাবে উনিশ শতকের পাঁচের দশকের মধ্যেই ভারত ধ্রুপদী ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ভূমিকায় – শিল্পপণ্যের ভোক্তা আর কাঁচামালের জোগানদার হিসাবে – প্রস্তুত হয়ে ওঠে। অন্তত ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত দিয়ে ব্রিটেন বাকি দুনিয়ার বাণিজ্য-ঘাটতি পূরণ করেছে এবং অর্থনৈতিক কারবারে আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছে (Bose and Jalal 2002: 102)। পাচারকৃত বিপুল সম্পদ এই হিসাবের বাইরে। ১৮৮৬-৮৭ সালে দাদাভাই নওরোজি পদ্ধতিমাফিক হিসাব করে দেখিয়েছেন, ঋণের সুদ ছাড়া কেবল তথাকথিত 'হোম চার্জেস' আকারেই বিলাতে পাচার হয়েছে ১০ কোটি পাউন্ড স্টারলিং (Chandra 1975: 116)। এর বাইরে লন্ডনের ভারত-অফিসের খরচ, দেশ-বিদেশের যুদ্ধের খরচ, সামরিক ক্রয়, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের পেনশন, রেলওয়ের মুনাফা, ভারত থেকে পাঠানো বিপুল রেমিটেন্স, ব্যবসায়ের মুনাফার টাকা ইত্যাদি খাতে কোটি কোটি পাউন্ড বিলাতে গেছে।[২০] ১৮৭০ সালের পর ভারতের প্রদেয় সুদের পরিমাণ বহিরাগত নতুন বিনিয়োগকে ছাড়িয়ে যায় (Bose and Jalal 2002: 103); আর ১৮৯৩ সাল নাগাদ ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়হার প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনায় ইংল্যান্ডের দাবি পরিশোধ করা ভারতের জন্য সত্যি কঠিন হয়ে ওঠে (Bose and Jalal 2002: 100)।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আদর্শ কেন্দ্র ছিল বাংলা অঞ্চল:

> Eastern India, with its metropolis, Calcutta, … provided a classic example of a colonial economy with all its social and cultural concomitants: a poor, exploited peasantry, a small landed and educated elite and an even smaller but very powerful European business community organizing export trade. (Kulke and Rothermund 1999: 243)

এ অঞ্চল তখন রফতানিযোগ্য প্রধান কৃষিপণ্য নীল, আফিম আর পাটের মূল উৎপাদনক্ষেত্র। বাংলার প্রতিবেশী আসাম চা উৎপাদনের প্রধান ঘাঁটি। কলকাতায় ব্রিটিশ বিনিয়োগের ঘনত্ব এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণ ভারতের অন্য যে কোনো নগরের চেয়ে বেশি ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর কালে ভারতে ইংরেজদের মোট লগ্নির তিন-পঞ্চমাংশ ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। এক হিসাবে দেখা যায়, এ সময় কলকাতার মোট বিনিয়োগের ৮১ শতাংশ ইউরোপীয়, আর মোটে তিন শতাংশ ভারতীয়। তুলনায় বোম্বাইতে এই হার ছিল যথাক্রমে ৪১ ও ৪৯ শতাংশ (Sarkar 1997: 164)। শিল্পোদ্যোগে এবং ব্যবসায়ে বাঙালির অসাফল্যের নানা কারণ দেখানো হয়। একটা কারণ জমিদারিতে লগ্নি করে সহজে উপার্জনের সুযোগ। তারচেয়েও গ্রহণযোগ্য কারণ বোধহয় এই যে, বোম্বাই বা অন্য নগরের তুলনায় কলকাতায় বিদেশি পুঁজির প্রাধান্য ছিল অনেক প্রবল। তাছাড়া বাংলাদেশ যেভাবে ১৭৫৭-১৮৫৭ পর্যন্ত ধননির্গমের শিকার হয়েছিল, অন্য কোনো অঞ্চল সেভাবে শোষিত হয়নি (সব্যসাচী ১৩৯৬: ১০১)।

২.৫ শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব: প্রাচ্যবাদী বনাম ইঙ্গবাদী

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতে তাদের শাসননীতি ও কৌশল বারবার বদলেছে। স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে আপোসরফা এর এক কারণ। অপর কারণ নিজ দেশের বাস্তবতা ও জনপ্রিয় দাবির অনুসরণ। ‘আধুনিক’ বাংলার ইতিহাস সাধারণত উনিশ শতক থেকেই শুরু হয়; আর বিশাল বাংলার বদলে মনোযোগ সীমিত থাকে কলকাতায়। ফলে ‘নবীন-প্রবীণ’ বা ‘রক্ষণশীল-প্রগতিশীল’ ধরনের বিপরীতার্থক শব্দজোড়ে শাসক ইংরেজের কর্মকাণ্ডকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। যেমন করেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। ইংরেজ শাসনের স্তরান্তরকে তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> ইহা নিশ্চিত যে ইংরাজগণ লঘুভাবে প্রাচীনের প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই; কতক ভয়ে, কতক লোকরঞ্জনার্থে, কতক প্রকৃষ্ট রাজনীতিবোধে, তাঁহারা প্রারম্ভে সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীনকে রক্ষা করিয়াই চলিতেন। এই সন্ধিক্ষণের মধ্যে মহা তর্ক-বিতর্কের পর প্রাচীনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া নবীনের প্রতিষ্ঠা করা হইল। ইংরাজ পক্ষে মেকলে ও বেণ্টিঙ্ক এই নবযুগের সারথি হইয়াছিলেন। ... এই আন্দোলন এই দেশীয়গণের মনেও উঠিয়াছিল। তাঁহারাও এই সন্ধিক্ষণে বিচার করিতে লাগিলেন, প্রাচীন ও নবীন ইহার মধ্যে কাহাকে বরণ করিবেন? তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিরা স্থির করিলেন যে, প্রাচীনকে বর্জ্জন করিয়া নবীনকেই বরণ করিতে হইবে। দেশীয় পক্ষে রামমোহন রায়, ডেবিড হেয়ার ও ডিরোজিও এই পুরুষত্রয় সারথ্য কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। ... রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া দিলেন। (শিবনাথ ১৯৫৭: ৯৫)

এ সময়কে বর্ণনা করার এই ভঙ্গি খুবই জনপ্রিয়। এ ভঙ্গিতে একটি জটিল পরিস্থিতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কেবল অতি সারল্যেরই আশ্রয় নেওয়া হয় না, ইংরেজ শাসনের সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক সক্রিয়তাকেও বেমালুম গায়েব করে ফেলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের কর্মপন্থা নির্ধারণে স্থানীয় প্রতিরোধ-সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পশ্চিমা ও স্থানীয়

বাস্তবতা মিলিয়ে কলকাতায় চলেছিল এক দীর্ঘস্থায়ী প্রাচ্যবাদী চর্চা, যার প্রভাব পড়েছিল শাসননীতিতে। আবার উনিশ শতকের গোড়া থেকে প্রাচ্যবাদীদের হটিয়ে ঔপনিবেশিক নীতি-নির্ধারণে ইঙ্গবাদীরা যে প্রবল হয়ে উঠেছিল, তার পেছনেও মূল ভূমিকা রেখেছে শাসকগোষ্ঠীর নানা পক্ষের তত্ত্বীয়-মতাদর্শিক লড়াই। এসব তত্ত্ব-মতাদর্শ ইংল্যান্ডের ক্ষমতাকাঠামো এবং ভারতের ব্যাপারে শাসককুলের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

২.৫.১ স্থানীয় প্রতিরোধ

ইংরেজ শাসনের শুরুতে স্থানীয়রা সাধারণভাবে কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, তা জানা কঠিন। এ সময়ের খুব কম নথিপত্র পাওয়া যায়; যা পাওয়া যায় তা-ও স্থানীয়দের নয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ *সিয়ার মুতাখখিরিনে*র লেখক গোলাম হোসেইন খান কোম্পানির দুঃশাসনে দেশবাসীর প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি সমসাময়িক ইংরেজ শাসনের ব্যর্থতার বারটি কারণ নির্দেশ করেছেন (Khan 1926: 162-213)। তাতে জনগণের অপরিমেয় দুর্ভোগ, দুঃশাসনের প্রত্যক্ষ আর ক্ষোভের পরোক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। ক্লাইভ বলেছিলেন, বাংলাদেশে ব্রিটিশরা এমনি বর্বর পাশবিকতার পরিচয় দিয়েছে এবং এদের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা এমন চরম যে, ‘ইংরেজের নাম বা চেহারা যেন এদেশের হিন্দু-মুসলমানের নাকে একটি অসহ্য দুর্গন্ধবিশেষ’ (উদ্ধৃত, সিরাজুল ২০০২: ৫১)।

দেশবাসীর মনোভাবের বিস্তারিত খতিয়ান না থাকলেও তাদের প্রতিক্রিয়ার নমুনা পাওয়া যায় অব্যাহত আন্দোলন-সংগ্রামে। কোম্পানি-শাসনের পুরো সময় জুড়ে ভারত ছিল অস্থির ও প্রতিবাদমুখর। প্রতিটি অঞ্চল তারা দখলে এনেছে ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। সব স্তরেই মুখোমুখী হয়েছে প্রতিরোধের। গ্রাম্য অভিজাতশ্রেণির প্রতিক্রিয়া, অব্যাহত কৃষক-বিদ্রোহ, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কারিগরদের প্রতিক্রিয়া, আদিবাসীদের নানা আন্দোলন-সংগ্রাম – বাংলা অঞ্চলের অগণিত এই প্রতিরোধ-সংগ্রামের হদিশ নিলেই বোঝা যায়, ঔপনিবেশিক শাসককে বারবার ছক বদলে যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্যে থেকে শাসন-পরিকল্পনা করতে হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের সঙ্গে ‘আধুনিকতা’ আর ‘বাংলার জাগরণে’র মতো বিষয়গুলো এমন জড়িয়ে-পেঁচিয়ে আছে যে, প্রতিরোধের মুখে ঔপনিবেশিক শক্তি কিভাবে শাসন-ছক পাল্টেছে, তা খতিয়ে দেখা হয়নি। অসম্ভব নয় যে, একটি অনুগত শ্রেণি তৈরি করার পরিকল্পনা তারা এই প্রতিরোধ-প্রাবল্য থেকেই নিয়েছিল।

রণজিৎ গুহ আরো পরোক্ষ কিন্তু গভীর এক প্রতিরোধ-প্রবণতার খবর দিয়েছেন। শাসকগোষ্ঠীর দেওয়ানি ও বণিকবৃত্তি ঠিকঠাক চলার জন্য তাদের দরকার ছিল জ্ঞান – ভারতের ঐতিহ্যবাহী এবং জটিল ভূমিব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত জ্ঞান:

> To put it in plain language, it was concerned with information about the volume and value of agricultural produce, the rules for appropriation of the producer’s surplus by landlords and the state, the nature of land tenures and proprietary institutions, the technicalities of estate accounts and above all, the laws and traditions governing the relationship of peasants, landlords and the state. (Guha 1988: 7)

স্থানীয় কর্মীদের উপর তারা এ ব্যাপারে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু স্থানীয়রা তাদের সঙ্গে খুব একটা সহযোগিতা করেনি। রণজিৎ গুহ বেশ কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, কোম্পানির আমলারা তাদের প্রতিবেদনে বারবার দেশীয় কর্মচারীদের অসহযোগিতার অভিযোগ করেছে (Guha 1988: 4-7)।

ভারতবিদ্যাচর্চার মূল প্রয়োজনটা এভাবেই তৈরি হয়েছিল।

২.৫.২ প্রাচ্যবাদী চর্চা

এডওয়ার্ড সাইদ (1995) দেখিয়েছেন, পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রাচ্য 'অপরে'র ধারণা মোটেই হাল-আমলের ব্যাপার নয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে প্রাচ্যবাদ যে কাঠামো ও ব্যাপকতা পেয়েছে, তার সঙ্গে আগের তুলনা হয় না।[২১] মধ্য আঠার শতকেই ইউরোপে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি বেশ মজবুত হয়ে ওঠে। এক-একটি বই বা অনুবাদ প্রকাশিত হতে-না-হতেই যেভাবে পঠিত-প্রশংসিত-মূল্যায়িত হয়েছে (আবু তাহের ২০০৬: ৩২-৬০), তা খেয়াল করলেই বোঝা যায়, সমকালীন ইউরোপে বিদ্যাচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ও জ্ঞানগত আবহে প্রাচ্যবিদ্যার তুমুল প্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে। উইলিয়াম জোন্সের জীবনতথ্য ঘাঁটলেই এর সত্যতা পাওয়া যাবে। জোন্স প্রাচ্যবিদ্যায় এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলেন, আর আশা করছিলেন যে এর ফলে তিনি সম্মানজনক পদ-পদবি পাবেন। এর মধ্যে ছিল অক্সফোর্ডে আরবি ভাষার অধ্যাপকের পদ, হাউস অফ কমন্সের সদস্যপদ, ভারতে বিচারপতির পদ ইত্যাদি (আবু তাহের ২০০৬: ৪১-৪৫)। শেষেরটি তিনি পেয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে ইউরোপে প্রাচ্যবিদ্যার প্রায়োগিক মূল্য যে ক্রমেই বাড়ছিল, এ বাস্তবতা তারই প্রমাণ।

হেস্টিংসের আমলে 'সুষ্ঠু' শাসনকাঠামো তৈরি করতে গিয়েই ভারতবিদ্যাচর্চার গুরুত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হয়। তাঁর মতে, 'Every accumulation of knowledge, and especially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise a dominion founded on the right of conquest, is useful to the state….' (উদ্ধৃত, Kopf 1969: 18) হেস্টিংস আরো লিখেছেন: 'We have endeavoured to adopt our Regulations to the Manners and Understanding of the People, and Exigencies of the Country, adhering, as closely as we are able, to their Ancient Usages and Institutions.' (উদ্ধৃত, Stokes 1959: 35-6) শাসক-শাসিতের মধ্যে চেনা-পরিচয়ের লেশমাত্রও না থাকলে সাম্রাজ্য টিকতে পারে না – এই শাসননীতিতে হেস্টিংস তাদেরকেই উঁচু পদ-পদবি দিয়েছিলেন, যারা ভারতীয় ভাষা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বেশি ওয়াকিবহাল। স্বাভাবিক কারণেই ওই কালের প্রশাসকদের অনেকেই ছিলেন খ্যাতিমান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ। তাঁদের অনেকেরই পাণ্ডিত্য ও কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছিল। ব্যক্তিগতভাবে সবার চর্চাও কেবল রাষ্ট্রতত্ত্ব দিয়ে মাপা যাবে না। যেমন, উইলিয়াম জোন্স যে *শকুন্তলা*-প্রসঙ্গে কালিদাসের সঙ্গে শেক্সপিয়রের তুলনা করেছেন, তা ঠিক দরকারের নিক্তিতে পরিমাপযোগ্য নয়।

কিন্তু তাই বলে কলকাতার প্রাচ্যচর্চাকে নিছক পাণ্ডিত্য আর বিদ্যাচর্চা হিসাবে দেখা বাস্তবের ঘোরতর লঙ্ঘন। রণজিৎ গুহ ওই সময়ের ইতিহাসচর্চার নানা ঘরানা সম্পর্কে লিখেছেন:

> Each of these had the material and political interests of the emerging colonial state branded on it as a birthmark. None had anything to do with the promotion of a liberal culture among

> the subject population. … Far from being a benign gift of metropolitan liberalism, it was complicit to a project that turned conquest into occupation. (Guha 1988: 9-13)

এ মন্তব্য কলকাতার প্রাচ্যবাদীদের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। তাঁরা তাঁদের ভারত-সম্পর্কিত জ্ঞানকে ব্যবহার করেছিলেন ভারত-শাসনের বৈধতা হিসাবে, ঠিক যেমনটা ঘটেছিল মিশরের বেলায়।[২২] প্রাচ্যপ্রেমিক জোন্সের স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও মানবদরদি মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর আমেরিকা-সম্পর্কিত নানা বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে (আবু তাহের ২০০৬: ৪৪)। কিন্তু ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনের ব্যাপারে তাঁর কোনো ভিন্নমত শোনা যায়নি। একই কথা সত্য ওয়ারেন হেস্টিংস কিংবা কর্নওয়ালিশের মতো 'প্রাচ্যবাদী' শাসকের ক্ষেত্রেও।

২.৫.৩ শাসকদের মনোভাবের পরিবর্তন

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম যুগে ভারতে আসা ইংরেজদের সম্পর্কে এরিক স্টোকস লিখেছেন:

> A handful of eighteenth-century Englishmen, scattered throughout the Bengal territories, without English wives, or prospects of furlough, and with no rigid moral or religious code, soon adapted themselves to Indian ways of living. Set on making their fortune before the climate or disease carried them off, they were zealots for no cause or political principle, and were content to conduct the public business according to its traditional Indian forms and in the traditional hybrid Persian. (Stokes 1959: 1-2)

নানা সঙ্গত ও বোধগম্য কারণে প্রাচ্যবাদীচর্চার কালে শাসকগোষ্ঠীর সুর খানিকটা নরম ছিল। কারো কারো মধ্যে শ্রদ্ধা ও সমীহের ভাবও দেখা গেছে। এর মূল কারণ নিঃসন্দেহে এদেশে তখনো গেঁড়ে বসতে না পারা: 'They were not yet the arrogant men of a latter day who felt that it was their duty to save India from barbaric superstitions and moral degradation.' (Kulke and Rothermund 1999: 226) কারণ যাই হোক, এই ঘরানার একটা শাসনদৃষ্টি ছিল। এই দৃষ্টির মূলকথা এভাবে বলা যায়: ভারত শাসিত হবে ভারতীয় রীতিনীতিতে (Said 1994: 180), আর শাসকদের রপ্ত করতে হবে এশীয় আচরণ (Kopf 1969: 18)।[২৩] পুরোনো কেতায় ভারত-শাসনের ব্যাপারে হেস্টিংসের পক্ষপাত খুবই প্রত্যক্ষ; আর কর্নওয়ালিশ (১৭৮৬-৯৩) অনেকগুলো নতুন উদ্যোগ নিলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পাওয়া যায় 'defensive form' (Stokes 1959: 2-3)। উনিশ শতকের গোড়া থেকে এ মনোভাব দ্রুত বদলে যায়। ওই শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যেই প্রাচ্যবাদীদের হটিয়ে নীতিনির্ধারকের ভূমিকায় উঠে আসে ইঙ্গবাদীরা।[২৪]

ইংল্যান্ডের হিতবাদী আন্দোলন এই বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রধানত স্মিথ, বেন্থাম ও মিলের লেখালেখিতে পুরোনো মনোভাব পরিবর্তিত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল হয়, আর ভারতীয় সবকিছু পরিত্যাজ্য গণ্য হতে থাকে। এ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে মিলের *দি হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া* বইতে। ভারত-ইতিহাসের এই 'আকরগ্রন্থে' প্রাচ্যতাত্ত্বিক মৃদুতার কোনো ছাপ নেই (শিবাজী ১৯৯১: ১০৫; Stokes 1959: 53; Spear 2004: 202)।[২৫] খ্রিস্টীয় মতবাদের ইভান্‌জেলীয় ধারা এই মনোভাবকে জোরালো করেছিল। এরিক স্টোকসের মতে, 'The assumptions of the Evangelical theology and the utilitarian philosophy were remarkably similar.' (Stokes 1959: 54) ভারতীয় ধর্ম যে একটা জঞ্জালবিশেষ, এ ব্যাপারে হিতবাদীদের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের মতের অমিল ছিল না (Spear 2004: 202)। মুক্তবাণিজ্যের ব্যাপারেও ইভান্‌জেলীয়দের সঙ্গে 'উদারপন্থী'দের মতের মিল ছিল। কেন্দ্রের ক্ষমতাকাঠামোয় অত্যন্ত প্রভাবশালী শোর, গ্রান্ট, উইলবারফোর্স প্রমুখ ছিলেন এই মতের একনিষ্ঠ প্রচারক।[২৬] এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এরিক স্টোকস লিখেছেন: 'To the Evangelicals the hand of God was visible in history, and nowhere more surely than in the miraculous subjugation of India by a handful of English.' (Stokes 1959: 30) এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা একদিকে ভারতীয়দের হীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, অন্যদিকে ভারত-শাসনের ব্যাপারে ইংরেজদের করণীয় সম্পর্কে নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ১৮১৩ সালের চার্টারে এসব প্রস্তাবের একটা অংশ বাস্তবায়িত হয় (Stokes 1959: 28-29)। এরপরও চলতে থাকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ধারা, বিশেষত উপযোগবাদীদের সঙ্গে মতাদর্শিক সমন্বয়। নানা মতান্তর ও স্বার্থদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ১৮৩৩-এর আইনে পুরোনো 'প্রাচ্যবাদী'দের বিপরীতে ইঙ্গবাদীরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

ইংল্যান্ডের নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনাও শাসকদের মনোভাব পরিবর্তনে গুরুতর ভূমিকা রেখেছিল (Bose and Jalal 2002: 61-62)। ওয়েলেসলি এবং তাঁর অধীন মনরো, ম্যালকম, এলফিনস্টোন, মেটকাফ প্রমুখ প্রশাসকের জাতীয়তাবাদী-সাম্রাজ্যবাদী 'রোমান্টিক' শাসনদৃষ্টি ভারত-শাসনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল (Stokes 1959: 8-13)। ইউরোপ-জোড়া বিপ্লব আর নেপোলীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে ওয়েলেসলি-প্রজন্ম নতুন ধরনের ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত হয়। সমুদ্রের ওপারে নিজেদের শক্তি ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে উন্নত জাতি হিসাবে ব্রিটিশদের নৈতিক অধিকারের ধারণা সেই জাতীয়তাবাদী চেতনারই অংশ। মুক্তবাণিজ্যের আদর্শ এবং জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বও কাজ করেনি, কেননা কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরেই বিশাল ঔপনিবেশিক বাজার কব্জা করা সম্ভব। ব্রিটিশদের ভারতনীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মারাঠাশক্তির চূড়ান্ত পরাজয়ও (১৮১৮) খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে (Stokes 1959: 13)। সুরেশচন্দ্র ঘোষ পরিবর্তিত এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

> ... the strengthening of ties with England, when England was acquiring a new pride in the scientific and technological revolution, and was being subjected to a new wave of evangelical religion worked in a contrary direction [of Indian studies]. The greatness of Indian past, the interest of her religious philosophy seemed less important than her political impotence in the present, and the certainties of English science and English religion. British society in Bengal, having passed through the heady adolescence of the post-Plassey years and come to maturity, was in no mood to admit an equal. (Ghosh 1998: 174)

শাসননীতি ও কৌশলের নতুন আদর্শ বাস্তবায়নের পণ নিয়ে বেন্টিঙ্ক ভারতে এসেছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন বেন্থামের বাণীর সারাৎসার। শোনা যায়, বেন্টিঙ্ক নাকি জেমস মিলকে বলেছিলেন, 'I am going to British India, but I shall not be Governor-General. It is you that will be Governor-General.' (Kopf 1969: 241) তাঁর এই শাসননীতির ফলে ১৮২৯ থেকে ১৮৩৫-এর মধ্যে শুধু প্রাচ্যবাদীদের প্রতাপই নষ্ট হয়নি, দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলোও ধ্বংস হয়ে যায়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা মাদ্রাসা, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি – নতুন শাসননীতিতে এর কোনোটারই আর দরকার ছিল না।

ঔপনিবেশিক শাসকদের নীতি আরেকবার বদলেছিল ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর। নতুন বিদ্রোহের ঝুঁকি এড়াতে ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বিতীয়বারের মতো ভারতীয় রীতির ব্যাপারে 'সহনশীলতা'র নীতি গ্রহণ করে। অবশ্য, সুমিত-

সাহসী-স্বস্থ 'সাবালক' ব্রিটিশদের বিপরীতে ভারতীয়রা যে নিছক 'নাবালক' আর চরিত্রবলশূন্য – এ ব্যাপারে শাসকপক্ষের কোনো মতান্তর কখনোই ঘটেনি (Nandy 1989: 6)।[২৭]

২.৬ ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি

ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি আসলে ক্ষমতা-সম্পর্কের অতি ভারসাম্যহীন দশা, যেখানে গুটিকয় উপনিবেশক বিপুল উপনিবেশিতের মালিক হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখক এইমে সেজায়ার লিখেছেন, 'Between colonizer and colonized there is room only for forced labor, intimidation, pressure, the police, taxation, theft, rape, compulsory crops, contempt, mistrust, arrogance, self-complacency, swinishness, brainless elites, degraded masses.' (Cesaire 2000: 42) এ কথার প্রমাণ পৃথিবীর যে কোনো উপনিবেশের ইতিহাসেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এমন নগ্ন পরিস্থিতিতে সামান্য সময়ের লুটপাট সামলানো যায়, দীর্ঘমেয়াদি শোষণ সম্ভব নয়। তাই দরকার হয় আবরণ। এই আবরণ পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার। হোমি কে ভাবা ব্যাপারটা খুব পরিচ্ছন্নভাবে শনাক্ত করেছেন:

> What is visible is the necessity of such rule which is justified by those moralistic and normative ideologies of amelioration recognized as the civilizing Mission or the white Man's Burden. However, there coexist within the same apparatus of colonial power, modern systems and sciences of government, progressive 'Western' forms of social and economic organization which provide the manifest justification for the project of colonialism – an argument which, in part, impressed Karl Marx. (Bhabha 2006: 119)

কার্যকর উপনিবেশের জন্য দরকার হয় নিজেদের মহৎ আর উপনিবেশিতদের হীনভাবে চিত্রিত করে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা, যাতে শোষিতরা শোষণকেই শাসন মনে করার বিভ্রমে পড়বে।

২.৬.১ উপনিবেশক ও উপনিবেশিত: 'নিজ' ও 'অপরে'র নির্মাণ

উপনিবেশায়ন-শাস্ত্রের বড় পণ্ডিতদের অনেকেই দেখিয়েছেন, উপনিবেশ কেবল উপনিবেশিতের জন্যই ক্ষতিকর হয়নি, বরং উপনিবেশকেরাও জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বড় ধরনের ক্ষতির শিকার হয়েছে (Cesaire 2000; Memmi 1976; Nandy 1989)। নমুনা হিসাবে সেজায়ারের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক :

> ... colonization ... dehumanizes even the most civilized man; the colonial activity … which is based on contempt for the natives and justified by that contempt, inevitably tends to change him who undertake it; that the colonizer, who … gets into the habit of seeing the other man as an animal, … tends objectively to transform himself into an animal. (Cesaire 2000: 41)

এখানে বলা হল, ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার মধ্যে উপনিবেশক পরিবর্তিত হয়। আলবেয়ার মেমি আরেক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, উপনিবেশকের এই পরিবর্তন আসলে উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ারই অংশ। উন্নত জীবনযাপনের আশায় তারা প্রান্তে আসে। যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয় কঠোর পরিশ্রমে, মেধায় আর সাফল্যে। জাঁকজমক আর ভীতিকর শক্তিমত্তায় স্থানীয়দের সামনে তাকে প্রতি মুহূর্তেই হয়ে থাকতে হয় ক্ষমতার প্রতীক:

> Here we overlap what is customarily called power politics, which does not stem only from an economic principle … , but corresponds to a deep necessity of colonial life; to impress the colonized is just as important as to reassure oneself. (Memmi 1976: 59)

কিন্তু ছকের এ এক অংশ মাত্র। অন্য অংশে আছে উপনিবেশিতরা। এরাও উপনিবেশেরই পয়দা। মেমির ভাষায়: 'The colonial situation manufactures colonialists, just as it manufactures the colonized.' (Memmi 1976: 56) উপনিবেশিতরা আদতে কেমন, তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। বরং ঔপনিবেশিক শক্তি তৈরি করে নেয় উপনিবেশিতের সুবিধাজনক মূর্তি। তাতে নিজেদের কাজের ও আচরণের ন্যায্যতা তৈরি করা সহজ হয়। মেমি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, উপনিবেশিতরা যে অলস, সে সম্পর্কে লাইবেরিয়া থেকে মাগরেব হয়ে লাওস পর্যন্ত কোনো উপনিবেশকের এক তিল সন্দেহ নেই। এই মিথ সন্তোষজনকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারায় নানারকম সুবিধা হয়েছে – 'Nothing could better justify the colonizer's privileged position than his industry, and nothing could better justify the colonized's destitution than his indolence.' (Memmi 1976: 79)

উপনিবেশিতদের সুবিধামত চিহ্নিত-চিত্রিত করা এবং নিজেদের উঁচু আর অন্যকে কোনো-না-কোনোভাবে অধস্তন হিসাবে প্রতীয়মান করা একটি কার্যকর ঔপনিবেশিক কৌশল। আনিয়া লুম্বা (Loomba 2001: 109) এর একটি চমকপ্রদ উদাহরণ দিয়েছেন। বহু বছর ধরে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন স্যার টমাস রো। এক পত্রে তিনি তাঁর নিয়োগদাতাকে জানিয়েছেন, 'যে উপহারসামগ্রী আমরা নিয়ে আসি, দরবারের লোকজন তা নিয়ে হাসাহাসি করে। এখানে উৎকৃষ্ট কাপড় বা উন্নতমানের চিত্রকর্মের ছড়াছড়ি। আমাদের দেওয়া জিনিসগুলোকে এরা তুচ্ছ জ্ঞান করে'। পরে কিন্তু আগের সে অবস্থাকেই ব্যবহার করা হয় সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে। প্রাচ্য, বিশেষত ইসলামি দুনিয়ার ঐশ্বর্য, স্বৈরতন্ত্র ও ক্ষমতার প্রতাপকে বিপরীত ধরনের বর্বরতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয় – সভ্যতার অভাবরূপে নয়, বাড়াবাড়িরূপে। আফ্রিকার ক্ষেত্রে যেমন আদিমতার কথা বলা হয়েছে, এখানকার ক্ষেত্রে তেমনি বলা হয়েছে সভ্যতার বিকার ও ক্ষয়ের কথা।[২৮]

ভারতীয়দের 'বর্বর' আখ্যা দিয়ে বাতিল করে দেওয়া খুব সহজ ছিল না। 'সভ্যতা'র যে উপাদানগুলোর অভাবে আফ্রিকাকে এক কথায় খারিজ করা গেছে, ভারতে তার সব কটাই ছিল, এবং ভালোভাবেই ছিল। বিশেষত প্রাচ্যবাদীদের অনেকের মধ্যে ভারত সম্পর্কে শ্রদ্ধার বোধও ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনেই ভারতীয় 'অপর' নির্মাণ আবশ্যক। আশিস নন্দী (Nandy 1989: 17-18) লিখেছেন, দুই পরস্পরবিরোধী যুক্তিধারায় তারা এই সমস্যার একটা বিহিত করার চেষ্টা করে। এক. ভারতের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তারা ছেদ তৈরি করে। যুক্তিটা দাঁড়ায় এরকম: সভ্য ভারত সুদূর অতীতের ব্যাপার; বর্তমানের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। শোনা যায়, ম্যাক্সমুলার নাকি তাঁর ছাত্রদের ভারতে আসতে নিষেধ করতেন; কারণ, তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ভারত মরে গেছে। দুই. ভারতীয় সভ্যতায় কিছু ভালো জিনিস ছিল বটে, কিন্তু তাতে তার ধ্বংসের বীজও ছিল। প্রথম যুক্তির 'ছেদে'র বিপরীতে দ্বিতীয় যুক্তিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ধারাবাহিকতাকে, যদিও তা মন্দের – ভালোর ধারাবাহিকতা নয়। ফলে ভারতের বর্তমান বেহাল দশার জন্য ঔপনিবেশিক শাসন দায়ী তো নয়ই, বরং এই শাসনই মুমূর্ষু ভারতকে বাঁচিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে।

ভারতের এই 'রূপ' শাসনকাজে পুরোমাত্রায় কাজ করেছিল। একটু বেশিই করেছিল – কারণ, এতে 'শিক্ষিত' ভারতীয়দের সম্মতিও মিলেছিল (২.৬.৬ দ্রষ্টব্য)।

২.৬.২ বর্ণবাদ

কোম্পানি ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরেও ইউরোপীয়দের একটা বড় অংশ ভারতীয় নবাবদের বিলাসী জীবনযাপন অনুসরণ করত। ভারতীয় বহু রীতি তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হয়ে যায়। যেমন, ভারতীয় নাচগানের আসরে যোগদান এবং হুকাসেবন (Ghosh 1998: 144-45)। এ সময়ে প্রাচ্যবাদীদের চোখ-ধাঁধানো চর্চাও চলছিল। ওই কালের ইংল্যান্ড থেকে ভারতের দূরত্ব, এ দেশে তখনো ক্ষমতার ভিত শক্ত না হওয়া, ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিলাসব্যসনের ঐশ্বর্য – ইত্যাদির কথা মাথায় না রেখে সাধারণত এসবকে ইংরেজের ভারতপ্রীতির নমুনা হিসাবে পরম মূল্য দেওয়া হয়। আরো পরে, ১৮৩০-এর দশকে কোম্পানি-সরকারের কিছু ছোট পদ দেশীয়দের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। ততদিনে উপনিবেশিত বাঙালির হীনমন্যতা এত প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, এই সামান্য প্রাপ্তিই তাদের কাছে অসীম করুণা বলে প্রতীয়মান হয়। এসব কারণে ভারতীয় ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাসে বর্ণবাদকে – অন্তত আফ্রিকার তুলনায় – খুব গৌণ করে দেখা হয়েছে। আসলে অন্য যে কোনো জায়গার মতো ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনও আগাগোড়া বর্ণবাদী। এতে বিস্ময়েরও কিছু নেই। কারণ, 'Racism appears not as an incidental detail, but as a consubstantial part of colonialism. It is the highest expression of the colonial system and one of the most significant features of the colonialist.' (Memmi 1976: 74) ভারতের ক্ষেত্রে এর একটা 'ভারতীয়' ধরন তৈরি হয়েছিল মাত্র।

আলবেয়ার মেমির মতে, ঔপনিবেশিক বর্ণবাদ তিনটি আদর্শিক উপাদানে গড়া: এক. উপনিবেশক-উপনিবেশিতে সাগর-প্রমাণ ফারাক; দুই. এই ফারাককে উপনিবেশকের অনুকূলে ব্যবহার; তিন. এই ধরে-নেওয়া পার্থক্যকে চূড়ান্ত সত্যের মতো করে কাজে খাটানো (Memmi 1976: 71)। ভারতে এর প্রথম প্রতিফলন ঘটে হেস্টিংসের প্রশাসনে। হেস্টিংস 'দায়িত্বজ্ঞানহীন', 'দুর্নীতিগ্রস্ত' আর 'অবিশ্বস্ত' ভারতীয়দের প্রশাসন থেকে বাদ দেওয়ার যে ধারা তৈরি করেছিলেন, কর্নওয়ালিশ কোডে তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে।[২৯] হেস্টিংস বা কর্নওয়ালিশের এই সিদ্ধান্ত তাঁদের ব্যক্তিগত বর্ণবাদ-প্রসূত নয়। এতে সমকালীন ইংল্যান্ডের জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে। কর্নওয়ালিশ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁর উপদেষ্টা ও জেলা-অফিসারদের মত নিয়েছিলেন। ১৭৯৩-এর চার্টার অ্যাক্ট এই নীতি অনুমোদন করেছিল। অর্থাৎ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, ব্রিটিশ জনগণ, কোম্পানির আমলাতন্ত্র – সবাই এই বর্ণবাদী নীতি অনুমোদন করে (Aspinall 1987: 168-70)। উল্লেখ্য, ভারতশাসন-সম্পর্কিত নীতিপ্রণয়নে অত্যন্ত প্রভাবশালী গ্রান্ট, মিল বা মেকলের রচনায় ব্যতিক্রমহীনভাবে ভারতীয়দের নীচতা ও অযোগ্যতার সমরূপ বয়ান পাওয়া যায়। যদি শাসনকাজে ভারতীয়দের অভিজ্ঞতা না থাকত, তাহলে এমন সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেখানো চলত। কিন্তু ভারতীয়রা ব্রিটিশদেরও বহু আগে রাষ্ট্রগঠন করে সভ্যসমাজ হিসাবে বিশ্বপরিচিতি লাভ করেছে। এ ধরনের এক জনগোষ্ঠীকে রাতারাতি শাসনকাজ থেকে উৎখাত করার একটাই কারণ থাকতে পারে – ঔপনিবেশিক বর্ণবাদ। বস্তুত, নিজেদের শাসন থেকে হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিশের আমলে ভারতীয়রা যেভাবে বঞ্চিত হয়েছে, তার তুল্য উদাহরণ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসেও সুলভ নয়। মনরো যেমনটা বলেছেন, অন্য অনেক দখলকারী প্রজাদের উপর সন্ত্রাস চালিয়েছে, নানা নিষ্ঠুরতা

দেখিয়েছে, কিন্তু পুরো জনগোষ্ঠীকে অবিশ্বস্ততার দায়ে কলঙ্কিত করে, সদাচরণ পাবার অনুপযুক্ত বলে চিহ্নিত করে, এবং কেবল নিম্নশ্রেণির কাজে নিয়োগ করে ব্রিটিশরা যেরূপ ঘৃণার উদাহরণ তৈরি করেছে, তেমনটা আর কেউ করেনি (Aspinall 1987: 174)।

প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে ১৮৩৩ সালে ডেপুটি কালেক্টর ও ১৮৪৩ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি হয়। ১৮৩৩-এর আইনে দেশীয়দের এই ধরনের পদে নিয়োগের বিধান করা হয়। কিন্তু অন্তত আরো বিশ বছর চাকরির ক্ষেত্রে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কারো অনুমোদন দরকার হত, যেখানে কোনো ভারতীয় ছিল না। ১৮৫৩ সালে উন্মুক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পরীক্ষা হত বিলাতে। ফলে ১৮৬৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার আগে ভারতীয়রা এই মাপের চাকরি আর পায়নি (Spear 2004: 180)। অনেক ঐতিহাসিক প্রচার করেছেন, বিলাতের উপযোগবাদীদের মানববাদী আন্দোলনের জন্যই ভারতে বর্ণবাদ সংশোধিত হয়েছিল। কিন্তু সরকারের দলিল-দস্তাবেজ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, মূলত অর্থনৈতিক এবং স্থানীয় বাস্তব প্রয়োজনেই সরকার চাকরির ক্ষেত্রে বর্ণবাদ আংশিক সংশোধন করতে বাধ্য হয় (সিরাজুল ২০০২: ২৩১)। এই সুযোগও ছিল অতি সীমিত পর্যায়ের। সেই সীমিত সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা ছিল পর্বতপ্রমাণ। কার্যত, ভারত সরকার প্রশাসনকে 'শ্বেতাঙ্গ' রাখার নীতি অনুসরণ করেছিল অন্তত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। তবে কর্নওয়ালিশের মতো ঘোষিতভাবে ওই বর্ণবাদী নীতি বাস্তবায়ন না করে সরকার কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছে (সিরাজুল ২০০২: ৩১৯)।

উপনিবেশক-উপনিবেশিত সম্পর্কের যে ধ্রুপদী রূপ (২.৬.১ দ্রষ্টব্য), ভারত মোটেই তার বাইরে ছিল না। থাকার কথাও নয়। অর্থনৈতিক শোষণ দিয়ে এ বস্তু সামান্যই ব্যাখ্যা করা যাবে। 'In the colonies the economic substructure is also a superstructure. The cause is the consequence; you are rich because you are white, you are white because you are rich.' – লিখেছিলেন ফ্রাঁৎস ফানো (Fanon 1963: 32)। শিশিরকুমার দাশ (১৯৯৯: ৫০-৫৫) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নথিপত্র ঘেঁটে কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেগুলো ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করে। ১৮০৬ সালের ২৬ এপ্রিল কলেজ কাউন্সিলে মুনশি নজরুল্লার একটি অভিযোগ নিয়ে বিচার হয়। নজরুল্লা হিন্দুস্থানির অধ্যাপক। সাহেব ছাত্র ইংলিশ তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করে। মুনশির অপরাধ, তিনি সাহেবের সামনে চেয়ারে বসেছিলেন। ১৮১০ সালে বাঙালি পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র একটি আবেদনপত্রে জানিয়েছিলেন যে, কেনেডি নামের এক ছাত্র তাঁকে খুবই মারধর করেছে। কেন? কেনেডি নিজেই বলেছে, পণ্ডিত তাকে যথেষ্ট সম্মান দেখায়নি। তার পরের বছর একজন ছাত্র মুনশি গোলাম হোসেনকে প্রহার করে। কলেজ কাউন্সিল যখন ছাত্রটিকে ডেকে তিরস্কার করে, তখন সে অম্লান বদনে বলে, মুনশি-পণ্ডিতদের ভদ্রলোক হিসাবে গণ্য করতে হয় এটা সে জানত না – 'He was not aware that these people were entitled to be considered as gentlemen.' এ হল উপনিবেশিত বাংলার শিক্ষককুলের হাল। সাধারণের অবস্থা তো আন্দাজ করা যায়।

যা আন্দাজ করা কঠিন তা হল, কলকাতার 'শিক্ষিত ভদ্রলোক'দের হাল একবিন্দুও আলাদা ছিল না। ইংরেজশাসনকে যাঁরা আশীর্বাদ মনে করতেন, তাঁদেরই পত্রপত্রিকায় গোটা উনিশ শতক জুড়ে এ নিয়ে বিস্তর আহাজারি ছাপা হয়েছে। ৫ জুন ১৮৫১-র *সংবাদ প্রভাকরে* লেখা হয়:

> রাজার এক প্রধান ধর্ম্ম অপক্ষপাতী হইবেন, বর্ত্তমান ভূপতিরা তাহার সমগ্রপ অন্যথা করিয়া থাকেন। ... প্রথম আপন দেশীয় মানুষ অপরাধ করিলে তাহার প্রায় এক মুদ্রা দণ্ড হয়, আর এতদ্দেশীয়দিগের দোষে যত ইচ্ছা করেন ততই দণ্ড করিতে পারেন, ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিরা রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অপরাধি হইলে তাঁহারদের ঊর্দ্ধসংখ্যা জিলা বদল হয়, এতদ্দেশীয় রাজকর্ম্মচারি হইলে তদপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র দোষে তাহাকে জন্মের মত পদচ্যুত করেন, এবং অপর দণ্ড দিয়া থাকেন। ... দ্বিতীয়। এদেশের সুনিপুণ মানুষ যে কার্য্যে একশত টাকা বেতন পান সেই কর্ম্মেই একজন যৎসামান্য ইউরোপীয়কে সহস্র মুদ্রার অধিক বেতন দেন। ... তৃতীয়। সমান রূপ স্নেহও দর্শন করিবেন তাহাই বা কোথায়? বাঙালিদিগের বিচার ইংলণ্ডীয়েরা করিবেন কিন্তু তাঁহারদিগের বিচার ইঁহারদিগের নিকট হইবে না। কোন দাতব্যস্থলে, ঔষধালয়ে, কারাগারে শ্বেত লোকেরা যেমন সুখে থাকেন, কালা লোকেরা তাহার শতাংশের একাংশ সুখ প্রাপ্ত হয়েন না, রাজার জ্ঞাতি কুটুম্বেরা যে পল্লীতে বাস করেন সে পল্লী যেন স্বর্গধাম, আর আমারদের হতভাগ্য পল্লীকে প্রেত পল্লী করিয়া রাখিয়াছেন। (বিনয় ১৯৬২: ১৭৫-৭৬)

ঔপনিবেশিক শাসনে এই চিত্রই স্বাভাবিক। বর্ণবাদ ছাড়া উপনিবেশ হয় না।

২.৬.৩ রক্ষণশীলতা

ঔপনিবেশিক শাসন ঔদ্ধত্য, নিপীড়ন আর বলপ্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। চরিত্রবিচারে এ একপ্রকার সামরিক স্বৈরশাসনই বটে। স্বভাবতই সব ঔপনিবেশিক শাসনকে মজুত রাখতে হয় বড় আকারের সেনাবাহিনী। বাংলা অঞ্চলে – এবং ভারতেও – তাই হয়েছে। ১৮০৫ নাগাদ ব্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীর সেনার সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৫৫,০০০। এর ফলে এই বাহিনী পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ইউরোপীয় ধারার সেনাবাহিনীতে পরিণত হয় (Bose and Jalal 2002 : 68)।[৩০] এই বাহিনী ভারতের ভিতরে ও বাইরে কেবল যুদ্ধই করেনি, উপনিবেশিত এলাকায় সামান্যতম বিদ্রোহের আলামত পেলে কঠোরভাবে দমনও করেছে। যদি নিজেদের কোনো নীতি বা আদর্শ উপনিবেশিত অঞ্চলে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করত, তাহলে তা করার শক্তি তাদের ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার কখনো তা করেনি। এর কারণ, সভ্যতা বিস্তারের বুলি আওড়ালেও তা তাদের লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়নি। অন্য কারণ, কোনো প্রকার গণভিত্তি না থাকায় প্রচলিত রীতি-রেওয়াজে নাক গলানোর ঝামেলায় – নিছক দরকার না হলে – তারা যেতে চায়নি। ভারতীয় ঔপনিবেশিক শাসন এদিক থেকে বেশ রক্ষণশীল শাসন।

বাংলা অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ তথ্য বেশি দরকারি; কারণ, এখানে ইংরেজশাসন ও 'আধুনিকতা'কে সাধারণভাবে একাকার করে দেখা হয়। ভাবা হয়, পশ্চিমা আদর্শ ও মূল্যবোধ সঞ্চারিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের মূল্যবোধ ও জীবনমানের উন্নতি হয়েছে। সাম্প্রতিক অনেক ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন, এ আশা শুধু অপূর্ণই থাকেনি, এ ধরনের কোনো উদ্যোগও আসলে নেওয়া হয়নি। অন্যভাবে বলা যায়, পশ্চিমা আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং ঔপনিবেশিক নীতির মধ্যে আসলে আকাশ-পাতাল ফারাক ছিল (Bose and Jalal 2002: 76)। নতুন ধারার ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন, ভারতের পশ্চিমায়ন আর আধুনিকায়ন তো দূরের কথা, উনিশ শতকে ব্রিটিশরা বরং কৃষক ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের এক ঐতিহ্যিক ভারত আবিষ্কার করে, এবং তাকেই রূপায়িত করে (Bose and Jalal 2002: 77)। আঠার শতকে গ্রামীণ সমাজে যে চলিষ্ণুতা ছিল, তার বিপরীতে ঔপনিবেশিক শাসন তৈরি করে সুবিধাজনক স্থিতিশীল গ্রামসমাজ। ঔপনিবেশিক শাসন ও এর আর্থিকনীতির ফলে শহর-গ্রামের ফারাক বেড়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অধিকতর হারে বঞ্চিত

হয়েছিল (সিরাজুল ২০০২: ১৫৫)। তাছাড়া কলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো বড় নগর গড়ে উঠলেও সামগ্রিকভাবে নগরায়ণের হার বাড়েনি (ইরফান ১৯৯৯:৬২; সব্যসাচী ১৩৯৬: ১২১)। সামাজিক স্থিতিশীলতার অংশ হিসাবে ব্রিটিশ প্রশাসন সমাজের বর্ণবিভাজনকে শক্তিশালী করে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের নিশ্চয়তা তৈরি করে, যা তাত্ত্বিকভাবে উপনিবেশপূর্ব যুগে থাকলেও বাস্তবে প্রায়শই উপেক্ষিত হত (Bose and Jalal 2002 : 77)।[৩১]

এর চমকপ্রদ উদাহরণ সতীদাহ প্রথা। পশ্চিমারা ভারতীয় সংস্কৃতির শোচনীয়তার উদাহরণ হিসাবে সবসময়ে এই প্রথার উল্লেখ করেছে। বিপরীতে এর বিলোপ সব পক্ষের কাছেই পশ্চিমা শিক্ষা ও রুচির দান হিসাবে কীর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বহু গবেষণায় দেখা গেছে, অঙ্কটা আদৌ অত সরল নয়। সতীদাহপ্রথা নিঃসন্দেহে প্রাচীন। কিন্তু তথ্য-উপাত্ত থেকে নিশ্চিত করে বলা যায়, মধ্যযুগেও এর প্রতাপ ছিল কম, দাহের ঘটনা ঘটত অল্প, আর এ প্রথা খুব উঁচুস্তরের কিছু পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। পার্লামেন্টারি পেপার্‌সের বরাতে রজতকান্তি রায় দেখিয়েছেন (Joshi 1975: 3-4), পশ্চিমা প্রভাব এ সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে; আর উনিশ শতকের পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, অন্য অঞ্চলের তুলনায় ইংরেজদের প্রভাববলয়ে আসা অঞ্চলগুলোতেই সতীদাহের ঘটনা অনেক বেশি ঘটেছে। যেমন বাংলা অঞ্চল বিশেষত কলকাতার আশপাশে এ হার ছিল অতি উচ্চ। ১৮১৫-১৮২৬ সালের মধ্যে বৃহত্তর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে যত ঘটনা ঘটেছে, তার প্রায় ৫৭ শতাংশ ঘটেছে কলকাতা ও সন্নিহিত বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া ও ২৪ পরগণায়। এর এক গুরুতর কারণ ছিল এই যে, এ সময়ে ব্রাহ্মণ্য-প্রতাপ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে হিন্দুসমাজে ব্যাপকভাবে 'সংস্কৃতায়ন' শুরু হয়, আর নিচু জাতের লোকেরাও সমৃদ্ধ উঁচু-সংস্কৃতি হিসাবে বহু প্রথা নতুন করে অনুসরণ করতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে আশিস নন্দী লিখেছেন:

> It was the babu culture which made a sadistic sport out of sati, and to the extent this culture was itself a product of western and modern encroachments upon the traditional life style, sati was the weirdest response to new cultural inputs and institutional innovations. (Nandy 1975: 178)

রজতকান্তি রায়ের সিদ্ধান্ত:

> Paradoxically, the rite of sati, regarded by the British as the most glaring abuse of 'traditional' Hindu society, was in its recrudescent form almost as much a product of colonial penetration as was the movement for its abolition. (Joshi 1975: 5)

উপনিবেশিতদের সুবিধাজনক ছাঁচ বা ছকে বিন্যস্ত করে নিয়ে সে অনুযায়ী কর্মসূচি ঠিক করা ঔপনিবেশিক শাসনের পৌনঃপুনিক কৌশল। স্থানীয় সমাজের পুরোনো ক্ষমতা-সম্পর্ককে ব্যবহার করেই সাধারণত এ ছক তৈরি করা হত (Loomba 2001: 98)। এর এক উদাহরণ ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া। ব্রাহ্মণদের বরাবরই চালাক-চতুর ভাবা হয়েছে। কারণ ভারতীয় সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে তারাই শিক্ষা ও জ্ঞানগরিমার ধারক-বাহক। বিপরীতে আদিবাসীসহ আগে থেকেই নানাভাবে নিপীড়িত বহু মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে অসভ্য, যুদ্ধপ্রিয় এবং শিশুপ্রতিম হিসাবে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিশেষায়িত কিন্তু নিম্ন-পেশায় নিযুক্ত বহু জনগোষ্ঠীর নিযুক্তি বৈধতা পেয়েছিল এই চিহ্নায়নের মাধ্যমে।

ব্রিটিশ আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণপ্রথা যে অধিকতর জনপ্রিয় ও জোরালো হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই (Srinivas 1972: 6; সুনীতি ২০০৫: ৪৮-৪৯)। আলবেয়ার মেমির মতে, উপনিবেশের সমাজে উপনিবেশায়নের স্বভাবেই এ ধরনের রক্ষণশীলতা প্রাধান্য পায়। রাষ্ট্র ও বহির্জগতের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় উপনিবেশিত সমাজে পরিবার হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল। মেমি ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামোয় পরিবারপ্রাধান্যের মনস্তাত্ত্বিক-প্রাতিবেশিক কারণ ব্যাখ্যা করেছেন (Memmi 1976: 99-100)। তাঁর মতে, প্রায় একই কারণ ধর্মের ক্ষেত্রেও খাটে। সিভিল সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পরিবারের অন্তরঙ্গতায় ধর্মীয় বিধিবিধান ক্রমশ বেশি হারে জেঁকে বসতে থাকে:

> Since colonized society does not possess national structures and cannot conceive of a historical future for itself, it must be content with the passive sluggishness of its present. … Formalism, of which religious formality is only one aspect, is the cyst into which colonial society shuts itself and hardens, degrading its own life in order to save it. It is a spontaneous action of self-defense, a means of safeguarding the collective consciousness without which a people quickly cease to exist. (Memmi 1976: 101-02)

মোটেই অস্বাভাবিক নয়, উপনিবেশিত বাংলার সমাজে ও রাজনীতিতে ধর্মীয় 'রক্ষণশীলতা'র দীর্ঘমেয়াদি প্রতাপ দেখা গেছে, এবং এই ধারার প্রচারক ও অনুসারীরা প্রায় সকলেই পশ্চিমা-শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন।

২.৬.৪ উপনিবেশ ও মিশনারি কার্যক্রম

মিশনারিরা সারা দুনিয়ায় ঔপনিবেশিক শক্তির সহায়ক হিসাবে কাজ করেছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কের ছক এঁকেছেন এভাবে:

> ইউরোপীয়রা ধনজয়ের লোভে বণিক-বেশে ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়াময়। তাদের পথ ধরে এসেছিল ধর্মের গোঁসাই পাদরিরা – তাদের পিছু পিছু আসে সৈনিক। ধার্মিকের সামনে ধনিকের মার্চেন্টম্যান জাহাজ, পেছনে রাজার সৈন্য ও ম্যান অব ওয়ার। ... রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদ ও অর্থনীতির সঙ্গে এই খ্রিস্টানি প্রচারের নিগূঢ় সম্বন্ধ। (প্রভাত ১৯৭২: ৩৮০-৮১)

কিভাবে? তাদের ভূমিকার ধরনকে আলবেয়ার মেমি চিহ্নিত করেছেন এভাবে: 'The church has greatly assisted the colonialist; backing his ventures, helping his conscience, contributing to the acceptance of colonization – even by the colonized.' (Memmi 1976: 72)

বাংলায় কোম্পানির শাসকবর্গ অবশ্য অনেকদিন পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিরোধী ছিল। এর প্রধান কারণ, শাসক হিসাবে প্রথমদিকের অনিশ্চয়তা। হিন্দু বা মুসলমান জনগোষ্ঠী বিগড়ে যেতে পারে, এমন কোনো কাজের অনুমতি দেওয়া কোম্পানির পক্ষে সহজ ছিল না। কোম্পানির কর্মচারীরা সাধারণ বাণিজ্যিক কাজ ছাড়াও ব্যক্তিগত লাভজনক ব্যবসা চালাত। যেভাবে হোক মুনাফা নিশ্চিত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। এমতাবস্থায় মিশনারিদের কার্যক্রমকে তারা নিজেদের জন্য অনুকূল ভাবতে পারেনি। তাছাড়া ওই সময়ের মিশনারিদের প্রভাব-প্রতিপত্তিরও বোধহয় ঘাটতি ছিল। ১৭৯৫ সালে বড়লাট স্যার জন শোর কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরসকে লিখেছিলেন, 'অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলায় আমাদের যাজক সম্প্রদায় মোটেই সম্ভ্রমের যোগ্য নয়' (মুহম্মদ সিদ্দিক ১৯৬২: ৯)। পরবর্তীকালের মিশনারিদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই এমন উচ্চারণ সম্ভব নয়।

কিন্তু কোম্পানির মত আর ব্রিটিশ জনমত সমার্থক নয়। মিশনারিরা ইংল্যান্ডে কেবল শ্রদ্ধেয়ই নয়, রীতিমত প্রভাবশালী (২.৫.৩ দ্রষ্টব্য)। ফলে ১৮১৩ সালের সনদে মিশনারি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় (Sinha 1996: 592)। শুধু তাই নয়। ওই চার্টারের ১২ নম্বর প্রস্তাবে স্পষ্ট করে অ্যাংলিকান চার্চের পাদরি-পোষণের ব্যয়ও ভারতীয় রাজস্ব থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় (প্রভাত ১৯৭২: ৩৫০)। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারীদের আইনি নিরাপত্তাদান, সতীদাহ ও শিশুবলি-প্রথা রহিতকরণ, হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উৎসবাদির সঙ্গে সরকারের সম্পর্কচ্ছেদ – সরকারকে এসব উদ্যোগ নিতে বাধ্য করেছিল ইভান্‌জেলীয় মিশনারিরা (Stokes 1959: 29)। আরো পরে, ১৮৫০ সালে, সরকার ধর্মান্তরিত হিন্দু বা মুসলমানের পৈতৃক সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার দিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের পক্ষে আইন প্রণয়ন করেছিল (স্বপন ২০০০: ৬৯)।

বাংলার ঔপনিবেশিক শাসন আর খ্রিস্টান মিশনারিদের পারস্পরিকতার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল অবশ্য অনেক আগেই – ১৮০০ সালে। তরুণ প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। প্রাচ্যবাদীদের ধ্রুপদী সংস্কৃতি ও ভাষার চর্চা এ কাজে কমই সাহায্য করেছিল। ভারতের জনপ্রিয় ভাষা ও সংস্কৃতি কাজ চালানোর মতো করে আত্মস্থ করেছে, ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশনই ছিল এরকম একমাত্র ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান:

> It was no coincidence, then, that William Carey was responsible for cultivating every Indian vernacular language at the college with the exception of Urdu. Furthermore … by 1805 the Serampore Mission Press could print any work in Bengali, Urdu, Oriya, Tamil, Telegu, Kanarese, or Marathi. (Kopf 1969: 71)

ফলে কোম্পানি-সরকারকে মিশনের দ্বারস্থ হতেই হল। ১৮০০ সালের ২৩ নভেম্বর কলকাতায় বুকানন ও কেরির মধ্যে সমঝোতা হয়। এ সমঝোতায় রাষ্ট্রপক্ষের প্রয়োজন সম্পর্কে ডেভিড কফ লিখেছেন: 'Wellesley needed Serampore because of the linguistic ability of Carey and the printing ability of Ward.' (Kopf 1969: 74) অন্যদিকে মিশন ভয়াবহ আর্থিক সংকটে ভুগছিল। সেই সংকটের কালে মিশনপ্রেসকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নানাভাবে সাহায্য করেছে (শিশির ১৯৯৯: ৬৫)। এই পারস্পরিকতার ফলে শ্রীরামপুর মিশনের গতিবিধির উপর যে কড়াকড়ি ছিল তাও খানিকটা শিথিল হয়; যদিও তখনো কোম্পানির এলাকায় খ্রিস্টধর্মপ্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে মিশনারি কার্যক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে স্থানীয়দের মনে গভীর ধারণা তৈরি করা। আলবেয়ার মেমি একেই বলেছেন 'contributing to the acceptance of colonization – even by the colonized'। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শিক্ষা আর খ্রিস্টানি প্রচারের মধ্যে আদতে কোনো বিরোধ ছিল না; বরং গভীর সমঝোতা ছিল। শিক্ষাকে – ইংরেজি বা বাংলা যে ভাষাতেই হোক – বরাবরই খ্রিস্টানি প্রচারের প্রাথমিক শর্ত ভাবা হয়েছে। বাংলা অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারসহ শাসকগোষ্ঠীর জন্য জরুরি বহু কাজে মিশনকে সক্রিয় দেখা গেছে। পত্রিকা সম্পাদনা, স্কুল প্রতিষ্ঠা, স্কুল বুক সোসাইটিতে ভূমিকা পালন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, ইংরেজি শেখানো এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে লড়াই চালানো – উপনিবেশায়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি এসব কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে খ্রিস্টান মিশনারিদের বিভিন্ন দল। এই পারস্পরিকতার এক অনন্য উদাহরণ উইলিয়াম কেরি। তাঁর চিঠিপত্র ও কর্মকাণ্ড থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়,

একজন নিবেদিত মিশনারি হিসাবে নিজের দায়িত্বের কথা তিনি কখনোই বিস্মৃত হননি (সবিতা ১৯৭২: ২৫৪; Kamal 1977: 9)। কিন্তু গভীরতর অর্থে মিশনারি কাজের সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার বিরোধ না থাকায় শেষ পর্যন্ত এই শাসনের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানরূপেই তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

'Evangelical Christianity is regarded as characteristically Western, and it is indisputable that Christian missionaries played a crucial role in India's modernization.' (Srinivas 1972: 52) – এ বাক্যের দু-অংশের সম্পর্ক এই যে, 'পশ্চিমায়ন' ও 'আধুনিকায়ন' সমার্থক গণ্য হত বলে মিশনারিদের পক্ষে এই ব্যাপক 'ভূমিকা' পালন সম্ভবপর হয়েছে। উল্লেখ্য, ইভান্‌জেলীয় মতবাদ খোদ ইংল্যাণ্ডের 'আধুনিকায়নে'ও নিয়ামক-ভূমিকা পালন করেছিল। এরিক স্টোকস এই মতবাদকে 'English liberalism'-এর অন্যতম উপাদান হিসাবে বর্ণনা করেছেন: 'Evangelicalism provided its programme of social reform, its force of character, and its missionary zeal.' (Stokes 1959: xiv) ভারতে মিশনারিরা সরকারের কাজে সাহায্য করেছে; ১৯৩০ সালের মধ্যে ভারতের অন্তত দুই শতাংশ লোককে ধর্মান্তরিত করেছে (Spear 2004: 280); কিন্তু 'আধুনিকায়নে'র ভূমিকা এগুলোর বাইরের এবং অধিকতর সুদূরপ্রসারী। স্কুল-কলেজ পরিচালনা, নারীশিক্ষার উদ্যোগ, স্থানীয় 'কুপ্রথা'র বিরুদ্ধে প্রচারণা – ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মিশনারিরা হয়ে উঠেছিল পশ্চিমা সভ্যতার মূর্তিমান প্রতীক:

> Most missionaries presented the gospel in its western dress, and they were therefore the apostles of the West as well as the pure spirit of Christ. By their manners and conduct, by their very existence, they had influences in favour of the western outlook. (Spear 2004: 280-81)

তাছাড়া:

> Though they could not change society except by persuation, they formed an important channel by which western values and western knowledge were poured into India and spread through the spray of many mission stations all over the country. (Spear 2004: 205)

উনিশ শতকের কলকাতায় এ বাস্তবতার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। ইয়ংবেঙ্গল দলের হিন্দুধর্মবিদ্বেষ খুবই বিখ্যাত। ইসলামধর্মের পশ্চাৎপদতা সম্বন্ধেও তাদের সন্দেহ ছিল না। কিন্তু খ্রিস্টানধর্ম সম্বন্ধে এমন মনোভাব দেখা যায়নি। পশ্চিমা উপাদান ভালো আর পুবের জিনিস মন্দ – এই দীর্ঘমেয়াদি মনোভাব তৈরিতে পশ্চিমের ধর্ম গভীর ভূমিকা পালন করেছিল।

২.৬.৫ ঔপনিবেশিক শিক্ষা

ঔপনিবেশিক শিক্ষার – এবং যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থারই – প্রধান দিক দুটি। একটি সাংস্কৃতিক, অন্যটি ক্ষমতা-সম্পর্কিত। এ দুটি অনেক জায়গায় পরস্পর-সম্পর্কিত, কিন্তু মোটেই এক জিনিস নয়। বাংলার ইতিহাসে সাধারণভাবে ঔপনিবেশিক শিক্ষাকে সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া হিসাবেই দেখা হয়েছে। আগের আমলের 'বিদ্যা'র বিপরীতে নতুন জমানার 'শিক্ষা'কে দেখা হয়েছে নৈতিক-আত্মিক উন্নতির প্রধান উপায়রূপে। রণজিৎ গুহ লিখেছেন, ঔপনিবেশিক শক্তিই চেয়েছে, শিক্ষাকে এভাবে দেখা হোক। সরকারি-বেসরকারি, সেক্যুলার-মিশনারি – সবাই দেশীয়দের মানসিক বিকাশের প্রকল্পরূপেই শিক্ষাকে হাজির করেছে। কিন্তু,

> Although colonialism and the many-sided thrust of liberal politics made it out to be so, there was more to education than was thus conceived. It stood not only for enlightenment but also authority – a fact which it has been the function of ideology in all its forms, including historiography, to hide both from the educators and the educated. In other words, it was an ideological effect that made both the propagators and the beneficiaries of education regard the latter as a purely cultural transaction and ignore that aspect of it which related directly to the power. (Guha 1988: 15)

বাংলার ইতিহাসে আঠার আর উনিশ শতকের যে ছেদ কল্পনা করার রেওয়াজ প্রায় সর্বব্যাপী, তার প্রধান অবলম্বন পশ্চিমা বা ইংরেজি শিক্ষা। এতে এই শিক্ষার সঙ্গে 'আধুনিকতা' ও 'প্রগতিশীলতা'কে খুব সরল-সম্পর্কে দেখা হয়; আর শিক্ষাকে ভাবা হয় অতি নিরীহ-নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া হিসাবে।[৩২] আরেকটি ধ্বংসাত্মক অনুমান থেকে – যে অনুমানটি ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্বেরই এক বিকট প্রকাশ – পুরো ভাবনাটি চালিত হয়। তা এই: ইংরেজ আমলের আগে এদেশে শিক্ষা বিশেষ ছিল না, যা ছিল তাও খুব নিম্নমানের।[৩৩]

মান যাই হোক, ঔপনিবেশিক বিধিব্যবস্থা ও বিলিবন্টনে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। দীর্ঘ সময়ের তর্ক-বিতর্ক ও পরিকল্পনার পর ১৮৩৫-এ ঘোষিত হয় নতুন শিক্ষানীতি, 'which was perhaps the most far-reaching single measure in the whole nineteenth century.' (Spear 2004: 274)

২.৬.৫.১ শিক্ষাবিতর্ক

শাসকপক্ষের লোকদের ব্যক্তিগত নথিপত্র এবং সরকারি কাগজপত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, স্থানীয়দের শিক্ষা-সম্পর্কিত আলোচনা ও প্রস্তাব ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো-সংক্রান্ত বিতর্কের মতোই পুরোনো। শাসননীতির ক্ষেত্রে শাসকদের মনোভাবের পরিবর্তনের (২.৫ দ্রষ্টব্য) সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে শিক্ষা-পরিকল্পনা। শুরুতে সংকটটা ছিল ভাষিক যোগাযোগের। স্থানীয়রা তখনো কাজ চালানোর মতো ইংরেজি শিখে উঠতে পারেনি। তাই যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ফারসি ও হিন্দুস্থানি। আরো পরে সংস্কৃতের সঙ্গেও শাসকবর্গের একটা বড় অংশের পরিচয় হয়। 'হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার আইন ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাঁহাদের পণ্ডিত ও মৌলবীর প্রয়োজন ছিল' (ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৩৯: ভূমিকা)। ফারসি কেবল আদালতের ভাষাই ছিল না, মুসলিম আইন-বিশেষজ্ঞ হিসাবে ফারসি-জানা লোক সরকারি কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হতেন; যেমন হিন্দু আইনের ব্যাখ্যার জন্য নিযুক্ত হতেন সংস্কৃত-জানা ব্যক্তি। এই দুই পদে নিয়োগের প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখেই কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮০) ও বেনারস সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২) – প্রাচ্যবিদ্যার এই দুই কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতদের তোষণ (২.৬.৩ দ্রষ্টব্য) এর আরেক কারণ। অবশ্য – যেমনটা আগেই বলা হয়েছে – প্রাচ্যবাদীদের নমনীয়তার দিকটাও এই শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয় ছিল।

ইভান্‌জেলীয় এবং হিতবাদীরা ভারতে পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা চালুর দাবি জানিয়ে আসছিলেন। চার্লস গ্রান্ট ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দেই ইংরেজিকে প্রশাসন, আদালত, রাজস্ব, ইউরোপীয় সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত করার দাবি তোলেন। ভারতে মুদ্রণযন্ত্র ও অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে দেশীয়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানোর কথা তিনিই প্রথম বলেছিলেন। এভাবে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা – ঔপনিবেশিক শাসনের স্থায়িত্ব ও দীর্ঘমেয়াদি মুনাফার রূপরেখা – প্রথম তাঁর চেতনাতেই স্পষ্টভাবে ধরা

পড়ে। এ ব্যাপারে মেকলে গ্রান্টের প্রস্তাব থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়: 'His minute owes … to Charles Grant's treatise in every way.' (Stokes 1959: 57)

আরো আগে, ১৭৭৫ সালে, কোম্পনির শীর্ষকর্তাদের অন্যতম ফিলিপ ফ্রান্সিস স্থানীয় তরুণদের ইংরেজি শিক্ষায় তৈরি করে নিয়ে প্রশাসনে নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন। লর্ড নর্থকে লেখা এক পত্রে তিনি লিখেছেন:

> If … the English language could be introduced into the transaction of business, … it would be attended with convenience and advantage to government and no distress or disadvantage to the natives, … to qualify themselves to employment, they would be obliged to study English instead of Persian…. (Guha 1988: 16)

এসব মত মোটেই ব্যক্তিগত মত হয়ে থাকেনি। উইলবারফোর্স-গ্রান্টদের জোরদার ওকালতির ফলেই ভারতের 'শিক্ষাসমস্যা'কে রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসাবে স্বীকার করে নেয় ব্রিটিশ সংসদ। সেই অঙ্গীকার রাখতেই প্রত্যাহৃত হয় মিশনারিদের উপর নিষেধাজ্ঞা, রচিত হয় ১৮১৩ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া আইনের ৪৩ নম্বর ধারা (শিবাজী ১৯৯১: ১০০)। এই ধারা মোতাবেক 'সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি এবং বিদ্বান ভারতীয়দের উৎসাহদান এবং বিজ্ঞানের প্রবর্তন ও প্রসারে'র জন্য বরাদ্দ হয় বার্ষিক এক লক্ষ টাকা। 'সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন' কিভাবে ঘটবে, আর 'ভারতীয় বিদ্যা' আর 'পশ্চিমা বিজ্ঞান'কেই বা কিভাবে মেলানো যায় – তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে পরবর্তী শিক্ষাবিতর্ক। ইতিমধ্যে উপনিবেশিতদের মধ্যে ইংরেজির চর্চা ও চাহিদা দুইই বেড়ে যায়। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে কোলব্রুক-ক্যামেরুন কমিশন যখন ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করেন, তখন তাঁদের ইংরেজি ভাষার অবস্থা খতিয়ে দেখার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল (মনসুর ১৯৮৪: ৭৪)। কমিশন প্রতিবেদন দাখিল করে ১৮৩২ সালে। ১৮৩৫ সালে মেকলের প্রস্তাবে শিক্ষাবিতর্কের একপ্রকার সমাপ্তি ঘটে। এ প্রস্তাবে প্রাচ্যবাদীদের বিপরীতে ইভান্‌জেলীয় ও হিতবাদীদের যুক্তির সমন্বয় ঘটেছিল (শিবাজী ১৯৯১: ১১০)।[৩৪]

২.৬.৫.২ শিক্ষা ও উপনিবেশায়ন

বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা না বুঝলেও[৩৫] শাসকপক্ষ কিন্তু উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষার মাহাত্ম্য সম্পর্কে আগাগোড়া হুঁশিয়ার ছিল। ইভান্‌জেলীয়দের মূল যুক্তি ছিল: ভারতের ওপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বহাল রাখতে কেবল কাঁচামাল ও শ্রমের নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, ঔপনিবেশিক অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষমতার সম্প্রসারণের প্রধান লক্ষ্য ও অবলম্বন হওয়া উচিত মানুষের চৈতন্য (শিবাজী ১৯৯১: ১০০)। এই চৈতন্যকে 'আধুনিক' ও 'প্রগতিশীল' করে তোলার জন্য উদগ্রীব ছিল ধর্মপ্রচারক, সমাজ-সংস্কারক, সিভিল সার্ভিসের লোক, বিচারক – সবাই। সবাই চাচ্ছিল শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার (প্রভাত ১৯৭২: ৩৫৫)। কারণ, এভাবেই কেবল দীর্ঘমেয়াদি উপনিবেশায়ন সম্ভব। মিশনারিদের প্রাথমিক যুক্তি ছিল ধর্মান্তরকরণ: 'Both Methodists and Evangelicals concentrated … on securing a minimum standard of education as a prerequisite for conversion, at least sufficient for a person to read and understand the Bible.' (Stokes 1959: 30) কিন্তু এর সঙ্গে বাণিজ্যের যোগ কখনোই গোপন ছিল না। চার্লস গ্রান্ট সেকথা স্পষ্ট করে বলেছেন। বলেছেন, শিক্ষার গুণে রুচির বদল হলে তারা বিদেশি সামগ্রীর জন্য লালায়িত হবে। এভাবে 'We shall also serve the original design

with which we visited India, that design still so important to this country – the extension of our commerce.' (উদ্ধৃত, Stokes 1959: 34) মেকলেও ইংরেজি শিক্ষার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ও দীর্ঘমেয়াদি ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন। ১৮৩৩-এ হাউস অব কমন্সের এক বিতর্কে তিনি বলেছিলেন, ভারতীয়রা যখন নিজেদের শাসনে থাকবে তখনো আমাদের আদবে চলবে আর আমাদের পণ্য ব্যবহার করবে – এটাই আমাদের জন্য কল্যাণের; ক্রয়ক্ষমতাহীন গরিব ভারতীয়দের সালাম পেয়ে কী লাভ (উদ্ধৃত, Sen 1977: 4)।[৩৬] পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, উপনিবেশ থেকে মুনাফা অর্জনের ধরন ও ধারণা ততদিনে বদলে গেছে। উনিশ শতকে উপনিবেশিত ভারত আর উপনিবেশক ইংল্যান্ড সম্পর্কে নীতি-নির্ধারক যেসব বই লেখা হয়েছিল, তার প্রায় সব কটাতেই শিক্ষার প্রসারের কারণ হিসাবে দীর্ঘমেয়াদি লাভের কথা বলা হয়েছে।

ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা দেশীয়দের কাছে হয়ত 'আধুনিক' জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎস ছিল। কিন্তু শাসকদের দিক থেকে নিশ্চিত করে বলা যায়, এ ছিল স্থানীয়দের মধ্যে পশ্চিমা মূল্যবোধ ও রুচি চারিয়ে দেওয়ার বিকল্পহীন উপায়। বিখ্যাত কেনীয় লেখক নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো একেই বলেছেন শ্রেণিকক্ষের নিপুণ শিল্পিত-সন্ত্রাস:

> The physical violence of the battlefield was followed by the psychological violence of the classroom. But where the former was visibly brutal, the later was visibly gentle … language was the most important vehicle through which that power fascinated and held the soul prisoner. The bullet was the means of the physical subjugation. Language was the means of the spiritual subjugation. (Thiong'o 2007: 9)

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাগজপত্র এবং বিতর্কাদি ঘেঁটে গৌরী বিশ্বনাথন ভারতের ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাঁর *Mask of Conquest: Literary Study and British Rule in India* বইতে গৌরী দেখিয়েছেন, ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ অর্থনৈতিক ও বস্তুগত শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল – আবির্ভূত হয়েছিল রাজনৈতিক আধিপত্যের কার্যকর উপাদানরূপে: 'The Eurocentric curriculum of the nineteenth century was less a statement of the superiority of the western tradition than a vital, active instrument of western hegemony in concert with commercial expansionism and military action.' (Viswanathan 1989: 166-67)

২.৬.৫.৩ শিক্ষার বন্দোবস্ত

১৮৩৫-এর শিক্ষানীতি চালু হবার বহু আগে থেকেই কলকাতায় ইংরেজি ভাষা রপ্ত করার ব্যাপক তোড়জোড় দেখা গেছে। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় পক্ষ আর স্থানীয়দের মধ্যে বিলক্ষণ মতৈক্য ছিল। ইংরেজ-নিয়ন্ত্রিত এই বাণিজ্যকেন্দ্রে অর্থ উপার্জনের সঙ্গে ইংরেজির যোগ প্রথম থেকেই অতি প্রত্যক্ষ। সামান্য ইংরেজি শিখলে বেনিয়ানি করা যায়, সাহেবদের হৌসে চাকরি পাওয়া যায়। 'তাই নতুন যুগে যে-বিদ্যার গৌরব ও মর্যাদা বাড়তে লাগল সমাজে, সে হল ইংরেজিবিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিদ্যা' (বিনয় ২০০০: ২০)। এ বাস্তবতা ইংরেজি শেখার প্রতি কী গভীর আগ্রহ তৈরি করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসু (১৯৬১, ১৪০২) কিংবা শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৯৫৭) লেখায়। শিবনাথ লিখেছেন: 'ইংরাজী শিক্ষা চাই, ইংরাজী শিক্ষা চাই এই রব দেশের সর্বত্র ধ্বনিত হইতেছিল'। আরো লিখেছেন, ডেভিড হেয়ার তাঁর স্কুলে ভর্তিপ্রার্থীদের অনুরোধে-উপরোধে উত্তক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বাটির 'বাহির হইলেই দলে দলে বালক 'me poor boy, have pity on me, me take in your school' বলিয়া তাঁহার পাল্কীর দুই

ধারে ছুটিত' (শিবনাথ ১৯৫৭: ৪৬)। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুতে কলকাতায় যে মাতম উঠেছিল (শিবনাথ ১৯৫৭: ১৫১), তা শহরবাসীর ইংরেজি শিক্ষাজনিত কৃতজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। সাহেবদের গুরুত্ব এবং সাহেবদের সঙ্গে যোগাযোগের গুরুত্বই নিঃসন্দেহে ইংরেজির গুরুত্বের কারণ। সেই গুরুত্ব এমনই যে, সে সময় 'সরকার-পরিচালিত এডুকেশন কমিটী ইংরাজী, সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত কমিটি প্রকাশিত ইংরাজী পুস্তকের একত্রিশ হাজার কপি মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে বিক্রয় হইয়া গেলেও, সংস্কৃত ও আরবীগ্রন্থ বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কার্যপরিচালকের বেতনও উঠে নাই' (অসিত ১৯৬৫: ১২৮)। এ ক্ষেত্রে 'প্রগতিশীল' ও 'প্রতিক্রিয়াশীল' পক্ষের মধ্যে একবিন্দু ফারাক ছিল না। হিন্দু কলেজের উদ্যোগ ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাঙালিরাই নিয়েছিলেন। এঁরা গোঁড়া হিন্দুসমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি (বিনয় ২০০০: ২১; বিমান ১৯৯১: ১০৬; শ্রীপান্থ ২০০১: ৩১৩)। সমকালে প্রতিষ্ঠিত 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি সাহেব ছাড়া দেশীয়দের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, তারিণীচরণ মিত্র। 'এঁরা সকলেই প্রতিক্রিয়াপন্থী, সতীদাহের সমর্থক, রামমোহনের প্রতিপক্ষ। অথচ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান বাংলার মাধ্যমে প্রচারিত হোক সেটি তাঁরা চাইছিলেন'। (প্রভাত ১৯৭২: ১৩৮)

সাহেবদের দিক থেকে স্থানীয়দের ইংরেজি শেখানোর চেষ্টার ঘাটতি ছিল না। সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ এসেছে মিশনারিদের কাছ থেকে। ১৮১৮ সালে মিশনারি স্কুলগুলোতে অন্তত ১৮০০ ছাত্র পড়ত (প্রভাত ১৯৭২: ৩৫০)। মিশনারি ও সরকারি ব্যবস্থাপনার বাইরে ইংরেজি শেখানোর জন্য বহু ফিরিঙ্গি স্কুলও গড়ে উঠেছিল।[৩৭] এসব স্কুলে মূলত ইংরেজি শব্দ শেখানো হত – বাক্য-রচনা-প্রণালি বা ব্যাকরণ নয়। রাজনারায়ণ বসু (১৪০২: ২৯৮-৩০১) প্রাথমিক অবস্থার এই শব্দ-নির্ভর চর্চা ও তার সংকটের রসাল বর্ণনা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, 'এইরূপ শোনা যায় শ্রীরামপুর মিশনারিগণ সে সময়ে এই বলিয়া তাঁহাদের আশ্রিত ব্যক্তিগণকে সার্টিফিকেট দিতেন যে, এ ব্যক্তি দুইশত বা তিনশত ইংরাজী শব্দ শিখিয়াছে' (শিবনাথ ১৯৫৭: ৭৪)। ক্রমে শব্দ-শেখার স্তর পেরিয়ে কলকাতার সমাজ ইংরেজি 'ভাষা' শেখার পর্যায়ে পৌঁছায়। হিন্দু কলেজ ওই শিক্ষার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিফলন।

উপনিবেশিত ভারতীয় সমাজে ইংরেজির প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ এভাবে শাসক-শাসিতের যৌথতায় সম্পন্ন হয়েছে। শাসকদের ভাষা-জানা দেশীয় জনশক্তির পর্যাপ্ততার প্রেক্ষাপটে পরের ধাপগুলো সম্পন্ন করেছে সরকার – আইন প্রয়োগ করে (মনসুর ১৯৮৪: ৭৫; পবিত্র ২০০৩: ১৩০)। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর সরকার শিক্ষা-সংক্রান্ত এক সিদ্ধান্তের বলে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৮৫৪ সালে চার্লস উড ভারতে ইংরেজি ভাষার বিশেষ প্রচারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এর ফলে ১৮৫৭-তে স্থাপিত হয় কলকাতা, বোম্বাই আর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৫৯ সাল থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ শুধু ইংরেজি-জানা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ১৮৬৪-তে সিদ্ধান্ত হয়, সিভিল সার্ভিস ও আইন পরীক্ষা ইংরেজিতে অনুষ্ঠিত হবে। সরকারি এসব সিদ্ধান্তের ফলে উপনিবেশিতদের মধ্যে ইংরেজির চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা ঘটে। এর আগে – ফারসি ও ইংরেজির মাঝখানে – শিক্ষায় বাংলার ব্যবহার বেড়েছিল। '১৮৩৫ থেকে ১৮৫৭-র মধ্যে প্রায় কয়েকশো ডাক্তারি বই বাংলায় লেখা হয়েছিল, তখন ডাক্তারি বাংলাতেই পঠনপাঠনের রেওয়াজ তৈরি হয়েছিল' (পবিত্র ২০০৩: ১৩০)। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর অভিন্ন বাংলা প্রদেশের সর্বত্র উচ্চস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৮২-তে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (হান্টার কমিশন) লক্ষ করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বছর কুড়ির মধ্যে এমনকি প্রাথমিক স্তরেও ইংরেজি সর্বব্যাপী হয়ে পড়ে (পবিত্র ২০০৩: ১৮)।

২.৬.৫.৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষার হাল

১৮৩৫-এর শিক্ষানীতি সাধারণভাবে কলকাতার শিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণির সম্মতি লাভ করেছিল। ১৮২৩ সালের ডিসেম্বরে লেখা বিখ্যাত পত্রে রামমোহন রায় ইঙ্গবাদীদের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। শোনা যায়, ইয়ং বেঙ্গলদের কেউ কেউ মেকলেকে তাঁর প্রস্তাব তৈরির ব্যাপারে সহায়তা করেন (De 1974: 65)। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসক ও উপনিবেশের প্রত্যক্ষ তাঁবে গড়ে ওঠা ভদ্রলোকদের এই মতৈক্যের ফাঁকে গণশিক্ষা ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারটা দীর্ঘদিনের জন্য চাপা পড়ে যায়। এমনকি অ্যাডামের অসামান্য রিপোর্টও শিক্ষিত হিন্দু জনগোষ্ঠীকে এদিকে আকৃষ্ট করতে পারেনি (De 1974: 58)। অ্যাডাম অনুমান করেছেন, বাংলা-বিহার অঞ্চলে পুরোনো দেশীয় ধারার বিদ্যালয়ের সংখ্যা এক লক্ষের কম নয়। তাছাড়া, উনিশ শতকের গোড়া থেকে মিশনারিদের নানা দল, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি, বাঙালি-বিদেশি ব্যক্তি – নানা পক্ষের উদ্যোগে দেশীয় ভাষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল (Long 1868: 1-9, *Introduction*; 23-26)। অ্যাডামের প্রস্তাব ছিল, এই বিদ্যালয়গুলো হবে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি। ক্রমে থানা, মহকুমা, জেলা, বিভাগ ও প্রদেশে ক্রমোচ্চপরম্পরায় এই শিক্ষা বিস্তৃত হবে। পাঠশালায় শিক্ষার মাধ্যম হবে দেশীয় ভাষা। মেধাবীরা উঁচুশ্রেণিতে ইংরেজিতে উচ্চতর পড়াশোনা করবে। এ ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত ও পরিচ্ছন্ন কাঠামো পেশ করেছিলেন।

কিন্তু অ্যাডামের পরিকল্পনা হালে পানি পায়নি – সরকারের কাছেও না, বাঙালি ভদ্রলোকদের কাছেও না। ১৮৬৬ সালে রেভারেন্ড লঙ্ গণশিক্ষা সম্পর্কে এক রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন (De 1974: 52-53)। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইংরেজি বিদ্যালয়গুলোর বেতন বাড়িয়ে শিক্ষাব্যয় নির্বাহ করা হোক, এবং সরকারের উদ্বৃত্ত টাকা গণশিক্ষায় ব্যয় করা হোক। তাঁর প্রস্তাবে জমিদারদের কাছ থেকে গণশিক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহের কথা বলা হয়েছিল। স্বভাবতই জমিদারশ্রেণি এর বিরোধিতা করে। সরকারও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ঔপনিবেশিক সরকারের এই শিক্ষানীতির কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। দীর্ঘমেয়াদি উপনিবেশায়ন আর খরচ কমানোর জন্যই তারা উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিল: 'This theory was, of course, very much useful in consolidating their rules with the assistance of a handful of educated bhodraloks.' (De 1974: 63) নিম্নবিত্তের বিপুল মানুষের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণিটির পার্থক্য এর ফলে আরো অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাংলা অঞ্চলে গণশিক্ষার জন্য সরকারি বরাদ্দ ছিল অত্যন্ত কম – মাত্র ১.০৩ লক্ষ টাকা; যেখানে বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই হার ছিল যথাক্রমে ৩.৯৩, ৩.৩৭ এবং ১.৬৭ লক্ষ। ১৮৭০-৭১ সালে বাংলায় এই খরচের শতকরা হার ছিল ১১.৭, যেখানে অন্য তিন প্রদেশে যথাক্রমে ৩০.৮৮, ২৪.৭ এবং ৩০ (Sen 1977: 38)। সরকারের এই নীতির ফলে উনিশ শতকের শেষাংশে ইংরেজি শিক্ষার কিছু প্রসার হয়েছিল। কিন্তু গণশিক্ষার কোনো প্রকল্প বা সরকারি বরাদ্দ না থাকায় এক ভারসাম্যহীন অবস্থা তৈরি হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বিকশিত না হয়ে হাই স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৯১ সালের জেলা জনসংখ্যা প্রতিবেদনে দেখা যায়, পাবনা ও ময়মনসিংহে হাই স্কুলের সংখ্যা কিছু বাড়লেও প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এর ছাত্র – দুইই উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে (Sen 1977: 40)। ১৯১৯ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টেও একই তথ্য পাওয়া যায় – প্রাথমিক বিদ্যালয় কমছে, উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়ছে। এই রিপোর্টে আরো বলা হয়: 'Nothing could more clearly show that it was not education at large, but English education, and

especially English education preparatory to the university course, which aroused the enthusiasm of Bengal.' (Sen 1977: 43)

২.৬.৫.৫ ঔপনিবেশিক শিক্ষার ফল

১৮৩৫-এর শিক্ষাপ্রস্তাবকে প্রগতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখাই রেওয়াজ। সংস্কৃত ও ফারসির বিপরীতে ইংরেজি শিক্ষাকে আধুনিকতার আমদানি হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই ঘটনা ঔপনিবেশিক শাসন সর্বব্যাপী হওয়ার ফল। এর মধ্য দিয়ে কেবল ধ্রুপদী প্রাচ্যশিক্ষার পতন ঘটেনি, কেবল প্রাচ্যের প্রতি বর্ণবাদী ঘৃণা পোক্ত হয়নি, স্থানীয় ভাষায় শিক্ষার ভিতও ধ্বংস হয়েছে। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর জন্য, এমনকি মেয়েদের স্কুলের জন্যও, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা খুব সামান্যই পেয়েছিলেন (Sen 1977: 33; De 1974: 66)। হিন্দুকলেজ পাঠশালা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা – স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য গঠিত এ ধরনের স্কুলগুলি যে টিকতে পারেনি, তা নতুন শিক্ষানীতির ধ্বংসাত্মক প্রবণতারই প্রমাণ।[৩৮] কিন্তু এত কিছু বিয়োগের মধ্য দিয়ে যা যোগ হল, তা কি 'পশ্চিমা শিক্ষা'? রামমোহনের ১৮২৩ সালের প্রস্তাবে (Roy 1906: 472-74) ইঙ্গবাদীদের মতেরই প্রতিফলন ঘটেছিল। তিনি প্রাচ্যের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে জাত বর্ণবাদী ঘৃণা পুরোপুরি মেনে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর চিঠিতে 'পশ্চিমা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' শেখানোর প্রস্তাব ছিল। বিপরীতে ওই শিক্ষানীতিতে পরম মূল্য পেল ইংরেজি সাহিত্য (Viswanathan 2009: 45)।

গৌরী বিশ্বনাথন ইংরেজি সাহিত্যকেন্দ্রিক এই পাঠক্রমকে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যবাদী চর্চার ভিন্ন এক ধরন হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ভারতে ইংরেজি সাহিত্যের বইগুলো ইংরেজ-সংস্কৃতির দূত হিসাবে কাজ করেছিল – সাফল্যের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণ ও দমন-নিপীড়নকে আড়াল করতে পেরেছিল। গৌরীর সঙ্গত সিদ্ধান্তঃ 'Both the Anglicist and the Orientalist factions were equally complicit with the project of domination, British Indian education having been conceived in India as part and parcel of the act of securing and consolidating power.' (Viswanathan 2009: 167)[৩৯]

১৮৩৬ সালের ১২ অক্টোবর, কলকাতা থেকে বাবাকে, ইভান্‌জেলিক্যাল মতাবলম্বী জ্যাকারি মেকলেকে, নব্যশিক্ষানীতির জনক লর্ড মেকলে একটি চিঠিতে লেখেন:

> No Hindu who has received an English education ever remains sincerely attached to his religion. It is my firm belief [so they always were] that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence. (উদ্ধৃত, Anderson 1983: 87)

মেকলের চিঠির এই অংশ উদ্ধৃত করে অ্যান্ডারসন লিখেছেন:

> The important thing is what we see a long-range (30 years!) policy, consciously formulated and pursued, to turn 'idolaters', not so much into Christians, as into people culturally English, despite their irremediable colour and blood. (Anderson 1983: 87)

ভারতে এই পরিকল্পনা আশাতীত ফল দিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার 'মাথাভারি কাঠামো'য় উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও মোহ ছিল; কিন্তু স্থানীয় বাস্তবতা বা পেশার সঙ্গে মিলিয়ে স্ব-উদ্যোগী মানুষ তৈরির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসক তৈরি। ফলে শতাব্দীর শেষাংশে এই শিক্ষিত শ্রেণি যে জীবিকার সংকটে পড়বে – এই শিক্ষার মধ্যেই তার কারণ নিহিত ছিল। এক হিসাবে দেখা যায়, ১৮৮১ সাল নাগাদ মোট ১৭০০ স্নাতকের অর্ধেকই বেকার (Sen 1977: 95)। একটা গরিব দেশের পক্ষে এই বিদ্যার্থীর সংখ্যাও অদ্ভুত রকমের বড়: ১৯২৫-২৭ সালে ভারতে যখন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ৯৪ হাজার, তখন ইংল্যান্ডে এ সংখ্যা ৪২ হাজার (সব্যসাচী ১৩৯৬: ১২৭)। বাংলা অঞ্চলের উচ্চশিক্ষিতদের কার্যকরতার পরিচয় দিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু। 'এ কালে'র বর্ণনায় লিখেছেন:

> দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না। বাহিরে শেক্‌সপীয়র, মিল্‌টন ও ডিফরেন্‌শিয়াল কেলকুলসের চাক্‌চিক্য, ভিতরে সব ভুওয়া। আমাদের সকল বিষয়েই সাহেবদের উপর নির্ভর, তাহাদের সাহায্য ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না। শেষকালে ইংরাজেরা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিবেন, তবে কি আমরা আহার করিব? তাঁহারা বিদেশীয় লোক, তাঁহারা আমাদের জন্য যতটুকু করেন, আমাদের ততটুকুই ভাল। তাহাদের উপর আমাদের জোর কি? (রাজনারায়ণ ১৪০২: ৩২০)

রাজনারায়ণের এই মন্তব্যে ইংরেজপ্রীতি যথেষ্ট আছে; ওই কালের বাস্তব অবস্থাও বেশ ভালো ফুটেছে। কিন্তু তাঁর ও তাঁদের বহুপ্রশংসিত 'ইংরেজি শিক্ষা'ই যে এ অবস্থার কারণ – শুধু সে কথাটি বলা হয়নি।

২.৬.৬ মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন

কিপলিঙের উপন্যাসে প্রতিফলিত সিপাহি বিদ্রোহের বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন এডওয়ার্ড সাইদ (1994)। কিপলিঙ এই বিদ্রোহকে বলেছেন 'পাগলামি'; বলেছেন, এতে বদমাশ দেশীয়রা ইংরেজ নারী ও শিশুহত্যার সুযোগ নিয়েছে। সাইদ লিখেছেন:

> Its author is writing not just from the dominating viewpoint of a white man in a colonial possession but from the perspective of a massive colonial system whose economy, functioning, and history had acquired the status of a virtual fact of nature. Kipling assumes a basically uncontested empire. (Said 1994: 162)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আত্মজীবনী*তে এই বিদ্রোহ-সম্পর্কিত কিছু বয়ান আছে। এ সময়ে তিনি উত্তর-ভারত ভ্রমণে ছিলেন। দিল্লির বাদশাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা তিনি দেখেছিলেন। যুদ্ধাহত সেনাদের বহনের জন্য রেল ও স্টিমারে যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল, তাতে তাঁর স্বাভাবিক গতিবিধি ব্যাহত হয়েছিল। এসব নিয়ে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, কিপলিঙের মতো তাঁর কাছেও ইংরেজশাসন সম্পূর্ণ 'স্বাভাবিক' শাসন, সিপাহিদের 'গোলমাল' ছিল অস্বাভাবিক। দিল্লির বাদশাকে ধরে নিয়ে যেতে দেখে তিনি লিখেছেন:

> সিমলাতে যাইবার সময়ে ইঁহাকে যমুনার চরে সুখে ঘুড়ি উড়াইতে দেখিয়াছিলাম; আজ আসিবার সময় ইঁহাকে দেখিলাম যে, ইনি বন্দী হইয়া কারাগারে যাইতেছেন। এই ক্ষণভঙ্গুর দুঃখময় সংসারে কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে? (দেবেন্দ্র ২০০৮: ১৬৯)

এই বর্ণনা নির্মমভাবে নিরাসক্ত।

এ বিদ্রোহ সম্পর্কে কলকাতার ভদ্রলোকশ্রেণির প্রতিক্রিয়ায় অবশ্য যথেষ্ট আসক্তি ছিল। 'The connection between the urge for education and the consolidation of the Raj … had ideological effects which were soon to be made explicit by the bhadralok's response to the Mutiny.' – লিখেছেন রণজিৎ গুহ (Guha 1988: 18-19)। এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার বেশুমার পরিচয় পাওয়া যায় সেকালের পত্রপত্রিকায়। প্রভাবশালী পত্রিকা *সংবাদ প্রভাকরের* ২০/৬/১৮৫৭ তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়:

> বিশেষতঃ বঙ্গদেশস্থ সমস্ত বাঙ্গালি প্রজা নিতান্ত প্রভুভক্ত, ইহারা নিরন্তর কেবল শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর প্রতুল প্রত্যাশা করে, যাহাতে রাজপুরুষদিগের রাজলক্ষ্মী ভারতবর্ষে চিরস্থায়ীনী হয়েন, একাগ্র চিত্তে তাহারই অভিলাষ করে, স্বপ্নেও কখনো অমঙ্গল চিন্তা করে না, কারণ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনতায় অধুনা দুর্ব্বল ভীরু বাঙ্গালি ব্যূহ যেরূপ সুখ সচ্ছন্দতা সম্ভোগ পূর্ব্বক সানন্দে বাস করিতেছে, কস্মিন্‌কালে তদ্রূপ হয় নাই, রামরাজ্য আর কাহাকে বলে? … সংপ্রতি অবোধ সেনারা বুদ্ধির বিকার বশতঃ যে কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে, আমরা সেই কাণ্ডকে প্রকাণ্ড কাণ্ড বলি না, কেননা যেমন ব্রহ্মাণ্ডের নিকট ভাণ্ড, সেইরূপ বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস জাতির নিকট এই কাণ্ড অতি ক্ষুদ্র। (বিনয় ১৯৬২: ২২৬-২৮)

ওই কালের পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে বহু প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে। কোনোটিতেই বিপরীত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না।[৪০] এরকমই যে হওয়ার কথা, শাসকপক্ষ সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। ১৮৫৩ সালে জর্জ ক্যাম্পবেল লিখেছেন:

> Bengalese who learn English may become bad subjects and servants, and (if permitted to do so) they may write any account of treason; but I do not in the least apprehend their acting upon it. The classes most advanced in English education, and who talk like newspapers, are not yet those from whom we have anything to fear; but on the contrary, they are those who have gained *everything* by our rule, and whom neither interest nor inclination leads to deeds of daring involving any personal risk. For a long time to come, if we incur any political danger, it will be from enemies of the original native stamp. (উদ্ধৃত, Stokes 1959: 254)

চার বছর পরের সিপাহী বিদ্রোহ তো বটেই, গোটা উনিশ শতক জুড়েই এ অনুমান সত্য থেকেছে।

বাঙালি ভদ্রলোক সমাজে উপনিবেশিত মনোভঙ্গির এ এক নমুনা মাত্র, একমাত্র নয়। কেন এমন হয়? কেন শাসিতরা কথা বলেন শাসকদের ভঙ্গিতে, আর শত্রু-মিত্রের ভেদ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়?

উপনিবেশতত্ত্বের পণ্ডিতেরা এ বস্তুকেই বলেছেন মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন। উপনিবেশের সম্পদের উপর দখল কায়েম করাই উপনিবেশায়নের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক বিবেচনায় উপনিবেশায়নের সামান্যই বোঝা যাবে। নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো এ দুয়ের – অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের – সম্পর্ক বিশদ করেছেন:

> Its most important area of domination was the mental universe of the colonized, the control, through culture, of how people perceived themselves and their relationship to the world. Economic and political control can never be complete or effective without mental control.

> To control a people's culture is to control their tools of self-definition in relationship to others. (Thiong'o 2007: 16)

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে এসে বাঙালি ভদ্রলোক সমাজে এই আধিপত্য পূর্ণরূপে কায়েম হয়েছিল। ফলে 'আপন-পর' আর 'ভালো-মন্দে'র ছক গিয়েছিল উলটে।

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গোর মতে, এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ স্থানীয় সংস্কৃতির অবনয়ন। *Black Skin White Masks*-এর ফানোর কথা ধার করে একে বলা যায় 'an inferiority complex … created by the death and burial of its local cultural originality.' (Fanon 1968: 18) কলকাতার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল ইঙ্গবাদীরা (২.৬.১ দ্রষ্টব্য)। প্রাচ্যের জ্ঞান আর মূল্যবোধের বিপরীতে ইংরেজি শিক্ষার চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াটিকে দৃঢ় ভিত্তি দেয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়:

> হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারাও ... বলিতে লাগিলেন যে – এক সেল্‌ফ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া *Edgeworth's Tales* সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না। (শিবনাথ ১৯৫৭: ১৪২)

দেবেশ রায় (১৯৯০: ৮৫) পত্রপত্রিকা বিশেষত *সমাচার দর্পণ* থেকে স্থানীয় সংস্কৃতির আরেক ধরনের অবনয়নের খবর দিয়েছেন। *দর্পণে*র প্রধান বিষয় ছিল ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্ববিস্তারের সংবাদ-কাহিনি, ইউরোপ-ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের সংবাদ, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ। এভাবে নাগরিক বাঙালির কাছে বৃহত্তর ভারতবর্ষ ও বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিত *দর্পণে*র মতো করে তৈরি হতে থাকে। এই পত্রিকায় বাঙালি সমাজের খবর হিসাবে প্রাধান্য পাচ্ছিল – বৃদ্ধের বহুবিবাহ, কুলীনের বহুবিবাহ, ঘটকের কারসাজি, বিবাহের উছিলায় প্রবঞ্চনা, পুরোহিতদের কীর্তিকাহিনি, দেশীয় কবিরাজদের চিকিৎসা-বিভ্রাট ইত্যাদি। প্রায়শই ছাপা হয়েছে 'sketches and articles on local superstitions and inconsistencies in social behaviour' (Kamal 1977: 25)। প্রভাবশালী 'জ্ঞান-উৎস'গুলোতে দীর্ঘদিন এই ধরনের প্রচারণা চলার পর উপনিবেশিতের উচ্চারণ এরকমই হওয়ার কথা:

> আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা আত্মশাসনে অক্ষম। আমাদিগকে এক্ষণে অনেকদিন পরাধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এক প্রভু গিয়া এক প্রভু হইতে পারে, কিন্তু হয়ত সেই প্রভু, আমাদিগের বর্ত্তমান প্রভুরা যত ভাল, তত ভাল না হইতেও পারেন। অতএব এতদ্দেশে ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থায়ী হয়, আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকি। (রাজনারায়ণ ১৪০২: ৩৩৩)

ভারতবর্ষীয়রা হীন, তাই পরশাসন তাদের জন্য অনিবার্য – এই বোধ কলকাতার ভদ্রলোকদের মনে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই জেঁকে বসে গেছে।[৪১] এর ফলে ঔপনিবেশিক শাসন কতটা সহজ হয়ে গেছে তার প্রমাণ মেলে ইংল্যান্ডে সম্পদপাচার বিষয়ে *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* পত্রিকার অবস্থানে: 'The Hindu Patriot looked upon this annual payment as India's tribute to England for the blessings of civilized rule.' (Chandra 1975: 116) অস্ত্রের জোরে এই সম্মতি আদায় অসম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব ভাষার জোরে। নগুগি ওয়া থিওঙ্গোর মতে এ হল 'conscious elevation of the language of the colonizer' (Thiong'o 2007: 16)। এখানে 'ভাষা' কথাটি ঠিক ইংরেজি-বাংলা অর্থে নয়, ব্যবহৃত হয়েছে আরো গভীর ও ব্যাপক অর্থে। এ আসলে জীবনদৃষ্টি, বা ভাবাদর্শ, বা সংস্কৃতি। আশিস নন্দী এই 'ভাষা'র সৃষ্টি-প্রক্রিয়া দুই ধাপে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, 'It includes codes which both the rulers and the ruled can share.' (Nandy 1989: 2) এই কোড পুরোনাকে ভুলিয়ে দেয়, আর আবশ্যিকভাবে তাতে থাকে উপনিবেশকের আধিপত্য। দ্বিতীয়ত,

> The culture of colonialism presumes a particular style of managing dissent. Obviously, a colonial system perpetuates itself by including the colonized, through socio-economic and psychological rewards and punishments, to accept new social norms and cognitive categories. … Particularly strong is the inner resistance to recognizing the ultimate violence which colonialism does to its victims, namely that it creates a culture in which the ruled are constantly tempted to fight their rulers within the psychological limits set by the latter. (Nandy 1989: 3)

দীর্ঘ বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রধানত উপনিবেশের সুবিধাভোগী অংশের মধ্যে কায়েম হয় ঔপনিবেশিক 'হেজিমনি',[৪২] এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অব্যাহত থাকে। ঐতিহাসিকেরা ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যায় গ্রামসির হেজিমনি তত্ত্ব খুব গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, যদিও তাঁরা এও খেয়াল করেছেন, ইউরোপের যে বাস্তবতায় গ্রামসির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার ফারাক বিস্তর। তবে এটা ঠিক, ঔপনিবেশিক সমাজে দমনপীড়নের পাশাপাশি 'সম্মতি'ও হাত-ধরাধরি করে চলেছে, যে সম্মতি কখনো স্বতঃউৎপাদিত, কখনো বা কৌশলে জাত (Loomba 2001: 31)। এর মধ্য দিয়ে – উপনিবেশকের আধিপত্য আর উপনিবেশিতের হীনতার বোধ একত্র হয়ে – গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ নতুন ভাষা, যাকে বলা যায় উপনিবেশিত মনস্তত্ত্ব ও সংস্কৃতির ভাষা।

এই ভাষার একটা প্রকাশ্য দিক আছে। পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, রীতিপদ্ধতি আর আচার-বিচারে তা সহজেই চোখে পড়ে:

> Some of the representatives of the new Bengali elite looked exactly like the Indian 'gentlemen' whom Macaulay had wanted to produce; now that they actually existed – well dressed and polished and speaking better English than their British masters. (Kulke and Rothermund 1999: 242)[৪৩]

ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে এর গুরুত্ব কিন্তু মোটেই কম নয় (২.৬.৫.২ দ্রষ্টব্য)। ধনঞ্জয় রামচন্দ্র গাডগিল তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৮০), উনিশ শতকে এরা কিভাবে সাহেবদের অনুকরণে বিলাতি কাপড় ও আমদানি করা শহুরে বিলাসদ্রব্যের দিকে ঝুঁকল, এবং তার ফলে দেশের উঁচুদরের এবং শহুরে শিল্পগুলো প্রাণ হারাল। বরং গ্রামীণ শিল্পীশ্রেণি তাদের গরিব গ্রাম্য খদ্দেরদের কল্যাণে আরো বেশি টিকে ছিল। দ্বিতীয় দিকটা আরেকটু গভীর। সামাজিক আন্দোলন থেকে সভাসমিতি পর্যন্ত বাইরের কর্মকাণ্ড আর দৈনন্দিন অভ্যাস থেকে শুরু করে নামোচ্চারণের রীতি পর্যন্ত অন্দরের যাপন ও বোধে সেই ভাষার অপ্রতিরোধ্য সঞ্চার। প্রথমটি অনেকের সজ্ঞান প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি যতটা সচেতন তার চেয়েও বেশি পরিমাণে অচেতন প্রক্রিয়া; আর 'স্বাভাবিক' যাপনপদ্ধতি হিসাবে একে 'বাঙালি হিন্দু অনিবার্যত মেনে নেয়। সে মেনে নেওয়ার প্রক্রিয়াতেই সে

ইংরেজকে ও নিজেকে একটা দৃশ্য হিশেবে মাত্র দেখে, বা নাটকের পাত্রপাত্রী হিশেবে মাত্র – নাটকের ঘটনার ওপর সেই পাত্রপাত্রীর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই'। (দেবেশ ১৯৯০: ৩৫৫)

ঔপনিবেশিক ভাষার সবচেয়ে গভীর ও সম্পূর্ণ গোপন দিকটিকে বলা যেতে পারে ভাবাদর্শ – জীবনবোধ ও বিশ্বদৃষ্টি। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত রচনা প্রতিযোগিতার রচনাগুলোকে বলা যায় এর আদর্শ নমুনা (Guha 1988: 19-20)। *Has Europe or Asia benefited most by the discovery of the passage round the Cape of Good Hope to India?* – হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেওয়া হয়েছিল। ১৮২৮-এর জানুয়ারিতে এর উত্তরে লেখা প্রবন্ধগুলো কলেজ কর্তৃপক্ষ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গর্বভরে প্রদর্শন করে। প্রবন্ধগুলোর মূল বক্তব্য ছিল এমন যে, এই পথ আবিষ্কার ইউরোপের জন্য বিশেষত ইংরেজদের জন্য নিশ্চয় কল্যাণের হয়েছিল। কিন্তু এশিয়াবাসী বিশেষত ইংরেজ-রাজত্বের ভারতীয়দের জন্য এর ভূমিকা তুলনাহীন। পুরোনো মুসলমান শাসনামলে স্বৈরশাসন আর অন্যায়-অবিচার ছাড়া কিছুই দেখা যায়নি। কিন্তু ইংরেজদের যোগ্য শাসনে ভারতীয়রা দিন দিন শিক্ষা ও বিজ্ঞানে উন্নতি করছে। ইংরেজশাসন বলবত থাকলে এই উন্নতি যে অব্যাহত থাকবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। রণজিৎ গুহ লিখেছেন, এই ভাষা রপ্ত হয়ে যাওয়ার পর –

> There would be only one short step for the student to take before maturing into a commited loyalist as he left school for employment at a lower rung of the colonial administration or with a British mercantile firm or for a career in one of the liberal professions or simply for life of leisure as an absentee landlord. (Guha 1988: 20)

যেখানে যেভাবেই থাকুক, এই তরুণেরা ইংরেজশাসনকে পরম পাওয়া বলেই জ্ঞান করবে। আশিস নন্দী লিখেছিলেন, 'Colonialism minus a civilizational mission is no colonialism at all. It handicaps the colonizer much more than it handicaps the colonized.' (Nandy 1989: 11) কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোক সমাজে ঔপনিবেশিক ভাষার সবগুলো স্তর এতটাই কার্যকর হয়েছিল যে, 'ভারতবর্ষে ইংরেজদের সভ্যতাভিযানের তত্ত্বটি ইংরেজরা ভারতীয়দের কাছ থেকে শিখেছিল কি না – এরকম একটা সন্দেহও জাগতে পারে'। (দেবেশ ১৯৯০: ৬৭)

২.৬.৭ ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির সার্বিক কাঠামো

ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির প্রকাশ্য একটা রূপ আছে। এই রূপ সুভাষণ আর কোমলতায় গড়া। সামরিক শক্তিও অবশ্য প্রকাশ্য। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে 'শৃঙ্খলা'র মতো 'সভ্য' ব্যাপার-স্যাপার। আরেক দিক গোপন। মুনাফা থাকে এই গোপনের সবচেয়ে গভীরে। তার একধাপ উপরে দৃশ্যমানতা আর অদৃশ্যের মেশামিশিতে বিরাজ করে 'সুশাসন'। হোমি কে ভাবা অল্প কথায় পুরো পরিস্থিতির পরিচয় দিয়েছেন:

> The barracks stands by the church which stands by the schoolroom; the cantonment stands hard by the 'civil lines'. Such visibility of the institutions and apparatuses of power is possible because the exercise of colonial power makes their relationship obscure, produces them as fetishes, spectacles of a 'natural'/ racial pre-eminence. Only the seat of government is always elsewhere – alien and separate by that distance upon which surveillance depends for its strategies of objectification, normalization and discipline. (Bhabha 2006: 119)

২.৭ উপনিবেশিত জনসমাজ

আলবেয়ার মেমির মতে, ঔপনিবেশিক শাসন অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যে ফ্যাসিবাদী, কারণ এতে গুটিকতকের মুনাফা নিশ্চিত করতে বিপুল মানুষকে নিপীড়নে রাখা হয় (Memmi 1976: 62)। আদতে উপনিবেশিত মানুষ এই প্রক্রিয়ায় মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল ভূমি আর সম্পদ।[৪৪] কিন্তু সেই ভূমি আর সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপনিবেশিতের সাহায্যও দরকার হয়েছে। একেবারেই বাস্তব প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক শক্তি নতুন জায়গায় আসর গাড়া এবং ওই জায়গার অজানা সব 'জ্ঞানে'র জন্য স্থানীয়দের উপর নির্ভরশীল ছিল (Loomba 2001: 67)। এর ফলে অবশ্য 'গুটিকতকে'র সীমা খুব প্রসারিত হয় না। বরং সুবিধাজনক স্থানীয় কিছু মানুষ ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার বলয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বাংলা অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, মূলত কলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে হেস্টিংসের আমল থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালি ছোট্ট একটা গোষ্ঠীর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রথম পর্যায়ে 'সম্পর্কটা অবশ্য লুটের মালের ভাগবাটোয়ারার মধ্য দিয়েই স্থাপিত হয়েছিল' (বিনয় ২০০৪: ২৭১)। পরে আরো নানা রকমের পারস্পরিকতা তৈরি হয়। এর ফলে উপনিবেশক-উপনিবেশিত সম্পর্কের ধ্রুপদী 'নিজ-পর' কাঠামো মোটেই শিথিল হয়নি; কিন্তু তৈরি হয়েছিল আরো গভীর আর দীর্ঘমেয়াদি এক বিচ্ছিন্নতা – উপনিবেশিত ওই ছোট্ট গোষ্ঠীটির সঙ্গে উপনিবেশিত বিপুল মানুষের সর্বাত্মক বিচ্ছেদ। সুবিধাভোগী অল্পের বিপরীতে বঞ্চিত বিপুল জনগোষ্ঠী – সংক্ষেপে এই হল উপনিবেশিত জনসমাজের গড়ন। বরুণ দে এই সমাজের মানচিত্র এঁকেছেন এভাবে:

> All these led to the formation of a bipolar structure, of *herrenvolk* and alien races, within each of which were embryonic class distinctions; of aristocracy based on feudalism; of middle class based on subaltern capital and ancillary professions of empire; and of workers and peasants saddled both with decadent feudalism and perverted capitalism. (De 1976: 124)

২.৭.১ সুবিধাভোগী শ্রেণি

কলকাতার প্রথম যুগের ধনী পরিবারগুলো মূলত মুৎসুদ্দি-দালাল-বেনিয়া (Sarkar 1997: 168)। উনিশ শতকের প্রথমাংশে কলকাতা তথা ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে প্রতাপশালী পরিবারগুলোর প্রায় সবাই ধনসঞ্চয় করেছিল কোম্পানির ব্যবসায়-সহযোগী হিসাবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য এ শ্রেণিটি অন্তত প্রথম যুগে অপরিহার্য ছিল। এদেরই একটা বড় অংশ বেনিয়াগিরিতে উপার্জিত টাকা খাটিয়েছিল জমিদারিতে। সূর্যাস্ত আইনের ফেরে পড়ে পুরোনো জমিদারেরা জমিদারি হারাতে থাকলে ক্রমে নগদ অর্থে বলীয়ান বেনিয়ারা সেসব জমিদারি কিনে নেয়। এর অন্য অনেক সামাজিক-অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু একটা তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই যে, ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা একটা শ্রেণির হাতে স্থানীয়দের ক্ষমতা-বিত্ত-সম্মান একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। বৃহত্তর অর্থে শাসকশ্রেণির সঙ্গে এদের স্বার্থ ছিল প্রায় এক সুতায় গাঁথা (Chandra 1975: 15)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের জন্য খুবই লাভজনক ছিল (De 1974: 16)। ১৭৯৩ সালে ধার্য করের পরিমাণ ছিল ২৮৬ লক্ষ টাকা। জমিদারদের আদায়ের পরিমাণ ১৭৯১ সালের ৩১৮ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৯০৪ সালে ১৪৭২ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে সরকারকে প্রদেয় খাজনার পরিমাণ ছিল ৩২৩ লক্ষ মাত্র। এই বিপুল মুনাফা ধনী উকিল ও ব্যবসায়ীদের জমিদারি কিনতে আগ্রহী করে তুলেছিল। ফলে অনুপস্থিত জমিদারের সংখ্যা দিনকে দিন

বাড়তে থাকে। এই সংখ্যা বাড়ার আরেক কারণ ১৮১৯ সালের আইন, যেখানে মধ্যস্বত্ব-প্রথাকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল (সিরাজুল ২০০২: ১৫৭)। এই আইনের ফলে জমিদারশ্রেণি অনর্জিত আয়-ভোগকারী কর্মবিহীন অলস শ্রেণিতে পরিণত হয়। এদের জমিদারিতে অনুপস্থিতি মানে কলকাতায় উপস্থিতি। প্রধানত এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাই কলকাতার ইংরেজি শিক্ষা ও অন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। বাংলা অঞ্চলের ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসন পেয়ে গিয়েছিল দরকারি কেরানি ও হিসাবরক্ষক শ্রেণি। সমগ্র ভারতে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে যুক্ত কেরানিকুলের অন্তত এক-তৃতীয়াংশের জোগান এখান থেকেই আসত (Kulke and Rothermund 1999: 243)।

দেশীয় সমাজের উঁচুতলায় ছিল জমিদারশ্রেণি। এর সঙ্গে যুক্ত সচ্ছল মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিটি চাকরি-বাকরি, স্বাধীন পেশা আর কায়কারবারে জড়িত ছিল, যে সুযোগগুলো ব্রিটিশরা নিতে চাইত না বলে দেশীয় মেধাবীদের জন্য বরাদ্দ করা হয় (Kumar 1983: 286)। বাংলা অঞ্চলে স্বাধীন কারবার বা বিনিয়োগের সুযোগ ছিল খুবই কম (২.৪ দ্রষ্টব্য)। কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিনিয়োগ হয়নি। আর সামরিক বাহিনীতেও খুব কমসংখ্যক ভদ্রলোক যুক্ত ছিল। ফলে চাকরি-বাকরিই ছিল ভরসা। কিন্তু কলকাতার মধ্যবিত্ত সরকারি বা সওদাগরি অফিসে চাকরি করেছে – এই সাদা তথ্যে তাদের ঠিক চেনা যাবে না। এ মধ্যবিত্তের মূল বৈশিষ্ট্য ইংরেজি শিক্ষা, উচ্চ বর্ণহিন্দুর আধিক্য, আর ছোট জমিদারির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা (Sarkar 1997: 169)। জমিদারির ভাগাভাগি ও কেনাবেচার ফলে ছোট জমিদারির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। এই অল্প আয়ে ভদ্রোচিত জীবনযাপন সম্ভব হচ্ছিল না। স্বভাবতই তাদের ঝুঁকতে হয় শিক্ষার দিকে; যে কোনো সম্মানজনক পেশার জন্য তা আবশ্যিক ছিল।[৪৫] ফলে বেনিয়াগিরি-দেওয়ানি হয়ে জমিদারি, আর ইংরেজি শিক্ষা হয়ে চাকরিবাকরি – এই ক্রমে উপনিবেশিত বাংলার সুবিধাভোগী অংশের যে পরিচয় দাঁড়ায়, তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল: উৎপত্তি ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতায় এরা মোটের উপর একই গোত্রভুক্ত। জন্ম ও কর্মসূত্রে এই গোত্র ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে বাঁধা।

বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইউরোপীয় মধ্যবিত্তের মতো শিল্পায়ন থেকে উদ্ভূত হয়নি; উদ্ভূত হয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশাসনিক যন্ত্র থেকে। স্বাভাবিকভাবেই এই দুই মধ্যবিত্তের মধ্যে আমূল চরিত্র ও গুণগত পার্থক্য ছিল। ইউরোপীয় মধ্যবিত্তের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিকাশ লাভ করে ব্যক্তিবাদ, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ; আর বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য দাঁড়ায় পরনির্ভরশীলতা, শিল্পবিমুখতা এবং সার্বিকভাবে অনুৎপাদনশীলতা (সিরাজুল ২০০২: ১৫৫-৫৬; নেপাল ১৯৮৩: ২)। উৎপাদনের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকা এই মধ্যবিত্তের সবচেয়ে বড় গুণগত সংকট। রামমোহন-দ্বারকানাথদের পরের এক প্রজন্মের মধ্যেই বাঙালি 'মধ্যবিত্ত' মধ্যস্বত্বভোগী ধরনের কর্মকাণ্ড থেকেও উৎখাত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্বৃত্ত আর চাকুরিই হয়েছে একমাত্র অবলম্বন। এর ফলে, সুমিত সরকারের মতে, 'The bourgeois values imbibed by the intelligentsia through their western education and contacts … remained bereft of material content or links with production.' (Sarkar 2000: 82)
সুমিত সরকার (2000: 23) উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যাসের – যাকে বলা যায় রেনেসাঁসের কালের সবচেয়ে ভালো সাহিত্যিক উপস্থাপন – চরিত্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, জীবিকার জন্য তাদের কোনো কাজ করতে হয় না। বিপরীত উদাহরণ তিনি নিয়েছেন ডিকেন্স থেকে, যাঁর সম্পর্কে বলা হয়, কাজ বা পেশা তাঁর চরিত্রগুলোর আবশ্যিক গড়ন-উপাদান। কাজের বা আর্থিক উৎসের একই ধরন থেকে যে সমমাত্রা গড়ে ওঠে –

উপনিবেশিত বাঙালি মধ্যবিত্তের তাও ছিল না। 'রামমোহন ও দ্বারকানাথের মতো সামাজিক বিষয়ে মুক্তবুদ্ধি, বিশ্বদৃষ্টিসম্পন্ন, ক্ষমতাবান বাঙালিরাও তো একই সঙ্গে ছিলেন – জমিদার, নায়েব ও ব্যবসায়ী' (দেবেশ ১৯৯০: ৩১১)। ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত বলে কোনো একটি শ্রেণির কোনো নির্দিষ্ট আকারই ছিল না। জমিদার থেকে শুরু করে ছোট চাকুরে পর্যন্ত সবাই এই শ্রেণির অংশ ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ সালে প্রকাশিত *কলিকাতা কমলালয়ে* বাঙালি মধ্যবিত্তকে ভাগ করেছিলেন তিনভাগে (ভবানী ২০০৩: ৪৭৫-৭৬)। ভাগটা তিনি করেছিলেন বিত্তের বাড়তি-কমতি হিসাবে – উৎপাদন-সম্পর্কের ধরন থেকে নয়। কারণটা অবশ্য পরিষ্কার: উপনিবেশের ছাঁচে গড়ে ওঠা আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই সীমিত ছিল এই শ্রেণির গতি ও বিধি। দেবেশ রায় লক্ষ করেছেন, 'ইয়ংবেঙ্গল-ব্রাহ্মদের সঙ্গে তথাকথিত রক্ষণশীলদের সমাজসংস্কারের কর্মসূচি নিয়ে এত বিতর্ক এতদিন ধরে চলল কিন্ত এই সমস্ত পরিবারের আচার-আচরণে, বিবাহ-সম্পর্কে, সম্পত্তি-সম্পর্কে কোনো আধুনিক ঘটনা ঘটল না – সবটাই সীমাবদ্ধ থাকল কাগজের পাতার তর্কে আর মিটিঙের প্রস্তাবে' (দেবেশ ১৯৯০: ৩১০)। উপনিবেশবাহিত ধারণা ও মূল্যবোধ নাগরিক সভাসমিতি পেরিয়ে জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে বড় জনসমাজের সঙ্গে নাড়ির যোগ তৈরি দূরের কথা, নিজেদের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো বিপ্লবের মধ্য দিয়েও এ সমাজ রূপান্তরিত হয়নি।

এ কারণেই উপনিবেশের সুবিধাভোগী অংশটিকে 'প্রগতিশীল', 'সংস্কারপন্থী', 'রক্ষণশীল', 'উদারনীতিবাদী' ইত্যাদি নানা মতগোষ্ঠীতে ভাগ করে দেখা খুব কাজের হয় না। অশোক সেন দেখিয়েছেন, এই ধরনের ভাগ উপনিবেশের সমাজে অর্থহীন – 'The division between the so called 'conservatives' and 'liberals' was related to no essential differences of economic interests and educational orientation, nor to that of caste affiliation.' (Sen 1977: 67) দেবেশ রায় 'পাশ্চাত্যমুখিতা ও প্রাচ্যমুখিতা, রক্ষণশীলতা ও সমাজসংস্কার, ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃত শিক্ষা এই সবের ভিতর' শনাক্ত করেছেন 'মিথ্যা সংঘাত'। তাঁর মতে, *সমাচার দর্পণ* ও *সমাচার চন্দ্রিকা*, *জ্ঞানান্বেষণ* ও *সংবাদ প্রভাকর* ইত্যাদি এক-একটি জীবনাদর্শের প্রতিনিধি সেজেছে। কিন্তু যখনই সাহেবদের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের সুযোগ এসেছে, যখনই নাগরিক ব্যবস্থায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে – তখনই এসব জীবন-দর্শনের বিবাদ মুহূর্তে ঘুচে গেছে (দেবেশ ১৯৯০: ৭২)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় সমাজের 'রক্ষণশীল-প্রগতিশীল' যৌথতার নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ডফ সাহেবের মন্ত্রণায় 'স্ত্রীলোক পর্যন্ত খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে' – এই সংবাদে কলকাতার নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রামগোপাল ঘোষ; আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন। ইহাতেই ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মসভার যে দলাদলি, এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই একদিকে হইলেন, এবং যাহাতে খ্রীষ্টানদিগের বিদ্যালয়ে আর ছেলে পড়িতে না পায়, যাহাতে খ্রীষ্টানেরা আর খ্রীষ্টান করিতে না পারে, তাহার জন্য সম্যক চেষ্টা হইতে লাগিল। ... সভা হইতে 'হিন্দুহিতার্থী' নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, এবং তাহার কর্ম্মসম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। (দেবেন্দ্র ২০০৮: ৬৭)

'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তেও পাওয়া যায় এমন বর্ণনা: 'ইউরোপীয়দের সার্থক ঐকমত্য দৃষ্টে ভারতবর্ষেও প্রবীণ নবীন রক্ষণশীল প্রগতিবাদী সকলেই একতাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন' (দেবেন্দ্র ২০০৮: ৩৩০)। জমিদারদের বেআইনি দখল বন্ধ করতে ১৮২৯-এর রেগুলেশন থ্রিতে কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব উঠলে শহর-গ্রামের সব জমিদারই একত্রিত হয়ে আবেদনপত্র পাঠান। 'সে আবেদনে গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুরও সই দেন ও জমিদারদের ক্ষমতাকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রায় নিরঙ্কুশ করার ব্যবস্থা চান' (দেবেশ ১৯৯০: ৩১৪)। বোঝা যায়, 'উদারপন্থী' আর 'রক্ষণশীল'দের মধ্যে ফারাকটা মোটেই মৌলিক কিছু ছিল না।[৪৬]

ইতিহাসের একই যুক্তিতে উপনিবেশিত বাঙালির এই অংশের তৎপরতা বরাবরই সংকীর্ণ গোষ্ঠীচেতনায় সীমিত ছিল। সেই সংকীর্ণতা কেবল শ্রেণির দিক থেকেই নয়, বর্ণ এবং ধর্মের দিক থেকেও বটে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি জাতিকে সম্বোধন করার রেওয়াজ তাঁদের রচনায় কখনোই দেখা যায়নি (De 1974: 47); বরং 'বাঙালি' বর্গটিকে নিজেদের সুবিধামত তৈরি করে নিয়ে তাঁরা নিজেদের কাজে খাটিয়েছেন। দেবেশ রায় লক্ষ করেছেন:

> এমনিতেই তো মুসলমান শাসনের বদলে সাহেবদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে সাহেবরা গোঁড়া হিন্দুদের কাছে ছিলেন প্রায় গোরা-অবতার। ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার লোকজনের চাইতে আগে ইংরেজি বলতে-লিখতে পারতেন বলেও বাঙালিরা মনে মনে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ ভাবতেন নিজেদের। যেমন তাঁরা এংলো-ইন্ডিয়ানদের বলতেন 'গবর্নমেন্টের পোষ্যপুত্র', তেমনি তাঁরা অন্যান্য ভারতীয়দের তুলনায় নিজেদের জন্যও ওই একই সুবিধা দাবি করতেন। সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দুরা যোগ না দেওয়ায় ও শহুরে বাঙালিরা সাহেবদের পক্ষে থাকায় বাঙালি হিন্দুর এই অগ্রাধিকারের ইচ্ছা প্রায় আবদারে পরিণত হয় ১৮৫৮ নাগাদ। (দেবেশ ১৯৯০: ২৯৪)

তিনি আরো লিখেছেন:

> ইংরেজিশিক্ষিত গোষ্ঠী বাঙালিয়ানার যে যুক্তিকে গোষ্ঠীগত স্বার্থে ব্যবহার করেছে, তা 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' নয়, অপরদিকে একটি গোষ্ঠীরই 'জাতি'র সমার্থক হওয়ার চেষ্টা। পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থেই যে তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদ'কে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে তারই যেন সূচনা। (দেবেশ ১৯৯০: ২৯০)

উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার দিক থেকে না দেখলে উপনিবেশিত বাঙালির এই অংশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

২.৭.২ সাহেব-বাঙালি একাকারতা

ঔপনিবেশিক বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নবজাগরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় বলে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালির কাছে কলকাতার মূর্তি তৈরি হয়েছে কতগুলো শ্রদ্ধেয় নামের এক মিলনমেলা হিসাবে (Sarkar 1997: 160)। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, কলকাতা ছিল সব অর্থেই এক ঔপনিবেশিক নগর – ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও অর্থনীতির কেন্দ্র। স্বাভাবিকভাবেই উপনিবেশায়নের সবগুলো দিক ভারতবর্ষের অন্য যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় কলকাতায় অনেক বেশি দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছে।[৪৭] অভিজাত সাহেবপাড়ার বাইরে সেকালের বাঙালির দীনহীন নিবাসই এই নগরের ঔপনিবেশিকতার মূর্তিমান রূপ। কলকাতায় ঔপনিবেশিকতার ধরনে কোনো শিথিলতা ছিল না।

কিন্তু অর্থনৈতিক লেনদেন আর কাছাকাছি বসবাসের কারণে এখানে সাহেব-বাঙালি মেলামেশার সুযোগ ছিল বেশি। আঠার শতকের শেষাংশ পর্যন্ত এই মেলামেশার একটা পর্ব গেছে। এই পর্বে শাসক-ইংরেজের সঙ্গেও বাঙালির মেশার সুযোগ ছিল। শোনা যায়, ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশি লোকদের সঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশা করতেন (বিনয় ২০০৪: ২৭১)। শাসকদের দ্বিধা, ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভৌগোলিক দূরত্ব আর 'প্রাচ্যবাদী কোমলতা' সেই মেলামেশার কারণ। তাতে সাহেবদের প্রভাব যেমন বাঙালি হিন্দুর উপর পড়েছে, স্থানীয়দের প্রভাবও তেমনি পড়েছে সাহেবদের উপর। রাজনারায়ণ বসু এ সময়ের বাস্তবতা মনে রেখে লিখেছিলেন, 'সে কালে সাহেবেরা অর্দ্ধেক হিন্দু ছিলেন' (রাজনারায়ণ ১৪০২: ২৮৮)। কিন্তু উনিশ শতকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শাসকদের কাছে পাওয়া আর সম্ভব ছিল না। তখন মেশামিশিটা হত অ-শাসক ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের (Spear 2004: 207)। পুরোনো অভিজাতরা নয়, নতুন সম্ভ্রান্ত শ্রেণি – ব্রিটিশ শাসনকে কেন্দ্র করে এই শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ পক্ষে ছিলেন কোর্টের উকিল, বিচারক, মিশনারি কিংবা ডেভিড হেয়ারের মতো প্রশাসন-বহির্ভূত মধ্যবিত্তরা। 'দুর্গোৎসবের মতো সভায় কলকাতার সাহেবরা দল বেঁধে ধনীগৃহে প্রমোদসভায় যোগ দিতেন' (বিনয় ২০০৪: ৩১১)। ১৮২২ সালে লেখা *ফ্যানি পার্কসের ভ্রমণবৃত্তান্তে* রামমোহনের বাড়ির এ ধরনের এক সভার কথা আছে – 'বাড়ির ভিতর সুন্দর ও মূল্যবান আসবাবপত্র সাজানো, এবং সবই ইউরোপীয় স্টাইলে, কেবল বাড়ির মালিক হলেন বাঙালিবাবু' (বিনয় ২০০৪: ২৫৯)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতার এক ভোজসভার বর্ণনায় লিখেছেন, 'যখন এখানে জেনারেল লর্ড অকলন্ড ছিলেন, তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্য সমারোহে গবর্নর জেনারেলের ভগিনী মিস ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়' (দেবেন্দ্র ২০০৮: ৫৩)। নিঃসন্দেহে এই ধরনের সুযোগ পাওয়া বাঙালির সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এঁরাই সমাজে প্রভাবশালী। সংশ্লিষ্ট ইংরেজের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। এই দুই পক্ষের পারস্পরিকতা ছিল খুবই গভীর:

> The two worlds which characterized Calcutta in the nineteenth century, the European world of business and administration and the native world of territorial magnates, landed gentry and men in the professions, were wholly closed to each other. (Kumar 1983: 286)

সম্পর্কের ভিত্তি অর্থনৈতিক হলেও পরে তা সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মতাদর্শিক পর্যায়ে প্রসারিত হতে থাকে। একে বলা যায় কলকাতার সিভিল সমাজ – ক্ষমতাকেন্দ্রের বাইরের সেই পরিসর যেখানে শাসনের মতাদর্শিক সম্মতি তৈরি হয়। যেমন 'স্কুল বুক সোসাইটি' ও 'স্কুল সোসাইটি' গঠন ও পরিচালনা সাহেব-বাঙালি সমন্বয়ের এক দৃষ্টান্ত। 'আত্মীয় সভা' থেকে 'ধর্ম্মসভা' পর্যন্ত যে সভাসমিতিগুলো নাগরিক বাঙালির ভাবনা ও তৎপরতা গড়ে দিচ্ছিল, তার অনেকগুলোতেই সরকারি-বেসরকারি ইংরেজকুলের সক্রিয় সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। সংগঠনের বাইরে ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়েও সম্পর্কের পারস্পরিকতা উল্লেখ করার মতো। আলেকজান্ডার ডফ কলকাতায় স্কুল করার আগ্রহ পোষণ করলে রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব ব্যবহৃত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ী নামক বাটি করিয়া দিলেন এবং প্রথম ছয়টি ছাত্র জুটাইয়া দিলেন' (শিবনাথ ১৯৫৭: ১০৪)। শিবনাথ শাস্ত্রী আরো জানিয়েছেন, 'ডিরোজিওর ভবনে হিন্দু কলেজের অগ্রসর বালকদিগের হিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ পান-ভোজনের অভ্যাস হইয়াছিল। ... অন্য ইউরোপীয় ভবনেও বালকদের দাওয়াত হইত' (শিবনাথ ১৯৫৭: ৮৬)। তবে শাসক-শাসিতের মেলবন্ধনের গভীরতর পরিচয় আছে শিবনাথ শাস্ত্রীর অন্য এক

মন্তব্যে। তিনি লিখেছেন : 'ইংরাজ পক্ষে মেকলে ও বেন্টিঙ্ক এই নবযুগের সারথি হইয়াছিলেন। দেশীয় পক্ষে রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও এই পুরুষত্রয় সারথ্যকার্যের ভার লইয়াছিলেন' (শিবনাথ ১৯৫৭: ৯৫)। রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার আর ডিরোজিও – তিনজনই দেশীয়দের পক্ষে কাজ করতে পারেন কেবল তাঁদের মতাদর্শ আর জীবনবোধে সাম্য তৈরি হলে। কলকাতার সাহেব-বাঙালি অধ্যুষিত ছোট্ট সমাজটিতে তা তৈরি হয়েছিল।

উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার দিক থেকে কলকাতার এই অ-শাসক ইংরেজ ভদ্রলোকেরা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করেন। উপনিবেশিতদের কাছে এঁরা ছিলেন 'ভালো ইংরেজ'। পুস্তক মারফত যে ইংরেজের পরিচয় স্থানীয়রা পাচ্ছিল নিপীড়ক শাসকশ্রেণির সঙ্গে তার কোনো মিল ছিল না। অথচ পশ্চিমা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ততদিনে তাদের পূর্ণ সম্মতি তৈরি হয়েছে। তাদের সেই সম্মতির পক্ষে নমুনা হিসাবে মূর্তিমান হয়েছেন পরিচিত 'ভালো ইংরেজ'রা। পুরো উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে দেশীয়দের লেখায় শাসকদের নিষ্ঠুরতার বিপরীতে 'মহৎ ইংরেজে'র এই ধারণা ক্রমাগত উচ্চারিত হয়েছে। এঁদের সম্পর্কে আলবেয়ার মেমি লিখেছেন:

> My model for the portrait of the colonizer of good will was taken in particular from a group of philosophy professors in Tunis. Their generosity was unquestionable; so, unfortunately their impotence, their inability to make themselves heard by anyone else in the colony. (Memmi 1976: 15)

ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতাও হুবহু এক। অ-শাসক ইংরেজরা নিজেদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বারবার বিরোধে জড়িয়েছে, কিন্তু খোদ শাসনটির ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। এইমে সেজায়ারের সাফ কথা: 'I saw that between colonization and civilization there is an infinite distance; that out of all the colonial expeditions that have been undertaken … there could not come a single human value.' (Cesaire 2000: 34) অথচ সভ্যতার বুলি আর মূল্যবোধের বরাত উপনিবেশের প্রাথমিক শর্ত। ঔপনিবেশিক শাসনের বীভৎসতার মধ্যে এ দুটির জোগান দিয়ে 'ভালো ইংরেজ'রা স্থানীয়দের মানসিক সান্ত্বনার আশ্রয় হয়েছে এবং এভাবে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ওই শাসনকেই বৈধতা দিয়েছে।

২.৭.৩ উপনিবেশের আওতা এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয়তা

উনিশ শতকের উপনিবেশিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হয়েছেন। তাঁদের আন্দোলনের সুফলও হয়ত ফলেছে। কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক বিবেচনায় রেখে নিশ্চিত করে বলা যায়, তাঁরা কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার অনুমোদিত সীমার মধ্যেই। এর বাইরে কোনো আকাঙ্ক্ষা যে কারো মধ্যে জাগেনি তা নয়; কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন তার নিজস্ব নিয়মেই সেই বাড়তি অংশ ছেঁটে দিয়েছে – ফলবান হতে দেয়নি।

নতুন ধ্যানধারণার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও প্রায়োগিকতার দিক থেকে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মতো বহু আন্দোলন, বলা যায়, ব্যর্থ হয়েছিল (গোলাম মুরশিদ ১৯৮৪: ৪১০; Sen 1977: 53-66)। সেদিক থেকে সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনকে সফল বলা যায়। কিন্তু একে ঠিক দেশীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের আন্দোলন বলা যাবে না।

ব্রিটিশদের নতুন মনোভাবের ফলে দেশীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারণা উনিশ শতকের গোড়ায় ব্যাপকভাবে বেড়েছিল (২.৫.৩ দ্রষ্টব্য)। গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জন আর সতীদাহ প্রথা ছিল এই প্রচারণার প্রধান আক্রমণস্থল। মিশনারিরা এ ব্যাপারে দারুণভাবে সক্রিয় ছিল। ১৮০৩ সালে ওয়েলেসলি হুগলির মোহনায় শিশুবলি-প্রথা নিষিদ্ধ করেন (Spear 2004: 203)। মেটকাফ ১৮০৯-১৮ সময়কালে দিল্লিতে প্রশাসনিক আদেশবলে সতীদাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন (Spear 2004: 204)। সজনীকান্ত দাস জানাচ্ছেন:

> কেরী লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে এই বিষয়ে এতখানি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন যে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ না করিলে তিনিই সতীদাহ-প্রথা নিবারণী আইন জারি করিয়া যাইতেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই সহমরণ প্রথা যে শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহা দেখান। অনেকের বিশ্বাস, রামমোহন রায়ের চেষ্টাতেই সতীদাহ নিবারিত হইয়াছিল, কিন্তু কেরীর জীবনের কার্য্যকলাপের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, মূলত এদেশে তাঁহার চেষ্টাতেই এবং ইউরোপ এবং আমেরিকায় উইলিয়ম ওয়ার্ডের প্রচারকার্য্যের ফলেই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ-প্রথা-নিবারণী আইনে সহি করেন। (সজনীকান্ত ১৩৫৩: ৯৩)

এর ফলে অবশ্য রামমোহনসহ দেশীয়দের সক্রিয়তার মূল্য কমে যায় না। বলা যায়, সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন ভারতীয়-ব্রিটিশশাসক-মিশনারি যৌথতার এক দৃষ্টান্ত।

পশ্চিমা ভাব-স্বভাবের ছাঁচে দেশীয়দের গড়ে ওঠার 'আকৃতিতে ক্ষুদ্র কিন্তু প্রকৃতিতে গভীর' এক নমুনা ব্রাহ্ম আন্দোলন। ব্রাহ্মধর্মকে বলা যায় পশ্চিমা আর ভারতীয় ধর্মের এক কার্যকর আপোসরফা। খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারকদের কর্মসূচি ছিল অতি স্পষ্ট – একটি 'নিম্নতর' ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দেশকে 'উচ্চতর' ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দেশে বদলে দেওয়া। এই চাওয়াটা ভারতীয়দের যে অংশের অনুমোদন পেয়েছিল, খ্রিস্টান ধর্মের সাংস্কৃতিক কাঠামো তাদেরও অবলম্বন হয়ে ওঠে। 'যাঁরা সরাসরি খ্রিস্টান হয়েছিলেন তাঁরা নন। কিন্তু যাঁরা খ্রিস্টান ধর্মের বিশ্বাস ও সংগঠনের ভারতীয়করণ ঘটিয়েছিলেন তাঁরা নিঃসন্দেহেই উচ্চতর সংস্কৃতি হিশেবে খ্রিস্টান ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ব্রাহ্ম আন্দোলনই এই স্বীকৃতির প্রথম চিহ্ন'। (দেবেশ ১৯৯০: ৬৮)[৪৮]

অর্থনৈতিক ও অন্য মতাদর্শিক ক্ষেত্রেও এই অধীনতা স্পষ্ট। কোম্পানির একচেটে বাণিজ্যের বিপরীতে মুক্তবাজার অর্থনীতির দাবিকে – যে দাবি রামমোহন, দ্বারকানাথসহ ইয়ংবেঙ্গল দলের সদস্যরা বারবার তুলেছেন – 'আধুনিক' দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবেই ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে এই দাবি শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবশালী অংশের পরিবর্তিত মনোভাবের অনুগমন মাত্র (২.৪ ও ২.৫.৩ দ্রষ্টব্য)। মুক্তবাণিজ্যের ইংরেজ প্রবক্তারা স্থানীয় একটি গোষ্ঠীকে সঙ্গে পেয়েছে; আর এর বিপরীতে ছিল কোম্পানির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ স্বার্থসংশ্লিষ্ট এক গোষ্ঠী, যাদেরকে বলা হয়েছে 'রক্ষণশীল'। কিন্তু এই মুক্তবাণিজ্য অনতিবিলম্বে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের কণ্ঠরোধ করে তাদের পথে বসিয়েছে। রজতকান্তি রায় (Joshi 1975: 15-17) দেখিয়েছেন, রামমোহন এবং দ্বারকানাথের সঙ্গে উপযোগবাদী ও কোম্পানি-বহির্ভূত ব্যবসায়ী দলটির সুসম্পর্ক ছিল। বিপরীতে রাধাকান্ত দেব ছিলেন কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই দুই দলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ভিন্নতাও ছিল। যেমন, দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমারের নীলচাষে বড় বিনিয়োগ ছিল। কিন্তু বাঙালি এই পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি পুরো ব্যাপারটিতেই ইংরেজপক্ষের দুই বিবদমান দলের ছায়ায় মত প্রকাশ করেছেন মাত্র। এই বিতর্কে রামমোহন দেশের উন্নতির যে দিশা দিয়েছেন বা যা নিজে ভেবেছেন, তার সবটাই ভ্রান্ত প্রমাণিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এর কারণ ঔপনিবেশিক শাসন আর ইউরোপের বুর্জোয়া বিকাশের পার্থক্য তাঁরা একেবারেই বুঝতে পারেননি।[৪৯]

রামমোহন রায়ের দল নিজেদের মতাদর্শ বা ভূমিকা দ্বারা আসলে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির 'দালাল শ্রেণি'র ভূমিকা পালন করেছিলেন, যে ভূমিকা অনতিবিলম্বে তাঁর শ্রেণির জন্য ধ্বংস ডেকে এনেছিল। এ ছিল নতুন যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিন্যস্ত নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা – আরো কার্যকরভাবে বাংলা অঞ্চলকে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অধীন করার মন্ত্র। রামমোহন উন্নতি চেয়েছিলেন, এবং ইউরোপে যে প্রক্রিয়ায় উন্নতি হয়েছিল এখানেও সে প্রক্রিয়া গ্রহণের দাবি করেছেন। উন্নতি হয়েছিল বৈকি। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে যতটুকু হওয়া সম্ভব, তা হয়েছিল। 'শিল্পবিপ্লব' বা ওই ধরনের কিছু ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে সম্ভব ছিল না। উপনিবেশ তার দরকার ও পরিকল্পনামাফিক অর্থনৈতিক প্রকল্প গ্রহণ করেছিল; 'Raja and his friends were but its unconscious and helpless agents.' (Joshi 1975:19)

আরো পরে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখালেখিতেও একই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় (Chatterjee 1993: 62-63)। তাঁর মতে, ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্যে ভারতের কৃষির উন্নতি হয়েছে। শিল্পখাত সম্ভবত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; কিন্তু তা ভারতের দারিদ্র্যের কারণ হয়নি। কেননা, শিল্প থেকে উৎখাত হওয়া শ্রমিক বর্ধিষ্ণু কৃষিখাতে শ্রম দেবে। প্রশাসকদের বেতনভাতা বাবদ কিছু অর্থ ইংল্যান্ডে পাচার হচ্ছে – এই উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। অবশিল্পায়নের বাস্তবতাও চোখের সামনে ছিল। কিন্তু মুক্তবাণিজ্য, বিশেষায়িত উৎপাদনব্যবস্থা আর শ্রমবিভাজনের মধ্য দিয়ে আর্থিক প্রগতি সম্ভব – এই 'জ্ঞান' তাঁকে অন্যরকম কিছু ভাবতে দেয়নি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> Thus Bankim's devotion to what he regarded as the fundamental principles of a rational science of economics makes it impossible for him to arrive at a critique of the political economy of colonial rule, even when the evidence from which such a critique may have proceeded was, in a sense, perfectly visible to him. (Chatterjee 1993: 63)

তাহলে যতটা ভাবা হয়, সমস্যার গোড়া তার চেয়ে অনেক গভীরে। গলদটা শিক্ষায় – ভাবনার পদ্ধতিতে। উপনিবেশিতের সবচেয়ে মেধাবীরাও উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার সেই ছক থেকে বেরোতে পারেন না।

কিন্তু উপনিবেশিত বুদ্ধিজীবীর সক্রিয়তার এ এক সীমাবদ্ধতা মাত্র। অন্য দিকে আছে তাঁদের উদ্যোগ-আয়োজন শাসনকৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া। রামমোহন তাঁর বিখ্যাত শিক্ষা-বিষয়ক পত্রে চেয়েছিলেন 'গণিত, প্রকৃতিদর্শন, রসায়ন, শরীরবিদ্যা এবং অন্যান্য দরকারি বিজ্ঞান' শিক্ষা। বিদ্যাসাগর এবং অন্য কেউ কেউ দেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্রচলনের এবং নারীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। নারী-অধিকার সংরক্ষণ, বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, কিংবা শিল্পশ্রমিকদের নিয়ে কাজ করার কথা ভেবেছিলেন কেউ কেউ। কিছু কিছু করেওছিলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে যোজন যোজন ফারাক। ১৮৩৫ সালে যে শিক্ষা চালু হয়েছিল তা বিশুদ্ধভাবে সাহিত্যনির্ভর এবং রামমোহনের চাওয়া থেকে অনেক দূরের জিনিস। বিদ্যাসাগর নিয়োগের তিন বছরের মধ্যেই সহকারী পরিদর্শকের পদ ত্যাগ করেছিলেন। বলা যায়, করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক সরকারের পরিকল্পনা আর ব্যয়-সংকোচন নীতি এই দুই ক্ষেত্রেই প্রধান ভূমিকা রেখেছিল (Sarkar 2000: 74-75)।

রামমোহন রায়ের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আর যোগ্যতা সত্ত্বেও তাঁর সীমিত সাফল্যের কারণ – সুমিত সরকারের মতে – ঔপনিবেশিক বাস্তবতা:

> Rammohun's achievements as a modernizer were … both limited and extremely ambivalent. What is involved in this estimate is not really his personal stature, which was certainly quite outstanding; the limitations were basically those of his times – which marked the beginning of a transition, indeed, from pre-capitalist society, but in the direction, not of full-blooded bourgeois modernity, but of a weak and distorted caricature of the same which was all that colonial subjection permitted. (Sarkar 2000: 23)

এ কথা উপনিবেশিত বাংলার সব বিশিষ্টজনের ক্ষেত্রেই খাটে। সেসঙ্গে এই কথাও সত্য, তাঁরা সেই বাস্তবতা বুঝতে পারেননি, নিজের বা সমকালীনদের জন্য পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারেননি, যেমনটা বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বলেছেন অশোক সেন:

> Despite his brave and noble efforts, Vidyasagar could not achieve the goals which he had set forth in the sphere of education and social reforms. The causes were connected with colonial constraints on Bengal's economy and society, with the historical complex of imperialism which Vidyasagar could not really clarify for himself, or for his society. (Sen 1977: xiv)

২.৭.৪ জনগণের অবস্থা ও সুবিধাভোগীদের জনবিচ্ছিন্নতা

> যখন মহানন্দা নদীর ভিতর স্টীমার অগ্রসর হইতে লাগিল তখন গ্রাম্য লোকেরা 'ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে' 'ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে' বলিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয়পোত দর্শন করিতে লাগিল। ইহার পূর্বে বাষ্পীয়পোত কখন মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করে নাই। লোকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোক হইতে সমাগত অদ্ভুত জীব মনে করিল। স্টীমার হইতে যখন গ্রামে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত যে, গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। একি ব্যাপার! আমরা ইহা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমরা কলম্বস ও তাঁহার সঙ্গীর ন্যায় কোন একটা নতুন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছি; ও সেই আমেরিকাবাসী ইন্ডিয়ানগণ আমাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে।

– এভাবে রাজনারায়ণ বসু (১৯৬১: ২২) তাঁর এক প্রমোদভ্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন। খানিকটা রসিকতা মেশানো এই বর্ণনায় কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মর্মান্তিক দশার বহুমাত্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সাহেবদের মতো সাহেব-বাঙালির সঙ্গেও আপামর সাধারণের দুরারোগ্য বিচ্ছিন্নতা। সে এমনই যে, রাজনারায়ণ বসুকে 'কলম্বস' আর 'আমেরিকাবাসী ইন্ডিয়ান'দের উদাহরণ দিয়ে তা বোঝাতে হয় – এই উপমার জঘন্য দিকটি তাঁর নজরেই পড়ে না। বিপরীতে সাধারণ গ্রামবাসীদের দিক থেকেও সম্পর্কের ধরনটি পরিষ্কার – ভদ্রলোকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রাণঘাতী ভীতির।

এই ভদ্রলোকদের সংখ্যা কত ছিল? ১৯১১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, 'ঐ সময়ে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তার সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৫৫০৪' (অমলেন্দু ১৯৭৪: ৪৯)। ব্রাহ্মরাই অবশ্য একমাত্র ভদ্রলোক ছিল না। উনিশ শতকের শেষাংশে ইংরেজি শিক্ষা হয়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি। কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষিত

মাত্রই ঔপনিবেশিক সমাজের সুবিধাভোগী দলের সদস্য হতে পারেননি। ঔপনিবেশিক ভাগ-বাটোয়ারায় উপনিবেশিতদের জন্য এতটা পরিসর থাকে না। সুমিত সরকার 'Renaissance and Kaliyuga: Time, Myth and History in Colonial Bengal' (Sarkar 1997: 186-215) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, উনিশ শতকের কলকাতায় রেনেসাঁস-মিথ কেবল উচ্চশ্রেণির একটা ছোট্ট অংশের ধারণায় ছিল, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বড় অংশই এ সময়কে চিহ্নিত করেছে কলিযুগ হিসাবে। বাংলার সাধারণ মানুষের কথা বলাই বাহুল্য।

জনসাধারণের বড় অংশই ছিল কৃষক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিতে কৃষকের কোনো স্বত্ব না থাকায় এবং জমিদারের বাড়তি খাজনা দাবির ক্ষেত্রে আইনি বাধা না থাকায় কৃষকের দুর্দশার সীমা ছিল না। 'ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়লেও কৃষির বাইরে তাদের যাওয়ার উপায় ছিল না; ঔপনিবেশিক আমলে শিল্পের অনগ্রসরতার ফলে তারা জমির মালিকদের হাতে বাঁধা ছিল বলির পশুর মতন' (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৬৩)। উনিশ শতকে কৃষিপণ্যের বাজার বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্তত অবস্থাপন্ন কৃষকের হাতে কিছু নগদ টাকা এসেছে; কিন্তু নানা নতুন সংকটও তৈরি হয়েছে। বস্তুত ঔপনিবেশিক কৃষিপণ্যের বাণিজ্যের প্রক্রিয়ায় কৃষকের পরাধীনতা নানাভাবে বাড়ে: উৎপাদনের বিনিয়োগের জন্য আগাম, খাজনার জন্য বা খাওয়ার জন্য কর্জ, পণ্য বিক্রি করার জন্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণির উপর নির্ভরতা ইত্যাদি। গরিব কৃষকদের ক্ষেত্রে এগুলো আরো বেশি সত্য। ভূমিহীন কৃষক প্রাক-উপনিবেশ আমলেও ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় চাষি নিজ জমি হারিয়ে স্বত্বহীন প্রজা অথবা আরো নিচে ভাগচাষি বা শ্রমজীবী হয়ে যাওয়ার ঘটনা উপনিবেশ আমলে অনেকগুণ বেড়েছে। অর্থাৎ কৃষকদের মধ্যে আয়বৈষম্য বেড়ে বিপুল পরিমাণ কৃষক ক্রমশ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। কৃষির বাণিজ্যীকরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ হার বেড়েছে – এতে সন্দেহ করার মতন প্রমাণ এখনো উপস্থাপিত হয়নি (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৬১)।

এই নিপীড়িত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উপনিবেশিত অভিজাতদের দূরত্ব ছিল অসীম। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে গড়া অভিজাতদের কাছে ঔপনিবেশিক বলয়ে ঢুকতে না পারা দেশীয়রাই ছিল 'অপর'। ব্রাহ্মধর্মের সংগঠন থেকে এই সত্য আঁচ করা যায়। রামমোহন রায় প্রটেস্টান্ট সংস্কার থেকে তাঁর মডেল সংগ্রহের কথা বলেছেন। কিন্তু জনপ্রিয় আচার ও বিশ্বাস আত্মীকরণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রক্রিয়া লুথারের একেবারেই বিপরীত। অষ্টাদশ শতকের বাংলায় একেশ্বরবাদী যেসব ধারা খুব জনপ্রিয় ছিল, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা রামমোহন বা অন্য ব্রাহ্মনেতারা করেননি।[৫০] বরং ব্রাহ্মণ, ধ্রুপদী সংস্কৃত টেক্সট[৫১] আর পশ্চিমা ধ্যানধারণার সমন্বয়ে এটি হয়ে ওঠে যাপনপদ্ধতি ও বিশ্বাসের এক চরম অভিজাত রূপ। সাধারণ মানুষকে অঙ্গীভূত করার মতো কোনো পরিসর এতে ছিল না, লক্ষ্যও ছিল না। ব্রাহ্মধর্ম ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির জনবিচ্ছিন্নতার অভ্রান্ত নজির।

আসলে উপনিবেশিত অভিজাত শ্রেণির লড়াইটা চলেছে – চালাতে হয়েছে – নিজেদের মধ্যেই। নতুন উৎপাদন-সম্পর্কে নিজেদের অবস্থিতি নিশ্চিত করা আর নতুন ভাষা (২.৬.৬ দ্রষ্টব্য) আত্মস্থ করা – লড়াইটা চলেছে এই দুই ময়দানে। এর বাইরে নজর দেওয়ার সুযোগই ছিল না। গোলাম মুরশিদ (১৯৮৪: ৪১৪) খেয়াল করেছেন, ইংল্যান্ডের আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হলেও কলকাতার সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ইংল্যান্ডের মতো 'প্রোলেটারীএট'দের নিয়ে ছিল না। এদেশে এই দুর্গতের ভূমিকায় হাজির হয় ভদ্রলোকদের নিজেদের ঘরের নারীরা। এজন্য বঙ্গদেশের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন কার্যত নারীমুক্তি আন্দোলনের রূপ নেয়। সেই 'নারী' এমনকি কোনো পরোক্ষ অর্থেও নিখিল বঙ্গীয় নারীসমাজের নারী নয় – ভদ্রসমাজের এখনো 'অপ্রস্তুত' নারী। সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করলে বোঝা যায়, ভিক্টোরীয়

পারিবারিক-সামাজিক জীবনের যে আদর্শ ইংরেজি শিক্ষার বদৌলতে বাঙালি ভদ্রলোকেরা শিখছিল, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের আকাঙ্ক্ষাই ছিল এই 'সমাজ-সংস্কার' আন্দোলনের মূল প্রেরণা। উপনিবেশিত বাংলায় প্রলেতারিয়েত খুঁজে না পাওয়াকে আর কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? দৃষ্টির এই সীমাবদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যায় উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমাংশের বাঙালিসমাজের প্রায় সকল বয়ানে। শিবনাথ শাস্ত্রীর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক কাজ। শতাব্দীব্যাপী সময়ের গতিমুখ আর উত্থান-পতনের প্রধান ধাপগুলো তিনি ভালোভাবেই আঁকতে পেরেছেন। কিন্তু এই পুস্তকের পরিধি যদি বিচার করা হয়, যদি হিসাব করা যায় মোট কী পরিমাণ মানুষ নিয়ে এই পুস্তকের 'বঙ্গসমাজ' বা 'বাঙালিসমাজ' গঠিত, তাহলে হতাশ না হয়ে উপায় নেই। স্থানের দিক থেকেও কলকাতার বাইরে তা যেতে চায়নি। দুই-চারবার গেছে মূলত ব্রাহ্মসমাজের হাত ধরে। কলকাতারই বা কয়জন এই পুস্তকের আওতায় এসেছে? জীবন-জীবিকা, পরিবার ও সমাজকাঠামো – ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতের কারণে এগুলোও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। সাহেব, বিদ্যালয়ের গুরু, ভট্টাচার্য, রাজকর্মচারী, ধনী লোক – সাকুল্যে এই হল রাজনারায়ণ বসুর (১৪০২) 'সে কালে'র লোক। 'এ কালে'র বর্ণনায়ও বর্ণিতব্য মানুষের বিশেষ হেরফের হয়নি। সুমিত সরকার (1997: 25) আরেকটি জুতসই উদাহরণ দিয়েছেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের *বিক্রমপুরের ইতিহাস* (১৯০৯) গ্রন্থে নৈপুণ্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে ওই অঞ্চলের অতীত-বর্তমানের কীর্তি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এ ইতিহাসের জনভিত্তি এতই সংকীর্ণ যে বইটি পড়ার সময়ে কেউ ধারণাও করতে পারবে না, ওই অঞ্চলের অর্ধেকেরও বেশি লোক মুসলমান, আর হিন্দুদের মধ্যেও নমঃশূদ্রের সংখ্যা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের সম্মিলিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি।

গোষ্ঠীবদ্ধ সংকীর্ণতার পরিচয় ভদ্রলোকদের যে কোনো তৎপরতায় পাওয়া যাবে। অ্যাডামের বদলে মেকলের শিক্ষানীতির প্রতিই বাঙালি ভদ্রলোকেরা চূড়ান্ত পক্ষপাত দেখিয়েছে। অ্যাডামের প্রতিবেদন কার্যকর করা কোনো ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষেই সম্ভব নয়; এবং দেখা যাচ্ছে, জনশিক্ষা-বিষয়ক এই অসামান্য প্রতিবেদনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা দেশীয় অভিজাতদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। উপনিবেশিত সমাজের স্বাভাবিক গড়নসূত্র অনুযায়ী চূড়ার কিছু মানুষের জন্য 'উৎকৃষ্ট' শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হয়, আর বাকিদের জন্য প্রচারিত হয় 'ফিলট্রেশন' তত্ত্ব। বাংলার পুরো উনিশ শতকই এই তত্ত্বের ভোক্তা। চিন্তা ও তৎপরতায় ওইকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এর বাইরে ছিলেন না। জনশিক্ষার প্রসারের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ চাওয়ায় ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯-এ বিদ্যাসাগর ছোটলাটকে লেখেন :

> An impression appears to have gained ground, both here and in England, that enough has been done for the education of the higher classes and that attention should now be directed toward the education of the masses. … An enquiry into the matter will however show a very state of things. As the best, if not the only practicable means of promoting education in Bengal, the government should, in my humble opinion, confine itself to the education of the higher classes on a comprehensive scale.

এই উদ্ধৃতি দিয়ে বিনয় ঘোষ (১৯৮৪: ৪৪৩) মন্তব্য করেছেন, 'বিদ্যাসাগর, অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে, নিজের চিন্তাকে যে স্বশ্রেণীর সীমানার বাইরে বেশিদূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেননি, তা তাঁর এই শিক্ষানীতিব্যাখ্যা থেকে বোঝা

যায়'। বঙ্কিমচন্দ্র জনশিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। বাংলায় লেখার মাধ্যমে জনচৈতন্য জাগানোর প্রস্তাব তিনি অনেকবার দিয়েছেন। কিন্তু জনশিক্ষাবিস্তারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি বা বিদ্যমান কাঠামো সংস্কারের প্রস্তাব তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি (De 1974: 68)। সামান্য অংশকে ইংরেজি শিখিয়ে বিপুল জনতাকে শিক্ষাবঞ্চিত রাখার দীর্ঘমেয়াদি ফল সম্পর্কে এঁরা সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না।

উপনিবেশিত জনসমাজের এই দুই অংশের গভীর বিচ্ছিন্নতার পরিচয় সবচেয়ে ভালোভাবে পাওয়া যায় কৃষক ও কৃষি-সম্পর্কিত মনোভাবে। উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের 'প্রগতিশীলতা'র উদাহরণ হিসাবে সাধারণত কৃষকদের প্রতি তাঁদের সহমর্মিতার উদাহরণ টানা হয় (নরহরি ১৯৯৭)। কিন্তু সাম্প্রতিক বহু গবেষণায় দেখা গেছে, এ সহমর্মিতার সীমা খুবই সংকীর্ণ। বলা যায়, কৃষকদের দুর্দশার প্রতি কাগুজে সহানুভূতি দেখিয়েছেন অনেকে; কিন্তু কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেননি। এর ভালো উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তিনি যথার্থই লিখেছেন, '১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, ... সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে' (বঙ্কিম ১৯৮৯: ২৮৫)। কৃষকের দুর্দশার বর্ণনায় তাঁর সহানুভূতি অতুলনীয়; দুর্দশার কারণ ব্যাখ্যায় তিনি অনন্য। কিন্তু এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? বঙ্কিম কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন চান না: 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি' (বঙ্কিম ১৯৮৯: ২৮৫)। এরপর তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে তাঁর এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। লিখেছেন, 'বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না' (বঙ্কিম ১৯৮৯: ২৮৫)। তখন দুই-একজনের লেখায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোগত সংস্কারের দাবি উঠছিল। সন্দেহ হতে পারে, কোনো আমূল সংস্কারের বদলে উপদেশ-অনুরোধে সমস্যাগুলো কমিয়ে আনার পরামর্শ দেওয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসামান্য লেখার মূল প্রেরণা। তাঁর পরামর্শ ছিল: প্রজার প্রতি জমিদারদের দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হতে হবে, আর 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' যেন দুষ্ট জমিদারদের কর্মকাণ্ড তদারক করে (Chatterjee 1993: 63)।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি ভেবে থাকেন, কৃষকের অনুকূলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংস্কারের জন্য ভদ্রলোকেরা কোনো চাপ তৈরি করবেন, তাহলে তিনি ভুল ভেবেছিলেন। গোটা উনিশ শতকে এ বাবদ একটি উদ্যোগও দেখা যায়নি। ১৭৯৩ সালের আইনে বরং কৃষকবান্ধব কিছু ধারা ছিল। জমিদারদের ক্রমাগত চাপের মুখে তার সবকটিই রদ হয়ে যায়। পরেও এ সংক্রান্ত আইন-বদলের সামান্যতম আলামত দেখা দিলে জমিদারশ্রেণি একত্রিত হয়ে সেই বদলকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে গেছে। সব্যসাচী ভট্টাচার্য এ বাবদ রমেশ দত্তের উদাহরণ টেনেছেন:

> রমেশ দত্ত যৌবনের উৎসাহে ১৮৭৫ সালে একটা বই লিখেছিলেন – চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে তো বটেই, কিন্তু তাঁর বড় কথাটা ছিল কৃষকের জমিদারকে দেয় খাজনাটাকেও চিরস্থায়ীভাবে বেঁধে দেওয়া, যাতে জমিদারের শোষণ উত্তরোত্তর না বাড়ে। এই লেখার ফলে জমিদারদের কাগজ হিন্দু পেট্রিয়টে কড়া সমালোচনা, সিভিল সার্ভিসের শাসানি, জমিদার বন্ধুদের অনুযোগ। শেষ বয়সে রমেশ দত্ত আবার যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে প্রস্তাব করেন, তখন কিন্তু আর কৃষক-জমিদারের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা তোলেননি, কেবল সরকারকে দেয় রাজস্বের

> চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথাই বলেন। এবং তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের দাবিও ছিল একই ধাঁচের। (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৪৯)

ফলে বিদ্যমান বন্দোবস্তের আমূল কোনো পরিবর্তনের কার্যকর প্রস্তাবই ওঠেনি; বাস্তবায়ন তো দূরের কথা।

কিন্তু ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে প্রজাস্বত্ব স্থির করা জরুরি হয়ে ওঠে। ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন তারই ফল। এই আইনে প্রজাস্বার্থ রক্ষিত হয়েছে বলে ব্যাপক প্রচার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধের নতুন মুদ্রণ প্রকাশের সময় লিখেছিলেন:

> 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ দেশীয় কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আর নাই। জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। কৃষকদিগের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দুর্ব্বল। (বঙ্কিম ১৯৮৯: ২৬৫)

১৮৮৩ সালের খসড়ায় আসলেই বড় ধরনের পরিবর্তনের কথা ছিল – কৃষকের খাজনা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু জমিদারদের সংগঠন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে এই ধারা শিথিল করা হয়। তাতে গ্রামের সম্পন্ন কৃষকের খানিকটা ক্ষমতায়ন হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত চাষিদের বেশির ভাগই এই আইনের আওতার বাইরে থেকে গেছে (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৬৬)। শেষ পর্যন্ত ১৮৮৫-র আইনে কৃষকস্বার্থ যতটুকু রক্ষিত হয়েছে, তাতে নগরবাসীদের লাভালাভের হিসাবটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল:

> The Indian Association campaign on the rent bill revealed an interesting concern for making occupancy rights saleable, not necessarily residential and free of all restrictions on sub-letting – all of which would obviously be of great help of 'ryots' settled in Calcutta or other urban centers and enjoying occupancy rights over agricultural lands. (Sarkar 2000: 78)

তবু ভদ্রলোকদের কাগজে ও লেখালেখিতে কৃষকের কথা এসেছে। তাদের দুর্দশায় আহাজারিও প্রকাশ পেয়েছে। দেবেশ রায় এ ধরনের লেখালেখির কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন (দেবেশ ১৯৯০: ৩১১-১৫)। এক. জমিদারদেরও নানা ধরন ছিল। তাদের পারস্পরিক স্বার্থের বিরোধ ছিল। ফলে এক পক্ষ আরেক পক্ষের বিরোধিতায় কৃষকের কথা এনেছে।[৫২] দুই. সাহেবরা, বিশেষত অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকরা, কোম্পানির বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে ভারতবর্ষের দুরবস্থার কথা বলেছেন। তাতে স্বভাবতই কৃষকের কথা ছিল। কারণ তারাই ভারতের পনের আনা। তাদের এই সমালোচনাগুলো বাঙালিদের প্রভাবিত করে থাকবে। তিন. উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষা নাগরিক বাঙালির কাছে যে নতুন মূল্যবোধ উপস্থিত করেছিল, সেই মূল্যবোধই ছিল কৃষকদের প্রতি সহানুভূতির একটি উৎস। তাই একই ব্যক্তি জমিদার হয়েও, জমিদারি চালিয়েও, কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু এঁদের বিশ্বাসের জগৎ আর ব্যবহারিক জগতে ফারাক ছিল। তাই কথার সূত্রে কাজে কেউ অগ্রসর হয়নি। জমিদার-কৃষক সম্পর্ক নিয়ে এত লেখা হলেও কোনো জমিদারের বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ বা কোনো প্রজার প্রতি অত্যাচারের নির্দিষ্ট ঘটনা খুব একটা ছাপা হয়নি। অথচ নামধাম ও ব্যক্তিগত তথ্যসহ লেখাই ছিল তখনকার রেওয়াজ। 'ফলে মনে হয়, স্ত্রীজাতির উন্নতি, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির মতো আদর্শ সামাজিক কর্মসূচিরই অংশ হিশেবে কাগজেপত্রে কৃষকদের প্রতি এত বেশি সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। পরিচিত বিষয় হিশেবে এর সাংবাদিক মূল্য ছিল কিন্তু এর কোনো সামাজিক কর্মসূচিগত তাৎপর্য হয়ত ছিল না'। (দেবেশ ১৯৯০: ৩১৫)

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উপনিবেশিত অভিজাতদের এই বিচ্ছিন্নতা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ ফল এবং ওই শাসনের পক্ষেই কাজ করেছে। পুরো উনিশ শতক জুড়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য কৃষকবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। আদিবাসী সম্প্রদায় মরণপণ লড়াই করেছে। কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণি এর কোনোটাতেই যুক্ত হয়নি। ফলে প্রান্তীয় বিদ্রোহগুলো ঔপনিবেশিক শাসনে কার্যকর আঘাত হানতে পারেনি।

২.৮ বাংলায় উপনিবেশায়ন: ঔপনিবেশিক শাসনের সর্বব্যাপ্তি

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয়দের জন্য চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ ছিল খুবই সামান্য। কিন্তু অল্পসংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্য তা-ই যথেষ্ট মনে হয়েছিল। যতই দিন গড়িয়েছে ততই শিক্ষিত সুযোগ-প্রত্যাশীর সংখ্যা বেড়েছে। বিশ শতক আসার আগেই ভারতের প্রত্যেক শহরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার আবিষ্কার করে যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে তাদের জন্য কোনো ভবিষ্যৎ আর অবশিষ্ট নেই (Kumar 1983: 297)। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম আর ইংরেজ-বিরোধিতার মূলসূত্র এই বাস্তবতা। তাই ইংরেজশাসনের বিরোধিতা মাত্রই উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা নয়। প্রত্যক্ষ উপনিবেশ শেষ হওয়ার পরের ভারতীয়দের ভাব ও তৎপরতার হদিশ নিলেই বোঝা যায়, উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া কী গভীর অর্থে উপনিবেশিতদের দেখার চোখ নিয়ন্ত্রণ করে। নমুনা হিসাবে ইংরেজশাসন সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল:

> Today the historian … knows that it was the beginning, slow and unperceived, of a glorious dawn, the like of which the history of the world has not seen elsewhere. On 23rd June 1757 the middle ages of India ended and modern age began. … In the space of less than one generation, in the twenty years from Plassey … the land began to recover from the blight of mediaval theocratic rule. Education, literature, society, religion, man's handiwork and political life all felt the revivitying touch of the new impetus from the west. The dry bones of a stationary oriental society began to stire. At first faintly, under the wand of a heaven-sent magician … It was truely a renaissance, wider, deeper and more revolutionary than that of Europe after the fall of Constantinople. (Sarkar 1972: 497-98)

যদুনাথ সরকারের এই মন্তব্যে আবেগের বাড়াবাড়ি আছে। এটুকু বাদ দিলে উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালির এমন বয়ান খুব কমই পাওয়া যাবে, যার সঙ্গে এই মতের বিরোধ আছে। অথচ ইংরেজ আমল সম্পর্কে কতগুলো তথ্য ওই আমলেই পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, ক) সরকারি হিসাবে ১৮৭১-৮১ পর্যায়ে ভারতীয় প্রজার জন্মক্ষণে প্রত্যাশিত আয়ু ২৪.৬ বছর, এবং ১৮৯১-১৯০১ সালে ২৩.৮ বছর। অনেক বিশেষজ্ঞ, যেমন অধ্যাপক বিসারিয়ার মতে ১৮৯১-১৯০১ সালের গড় আয়ু ২০.২ বছর (সব্যসাচী ১৩৯৬: ২৬)। খ) মোটামুটি ১৯২১ অবধি কোনো দশকেই বার্ষিক জনবৃদ্ধির হার ১ শতাংশ অবধিও পৌঁছায়নি (সব্যসাচী ১৩৯৬: ২৭)। গ) সরকারি হিসাবে ১৯০১ সাল পর্যন্ত দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ১ কোটি ২২ লক্ষ (সব্যসাচী ১৩৯৬: ২৬)। ঘ) দারিদ্র্যের পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ: 'In 1900, India, 'the brightest jewel in the British Crown', was one of the poorest nations of the world.' (Bagchi 1972: 3) ঙ) ১৯৪৭ সনে ভারতের কোনো অংশের সাক্ষরতাই দশ শতাংশের উপরে ছিল না। মাথাপিছু আয় ছিল বিশ্বের সর্বনিম্নের কাছাকাছি (সিরাজুল ২০০২: ৩৪)। তাছাড়া বর্ণবাদী অনাচার, ঘোরতর সাম্প্রদায়িক সমস্যা আর

জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদের ঘনীভূত সংকট তো ছিলই। ছিল মর্যাদার সংকটও। ভারতীয়দের নাগরিক-মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'In colonial india there were to be no citizens, only subjects of the empire and 'traditional' princes.' (Bose and Jalal 2002: 103) এর কোনোটিকে বিবেচনায় না এনে ঔপনিবেশিক শাসনকে 'আধুনিকতা' আর 'রেনেসাঁসে'র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের সর্বোত্তম নমুনা।

এটা সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, ঔপনিবেশিক শাসন উপনিবেশিতের মধ্যে যে অধিপতি শ্রেণি জন্ম দিয়েছে, এ তাদেরই ইতিহাসদৃষ্টি (গৌতম ও পার্থ ২০০১; Guha 1988)। আরেকটি কারণের কথা বলা দরকার। উপনিবেশ আমলে বাংলা সাহিত্যের অসামান্য উন্নতি হয়েছে। সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে শিক্ষার প্রধান উপাদান হিসাবে ইংরেজি সাহিত্যের প্রসারের হয়ত সম্পর্ক আছে। উৎপাদন-সম্পর্কে ও রাষ্ট্রে কর্তৃত্ব না থাকায় উপনিবেশিত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সৃজনশীলতা হয়ত সাহিত্যে মুক্তি পেয়েছে। ঔপনিবেশিক বাস্তবতার স্বাভাবিক সূত্র অনুযায়ী এই সাহিত্য উৎপাদন-সম্পর্কের প্রত্যক্ষতা থেকে বঞ্চিত আর জনবিচ্ছিন্নতার দায়ে দুষ্ট। কিন্তু এর উৎপাদক ও ভোক্তারা পশ্চিমা ধ্যানধারণা আর মূল্যবোধ যতটা আত্মস্থ করতে পেরেছেন, তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে উনিশ-বিশ শতকের সাহিত্যে। বলা যায়, বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের প্রায় যে কোনো মাপে 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ। প্রধানত সাহিত্যিক সমৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে, সাহিত্যে প্রতিফলিত চেতনার বরাতে বাংলার 'আধুনিকতা' ও 'রেনেসাঁস' বৈধ হয়। তা না হলে, যাকে মার্কসীয় পরিভাষায় সাধারণভাবে 'ভিতর-কাঠামো' বলা হয়, তার বিচারে এ এক 'অন্ধকার যুগ'ই বটে। বরুণ দে লিখেছেন:

> With regard to India, it is possible that some future historians viewing the long-range crumbling of unstable modernization … might put the nineteenth and twentieth centuries at the end of medieval period of uncertainty, instead of the beginning of the modern period, which still awaits us in the Third World. (De 1976: 125)

এ বক্তব্যের সারবত্তা অগ্রাহ্য করার কোনো কারণ নেই।

সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা ভাষারও বিকাশ ঘটেছে। উপনিবেশিত দুনিয়ায় বাইরের পরিসর সংকীর্ণ হয়ে আসার পটভূমিতে বাড়তে থাকে ঘরের পরিসর – ধর্ম ও পরিবারের সঙ্গে সে পরিসরে ভাষাও জায়গা নেয়। 'নিজে'র গঠনে ভাষা কার্যকর উপাদান হিসাবে কাজ করতে থাকে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামও এক ধরনের ভাষাপ্রীতি তৈরি করে। কারণ যাই হোক, উনিশ শতকে বাংলা ভাষার বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল, এ ব্যাপারে সন্দেহ করা চলে না (Chatterjee 1998: 21)। শুধু মনে রাখা দরকার, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির সর্বগামিতা বিবেচনায় না রেখে ভাষার ওই সমৃদ্ধির পর্যালোচনা অসম্ভব।

টীকা

১. 'It was in Bengal that the western intrusion was the deepest and the colonial presence the longer.' (Nandy 1989: 27)
এ ব্যাপারে এডওয়ার্ড সাইদের মন্তব্য: 'By the late nineteenth century India had become the greatest, most durable, and most profitable of all British, perhaps even European, colonial possessions.' (Said 1994: 160)

২. 'Known technically as the company's accession to Diwani – a technicality which has, alas, made some scholars insensitive to its significance as the truly inaugural moment of the Raj … .' (Guha 1988: 4)

৩. যেমন সুশীলকুমার দে ভেবেছেন: বাংলায় নিজেদের সার্বভৌম ঘোষণার ক্ষেত্রে যে দ্বিধা দেখা যায়, তাতে প্রমাণ হয় ওই ব্যবসায়িক কোম্পানি সামরিক শক্তিবলে এদেশ দখলের ব্যাপারে সামান্যই চিন্তা করেছিল এবং পদক্ষেপের ব্যাপারে তারা অনিশ্চিত ছিল (De 1962: 7)। এ ধরনের সিদ্ধান্ত প্রধানত নেওয়া হয় কোর্ট অফ ডাইরেক্টরসের কাগজপত্রে রাজ্যস্থাপনে উৎসাহের কোনো নজির না পাওয়ার বরাতে। কিন্তু ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি ওইসব কাগজপত্র থেকে বোঝা দুষ্কর। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মকর্তারা কোনো কাজ সম্পন্ন করে বা উদ্দেশ্য হাসিল করেই কেবল পরে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরসকে দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিত। ঘটনার নায়ক ছিল কোম্পানির ভারতে অবস্থিত কর্মচারীরা। তাছাড়া ইংল্যান্ডের কর্তারা রাজ্যজয়ের আদেশ দেয়নি বটে, কিন্তু জয়ের পর সংশ্লিষ্টদের সবসময়ে পুরস্কৃত করেছে। বস্তুত লাভের হিস্যা নিশ্চিত হলে কর্তাব্যক্তিরা কোম্পানির কোনো কাজে কখনোই বাধা দেয়নি। পলাশি যুদ্ধের পাঁয়তারা, হেস্টিংস-কর্নওয়ালিশ-ওয়েলেসলির আমলের সব যুদ্ধ কোর্ট অফ ডাইরেক্টরসের অনুমতি ছাড়াই পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়। নেহায়েত লাভ-লোকসানের হিসাব ছাড়া বাকি সব ব্যাপারে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস অন্ধভাবে মেনে নিত কোম্পানির ভারতস্থ কর্মচারীদের সিদ্ধান্ত (সিরাজুল ২০০২: ২০১)।

৪. সরাসরি ক্ষমতায় আসীন না হওয়ার ব্যাখ্যা হিসাবে এসব তথ্য-উপাত্ত হাজির থাকার পরও বহু ঐতিহাসিক যে বলতে চেয়েছেন, কোম্পানি বাংলা দখলে গররাজি ছিল – তা আসলে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রচারণারই সাফল্য। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি শাসিতের মধ্যে চারিয়ে দেওয়া ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম প্রধান কৌশল (২.৬.৬ দ্রষ্টব্য)।

৫. সি. এ. বেইলি লিখেছেন:

> Earlier despotisms were tempered by a political culture which insisted that rulers should offer service and great expenditures in return for high revenue demand, the British acknowledged few such restraints. The crisis of legitimacy of the early colonial state was a moral as much as an economic one. (Bayly 2002: 468)

৬. দেশি শিল্প ধ্বংসের মাত্রা কতটা ভয়াবহ এবং এর ফল কতদূর শোচনীয় ছিল, তা জানা যায় সি. আই. ট্রেভিলিয়ানের প্রদত্ত তথ্য থেকে। *Report Upon the Inland Customs and Town Duties of the Bengal Presidency* (1835)-এ তিনি দেখিয়েছেন, ১৮১৩-১৪ সালে বাংলা অঞ্চল থেকে বস্ত্রখাতে রফতানির পরিমাণ ছিল ৫২,৯১,৪৫৮ টাকা, ১৮৩২-৩৩-এ এ

সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৮,২২,৮৯১ তে। বিপরীতে এ সময়ের মধ্যে একই খাতে আমদানি ৯,০৭০ টাকা থেকে বেড়ে ৬৬,১২,১১৪ টাকায় উন্নীত হয়। (Sinha 1996: 116-17)

৭. এখানে উল্লেখ্য, ভারতীয় উপনিবেশ সম্পর্কে ভারত ও লন্ডনে বিভিন্ন দল ও মতের পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন পর্বে দেখা গেছে। কোম্পানির সঙ্গে স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, নিজেদের নীতি ও বিশ্বাসের বাস্তবায়ন এবং অধিকতর ঘাতসহ ও দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা – ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়েই এসব মতামত পাঠ করতে হবে। অন্যথায় বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তের আশঙ্কা আছে।

৮. 'Dow was a mercantilist; Pattullo and Francis were physiocrats; Law and to a lesser degree Cornwallis, free traders. If in spite of those differences their ideas came to converge on one common and irresistible solution for Indian policy, it was because they lay on the same axis as what was indeed one of the most forward-moving trends in the age – the transition from mercantilism to free trade, a movement which reached in its final phase in the last quarter of the eighteenth century.' (Guha 1963: 18)

৯. 'Cornwallis … had spent a great deal of money on fighting Tipu Sultan. In fact the permanent settlement of 1793 must be seen in the context of this dilemma of rising military expenditure and the uncertainty of revenue collection from absconding peasants.' (Kulke and Rothermund 1999: 230)

১০. সমকালীন তর্কবিতর্কের মধ্যে এ ব্যাপারটি মোটেই অনুল্লিখিত ছিল না। যেমন, আলেকজান্ডার ডাউ তাঁর ভূমিসংস্কার-প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছিলেন, তাঁর প্রস্তাবিত সংস্কার শুধু অর্থনৈতিক উন্নতিরই সহায়ক হবে না, দেশবাসীকে ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত করার পথেও তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে; কেননা ব্রিটিশদের কৃপায় যারা সম্পত্তির মালিক হবে তারা সম্পত্তির কারণেই ব্রিটিশের প্রতি সদা-অনুগত থাকবে। (সিরাজুল ২০০২: ৯৯)

১১. ঔপনিবেশিক শাসন তার অস্তিত্বের স্বার্থেই স্থানীয় সুবিধাভোগী শ্রেণি তৈরি করে। মুনাফা নিশ্চিত করার স্বাভাবিক সূত্র অনুযায়ী এই শ্রেণিটি ছোট আকারের হয়। বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে জমিদার শ্রেণিই এই সুবিধা ভোগ করেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন ইংরেজি-শিক্ষিতরা এই বলয়ে ঢুকে পড়ে। অবশ্য এই দুই শ্রেণি – জমিদার ও ইংরেজি-শিক্ষিত – জনগোষ্ঠীর একই বলয় থেকে উদ্ভূত এবং পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

১২. অর্বাচীন ব্রিটিশ অফিসারেরা আইনি কারবারে কোনো দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই নিয়োগ পেত। তাই বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই আইন বিধিবদ্ধ করা ছিল খুব জরুরি (Kulke and Rothermund 1999: 228)। ১৮১৭ সালে মনরো বলেছিলেন, 'Nine-tenths of the men in the judicial line knew as little of India as if they had never left Great Britain.' (Aspinall 1987: 174)

১৩. স্পিয়ার *The Twilight of the Mughals* গ্রন্থে একটি কৌতুককর মন্তব্য করেছেন, যেখানে ঔপনিবেশিক আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রকৃত চিত্রটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। মন্তব্যটি এরূপ: 'The courts were to the public a great penny in the slot machine whose working passed man's understanding and from which anything might come except justice.' (Spear 1951: 95)

এই মন্তব্য গোলাম হোসেইন খানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ: 'A whole life is needful to attend their long, very long proceedings; and till a decision is given there is no comprehending what is going on, and what is likely to follow, nor what is probable end of the business.' (Khan 1926: 210)

১৪. *সংবাদ প্রভাকরের* ১৪/১১/১২৫৯ তারিখের সংখ্যায় ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থার নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে:

> প্রদেশমধ্যে যে সকল সাহেব বিচারকের পদে অভিষিক্ত আছেন তাঁহারদিগের অধিকাংশ ব্যক্তি রাজনিয়মের কোট্যর্থ ধরিয়া আপনাপন প্রভুত্ব প্রকাশ করাতেই প্রজারা অতিশয় ভীত হইয়া কালযাপন করিতেছে, নিরীহ লোকসকল সর্ব্বস্বান্ত হইলেও রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করেন না, কেবল নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস নিঃসরণ করেন, ব্রিটিস বিচারের এমত চমৎকার গতি যে সাক্ষি প্রভৃতি উপস্থিত ও নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে অনায়াসে যথার্থেরও অপহ্নব হইয়া থাকে, বিশেষত এতদ্দেশীয় লোকেরা অত্যন্ত ভীরু স্বভাব, তাহারদিগের মধ্যে যাহারা কখন আদালত দেখে নাই তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে আমলাদিগের চক্রেই পতিত হয়, উকীল মোক্তারেরা নানা প্রকার খরচার ফন্দি তুলিয়া কেবল অর্থ সংগ্রহকরণের চেষ্টা করে। এসকল ব্যাপার খোদাবন্দ বিচারপতি মহাশয়দিগের চক্ষের উপরে হয়, তাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকদিগের স্বভাবাদি না জানাতে তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন না, অধিকন্তু বিচারপতিদিগের মধ্যে যাঁহারা আবার আমলার বশীভূত থাকেন অথবা আমলা দ্বারা আপনাপন উদর পরিপূর্ণ করণের চেষ্টা করেন, তাঁহারদিগের বিচার আরো চমৎকার হয়। (বিনয় ১৯৬২: ১৯০)

১৫. 'The East India Company's service was already what Sir John Kaye was to call it a 'great monarchy of the middle classes'.' (Ghosh 1998: 53)

১৬. 'Every colonial nation carries the seeds of fascist temptation in its bosom. What is fascism, if not a regime of oppression for the benefit of a few? The entire administrative and political machinery of a colony has no other goal. The human relationship has arisen from the severest exploitation, founded on inequality and contempt, guaranteed by police authoritarianism. There is no doubt in the minds of those who have lived through it that colonialism is one variety of fascism.' (Memmi 1976: 62)

১৭. পরবর্তীকালে অন্য খাতের অধিকতর আয়ের স্বার্থে কোথাও কোথাও ভূমিরাজস্বে ছাড় দেওয়া হয়েছিল বা 'কৃষকবান্ধব' নীতি করা হয়েছিল। যেমন, ১৯০০ সালের দিকে পাঞ্জাবে এমন আইন করা হয়, যাতে কৃষকের জমি অ-কৃষকের হাতে না যেতে পারে। কৃষিপ্রধান ভারতের কৃষকপ্রধান বাস্তবতায় ইংল্যান্ডের পণ্যক্রয়ে সমর্থ জনগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেই এসব নীতিগত পরিবর্তন আনা হয়েছিল। নতুন অর্থকরী শস্যের উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্যও দরকার ছিল রাজস্বের বোঝা কমানো। কৃষির উদ্বৃত্ত হাতিয়ে নেওয়ার জন্য ঔপনিবেশিক পুঁজিপতিরা রাজস্বের বদলে ধার দেওয়ার পন্থা গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে বহু কৃষক খুব অল্পসময়ের মধ্যে জড়িয়ে যায় ঋণচক্রে, আর তার উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতা ও মধ্যস্বত্বভোগীরা সস্তায় মাল পেয়ে পর্যাপ্ত মুনাফা হাতিয়ে নেয়। (Bose and Jalal 2002: 101)

১৮৫৯ এবং ১৮৮৫ সালে বাংলায় ভূমিব্যবস্থাপনা ও কৃষিরাজস্বে যে পরিবর্তন আনা হয়, তার পেছনে কলকাতায় বসবাসবারী 'অনুপস্থিত রায়ত'দের চাপ ছিল; কিন্তু এ ধরনের নানা হিসাবও কাজ করেছে।

১৮. ১৮৩৩-এ কলকাতার বড় বড় এজেন্সিগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর দ্বারকানাথ ঠাকুর 'স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে' তাঁর সরকারি চাকরি ছেড়ে কার-টেগোর কোম্পানি নামে 'হৌস' স্থাপন করেছিলেন (দেবেন্দ্র ২০০৮: ১৯৯)। সঙ্গে অবশ্য ইংরেজ শরিকও রাখতে হয়েছিল। দ্বারকানাথের এই উদ্যোগ এবং তাঁর ও অন্যদের আরো কয়েকটি উদ্যোগের কথা বাংলার 'আধুনিকতা'র ইতিহাসে জোর গলায় প্রচারিত হয়। কিন্তু সত্য হল, দ্বারকানাথসহ বাঙালির কোনো উদ্যোগই ব্রিটিশ পুঁজির সামনে দাঁড়াতে পারেনি।

১৯. ঔপনিবেশিক আমলের অবশিল্পায়নের ব্যাপারে একটা জোরালো মত এই যে, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ কৃষিপ্রধান ভারত আর শিল্পপ্রধান ইংল্যান্ডের মধ্যে হওয়াই স্বাভাবিক এবং উভয়ের জন্য লাভজনক। এক অর্থে এ কথা মিথ্যা নয়। কৃষিখাতের বিকাশেও ভারত লাভবান হতে পারত। মুশকিল হল, উপনিবেশিত একটি দেশে যেখানে শাসকগোষ্ঠী উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে বাধা তৈরি করে এবং নানামাত্রিক শোষণ অব্যাহত রাখে সেখানে মুক্তবাণিজ্যের হিসাবই বা চলে কিভাবে আর আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগই বা কিভাবে কাজ করবে? (সব্যসাচী ১৩৯৬: ৮৫)

২০. কোম্পানির অর্থপাচারের ধরন ও উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> In fact, this trade was of interest to the company purely as a means of transfer of India's tribute. International financial transactions of various kinds were used for this purpose. For instance, Indian revenues or income from the company's opium monopoly would be transferred to China in order to buy tea which was then sold in London; or private traders shipped Indian cotton to China and paid their sales proceeds into the treasury of the company at Canton, obtaining drafts on London or Calcutta in return. Thus the company had no problem in transferring the tribute to London. In fact, these financial transactions provided additional profit, whereas a direct shipment of precious metals from Calcutta to London would have caused a great deal of expenditure. (Kulke and Rothermund 1999: 232)

২১. '… since the middle of eighteenth century there had been two principal elements in the relation between East and West. One was a growing systematic knowledge in Europe about the Orient, knowledge reinforced by the colonial encounter as well as by the widespread interest in the alien and unusual, exploited by the developing sciences of ethnology, comparative anatomy, philology, and history; furthermore, to this systematic knowledge was added a sizable body of literature produced by novelists, poets, translators, and gifted travelers. The other feature of Oriental-European relation was that Europe was always in a position of strength, not to say domination. … the essential relationship, on political, cultural, and even religious grounds, was seen – in the west, which is what concerns us here – to be one between a strong and a weak partner.' (Said 1995: 39-40)

২২. 'England knows Egypt; Egypt is what England knows; England knows that Egypt cannot have self-government; England confirms that by occupying Egypt; for the Egyptians Egypt is what England has occupied and now governs; foreign occupation therefore becomes 'the very basis' of contemporary Egyptian civilization; Egypt requires, indeed insists upon, British occupation.' (Said 1995: 34)

ভারতে পুরো উনিশ শতক জুড়ে শাসকপক্ষ এবং অনুগত স্থানীয়দের মধ্যে নানাভাবে একই যুক্তি উৎপাদিত-পুনরুৎপাদিত হয়েছে।

২৩. 'Jones deliberately chose 'Asiatik' in preference to 'oriental', because he wanted to study India's civilization on its own terms rather than looking at it from the western viewpoint implied by the word 'oriental'. Such an attitude enabled the British of those days to master the tasks demanded to them by an environment of which they initially knew a little.' (Kulke and Rothermund 1999: 226-27)

২৪. মনোভাবের এই পরিবর্তনের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন ডেভিড কফ (1969)। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় প্রাচ্যবাদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের আঁতাত অনুচ্চারিত থেকে গেছে। এরিক স্টোকস (1959) এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন কেন্দ্রের রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক নীতি-পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে। তাঁর বিশ্লেষণে গুরুত্ব পেয়েছে 'English political mind' – ইভান্‌জেলিক্যাল মতবাদী, উদারনীতিবাদী ও উপযোগবাদীদের নীতি ও কর্মকাণ্ড।

২৫. 'This utilitarian generation not just disregarded, but utterly despised, Indian tradition.' (Kulke and Rothermund 1999: 229)

২৬. 'Shore and Grant who on their return to England went to live as neighbours to Wilberforce at Clapham, and, together with Zachary Macaulay, Henry Thornton, and John Venn, formed the Clapham Sect. The influence of this group sprang from its leadership of Evangelical and Methodist opinion on political issues. Wilberforce, as a personal friend of Pitt, and Grant, as a director and for many years chairman of the East India Company, were able to command a powerful minority in the Commons.' (Stokes 1959: 28)

২৭. শাসকদের মতবিরোধ বা নীতির পরিবর্তনের ফলে উপনিবেশকের মূলনীতির খুব একটা বদল হয়নি। এডওয়ার্ড সাইদ এ প্রসঙ্গে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন:

> No one with any power to influence public discussion or policy demurred as to the basic superiority of the white European male, who should always retain the upper hand. Statements like 'The Hindu is inherently untruthful and lacks moral courage' were expressions of wisdom from which very few, least of all the governors of Bengal, dissented. (Said 1994: 182)

গৌরী বিশ্বনাথন দেখিয়েছেন, প্রাচ্যবাদী আর ইঙ্গবাদীদের মধ্যে যতই অমিল থাকুক না কেন, উভয়ের তর্ক-বিতর্ক ও শাসনতন্ত্রের মূলে ছিল সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি সংহত করা – আধিপত্য নিশ্চিত করা (Viswanathan 2009: 167)।

২৮. এই নির্মাণ-বিনির্মাণ সবসময়েই প্রচণ্ড পুরুষতান্ত্রিক এবং নারী-বিরোধী (Loomba 2001: 152-53)। শুরু থেকেই উপনিবেশিত ভূমিকে উপস্থাপন করা হয়েছে নারী-শরীরের প্রতীকে। আর একে সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে উপনিবেশিতের বিরুদ্ধে। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে নগ্ন নারীচিত্রের বিপরীতে এশিয়ার নারী সবসময়ে বেশি কাপড়ে ঢাকা। মধ্যযুগে ইউরোপীয়রা এশিয়ায় সাধারণভাবে লৌহকঠিন শাসকদের মুখোমুখি হয়েছে। ফলে এখানকার ভূমিরূপ-নারীর কৌমার্য-হরণকারী পুরুষ হিসাবে নিজেদের উপস্থাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রাচ্যের পুরুষদের

চিত্রিত করা হয়েছে মেয়েলি স্বভাবের এবং সমকামী হিসাবে। তারা চিত্রিত হয়েছে কামুক খলচরিত্র হিসাবে, যাদের কবল থেকে স্থানীয় কিংবা ইউরোপীয় নারীদের উদ্ধার করবে পৌরুষদীপ্ত কিন্তু মার্জিত ইউরোপীয় পুরুষেরা। স্বভাবতই প্রাচ্যদেশীয় রানি বা হেরেমের মেয়েরা দুনিয়ার এই অংশের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

এই নির্মাণ উপনিবেশিতের পুরুষতন্ত্রকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

২৯. 'In bringing the administration of criminal justice under English control in 1790, Cornwallis was continuing the policy of Hastings. For in 1772 Hastings too had realized the danger of entrusting power to irresponsible Indian officials who were frequently corrupt … . Perhaps the most controversial of all his innovations was the substitution of English for Indian judges of the criminal courts: a change which … was based on his deeply rooted convictions that Indians were unworthy of trust.' (Aspinall 1987: 168)

৩০. 'The Company's Indian troops were undoubtedly the most efficient army in India and probably in all Asia in the early nineteenth century.' (Spear 2004: 182)

৩১. 'To galvanize Hindu commercial and clerical support in the south the company state sponsored a somewhat spurious new Brahmanical ruling ideology based on the rigid varna-defined caste system. Similarly company's orientalist scholars gave far greater importance to doctrinal Islam or sharia as propagated by the ulema than the eclectic religion shot through with local customary practices, which was followed by the vast majority of Indian Muslims.' (Bose and Jalal 2002: 74)

৩২. আপাত নিরপেক্ষ বহু বিষয় যে আসলে গভীরভাবে উপনিবেশায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত, তার বহু নজির ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডে উঠে এসেছে। যেমন Alan J. Bishop তাঁর 'Western Mathematics: The secret weapon of cultural imperialism' (2007) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, পশ্চিমা গণিত উপনিবেশকের শ্রেষ্ঠত্ব আর উপনিবেশিতের হীনতার বোধ তৈরির কাজে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

৩৩. অ্যাডাম অবশ্য তাঁর রিপোর্টে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, বাংলার পাঠশালাগুলো জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং এগুলির আধুনিকায়নের মাধ্যমে নতুন ও লাভজনক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব (De 1974: 58)। অ্যাডামের প্রতিবেদনের সম্পাদক জেমস লঙ্ লিখেছেন, 'Adam, in his report, dwells on the importance not only on vernacular but also of oriental education, which must be the fountain of polishing the vernacular, making English ideas to be clothed in an oriental garb suitable to the people.' (Long 1868: 31) সেকালের বিদ্যাশিক্ষার মান যে মোটেই হীন ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অ্যাডামের এই উক্তিতে: 'Perhaps we shall not err widely if we suppose that the state of learning amongst the Mussalmans of India resembles that which existed among the nations of Europe before the invention of printing.' (Long 1868: 215)

৩৪. 'মেকলের মীমাংসা-সূত্র কোন ধরনের যুক্তির ভিত্তিতে উদ্ভাবিত হয়েছিল জানতে হলে, আগে আমাদের ১৮১৩ থেকে ১৮৩৫-এর মধ্যে ইংল্যান্ডের ভেতরকার পরিবর্তনের খতিয়ান নিতে হবে; কেননা, একেবারে গোড়া থেকেই ইংল্যান্ডের

অভ্যন্তরীণ ও ঔপনিবেশিক নীতি এক অচ্ছেদ্য যোগে ছড়িয়ে গিয়েছিল, মেকলের শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবও সেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না; তৎকালীন ইংল্যান্ডের প্রধান মতাদর্শের পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই রচিত হয়েছিল ভারতের নয়া শিক্ষানীতি, গড়ে উঠেছিল 'আধুনিক' শিক্ষাপ্রণালী'। (শিবাজী ১৯৯১: ১০০)

এই তর্কবিতর্কের মধ্যে শিক্ষানীতির বিবেচনায় কাজের কথাও নিশ্চয়ই ছিল। নিজেদের মতো করে উপনিবেশিতের 'উন্নতি'র আগ্রহও অনেকের মন্তব্যে আঁচ করা যায়। মাদ্রাজের গভর্নর স্যার টমাস মনরো ঘোষণা করেছিলেন, 'The ultimate object of British rule in India was to 'improve the character of our Indian subjects as to enable them to govern and protect themselves'.' (Aspinall 1987: 176) এই মন্তব্য খুবই বর্ণবাদী; তবু ধরা যাক, এ ধরনের ভাবনায় উপনিবেশিতের কল্যাণ করার মনোবৃত্তিও আছে। ফিলিপ ফ্রান্সিসের কথা আগেই বলা হয়েছে, যার 'eighteenth-century idea was incorporated into the vision of a post-revolutionary bourgeois state run by the bureaucracy as a 'universal class' in whom efficiency would be fruitfully wedded to virtue – power to culture.' (Guha 1988: 16) মুশকিল হল, একটা সর্বব্যাপী ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে এই ধরনের নীতি বাস্তবায়িত হতেই পারে না – 'Under the condition of colonial rule, that is, the rule of a post-revolutionary bourgeois in a state without citizenship, such a vision was bound to end up in a caricature. And so it did.' (Guha 1988: 16)

৩৫. 'Education (was) related to colonial dominance not only as a means of persuation, but as an arm of its coercive apparatus as well. The later is a fact of history which the ideology of liberalism, in its eagerness to display education merely in a hegemonic role, would rather forget. But there is a great deal of evidence to the contrary.' (Guha 1988: 16)

পর্যাপ্ত দলিলপত্র ঘেঁটে গৌরী বিশ্বনাথন এই মন্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তঃ 'The nineteenth-century Anglicist curriculum of British India is not reducible simply to an expression of cultural power; rather, it served to confer power as well as to fortify British rule against real or imagined threats from a potentially rebellious subject population.' (Viswanathan 2009: 167)

৩৬. আরো আগে চার্লস গ্রান্ট শিক্ষা ও বাণিজ্যের এই সংযোগ আরো পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন। সঙ্গে যোগ করেছেন খ্রিস্টানি প্রচারকেও। গ্রান্টের সে প্রস্তাব সম্পর্কে এরিক স্টোকস লিখেছেনঃ 'Hitherto British manufacturers had found only a limited market in India because of the poverty of the people and their unformed taste. Education and Christianity would now remove these obstacles. In this way, the noblest species of conquest, the spread of true religion and knowledge, would not forfeit its earthly reward; for 'wherever our principle and our language are introduced our commerce will follow'.' (Stokes 1959: 34)

৩৭. শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'কলিকাতা সহরের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে নিজ সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। সুবিধা বুঝিয়া কয়েকজন ফিরিঙ্গী কলিকাতার স্থানে স্থানে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন। সার্বরণ নামক একজন ফিরিঙ্গী চিৎপুর রোডে একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এই স্কুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। মার্টিন বাউল নামক আর একজন ফিরিঙ্গী আমড়াতলায় এক স্কুল স্থাপন করেন; সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল সেই স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আরাটুন পিট্রাস নামক আর একজন ফিরিঙ্গী আর একটি স্কুল স্থাপন করেন; তাহার যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে

কলুটোলার কাণা নিতাই সেন ও খোঁড়া অদ্বৈত সেন প্রসিদ্ধ। ইহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ব্যাকরণ-হীন ইংরাজী বলিতে পারিতেন এবং লিখিতে পারিতেন বলিয়া তৎকালীন কলিকাতা সমাজে ইঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা ছিল না।' (শিবনাথ ১৯৫৭: ৭৩-৭৪)

৩৮. এ প্রসঙ্গে হিন্দু কলেজ পাঠশালার উদাহরণ দেওয়া যায়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া পাঠশালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৪৩-৪৪-এর শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে লেখা হয়: 'The primary object contemplated in the establishment of the pathsala were to provide a system of national education, and to instruct Hindoo youths in literature, and in sciences of India and of Europe, through the medium of Bengali language.' (উদ্ধৃত, প্রশান্ত ২০০৭: ১৯)

'পাঠশালাটি প্রথমে যথেষ্ট জনসমাদর লাভ করলেও সরকারের নীতি পরিবর্তিত হওয়ায় ১৮৪৩-৪৪-এ ছাত্রসংখ্যা কমে দেড়শতের কিছু বেশিতে দাঁড়ায়। বারোটি শ্রেণী কমে সাতটি শ্রেণীতে পরিণত হয়, শিক্ষক-সংখ্যাও স্বভাবতই কমে যায়।' (প্রশান্ত ২০০৭: ৬৪)

৩৯. মেকলের প্রস্তাবের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের রুচি, মত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুকূলে ভারতীয়দের গড়ে তোলা। ইংরেজি সাহিত্যকে বেছে নেওয়া হয় পশ্চিমা মূল্যবোধ চারিয়ে দেবার প্রধান উপায় হিসাবে। ফলে ভারতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শুরু হয় খোদ ইংল্যান্ডের অনেক আগে। এ বিষয়ে উপনিবেশিতদের অধিক পারঙ্গমতা এখানকার ইংরেজ প্রশাসকদের সঙ্গে তাদের জানাশোনার ভারসাম্যহীনতা তৈরি করতে পারে, এই আশঙ্কায় ১৮৫৩ সালের আইনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় এক হাজার নম্বরের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য যোগ করা হয়। এর ফলেই 'বিষয় হিসেবে এ-যাবত অচ্ছুত বলে গণ্য ইংরেজি সাহিত্য জিতে নেয় সম্মানের আসন, জায়গা পায় ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে; ... অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের সর্বপ্রথম অধ্যাপক ওয়ালটার রলে অক্সফোর্ড যাবার আগে ইংরেজি পড়াতেন আলিগড়ের অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজে। খোদ ইংল্যান্ডে ইংরেজির উত্থানের সঙ্গে উপনিবেশের শিক্ষানীতির যোগটা যে কত গভীর, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ওয়ালটার রলের নিয়োগ-বিত্তান্ত।' (শিবাজী ১৯৯১: ১১৪)

৪০. কলকাতার ভদ্রলোকদের প্রতিক্রিয়ার আরো অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসুর লেখায়। তিনি লিখেছেন, 'আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যান্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহী আসিবে প্যান্টালুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদের প্যান্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। ... কোন পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। ... নিদ্রার সময়ে লাল কোর্তাধারী সিপাহীর স্বপ্ন দেখিতাম।' (রাজনারায়ণ ১৯৬১: ৬৬)

যাকে আজকাল হামেশাই 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলা হয়, সেই বিদ্রোহ সম্পর্কে কলকাতার শিক্ষিত ভদ্রলোকদের এই মনোভাব অভাবনীয়। রণজিৎ গুহ আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, 'The difficulty of reconciling that response with the nomination of our educated nineteenth-century forbears as pioneers of a freedom movement is a conundrum on which the problematic of Indian History under British rule will continue to turn for a long time yet.' (Guha 1988: 19)

মোটেই অস্বাভাবিক নয়, সিপাহী বিদ্রোহের কালে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিকে খ্রিস্টান ও ইংরেজদের সঙ্গে এক কাতারে রেখে বিচার করা হয়েছিল।

৪১. উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত বাঙালির লেখায় ও কাজে এর উদাহরণ পাওয়া যাবে। এখানে নেপাল মজুমদার (১৯৮৩: ৪) থেকে তিনটি নমুনা চয়ন করা হল:

এক. রামমোহন রায় লিখেছেন: 'Among other objects, in our solemn devotion, we frequently offer up our humble thanks to God, for the blessings of British Rule in India and sincerely pray, that it may continue in its beneficient operation for centuries to come.' (J. C. Ghosh, edited, *English Works of Rammohan Roy*, v. 1, p. 230)
দুই. ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর সগর্বে বলেছিলেন, 'If we were to be asked, what Government we would prefer, English or any other, we would, one and all reply, English by all means, even in preference to Hindu Government.' (*India Gazette*, July 4, 1831)
তিন. বিলাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে ইংরাজ-প্রশস্তি গাইতে গিয়ে এমন কথা বলতেও দ্বিধা করেননি: 'It was England who sent out Clive and Cornwallis to benefit India by their counsels and arms. It was England that sent out to that distant nation the great man who had succeeded establishing peace in the world, and who was the first who first introduced a proper and permanent order of things in the East.' (Kishori Chand Mitra, *Memoir of Dwarakanath Tagore*, p. 94)
নেপাল মজুমদার আরো লিখেছেন, 'কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তারপর বহুদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের সভামঞ্চ হইতে ইংরাজের উদ্দেশে এই একই সুরে একই ভাষায় প্রশস্তি ও স্তুতিবাদ করা হইয়াছে'।

বাঙালিদের বাণিজ্যে অসাফল্যের জন্য আহাজারি ছাপা হয়েছে উনিশ শতকের বহু পত্রপত্রিকায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক আর্থিক কাঠামোই যে এর মূল কারণ, সে কথাটা প্রায় অনুল্লিখিত থেকে গেছে। ৯/৮/১২৬০ তারিখের *সংবাদ প্রভাকরে* লেখা হয়েছে, 'জাহাজারোহণ পূর্ব্বক বিলাত গমনের নিয়ম না থাকাতে বিদেশের বাণিজ্য বিষয়ে কেহই সাহস করিতে পারেন না' (বিনয় ১৯৬২: ৩৪)। আরো কিছু কারণের কথা আছে। বেশিরভাগই দেশীয়দের জাতিগত দোষত্রুটির কথা। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী যা চেয়েছিল, এবং এ দেশীয়দের যেভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল, তা মেনে নেওয়ার এবং ওই ধারণা পুনরুৎপাদনের এ এক দারুণ নমুনা। এই মানুষগুলোই অতীতে সাফল্যের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য করেছে। *প্রভাকর* সে কথা বেমালুম ভুলে গেছে। একেই বলা যায় 'death and burial of … local cultural originality.'

৪২. ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামসি প্রস্তাবিত এবং পরবর্তীকালে বহুব্যবহৃত 'হেজিমনি' সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> Hegemony is economic-ideological domination – always-incomplete, always-becoming, vulnerable, flexible, and hospitable to change – enacted as it is by a dialectic of *both consent and coercion*. Hegemony is generally consensual; but hegemony can also be coercive if coercion itself can be reproduced as consent. (Hussain 2003: 205)

ঔপনিবেশিক শাসন প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলা যায়, এতে consent অর্জিত হয় প্রধানত coercion-এর মধ্য দিয়ে।

৪৩. ঔপনিবেশিক ভাষার এই দিকটি প্রকাশ্য বলেই সহজে চেনা যায়। উনিশ শতকের সাহিত্যকর্ম ও পত্রিকার পাতায় এই ধরনটি অনবরত বর্ণিত হয়েছে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিন্দিত হয়েছে। প্রসঙ্গত কালীপ্রসন্ন সিংহের বিখ্যাত বর্ণনাংশ উদ্ধৃত করা যায়: 'প্রথম দলের সকলি ইংরেজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিস, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাক্নি, সালু মাড়া, – হরকরা, ইংলিসম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পোলটিক্স ও বেষ্ট নিউজ অব্ দি ডে নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন'। (অরুণ ২০০৮: ৫০)

৪৪. '... the modern colonizing imagination conceives of its dependencies as a territory, never as a people, wrote Sir Herman Merivale in 1839 in his influential Oxford lecture on Colonization.' (Bhabha 2006:138; নিম্নরেখা মূলের)

৪৫. 'The Permanent Settlement of land revenue by Cornwallis in 1793 had led to a vast proliferation of rentier interests, many of them quite tiny, and this was the material base for the overwhelmingly upper-caste respectable educated bhadralok. Rentier incomes had to be increasingly supplemented by professional or clerical jobs, for which a smattering of western education had become essential.' (Sarkar 1997: 190)

৪৬. উপনিবেশের ছাঁচের সমরূপতার জন্যই এমন হয়েছে। সমকালীন ভারতীয় সমাজ যে হীন, সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাটাও সবপক্ষ আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে সমাজচিন্তার যে ধারাটিকে 'সনাতনপন্থী' বা 'রক্ষণশীল' বলা হয়, হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যে ধারা, তার নেতারাও যে প্রবলভাবে সংস্কারপন্থী এবং হিন্দুসমাজের আধুনিকীকরণের প্রবক্তা, এ-কথাটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। তথাকথিত 'উদারপন্থী' আর 'রক্ষণশীল'দের মধ্যে অন্য যা-ই তফাত থাকুক, পুরনো সমাজকে বদলে আধুনিক সমাজের উপযোগী করে তুলতে হবে, এ-বিশ্বাস দুজনের মনেই সমান দৃঢ় ছিল। (গৌতম ও পার্থ ২০০১: ১৩৯)

৪৭. কলকাতার তুলনায় বোম্বাইয়ের পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'The rise of Bombay as an industrial and commercial centre was of great importance for all of western India. This city set the pace in thought and action and in this respect it was particularly significant that this was not an imperial city like Calcutta but a city of indigenous enterprise.' (Kulke and Rothermund 1999: 248)

৪৮. রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবনে এই রফার ব্যাপারটি মোটেই গোপন ছিল না। অ্যাডাম এক পত্রে লিখেছিলেন, রামমোহন 'is both a Christian and a Hindu – Christian with Christians and Hindu with Hindus …' (উদ্ধৃত, প্রভাত ১৯৭২: ৪৩৮)। *বেদান্তসারের* জার্মান অনুবাদ জেনা থেকে ১৮১৭ সালে প্রকাশিত হয়। রামমোহনের ভূমিকায় উদ্ধৃত পত্রখানি পড়ে অনামী এই অনুবাদকের মনে হয়েছিল: 'The author's intention seems to have been to show the agreement with Christianity of the foundation of Brahmaism.' (উদ্ধৃত, প্রভাত ১৯৭২: ২৬২)।

৪৯. রামমোহনরা যখন মুক্তবাণিজ্যের পক্ষে লড়ছেন, তখন বাংলা অঞ্চল দ্রুত উৎপাদনক্ষমতা হারাচ্ছে, উৎপাদনের নতুন সব কারিগরি একচ্ছত্রভাবে চলে যাচ্ছে ব্রিটিশদের দখলে। ১৮১৩-১৮৩৩ সালের মধ্যে – রামমোহনের সবচেয়ে কর্মময় সময়ে – ঢাকার চৌকিদারি ট্যাক্সদাতা ঘরের সংখ্যা ২১,৩৬১ থেকে কমে ১০,৭০৮ হয়েছে (Sinha 1996: 119)। বস্ত্রখাতের ধ্বংসের ফলে অন্যূন দশ লক্ষ লোক কাজ হারিয়েছে; কিন্তু রামমোহনসহ আমাদের বিদ্বৎসমাজ এই নিয়ে বাক্যব্যয় করেননি (Sarkar 2000: 23)।

৫০. 'অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে হিন্দু সমাজের মধ্যে কয়েকটি ধর্মীয় গ্রুপ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের সপক্ষে, জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়। ... কোনো কোনো গ্রুপের শাখা কলকাতাতেও ছিল। মুসলমানেরাও কোনো কোনো গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন। এই সব গ্রুপের উপর সহজমত, নাথমত ও নিরঞ্জনমতের

যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাছাড়া তাদের উপর মুসলমান ভাব ও সাধনার প্রভাবও পড়ে। কবীর, দাদু প্রভৃতির প্রভাবও খানিকটা পাওয়া যায়। এরা 'জাতি, পংক্তি, প্রতিমা ও শাস্ত্র মানেন না'। এদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম বলেও কোনো বাদ-বিবাদ নেই। কোনো কোনো গ্রুপে মুসলমান গুরুর নিকট ব্রাহ্মণ পর্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করতে পারত। কোনো কোনো গ্রুপে মুসলমান সভ্যসহ প্রায় কুড়ি হাজার সভ্য ছিল। কর্তাভজাদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত লেখেন যে, 'লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে'। এদের যে গণভিত্তি ছিল তা এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায়।' (অমলেন্দু ১৯৭৪: ১-২)

ধর্মতত্ত্বের এসব 'প্রগতিশীল' ধারার সঙ্গে সমন্বয়ের কোনো লক্ষণ ব্রাহ্মধর্মে দেখা যায়নি। নীরদচন্দ্র চৌধুরী অবশ্য বলেছেন, ব্রাহ্মদের একেশ্বরবাদে হিন্দুদের 'অস্ফুট' ঈশ্বরের ভূমিকা আছে। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ ঈশ্বর প্রথম আসিয়াছিল বাহির হইতে, উহার সহিত সমধর্মিতার জন্য হিন্দুর অস্ফুট ঈশ্বর অলক্ষিতে বিদেশী ঈশ্বরের সহিত মিশিয়া গেল। সেই নূতন ঈশ্বর – যাহা ব্রাহ্মদের ও রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর হইল, তাহা মূলত খ্রিস্টধর্মের ঈশ্বর।' (নীরদ ১৪১৫: ১২২)

৫১. 'তৃতীয় বছরে তত্ত্ববোধিনী সভার বড় অনুষ্ঠানে'র বিবরণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'আমরা সকলকে আহ্বান করিয়া ঘরের মধ্যে বসাইলাম। সমুখেই বেদী। তাহার দুই পার্শ্বে দশ দশ জন করিয়া দুই শ্রেণীতে বিশ জন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ, তাহাদের গাত্রে লাল রঙের বনাত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন, দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণেরা একস্বরে বেদ পড়িতে লাগিলেন' (দেবেন্দ্র ২০০৮: ৪৬)। উল্লেখ্য, ব্রাহ্মধর্মের বৈদিক আচার কেবল ব্রাহ্মণদের জন্যই খোলা ছিল, তাতে গণমানুষের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ ছিল না (Joshi 1975: 14)।

৫২. ষাটের দশকে নীলচাষ-সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া এর এক ভালো উদাহরণ। নীলচাষের সঙ্গে জমিদারদের একাংশ ও মধ্যবিত্তের লাভক্ষতির সম্পর্ক ছিল। ফলে একে কৃষকের পক্ষে সক্রিয়তার নমুনা হিসাবে চালানো যায় না। (Sarkar 2000: 78)

তৃতীয় অধ্যায়
উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া ও বাংলা ভাষা

৩.১ উপনিবেশিত বাংলার ভাষাপরিস্থিতি ও বাংলা ভাষা

ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির বর্ণনায় আলবেয়ার মেমি লিখেছেন, 'I discover that few aspects of my life and my personality were untouched by this fact.' (Memmi 1976: viii)। দেবেশ রায় এই বাস্তবতা বর্ণনা করেছেন এভাবে: 'উপনিবেশের জীবনের কোনো কিছুকেই সাম্রাজ্য তার ক্ষমতাপ্রয়োগের লক্ষ্যের পরিধির বাইরে যেতে দেয় না – সে একটি গ্রামের নামই হোক, আর একটি সভার বিবরণই হোক' (দেবেশ ১৯৯০: ১৫)। বাংলা অঞ্চল শুধু ব্রিটিশ ভারতীয় ঔপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্রই ছিল না, ছিল উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ারও প্রধান লীলাক্ষেত্র (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। স্বভাবতই অন্য নব্যভারতীয় আর্যভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার উপর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। কিন্তু এইমে সেজায়ার, ফ্রাঁৎস ফানো, নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গোসহ উপনিবেশায়নতত্ত্বের আরো অনেক পণ্ডিত ভাষার উপনিবেশায়নের যে পরিচয় দিয়েছেন, বাংলার সঙ্গে তার গুরুতর প্রভেদ আছে। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা বা ক্যারিবীয় অঞ্চলে উপনিবেশকের ভাষা উপনিবেশিতের ভাষাকে যেভাবে বিপর্যস্ত করেছে, বাংলার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেভাবে ঘটেনি। না ঘটার মূল কারণ ভারতীয় উপমহাদেশের উপনিবেশ-পূর্ব সমৃদ্ধি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বরাত দিয়ে আনিসুজ্জামান জানিয়েছেন, 'ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ভাষা ও ছন্দের আদর্শ বা মান নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল' (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ৪৯)। আঠার শতক পর্যন্ত এর ব্যবহার-পরিধি বেড়েছে – রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে শুরু করে সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে বাংলা ভাষার ভিত্তি পোক্ত হয়েছে। পাকা ভিতের কারণেই – অনুমান করা যায় – উপনিবেশক ভাষার প্রচণ্ড প্রতাপে বাংলা নিশ্চিহ্ন হয়নি, বরং সেই প্রভাব কাজে লাগিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হয়েছে।

বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত হয়েছে অন্তত পাঠান আমল থেকে। পাঠানদের দলিলপত্র 'অনেক সময়ে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইত। শের সাহের কামানের উপর বাঙ্গলা অক্ষরে তাঁহার নাম ও উপাধি পাওয়া গিয়াছে' (দীনেশ ২০০৬: ৬৫৭)। মোগল আমলেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। সেসময়ের রাষ্ট্রীয় নথিপত্র সাক্ষ্য দেয় (এস. এম. লুৎফর ২০০৫) – কেন্দ্রীয় সরকার তথা দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা ছিল ফারসি, আর প্রদেশের সরকারি-বেসরকারি কাজের রাষ্ট্র-স্বীকৃত ভাষা ছিল বাংলা। সরকারি ও বেসরকারি 'আরজী, দস্তক, রাজীনামা, রায়নামা, সালিশনামা, পরোয়ানা, ওকালতনামা, হকিকৎনামা, হুকুমনামা, পাট্টা, কবুলিয়ৎ, খতপত্র, ছাড়তিনামা বা একরারনামার যেসব নমুনায় সমকালীন সরকার ও সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সইমোহর ... সীলমোহর রয়েছে – সেগুলো পষ্টভাবে সে আমলের অন্যতম 'রাষ্ট্রভাষা' রূপে বাঙালা ভাষার মর্যাদা ও আদর-কদরের প্রমাণ দেয়' (এস. এম. লুৎফর ২০০৫: ১৭৩-৭৫)। নবাবি আমলে রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলার প্রতাপ আরো বিস্তৃত হয়েছে। এ সময়ে ত্রিপুরা, কুচবিহার, জয়ন্তিয়া ও কাছাড় ছিল বাংলার করদরাজ্য (সুবোধ ১৯৮৫: ৯; সুকুমার ১৯৯৮: ১৬)। রাজ্যগুলোর বেশিরভাগের ভাষা বাংলা না হলেও এদের রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলা ব্যবহৃত হত (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ১৯; ভক্তিমাধব ১৯৮৮: ৬২-৬৩)। এ

Dhaka University Institutional Repository

মর্মে বহু দলিলপত্রের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। 'মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে বৈষ্ণব মতাদর্শঘটিত বিতর্ক অনুষ্ঠানের পরিণামে নবাবের মোহর-অঙ্কিত বাংলায় লেখা জয়পত্রের অস্তিত্ব রয়েছে' (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ১৯)। 'শ্রীহট্টের ফৌজদার মতিউল্লা গৌহাটির বড়ফুকনের নিকট বাংলায় চিঠি লিখেছেন। গৌহাটির কামরূপ রাজসভা থেকে শ্রীহট্টের ফৌজদারকে বাংলায় চিঠি পাঠানো হয়েছে। হেড়ম্বরাজ্যে (কাছাড়) উজির নিযুক্ত হচ্ছে বাংলা আদেশনামায়' (ভক্তিমাধব ১৯৮৮: ৬২-৬৩)। ১৭৭২ সালের ডিসেম্বরে করা কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সন্ধিপত্র এরকমই এক মূল্যবান দলিল (সুরেন্দ্রনাথ ১৯৪২: ৮-৯; সুকুমার ১৯৯৮: ১৬)। নিজের সংকলিত পত্রাদি বিশ্লেষণ করে সুরেন্দ্রনাথ সেনের সিদ্ধান্ত: 'বাঙ্গালাই যে তখন পূর্ব্বোত্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল আমাদের সঙ্কলিত পত্রগুলি পাঠ করিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না' (সুরেন্দ্রনাথ ১৯৪২: ৮৪)। বোঝা যায়, রাষ্ট্রীয় ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের ভাষা হিসাবে বাংলা তার সীমানাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

তাই উনিশ শতকের আগে বাংলা ভাষা বিশেষ মর্যাদা কখনো পায়নি বলে যে মত ব্যাপকভাবে চালু আছে, তা ঠিক বলে মানা যায় না। কোম্পানি-শাসনের প্রথম দিক সম্বন্ধে অবশ্য এ কথা খাটে। তখনো একদিকে স্থানীয় ভাষা হিসাবে বাংলার গুরুত্ব শাসকপক্ষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি,[১] অন্যদিকে সর্বভারতীয় যোগাযোগ আর ইউরোপীয়দের পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানি ও পর্তুগিজের কার্যকরতা অনেক বেশি ছিল। এ কারণে বাংলা ভাষা ঔপনিবেশিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে আরো পরে। সমসাময়িক কলকাতার ভাষাপরিস্থিতি নিয়ে একমাত্র পদ্ধতিমাফিক জরিপ করেছেন ক্লার্ক (T. W. Clark, *The languages of Calcutta, 1760-1840*, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1956, xviii, 3)। ক্লার্কের জরিপ অবলম্বনে শিশিরকুমার দাশ (Das 1966: 18-21) লিখেছেন, আঠার শতকের শেষাংশেও ইউরোপীয়দের মাঝে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসাবে পর্তুগিজ চালু ছিল। তাছাড়া ফারসি ও হিন্দুস্থানির বাইরে কলকাতায় আরবিরও চর্চা হত। ক্লার্ক লক্ষ করেছেন, ১৭৬০ সালের পরেও অনেক বছর বাংলার কোনো মর্যাদা ছিল না, যদিও এটা এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের মুখের ভাষা। সরকারি ও বাণিজ্যিক কায়কারবারের ভাষা ছিল ইংরেজি, পর্তুগিজ, ফারসি। অভিজাত হিন্দুরা সামান্য হলেও ফারসি শিখত। 'The pundits engrossed in Sanskrit still regarded Bengali as a 'barbaric' dialect, as they had done for centuries.' ফলে বাংলার মর্যাদা দেবার কিংবা মর্যাদা দাবি করবার কেউ ছিল না।

বহুজাতিক নগরী কলকাতায় যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য ছিল হিন্দুস্থানি। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিপুল মানুষের ব্যবহার্য ভাষা হওয়ায় ইউরোপীয় বণিকেরা হিন্দুস্থানি শিখতে চাইত। বিদেশিদের হিন্দুস্থানি ব্যাকরণ রচনার প্রাচুর্য এবং ব্যাকরণগুলোর সংস্করণ-সৌভাগ্য দেখে সহজেই বোঝা যায়, এদেশে অভ্যাগতদের কাছে এই ভাষা কতটা অপরিহার্য ছিল (নির্মল ২০০০: ৩৮)। হিন্দুস্থানি ছিল ইন্দো-মুসলমান সংস্কৃতির বাহন; আর অষ্টাদশ শতকে মূলত এর প্রভাবেই বাংলার ফারসিশব্দবহুল চলতি রূপটি গড়ে উঠেছিল (Chatterji 2002: 206)।

বাংলা প্রদেশে থিতু ইংরেজরা অবশ্য বাংলা জানতেন। লর্ড ক্লাইভ আর ওয়ারেন হেস্টিংস যে বাংলা জানতেন এবং বাঙালিদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ২৪১; Kopf 1969: 15)। বাংলা অঞ্চলে শাসন শুরু করার পর ক্রমে শাসনকাজে বাংলার গুরুত্বও শাসকপক্ষ উপলব্ধি করতে থাকে। যেমন, ফরস্টার খেয়াল করেছিলেন, বঙ্গপ্রদেশের দশভাগের ছয়ভাগ লোক বাংলায় কথা বলে, এবং দশভাগের নয়ভাগ কাজ

এই ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হয় (Forster 1799: iv)। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে আইন-অনুবাদের দরকার হয়, আর আদালতে বাংলার আংশিক ব্যবহার শুরু হয়। ১৭৯৩ সালে আইন-সংস্কার হলে দেখা গেল 'বিচারালয়ে বাংলার স্থান কিছুটা বেড়েছে। এবার থেকে বিচারালয়ের নির্দেশ এবং বিবরণী ফারসি কিংবা বাংলায় লেখা হতে পারে। তাছাড়া সদর দেওয়ানি আদালতে কিছু কিছু বাংলা জানা লোকেরও আমদানি হল' (শিশির ১৯৯৯: ১৪)। পরের প্রায় চার দশক জুড়ে বাংলা ভাষার সঙ্গে শাসকপক্ষের এই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আরো নানাদিকে বেশিমাত্রায় প্রসারিত হয়েছিল।

৩.২ ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার গুরুত্বের রকমফের

রণজিৎ গুহ লিখেছেন (Guha 1988: 27-28), উপনিবেশায়নের দুই পর্বের – ষোল ও আঠার শতকের – ভাষাপরিকল্পনায় ছিল 'সাগর-প্রমাণ' ফারাক। তাঁর মতে, দুই যুগের অর্থনৈতিক বিশিষ্টতাই এর কারণ। স্পেনীয়রা লাতিন আমেরিকায় স্থানীয় ভাষা শেখেনি; স্থানীয়দের কয়েকজনকে স্প্যানিশ শিখিয়ে কাজ হাসিল করেছে। বিপরীতে,

> In India, unlike in new Spain, a knowledge of the indigenous languages was recognized by the rulers as an essential condition for the maintenance of their rule; and the Fort William College, set up in 1800, was the first historic step they took to harness the Indian languages to the construction of a colonial state apparatus. (Guha 1988: 28)

ভারতে স্থানীয় ভাষা শেখার ব্যাপারে শাসকপক্ষ মনোযোগী হয়েছিল আসলে আরো অনেক আগে। দেশীয় ভাষা না জানায় ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে কটকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মি. ব্রিস্টোকে অপসারণ করা হয় (নির্মল ২০০০: ৪২)। বিপরীতে স্থানীয় ভাষাজ্ঞান কোম্পানির বহু কর্মকর্তা-কর্মচারীর উন্নতির কারণ হয়েছিল। বস্তুত, 'The key to advancement, in most cases, was linguistic proficiency.' (Kopf 1969: 27) হেস্টিংস চেয়েছেন, কোম্পানির কর্তারা স্থানীয় ভাষা – বিশেষত ফারসি ও হিন্দুস্থানি – শিখেই ভারতে আসুক; আর ১৭৯০ সালে কর্নওয়ালিশ কোম্পানির সবচেয়ে নিচুপদের কর্মচারী 'রাইটারে'র মুনশি নিয়োগের জন্য মাসে বাড়তি ত্রিশ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন (Kopf 1969: 18)।

আগেই বলা হয়েছে, প্রধানত শাসিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের বাস্তব প্রয়োজনেই স্থানীয় ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা প্রাধান্য পেতে থাকে।[২] আইনগ্রন্থ অনুবাদ শুরুর বহু আগেই বাংলা ভাষার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়। ১৭৭৮-এর হ্যালহেডের ব্যাকরণে কেবল হেস্টিংসই নয়, কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে: '… the writer and the printer were paid for five hundred copies of the book and in April the printed preface and one hundred pages of the book were sent to England for 'the final approval of the project'.' (উদ্ধৃত, প্রফুল্ল ২০০৬: জ)। এসময়ে বাংলা ভাষার উপযোগিতার যুক্তিও তৈরি হতে থাকে। উপনিবেশক পক্ষের জন্য ফারসি ও হিন্দুস্থানির তুলনায় বাংলার অধিকতর উপযোগিতার তালিকা তৈরি করেছিলেন হ্যালহেড (Halhed 1980: xv-xviii): ১) কলকাতার বোর্ড অফ কমার্সের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বাঙালি মধ্যস্থতাকারীদের সাহায্য অপরিহার্য; ২) কোর্টে বাঙালি মধ্যস্থতাকারী দরকার এবং আদালতের নোটিশগুলো ফারসির মতো বাংলায়ও অনূদিত হওয়া দরকার; ৩) রাজস্ব, বাণিজ্য ও আইনি ব্যাপারে বাংলা ফারসির চেয়ে অনেক বেশি উপযোগী হবে; ৪) বাংলার গাণিতিক পদ্ধতি হিসাব-নিকাশের জন্য অধিকতর উপযোগী; ৫) বাংলা শেখা সহজ; কারণ এর ব্যাকরণ ও নিয়মাবলি

সরল, ব্যতিক্রম কম। তাঁর মতে 'বাংলাদেশের শাসনকার্যে ফারসি অচল, হিন্দুস্থানি অসম্পূর্ণ এবং বাংলা অপরিহার্য' (নির্মল ২০০০: ৪৭)। ফরস্টার তাঁর অভিধানের ভূমিকায় একই যুক্তিতে একই মত দিয়েছেন। আদালতে ফারসি ও হিন্দুস্থানি চালু থাকায় ন্যায়বিচারের যেরূপ বিঘ্ন হচ্ছে, তার বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে ফরস্টার অবিলম্বে বাংলাকে সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেন (Forster 1799: iv-vii)। সংক্ষেপে প্রায় একই মত প্রকাশ করেছেন উইলিয়াম কেরি তাঁর অভিধানের ভূমিকায়। তিনি প্রচলিত ভাষাগুলোর তুলনায় বাংলার গুরুত্ব, উপযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন (Carey 1825: iv-v)।

দেখা যাচ্ছে, ভারতে কর্মরত সমকালীন ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাংলার অনুকূলে নানা মত উচ্চারিত হয়েছে। বাস্তব কাজে-কর্মে অবশ্য বাংলার এরূপ প্রতিষ্ঠা কখনো ঘটেনি। তার এক কারণ বিধিবদ্ধভাবে বাংলা পঠনপাঠনের সংকট। গুরুতর কারণটি উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। সজনীকান্ত দাস (১৩৫৩), সবিতা চট্টোপাধ্যায় (১৯৭২) ও আরো অনেকে বাংলার প্রতি শাসকপক্ষের আনুকূল্যকে যেভাবে ভাষাপ্রেম হিসাবে দেখেছেন, তা নিঃসন্দেহে ক্ষীণদৃষ্টিজাত। স্পষ্টতই ১৮৩৫-এ ইংরেজি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার আগে পর্যন্ত ঔপনিবেশিক প্রয়োজনের সমান্তরালে বাংলার গুরুত্ব ওঠানামা করেছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী বিভাগগুলো ছিল যথাক্রমে ফারসি, আরবি, হিন্দুস্থানি, সংস্কৃত ও অন্য কথ্যভাষা (Kopf 1969: 50)। এর মধ্যে বাংলাসহ অন্য কথ্যভাষাগুলোর জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল কেবল একজন – উইলিয়াম কেরিকে, কলেজে যাঁর বেতন ও গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে কম (Kopf 1969: 51)। ১৮০৭ সালে কলেজের পরিধি ছোট হয়ে আসে এবং কিছু সময়ের জন্য প্রধানত বাংলা অঞ্চলের প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ এখানে গুরুত্ব পেতে থাকে (Kopf 1969: 147)। এর মধ্যে কেরির উদ্যোগ ও সাফল্যে বাংলা পঠনপাঠনেরও লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছিল। তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজসহ আনুষঙ্গিক নানা চর্চায় বাংলার গুরুত্ব বেড়ে যায়। তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি এ অবস্থার অবসান ঘটে। প্রশাসন এবার জোরালোভাবে হিন্দির পক্ষ নেয়। এসময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিরাট অঞ্চল ব্রিটিশদের অধীনে চলে আসে। তাতে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে বাংলার বদলে হিন্দি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ২০৩; Kopf 1969: 209)। কেরি ১৮২৫ সালের দিকে কাউন্সিলকে লেখা এক পত্রে জানিয়েছেন, 'An attempt was being made to remove pundits from his Bengali and Sanskrit department simply because they did not know Hindi.' (Kopf 1969: 209)

উনিশ শতকের তিনের দশকে উপনিবেশিতদের মধ্যে ইংরেজির প্রতিষ্ঠা ঘটলে বাংলা ভাষা নিয়ে অন্তত পাঁচ দশকের টানাপোড়েন শেষ হয়। 'শাসিতরা যখন রাজভাষা রপ্ত করে নিলেন তখন বিদেশি রাজপুরুষদের আর বাংলা চর্চার তেমন প্রয়োজন রইল না' (মুহাম্মদ হাবিবুর ১৯৮৩: তের)। বিষয় হিসাবে বাংলা পরেও ইংরেজমহলের সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগে চর্চিত হয়েছে; কিন্তু শাসনের ভাষা হিসাবে বাংলার নাম আর কখনো ওঠেনি।

৩.৩ বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া

বাংলা ভাষার উপনিবেশায়নপর্বে সবচেয়ে প্রভাবশালী ঘটনা সাহেবদের সংস্কৃত-আবিষ্কার। ঔপনিবেশিক প্রয়োজন আর পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডের সমন্বয় ঘটেছিল প্রাচ্যবাদীচর্চায়। ডেভিড কফ লিখেছেন: 'The combination of a transplanted elite transformed on Indian soil and their eighteenth-century background helps to explain both the institutional genesis of the Asiatic Society and the nature of its intellectual values.' (Kopf 1969: 31) এই বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যের 'রাজনীতি-নিরপেক্ষ' জ্ঞানগত দিক আছে; কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কেজো দিক নিশ্চয়ই এই যে, ধ্রুপদী গ্রন্থগুলোর বিশদ পঠনপাঠন উপনিবেশে তার আধিপত্য মজবুত করবে। অন্য কথায়, এই জ্ঞানের বরাতে তার দখলদারিত্ব বৈধ হবে।[৩] ধ্রুপদী গ্রন্থপাঠের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হিসাবে সংস্কৃতচর্চার এক বর্ণাঢ্য ধারা তৈরি হয় আঠার শতকের শেষাংশে, এবং পরের প্রায় একশ বছর ধরে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের আবশ্যিক উপাদান হিসাবে এই চর্চা অব্যাহত থাকে। এডওয়ার্ড সাইদ (1995) দেখিয়েছেন, ফিলোলজি শাস্ত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের যোগ অতি নিবিড়। কার্যত দখল করা নতুন ভূমির ভাষিক-নৃতাত্ত্বিক পরিচয় জানার প্রয়োজনেই প্রভাবশালী এই শাস্ত্রের বিকাশ ঘটতে থাকে। তৈরি হয় ভাষা-সম্পর্কিত ধারণা আর ভাষা রপ্ত করার কার্যকর সব কলাকৌশল। ভাষাকে 'ভাষা-পরিবারে' বিন্যস্ত করা, আদর্শ ভাষার অনুসন্ধান এবং সংশ্লিষ্ট চালু ভাষাগুলোর নিয়ামক 'touchstone' হিসাবে ওই আদর্শ ভাষার ব্যবহার – এই ধারণা থেকে ভাষাচর্চার যে নতুন ধারা গড়ে ওঠে, সংস্কৃত ছিল তার প্রধান আশ্রয় (Said 1995: 136-37)। স্বভাবতই এই ধারণা শুধু সংস্কৃতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় ভাষাগুলোর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কিন্তু এই চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের যোগ প্রভাবশালী 'জ্ঞানতাত্ত্বিক' ভিত্তি পেয়ে যায়, যাকে বলা যায়, বাংলা ভাষার উপনিবেশায়নের সবচেয়ে গভীর দিক। সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা যে দীর্ঘ সময়ের জন্য বাংলাচর্চার একমাত্র বৈধ অধিকারী হয়ে ওঠেন, তা এই ধারণার 'যৌক্তিক-আবশ্যিক' সম্প্রসারণ মাত্র।

৩.৩.১ সাহেব-পক্ষের সক্রিয়তার ধরন

ভাববিনিময় আর দরকারি নানা কাজে মানুষ ভাষা ব্যবহার করে। যোগাযোগের কার্যকরতা বাড়ানোর জন্য ভাষা-ব্যবহারে তাকে সতর্কও হতে হয়। তাতে ভাষার শৃঙ্খলা ও প্রকাশক্ষমতা হয়ত বাড়ে। কিন্তু ভাষার নিয়ম প্রণয়ন আর বিধিবদ্ধকরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কাজ। প্রধানত ব্যাকরণ ও অভিধানের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন হয়। তাতে ভাষার মান্যরূপ গড়ে ওঠে। ভাষাভাষীদের পক্ষে এই মান্যরূপের আধিপত্য এড়ানো কঠিন। যে কারণেই হোক, উপনিবেশ-পূর্ব যুগে বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান বা ব্যাকরণ রচিত হয়নি। প্রথম যুগের গুরুত্বপূর্ণ অভিধান ও ব্যাকরণ-প্রণেতারা সকলেই ছিলেন ইংরেজ। এঁদের সবগুলো কাজই বেরিয়েছিল ছাপার হরফে। শ্রুতিনির্ভর সংস্কৃতির বিপরীতে মুদ্রণসংস্কৃতির প্রতাপও স্বভাবতই যুক্ত হয়েছিল এসব কাজের সঙ্গে। ১৮০১ সালের পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে বাংলা গদ্য-পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে। এই বইগুলোর গদ্য শেষ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ধারায় কতটা কার্যকর হয়েছে, তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। যেমন, সুকুমার সেন (১৯৯৮: ৩৯) মনে করেন, এ প্রভাব বেশ সীমিত।[৪] কিন্তু গদ্যধারায় প্রভাব যাই হোক, এই প্রকাশনা যে বাংলা ভাষা ও গদ্যবিষয়ক কর্মকাণ্ডে 'কেন্দ্রত্ব' পেয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সব মিলিয়ে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সাহেবদের তৎপরতাকে চেনা যাবে তার আধিপত্য বা

Dhaka University Institutional Repository

'হেজেমনি' দিয়ে – জ্ঞানতাত্ত্বিক আধিপত্য, মুদ্রণসংস্কৃতির প্রতাপ, প্রণীত বিধির প্রভাব আর কাঠামোগত কেন্দ্রত্ব সেই আধিপত্য বা 'হেজিমনি'র উৎস।

হ্যালহেডই তাঁর ক্লাসিক-নির্ভরতা আর ভাষাতাত্ত্বিক দক্ষতায় এই পথের দিশা দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (Qayyum 1982: 71) বহু সাক্ষ্যপ্রমাণযোগে দেখিয়েছেন, বাংলা ভাষায় হ্যালহেডের দখল ছিল অতি সীমিত। তাঁর পক্ষে বাংলা ব্যাকরণ লিখে ফেলা সম্ভব ছিল কেবল ধ্রুপদী সংস্কৃতের ছাঁচে ফেলে।[৫] তিনি চেয়েছিলেন, বাংলাকে 'সরল' ও 'বিশুদ্ধ' করতে। একজন বিভাষীর জন্য এই সারল্য দরকার। কিছু সরল ধাতু শিখে তাদের বিচিত্র ব্যবহার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের উপযোগী করে একটি বিদেশি ভাষা আয়ত্ত করার চিন্তায় হ্যালহেডের সায় থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কথ্য-বাংলায় কোনো দখল না থাকায় এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকায় বাংলার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি এমনসব ভুল করেছেন, যা বাংলার সঙ্গে পরিচিত কোনো বিশ্লেষক করবেন না (Qayyum 1982: 99-102)। তাঁর পুস্তকে নিজের বানানো কোনো উদাহরণ ব্যবহৃত হয়নি। তিনি উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন পুরোনো কবিতা থেকে। ফলে তিনি কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা – এই ক্রমে বাংলা বাক্য গঠিত হয়, এমন ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এ ব্যাকরণে 'নিঃশ্বাস' শব্দের উচ্চারণ লেখা হয়েছে 'niswas', যা বাংলা উচ্চারণ ও ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ই/ঈ, উ/ঊ, স/ষ/শ, জ/য ইত্যাদি যত ক্ষেত্রে বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন সংস্কৃত থেকে বাংলাকে আলাদা করেছে, তার সবক্ষেত্রেই এই ব্যাকরণ সংস্কৃত উচ্চারণকেই বাংলা উচ্চারণ বলে উল্লেখ করেছে। শুধু তাই নয়। শব্দগত যেসব উপাদানের সঙ্গে সংস্কৃতের যোগ পাওয়া যায়নি সেগুলোকে বাংলা থেকে বাতিলও করে দিয়েছেন তিনি। নিজের ব্যবহারের জন্য বানানো ফারসি-বাংলা শব্দকোষে হ্যালহেড ১৫০টি ক্রিয়াপদ সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে মাত্র ৩২টি স্থান পেয়েছে তাঁর ব্যাকরণে। সন্দেহ নেই, সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় এই বিপুল-সংখ্যক ক্রিয়াপদ পরিত্যক্ত হয়েছে।

উইলিয়াম কেরি তাঁর ব্যাকরণে (১৮০১) হ্যালহেডের ঋণ স্বীকার করেছেন। হ্যালহেডের ব্যাকরণটি আগেই তাঁর হাতে পড়েছিল। জাহাজে আসার সময়ে বা তার আগেও বাংলা শেখার কাজে তিনি এই ব্যাকরণ ব্যবহার করেছিলেন (Qayyum 1982: 141-42)। তুলনামূলকভাবে ভালো বাংলা জানতেন বলে হ্যালহেডের ছাঁচের মধ্যে থেকে বা ছাঁচের বাইরে গিয়ে চলতি বাংলার কিছু বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ তিনি সংযোজন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১৮০৫-এ প্রকাশিত এই ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণে চলতি উপাদান প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়; আর সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ফেলে তিনি এই ব্যাকরণকে তাঁর ভাষায় 'a new work' হিসাবে রচনা করেন (নির্মল ২০০০: ১০০; Qayyum 1982: 161-64)। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম এই দ্বিতীয় সংস্করণে গভীরতর সংস্কৃতায়নের বহু উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন (Qayyum 1982: 165-66), এতে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ঢুকেছে, প্রথম সংস্করণের অনেক চালু শব্দ পরিত্যক্ত হয়েছে, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষার পরিমাণও অনেক বেড়েছে। প্রথম সংস্করণে কোথাও কোথাও সংস্কৃত- রীতি উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, বাংলায় এগুলো আংশিকভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে সংস্কৃতের কোনো উল্লেখ ছাড়াই বাংলার ক্ষেত্রে তা হুবহু চালানো হয়েছে। সংস্কৃতায়নের মাত্রা উপলব্ধি করা যাবে উচ্চারণ নির্দেশের পার্থক্য থেকেও। প্রথম সংস্করণে লেখা হয়েছে, বাংলা শব্দ 'nisvas' 'nishwas' হিসাবে উচ্চারিত হয় না, উচ্চারিত হয় 'nishshas'-রূপে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে বলা হয়েছে 'nishwas'-ই শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ। বাঙালিরা যে উচ্চারণ

করে তা ভুল। ক্রমবর্ধমান সংস্কৃতায়নের এই ধারা এ ব্যাকরণের পরের সংস্করণগুলোতেও অব্যাহত ছিল (নির্মল ২০০০: ১১৭-১২২)।

সাহেবদের অভিধানগুলোতেও বাংলা ভাষা সম্পর্কে একই দৃষ্টিভঙ্গির বিকট প্রকাশ ঘটেছে। হেনরি পিটস ফরস্টার তাঁর দুই-খণ্ড অভিধানের (ইংরেজি-বাংলা, ১৭৯৯; বাংলা-ইংরেজি, ১৮০২) ভূমিকায় শব্দ ও বানানরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> Being current over an extensive country and amongst an illiterate people, almost every word has been, and continues in one district or other, to be variously spelt, and not unfrequently is so disguised, as to render it difficult to recognize it, when met in its genuine form in the Songskrit. – In such cases, I have not scrupled to adopt the Songskrit orthography. (Froster 1799: ii)

ফরস্টার তাঁর শব্দসংগ্রহের মূলনীতি হিসাবেই আরবি-ফারসি বা হিন্দুস্থানি শব্দ যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। কিন্তু লৌকিক বা তদ্ভব শব্দ বর্জন করেননি (সরস্বতী ২০০০: ৪৭)। উইলিয়াম কেরির অভিধানেও দেশি, বিদেশি, তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দ আছে। কিন্তু তৎসম ও সংস্কৃত শব্দের অনাবশ্যক বাহুল্য থেকে বোঝা যায়, তিনি বাংলা ভাষার সংস্কৃতঘনিষ্ঠ 'শুদ্ধরূপ' প্রতিষ্ঠাতেই তৎপর ছিলেন। অভিধানের প্রথম খণ্ডের (১৮১৮) ভূমিকায় তিনি নিজের এই ধারণা খোলাখুলি বলেছেন: 'The Bengalee language, of which the following is a dictionary, is almost entirely derived from the Sungskrita: considerable more than three-forths of the words are pure Sungskrita.' (Carey 1825: iv) এই ধারণার ফল ফলেছে তাঁর সংকলিত শব্দের ধরনে। সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী তৈরি সাধিত শব্দ আর অচলিত শব্দের বাহুল্যে তাঁর অভিধানের একটা বড় অংশ হাস্যকর হয়ে উঠেছে। তাঁর অভিধানে পাওয়া যায় অব্যথা, অমৎস্য, অমদ ইত্যাদির মতো অ-বাংলা শব্দ; আর দ্রব্যায়োজননির্বর্ত্তক, নিগমাধ্যয়নাভিলাষী, পাদাস্থিমধ্যবর্ত্তান্তঃস্থ, উদরস্থষকৃষকৃদ্যুক্তক্ষুদ্রাপ্লাবক ইত্যাদির মতো উৎকট শব্দ (সরস্বতী ২০০০: ৫৬; Carey 1825: 734, 834)।[৬]

বাংলা ভাষা বাংলাভাষীদের দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়নি। এমন একটি ভাষা চর্চা করতে গিয়ে বিভাষীদের যে সমস্যায় পড়ার কথা, বাংলা চর্চাকারী সাহেবদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। বাংলা কথ্যরূপের বৈচিত্র্য সবসময়ে সাহেবদের বিস্মিত ও বিরক্ত করেছে। হ্যালহেড বাংলাভাষীদের বাংলাকে কার্যত বাতিল করে দিয়েছেন:

> Little indeed can be urged in favour of the bulk of the modern Bengaleese. Their forms of letters, their methods of spelling, and their choice of words are all equally erroneous and absurd. They can neither decline a word, nor construct a sentence: and their writings are filled with Persian, Arabic and Hindustanic terms, promiscuously thrown together without order or meaning: often unintelligible, and always embarrassing and obscure. They generally omit the diacritical terminations, or add them where not wanted, drop the personal signs of verbs, or substitute one person for another, lengthen vowels that should be short, and curtail those that are properly long. They seldom separate the several words of a sentence from each other, or conclude the period with a stop. (Halhed 1980: 178)

হ্যালহেড এখানে বাংলাভাষীদের যেসব ত্রুটির কথা বলেছেন তার সবকটিই – বাংলা ব্যাকরণের ভয়াবহ রক্ষণশীলতা আর সংস্কৃত-আনুগত্য সত্ত্বেও – বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য বলেই স্বীকৃত। সংস্কৃতের সঙ্গে মিলিয়েই তিনি এই ভুল নির্দেশ করেছেন; সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্যকেই বাংলার বৈশিষ্ট্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। অপরিচয়জনিত এ ভুল অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাঁর এই উচ্চারণের মধ্যে মারাত্মক ঔদ্ধত্য আছে। এই ঔদ্ধত্য ঔপনিবেশিক প্রভুর ঔদ্ধত্য। একটা ভাষায় যারা কথা বলে তারা নয়, ভাষাটির ভালোমন্দ জানে বিভাষী একজন – ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব ছাড়া এমন উচ্চারণ অসম্ভব। কিন্তু হ্যালহেডের দিক থেকে সমস্যাটাও মোক্ষম। ভাষাপ্রীতি বা নিছক জ্ঞানগত অভিপ্রায় থেকে তাঁর এই উদ্যোগ নয়। তাঁর কাছে এটি দরকারি কাজ। সেই দরকারটাও বিভাষীদের। ফলে বৈচিত্র্যজনিত জটিলতার বিপরীতে সারল্য প্রস্তাব করা তাঁর কাজের সাফল্যের জন্যই জরুরি।

উইলিয়াম কেরির লেখায়ও একই ধরনের ঔদ্ধত্য আর বিমূঢ় দশার পরিচয় পাওয়া যায়। ২ অক্টোবর ১৭৯৫ তারিখের এক পত্রে কেরি লিখেছেন: 'One of my great difficulties arises from the common people being so extremely ignorant of their own language, and the various dialects which prevail in different parts of the country.' (উদ্ধৃত, নির্মল ২০০০: ৮১) উপভাষার বৈচিত্র্য যেখানে একটি ভাষার সমৃদ্ধির পরিচয় হওয়ার কথা, সেখানে সাহেব কেরির কাছে তাঁর বাস্তব অসুবিধার কারণে তা ভাষার সংকট হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। অন্যত্র বাংলার উপভাষাগুলোকে সরলভাবে দুই ভাগে ভাগ করতে গিয়ে কেরি আরো বড় বিভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন। সাটক্লিফকে লেখা এক পত্রে কেরি জানিয়েছেন – 'Indeed, there are two distinct languages spoken all over the country, viz, the Bengali, spoken by the Brahmans and higher Hindus; and the Hindostani, spoken by the Mussulmans and lower Hindus, which is a mixer of Bengali and Persian.' (উদ্ধৃত, সবিতা ১৯৭২: ১৮৮) কেরি এই চিঠি লিখেছেন মালদহ থেকে। সেখানকার সাধারণ বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের হিন্দুস্থানিতে কথা বলার প্রশ্নই আসে না। তিনি যে লিখেছেন, তাঁর বাংলা ভদ্রলোকেরা বুঝতে পারে, তার কারণ, পণ্ডিতের কাছে শেখা বাংলাতেই তিনি কথা বলতেন। তখনো চলতি বাংলা শিখে উঠতে পারেননি। তাই প্রচলিত বাংলার জনপ্রিয় রূপকে হিন্দুস্থানি বলে বর্ণনা করার মতো বিভ্রান্তিতে পড়েছেন।

হ্যালহেড কিংবা কেরি বা আরো অনেক সাহেব আসলে সাহেবদের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটা বাংলা আবিষ্কার করছিলেন (দেবেশ ২০০৩: ৫৩)। সেই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা বাংলা ভাষাকে তত্ত্বত বদলে দিয়েছিলেন। যে সরল নিয়মে তাঁরা বাংলাকে জানতে চেয়েছেন, বাংলা স্বভাবতই তাতে সায় দেয়নি। সেজন্য তাঁরা বাংলা ভাষাটাকেই বদলে দিয়ে তাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে তৈরি ব্যাকরণে নতুন চেহারায় নিয়মবদ্ধ করতে চাইলেন। দেবেশ রায় প্রশ্ন তুলেছেন (দেবেশ ২০০৩: ৫৩), সাহেবরা একটা ভাষার নিয়ম বুঝতে পারেন, কিন্তু একটা চলমান ভাষার জীবনকে বুঝবেন কী করে? আসলে তারা জীবনকে বুঝতেও চায়নি। এই না-চাওয়ার – আগেই বলা হয়েছে – বাস্তব কারণ অসামর্থ্য। কিন্তু উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে আরো গভীর কারণের হদিশ পাওয়া যায়।

উপনিবেশিতের বর্তমানকে হীনরূপে চিহ্নিত করা এক কার্যকর ঔপনিবেশিক কৌশল। সেই 'হীন' অবস্থার সংশোধক-রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা খোদ ঔপনিবেশিক শাসনকেই বৈধতা দেয়। এডওয়ার্ড সাইদ লক্ষ করেছেন:

> One can say that so far as the west was concerned during the nineteenth and twentieth centuries, an assumption had been made that the orient and everything in it was, if not patently inferior to, then in need of corrective study by the west. (Said 1995: 40-41)

হ্যালহেড কিংবা কেরি যেভাবে বাংলাভাষীদের বাংলার নিন্দা করেছেন, পুরোনো বাংলার প্রশংসা করেছেন, আর ততোধিক পুরোনো সংস্কৃতের ছাঁচে বাংলাকে 'বিশুদ্ধ' করতে চেয়েছেন, তাতে এই মন্তব্য বাংলা ভাষাপ্রশ্নে আক্ষরিকভাবে প্রমাণিত হয়।

ব্যাকরণ-অভিধান প্রণয়ন বাংলা ভাষায় সাহেবদের সক্রিয়তার একদিক মাত্র; যদিও এটিই প্রধান দিক। কারণ, এর মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে বাংলা ভাষাবর্ণনার ছক, বিধিবদ্ধ হয়েছে শব্দরূপ, আর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ভাষা-সম্পর্কিত সেসব ধারণা, যা পরবর্তী সময়ে বারবার উচ্চারিত-পুনরুচ্চারিত হয়ে বাংলা ভাষাচর্চার নিয়ন্ত্রকসূত্র-আকারে থেকে গেছে। এদের সক্রিয়তার অন্যদিক সরাসরি গদ্য রচনা। আইনের অনুবাদের মধ্য দিয়ে এই চর্চার শুরু। সজনীকান্ত দাস ঠিকই বলেছেন, পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যের প্রধান ধারা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে যে চর্চা, ১৭৭৮ সাল থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত একুশ বছর সময়ে সেই ধারায় কেবল বিদেশিরাই – নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড, জোনাথন ডানকান, এন. বি. এডমনস্টোন, হেনরি পিটস ফরস্টার, এ. আপজন, জন মিলার এই ছয় জন – সক্রিয় ছিলেন (সজনীকান্ত ১৩৫৩: ৩১-৩২)। এঁরা সবাই সরাসরি প্রশাসনের উদ্যোগে প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যই কাজ করেছেন। পরের পর্বের নায়ক উইলিয়াম কেরি। নিজে লিখে আর বিপুল রচনার নজরদারি করে তিনি অনেকের কাছে বাংলা গদ্যের জনকের মর্যাদা পেয়েছেন (Kopf 1969: 51)। 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের কাহিনীই' সজনীকান্ত দাসের মতে 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়ার কথা' (সজনীকান্ত ১৩৫৩: ৮০)। এই বিভাগের প্রধান হিসাবে কেরির কাজ ঔপনিবেশিক প্রশাসনেরই অংশ। অন্যদিকে আবার তিনি মিশনারি বাংলা গদ্যেরও প্রধান লেখক। সরকারি ও মিশনারি – এই দুইধারার গদ্যচর্চা একসঙ্গে মিলেছিল কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটিতে (সুকুমার ১৯৯৮: ৩৬)। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ছাড়াও তাঁদের পরিচালিত বাংলা স্কুলগুলোর জন্য বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। ফেলিক্স কেরি বা জোশুয়া মার্শম্যানের মতো বিখ্যাত লেখকদের বই সোসাইটির অধীন বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়েছিল। বাংলা ভাষার প্রথম যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী একাধিক পত্রিকার প্রকাশকও এই মিশনারিরাই। এসব বিচিত্র চর্চার মধ্য দিয়ে, সজনীকান্ত দাসের মতে, ১৮১৮ সালের মধ্যেই বাংলা ভাষার প্রাণধর্ম আবিষ্কৃত হয় (সজনীকান্ত ১৩৫৩: ১০০)। সজনীকান্তের এই মন্তব্য ঠিক কি বেঠিক এ বিতর্কে না গিয়েও নিশ্চিত করে বলা যায়, উনিশ শতকের প্রথম ক-দশক প্রধানত সাহেবরাই বাংলা গদ্যের 'মূলধারা'র চর্চা করেছেন। সুশীলকুমার দে (De 1962: 247-48) এ সময়ের ইংরেজ লেখকদের যে তালিকা দিয়েছেন, তা বিস্ময়করভাবে বিশাল। তাঁর মতে, উনিশ শতকের প্রথম পর্বকে বলা যায় ইউরোপীয়দের সক্রিয়তার পর্ব।

সাহেবদের গদ্যচর্চা কোনো একরৈখিক ব্যাপার ছিল না। তাতেও ধ্যান-ধারণার পার্থক্য ছিল, রীতির ভিন্নতা ছিল। ভাষার নিয়ম বিধিবদ্ধকরণ আর গদ্যচর্চা – এ দুয়ের গতিও সম্ভবত সমান্তরাল ছিল না। তার এক কারণ, কেজো গদ্য লিখতে হত বলে, জটিল-দুর্বোধ্য গদ্যে সাহেবরা সবসময়ে সায় দিতে পারেনি। সুশীলকুমার দে (De 1962: 200) মনে করেন, বাংলা সরল গদ্য আর পণ্ডিতি রীতির লড়াই শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শুরুতেই। ইউরোপীয়রা আর তাদের অনুকারীরা পছন্দ করত সরল রীতি, পণ্ডিত ও রক্ষণশীল অংশ প্রচার করত পণ্ডিতি রীতি। কিন্তু রীতির

টানাপোড়েন যেমনই হোক, উপনিবেশিত বাংলা ভাষার প্রধান লক্ষণগুলো – সংস্কৃতায়ন, দুর্বোধ্যতা, ইংরেজি বাক্যগড়ন ও বাগবিধির বাড়াবাড়ি, মুখের ভাষা থেকে গদ্যের আরোপিত দূরত্ব ইত্যাদি – যে প্রধানত সাহেবদের বাংলাচর্চা থেকেই বাংলা ভাষায় সঞ্চারিত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩.৩.২ সংস্কৃত ও সংস্কৃত-পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠা

উপনিবেশ আমলের আগেও ইউরোপীয়রা বাংলা ভাষার চর্চা করেছে। এর মধ্যে পর্তুগিজ মিশনারিদের চর্চার ফল অভিধান-ব্যাকরণ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ফাদার হস্টেন প্রমুখ পণ্ডিত ও গবেষকের মতে মানোএল দা আস্সুম্পসাঁওয়ের শব্দকোষই বাংলা ভাষার সর্বপ্রাচীন অভিধান (সরস্বতী ২০০০: ২৪)। ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে ভাওয়ালে বসে তিনি এ অভিধান সংকলন করেন। এর সঙ্গে একটি ছোট ব্যাকরণও যুক্ত ছিল। এতে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে মানোএলের যে মত প্রকাশ পেয়েছে, তাতে খুব একটা শ্রদ্ধার ভাব নেই। তিনি লিখেছেন:

> এই বঙ্গভাষা বিশুদ্ধ নয়, পরন্তু হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃতের মিশ্রণ, ইহা নিয়মিত নয়, সর্ব্বতোভাবে লাতীনের অনুগত নয়। এবং এই কারণে ইহার নিজস্ব অনেক ক্রিয়ার অভাব আছে। ... এই ভাষার বর্ণমালা, বাঙ্গালা ভাষায় শব্দাবলী উচ্চারণ করিবার যত বিভিন্ন উপায় আছে, ততগুলি বর্ণদ্বারা গঠিত। (মানোএল ১৯৩১: ৩৮-৩৯)

বাংলা বর্ণমালার নানা অসঙ্গতির জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের দায়ী করেছেন।[৭] লাতিনের সঙ্গে বাংলার মিল না পেয়ে মানোএল বাংলাকেই দুষেছেন। লাতিনের ছক ব্যবহার করায় তাঁর ব্যাকরণে কিছু বাড়তি অসঙ্গতিও যোগ হয়েছে। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতা আর অপূর্ণতা সত্ত্বেও এই ব্যাকরণ বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সূত্রবদ্ধ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছিল (Qayyum 1982: 94-97; নির্মল ২০০০: ৩৪)। অভিধান-অংশের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। এই মুদ্রিত গ্রন্থের বাইরে ওই সময়ে সংকলিত আরো দুটি পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। মুদ্রিত বই ও পাণ্ডুলিপি দুটির শব্দস্বভাব পরীক্ষা করলে দেখা যায় (সরস্বতী ২০০০: ২৪-৩৩), এগুলোতে পর্তুগীজ, বাংলা, হিন্দুস্থানি এবং এমনকি সাধু বাংলা প্রতিশব্দ সংকলিত হয়েছে। পর্তুগালের এভোরো পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে বাংলা প্রতিশব্দের পাশে আবার সাধু-বাংলা প্রতিশব্দ যোগ করা থেকে বোঝা যায়, সংকলক বাংলা ভাষার দুই শব্দস্বভাব সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক পাণ্ডুলিপিতেই প্রয়োজনীয়, নিত্য-ব্যবহৃত ও লোকমুখে প্রচলিত শব্দসংগ্রহের ঝোঁক সহজেই চোখে পড়ে। নিজের অভিধান প্রসঙ্গে মানোএলের ভূমিকা-মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'ইহাতে তুমি আর কিছু না হউক, অন্ততঃ দেশীয়দের ব্যবহৃত শব্দগুলির অধিকাংশ পাইবে।' (মানোএল ১৯৩১: v)

বাংলা ভাষার এই আমলের চর্চার সঙ্গে উপনিবেশক পক্ষের চর্চার বিশাল ফারাক। পর্তুগিজ মিশনারিরা দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে বসবাস করে কথ্য-বাংলা শিখেছেন। তাঁদের বাংলা ব্যবহারের ও চর্চার সঙ্গে কর্তৃত্বের যোগ ছিল না। অন্যদিকে হ্যালহেডদের বাংলাচর্চা সরাসরি কর্তৃত্বের সঙ্গে যুক্ত। এই কর্তৃত্ব প্রশাসনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক। সমসাময়িক ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানকাণ্ডে, আগেই বলা হয়েছে, ধ্রুপদী ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে চালু ভাষা পাঠের সমর্থন ছিল। আর ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃতের উপর দখল এখানকার চালু ভাষা বাংলাকে সাফসুতরা করে নিয়ে 'শুদ্ধ' করার

জ্ঞানগত ভিত্তি জুগিয়েছে। বলা যায়, আগের জমানার ইউরোপীয়দের বাংলাচর্চার সঙ্গে উপনিবেশায়ন পর্বের বাংলাচর্চার মূল ফারাকটা তৈরি হয়েছে সংস্কৃত আবিষ্কার আর বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের যোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। হ্যালহেড বা কেরির বাংলা ভাষার প্রশংসাসূচক মন্তব্যগুলোই এর প্রমাণ। হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেছেন, আগের ইউরোপীয় চর্চাকারীরা বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সম্ভবত তিনি এখানে মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁওয়ের ইঙ্গিত করেছেন।[৮] আগের চর্চাকারীদের 'ভুল' এই যে, 'none of them traced its connexion with Shanscrit.' কোন সংস্কৃত? – 'The grand source of Indian literature, the parent of almost every dialect from the Persian gulph to the China seas, is the Shanscrit, a language of the most venerable and unfathomable antiquity.' (Halhed 1980: iii)। তিনি নিজে সেই ভুল করেননি। ভূমিকায় পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, 'The following work presents the Bengal language merely as derived from its parent the Shanscrit.' বাংলা ভাষা নিয়ে কেরির উচ্ছ্বাস হ্যালহেডের সঙ্গে প্রায় হুবহু তুলনীয়। ব্যাকরণের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন (সবিতা ১৯৭২: ২২৫-২৬), বাংলা ভারতীয় কথ্যভাষাগুলোর মধ্যে সংস্কৃতের সবচেয়ে কাছের। এর প্রায় চার-পঞ্চমাংশ শব্দ বিশুদ্ধ সংস্কৃত। যৌগিক শব্দ গঠনের অসাধারণ ক্ষমতা থাকায় বাংলায় যে কোনো ভাব খুব সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করা যায়। তাঁর সিদ্ধান্ত: 'Were it properly cultivated, would be deserving a place among those which are accounted the most elegant and expressive.' বলা বাহুল্য, 'তাঁদের' দেখানো পথেই কেবল এই 'ঠিকঠাক' চর্চা সম্ভব।

হ্যালহেড-কেরির মত-মন্তব্যে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে – এমনকি সংস্কৃত সম্বন্ধেও – যেসব ধারণা আছে, তার অনেকগুলোই উত্তরকালে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার অভিভাবক হিসাবে সংস্কৃতের এক 'অনন্ত' প্রতিষ্ঠা ঘটে। মনে রাখা দরকার, এই 'সংস্কৃত' হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের ভাষামাত্র নয়। এ শাসকশ্রেণির 'বিজ্ঞানসম্মত' জ্ঞানকাণ্ডে আবিষ্কৃত নতুন মহিমায় স্নাত সংস্কৃত। আঠার শতকের শেষ দুই দশকে শুরু হয়ে উনিশ শতক পার হয়ে বিশ শতক পর্যন্ত কলকাতার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সংস্কৃতের যে প্রতাপ, 'ধর্মীয় ভাষা' অভিধায় তাকে খুব সামান্যই ব্যাখ্যা করা যাবে। ধর্ম ও ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে এই প্রতাপের অব্যবহিত যোগ আছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তি তৈরি হয়েছে ঔপনিবেশিক জ্ঞানতন্ত্রের বরাতে। বলা বাহুল্য, প্রাচ্যতাত্ত্বিক চর্চাই সেই জ্ঞানের মূল।

ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণির প্রাচ্যতাত্ত্বিক চর্চা ও মনোভাবে ভাটা দেখা দেয় উনিশ শতকের তিনের দশকেই; কিন্তু কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে 'সোনালি অতীতের আদর্শ হিন্দু ঐতিহ্য' আকারে তা উৎপাদিত-পুনরুৎপাদিত হতে থাকে (Kopf 1969: 222, 272; Ghosh 1998: 169)। প্রাচ্যবিদ্যার ফসল ভারতীয়রা যে সবই নিয়েছে এমন নয়। অনেক কিছুই নেয়নি। যা নিয়েছে তাও সাজাবার চেষ্টা করেছে নিজেদের মাপমতো ছকে (পার্থ ২০০১: ১৩৩)। কিন্তু সেই ছকে প্রাচ্যবাদীদের কিছু আকর-উপাদান আর কিছু কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গভীরভাবে কাজ করে গেছে।[৯] এমনি এক উপাদান ভাষাবংশের ধারণা, যার সঙ্গে মানব-বংশের ঘনিষ্ঠ যোগ। সংস্কৃতের সঙ্গে লাতিন আর গ্রিকের ব্যাপক সাদৃশ্যের কথা প্রথম কলকাতাতেই ঘোষিত হয়েছিল। সেই মিলের উপর নির্ভর করেই তৈরি হয় বৃহৎ ভাষা-পরিবার। আদি ভারতীয়রা বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে নৃতাত্ত্বিকভাবে সম্পর্কিত – এই 'জ্ঞান' কেবল শাসক-শাসিতের আত্মিক বন্ধনই গভীর করেনি, শাসিতের অহংবোধের একটা দারুণ জায়গাও তৈরি করেছিল (দেবপ্রসাদ ২০০৬: ১৩০-৩১)।

পুরো প্রক্রিয়াটির কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছে সংস্কৃত ভাষা – যা তাৎপর্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা পর্যন্ত নিয়ত প্রসারিত হয়েছে:

> Indeed, what Jones actually accomplished, and which would have important repercussions in later generations, was that by linking Sanskrit, the language of the ancient Hindus, to the European language family he related Hindu civilization to that of Europe and reanimated the resplendent Hindu past. (Kopf 1969: 38)

হ্যালহেড বা উইলিয়াম কেরিদের কাছে যা ছিল প্রয়োজনের বা বড়জোর জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাপার, কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের কাছে তা হয়ে দাঁড়ায় অস্তিত্ব বা সত্তার পুনর্গঠনের সুযোগ। ফলে সাহেবদের যুক্তি ব্যবহার করে, সঙ্গে আলাদা যুক্তি ও আবেগের চাপে উনিশ শতকের গদ্যলেখক ও ব্যাকরণ-অভিধান-প্রণেতারা বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উপাদান বেশিমাত্রায় আমদানি করেছিলেন এবং জনপ্রিয় লৌকিকরীতির পরিবর্তে ধ্রুপদীরীতির প্রবর্তন চেয়েছিলেন। 'অতীত ভারত এবং সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ স্থাপন এবং সংস্কৃত উপাদানের সাহায্যে প্রাকৃতজনের অনার্য-প্রভাবিত ভাষাকে মার্জিত করার প্রয়াস' তাঁদের কাছে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ১৮৮)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বে ওয়াকিবহাল বাঙালির কাছে সংস্কৃত কেবল ধর্মীয় অনুষঙ্গ ছিল না, বরং প্রভাবশালী 'জ্ঞানতাত্ত্বিক বর্গ' হিসাবেই আদৃত হয়েছিল। কিন্তু বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের আবশ্যিক সংযুক্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে – উনিশ শতকের প্রথমার্ধে – এই শ্রেণির বিকাশ ঘটেনি। স্বভাবতই সংস্কৃত চর্চাকারী গোষ্ঠী হিসাবে সেযুগে বাংলা ভাষাচর্চায় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা পায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা।

উপনিবেশিত বাংলায় রক্ষণশীলতা ও বর্ণবিভাজিত সমাজকাঠামো প্রশ্রয় পেয়েছিল (২.৬.৩ দ্রষ্টব্য)। ব্রিটিশরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উপর নির্ভর করত রাজস্ব-সংক্রান্ত তথ্য, আইন-সংক্রান্ত ও প্রাচ্যবাদী জ্ঞানের উৎস হিসাবে। ছাপাখানার বিকাশ ও অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের প্রভাব এবং বর্ণপ্রথার ধারণা ব্যাপক ও গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি ব্রাহ্মণ ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যায় ধ্রুপদী হিন্দু গ্রন্থভিত্তিক 'ইঙ্গ-হিন্দু' আইন চালু হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রাত্যহিক জীবনেও এই প্রভাব বহুগুণে বেড়ে যায় (Sarkar 1997: 370)। অন্তত ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ আদালতগুলোতে চাকুরিজীবী হিসাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংযুক্ত ছিলেন (Srinivas 1972: 6)। উল্লেখ্য, ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাজ ত্যাগ করে জজ-পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেছিলেন (সুকুমার ১৯৯৮: ৩০)। সরাসরি চাকরির বাইরেও বিচারকাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নানারকম সম্পৃক্ততা ছিল। ইংরেজি-শিক্ষিত উকিলেরা হিন্দু-আইন অনুযায়ী বিচারকাজ করতে গিয়ে স্বভাবই এদের উপর নির্ভর করতেন (Srinivas 1972: 6)। এমনিতেই স্থানীয় সমাজকাঠামোকে অক্ষুণ্ন রাখতে চাইত বলে ইংরেজরা স্থানীয় সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতাপশালী শ্রেণি হিসাবে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য মেনে নিয়েছিল, এবং সুবিধামতো সেই আধিপত্যকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহারও করেছিল। তদুপরি প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা থেকে শুরু করে আইন ও বিচারবিভাগীয় নতুন বিন্যাসের মধ্যে সংস্কৃত-পণ্ডিত হিসাবে ব্রাহ্মণেরা নতুন শাসনের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। কায়স্থ, বণিক প্রভৃতি বর্ণ ও পেশার লোক যেমন ইংরেজদের সরকার-বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি হিসাবে নতুন পেশায় ঢুকে পড়েছিল ও নতুন শ্রেণিবৈশিষ্ট্য রপ্ত করেছিল, ব্রাহ্মণেরাও তেমনি ভারতীয় সমাজের স্বীকৃত বুদ্ধিজীবী হিসাবে সরকারি সংগঠনে

উপদেষ্টা থেকে শুরু করে জেলা-আদালতের পণ্ডিত পর্যন্ত নানা চাকরিতে ঢুকে পড়ে। ফলে, 'ইংরেজরা ক্ষমতাদখলের পর বাংলায় অনেকদিন হিন্দুপ্রাধান্যের ও সেই সূত্রে সংস্কৃত-পণ্ডিতদের প্রাধান্যের একটি পরিবেশ ছিল'। (দেবেশ ১৯৯০: ৭২)[১০]

এই নতুন ধরনের প্রতিপত্তি কলকাতার নতুন সমাজে ব্রাহ্মণদের পুরোনো প্রতিপত্তি কেবল অক্ষুণ্নই রাখেনি, বাড়িয়েও দিয়েছে। উনিশ শতকে বাঙালির কলকাতা ছিল প্রধানত হিন্দুর, যেখানে আবার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মতো উচ্চবর্ণের হিন্দুর সংখ্যা ছিল বাংলার অন্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি (Sarkar 1997: 167-68)। কলকাতার প্রাচীন অধিবাসী আর প্রতিপত্তিশালী পরিবারগুলোর বড় অংশই ছিল কায়স্থ (নিশীথরঞ্জন ও অশোক ১৩৯০: ২১০)। এই নতুন টাকাওয়ালা শ্রেণির মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য সংস্কৃতের চাহিদা তৈরি হয়: 'For the new generation, … a knowledge of Sanskrit was particularly important in carrying out the socio-religious activities … at maintaining their newly won status.' (Kopf 1969: 62) স্বভাবতই তারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আধিপত্য মানতে বাধ্য ছিল।[১১] কলকাতার পুরোনো-ইতিহাস রচয়িতাদের প্রায় সকলেই (যেমন, বিনয় ২০০৪, ১৯৬২, দেবেশ ১৯৯০, শিবনাথ ১৯৫৭, ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৩৯, ১৩৪০, রাজনারায়ণ ১৯৬১, ১৪০২, Sarkar 1997) নতুন পরিবেশে ব্রাহ্মণ-আধিপত্যের আর ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার খবর দিয়েছেন। *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় নিয়মিত সংস্কৃত-পণ্ডিতদের সংবাদ ছাপা হত (ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৩৯: ৩২-৪০)। তাঁদের সামাজিক গুরুত্ব ও প্রভাবের এ এক বড় প্রমাণ। সেই প্রভাব শাসকপক্ষ রীতিনীতি প্রণয়নে আর দেশীয় অভিজাতরা ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে কার্যত মেনে নিয়েছিল।[১২]

৩.৩.৩ মুসলমান সমাজের অনুপস্থিতি ও 'অপরতা'

বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ায় সাধারণভাবে মুসলমান সমাজ, আর বিশেষভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজ এক বিশেষ পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। এই ভূমিকার একদিক তাদের 'অনুপস্থিতি'। কলকাতার সেই কর্মযজ্ঞে আসলে আরো অনেকেই অনুপস্থিত ছিল। বাংলা ভাষার এই নতুন গড়ন ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের মতোই জনবিচ্ছিন্ন – বিপুল বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কোনো অংশভাগ তাতে ছিল না। কিন্তু মুসলমান সমাজের অনুপস্থিতির মধ্যে আগের ইতিহাসের 'প্রচণ্ড উপস্থিতি'র প্রতিক্রিয়া কাজ করে গেছে। যেহেতু উপনিবেশ আমলে বাংলা ভাষার নতুন গড়াপেটায় কেবল সংস্কৃতায়নই হয়নি, – সজনীকান্ত দাসের ভাষায় – 'আরবী-পারসী-নিসূদন-যজ্ঞ'ও হয়েছে (সজনীকান্ত ১৩৫৩: ২৭), আর আরবি-ফারসিকে সবসময়েই ভাবা হয়েছে 'মুসলমানি' উপাদান, তাই এই প্রক্রিয়ার আলোচনায় মুসলমান সমাজকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তাদের অনুপস্থিতিজনিত নিষ্ক্রিয়তার ফলেই হয়ত প্রক্রিয়ার দুই সক্রিয় পক্ষের – সাহেব আর সংস্কৃতপন্থী হিন্দু সম্প্রদায়ের – জন্য মুসলমান সমাজকে 'অপর' বলে সাব্যস্ত করা সহজ ও সম্ভব হয়েছে।

উপনিবেশ আমলের আগেও সম্ভবত 'বাঙালি মুসলমান' সমাজের আর্থিক-সামাজিক কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার একটা ভারসাম্য ছিল (De 1974: 3-4)। তখন মুসলমানেরা ছিল রাষ্ট্রের সামরিক ও প্রশাসনিক দিকের নিয়ন্তা। আমিল ও ফৌজদারের পদগুলো তাদের দখলে থাকায় প্রশাসন ও ফৌজদারি কার্যক্রমের প্রায় সবটাই ছিল মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে। অপরদিকে ভূমিব্যবস্থাপনা এবং

ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দুরা ছিল প্রতিপত্তিশালী। কানুনগো বিভাগের কর্মচারীরা ছিল মূলত হিন্দু, যেমন বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাংকাররাও হিন্দু ছিল। মুর্শিদকুলির 'সময় থেকে বাংলার রাজস্ব বিভাগে বাঙ্গালী হিন্দুদের চাকরি একচেটিয়া হয়ে দাঁড়ায়' (সুবোধ ১৯৮৫: ৮)। এই ভারসাম্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম কদশকের মধ্যেই (De 1974: 3-4)। আমিল ও ফৌজদারেরা চাকরি হারায়। সামরিক বাহিনীতে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমানেরা অন্তত প্রথম দিকে বাদ পড়ে। আইনি ব্যাপারে তাদের পূর্বতন প্রাধান্য নস্যাৎ হওয়ায় মুসলমান উকিলশ্রেণি ধ্বংস হয়। কর্নওয়ালিশের আমলে রেফারি ও সালিশকারী মুসলমানের সংখ্যা এক চতুর্থাংশে নেমে আসে। এভাবে খুব কম সময়ের মধ্যে মুসলমানদের পূর্বতন প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যায়।

শাসক ইংরেজ আর রাজ্যহারা মুসলমানদের পারস্পরিক বিদ্বেষ-বিরোধই মুসলমান সমাজের পতনের কারণ – বহুপ্রচলিত এই মতের যুক্তিসংগত বিরোধিতা করেছেন আনিসুজ্জামান (২০০১) ও আহমদ শরীফ (১৯৯২)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদারশ্রেণি ধ্বংস হয়েছে – এই মত ভিত্তিহীন; কারণ, আগেও মুসলমান জমিদারির সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। তাছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নতুন ব্যবস্থায় পুরোনো সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমিদারিগুলোও ধ্বংস হয়েছিল। তবে নগদ টাকা হাতে থাকায় হিন্দুরা নিজেদের পুনর্গঠনের যে সুযোগ পান, মুসলমানরা তা পাননি (আনিসুজ্জামান ২০০১: ১৯)। নতুন শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ইংরেজ-বিদ্বেষের কারণে মুসলমান সমাজ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেনি এমন নয়। বরং বিপরীত উদাহরণই বেশি পাওয়া যায় (আনিসুজ্জামান ২০০১: ৪৩; আহমদ শরীফ ১৯৯২: ১৭৩-৭৪)। আহমদ শরীফ (১৯৯২: ১৬৬-১৭৯) বিস্তারিত তথ্য-উপাত্তযোগে দেখিয়েছেন, উপনিবেশ আমলে বাঙালি মুসলমানের পশ্চাৎপদতার কারণ 'ব্রিটিশ-হিন্দুর' ষড়যন্ত্র নয়; বরং অবস্থা ও অবস্থানগত কারণেই মুসলমান সমাজ নতুন কালের নতুন ব্যবস্থায় দাখিল হতে পারেনি।[১৩]

কারণ যাই হোক, এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়, উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার মূল রঙ্গমঞ্চে মুসলমান সমাজ 'অনুপস্থিত' ছিল। কলকাতার প্রাচীন সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের গোটা তিনেক তালিকা তৈরি হয়েছিল ১৮১৪ থেকে ১৮৩৯ সালের মধ্যে (নিশীথরঞ্জন ও অশোক ১৩৯০: ২২১)। এর মধ্যে একটিমাত্র মুসলমান পরিবারের নাম পাওয়া যায়। এ পরিবারটিও বাঙালি কি না নিশ্চিত করে বলা কঠিন। উনিশ শতকের শেষ তিন-চার দশকের আগে কলকাতায় যে দু-চারজন সক্রিয় মুসলমানের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের প্রায় সবাই অবাঙালি। ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মাদ্রাসায় 'শিক্ষার সুযোগ নিয়েছে অবাঙালী মুসলমানরাই। শিক্ষকদের মধ্যেও কেউ বাঙালি ছিলেন না' (আহমদ শরীফ ১৯৯২: ১৭৪)। অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত মুসলমানের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বাংলার বাইরে থেকে এসে কলকাতায় বসতি গড়েছিল, যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, উর্দু। ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৩৬.৩ শতাংশ কলকাতাবাসী কোনো না কোনো হিন্দুস্থানিতে কথা বলত (Sarkar 1997: 166)। এই দুই বাস্তবতা – সক্রিয়তার পরিসরে মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য হওয়া আর নগণ্য-সংখ্যকের মধ্যেও বাঙালির অনুপস্থিতি – বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত প্রভাবশালী ধ্যানধারণাগুলো গড়ে ওঠার ওই নির্ণায়ক সময়ে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উনিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদে মুসলমান-বিরোধিতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুরাধা রায় (২০০১: ১০৫-০৬) লিখেছেন, 'ভদ্রলোকরা সহপাঠী বা সহকর্মী হিসেবে মুসলমানদের পেতেন না বড়ো-একটা। ... মুসলমানদের থেকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের বিদেশি বলে চিহ্নিত করতে ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীদের তেমন অস্বস্তি' হয়নি। 'অপরায়ণে'র ক্ষেত্রে এই 'বিদেশি' তকমা ভাষাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনায়ও প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।

ইংরেজদের সরকারি নীতিতে সাধারণভাবে মুসলমান-বিরোধিতার পরিচয় পাওয়া যায় না (আনিসুজ্জামান ২০০১: ১৯)। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে শুধু ইংরেজ নয়, সামগ্রিকভাবে ইসলাম ছিল খ্রিস্টানি দুনিয়ার পুরোনো শত্রু (Sarkar 1997: 17)। এডওয়ার্ড সাইদ এই শত্রুতাকে পশ্চিমা সভ্যতার অন্যতম প্রধান গড়ন-উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন:

> The European encounter with the orient, and specifically with Islam, strengthened this system of representing the orient and, as has been suggested by Henri Pirenne, turned Islam into the very epitome of an outsider against which the whole of European civilization from the middle ages on was founded. (Said 1995: 70)

ভারতে ইংরেজরা ক্ষমতা নিয়েছিল মোগলদের কাছ থেকে। শাসনের সাধারণ সূত্র অনুযায়ী পুরোনো শাসকদের নিন্দা যেমন তাদের করতে হয়েছে, ঠিক তেমনি স্থানীয়দের একটা অংশকে খুশি করার চেষ্টাও চালাতে হয়েছে। পুরোনো শাসকেরা মুসলমান, আর স্থানীয়দের গরিষ্ঠাংশ হিন্দু – এই সমীকরণ তাদের জন্য সুবিধাজনক ছিল। প্রথম থেকেই ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসের একটা মূল প্রচারণা ছিল, ব্রিটিশরা ত্রাণকর্তা হিসাবে মুসলমানদের দুঃশাসন থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঁচিয়েছে (Sarkar 1997: 19; 2000: 77)। এই প্রপাগান্ডা এত জোরালো ছিল যে, 'Most of the young men under Colebrooke and Carey seemed to identify India with Hinduism and regarded the Muslims as intruders.' (Kopf 1969: 103) ডেভিড কফ (1969: 162-66) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভিতরে ইসলামি ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে ফারসি-হিন্দুস্থানি এবং হিন্দু ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে সংস্কৃত বিভাগের মধ্যে টানাপোড়েনের চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন। এসব আভ্যন্তর নজিরের বাইরে প্রকাশ্য ঘটনাপ্রবাহেও ইংরেজ-হিন্দু সখ্য আর ইংরেজ-মুসলমান বিরোধের আলামত পাওয়া যায়। যেখানে 'প্রাচ্যবাদী'চর্চা হিন্দু ভারতের গৌরবদীপ্ত অতীতকে গ্রেকো-রোমান ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিল ভাষার সূত্রে, সেখানে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়ে ওহাবি আন্দোলনের ঘটনাপরম্পরা আর ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ প্রমাণ করছিল যে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা অনেক বেশি বিপজ্জনক (Sarkar 1997: 17)। এই কারণেই হয়ত ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রচলিত আইন রদ করার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেছিলেন, ইউরোপীয় আইন প্রবর্তন করলে,

> হিন্দুরা হয়ত মেনে নেবে, কেননা এরা অত্যধিক নমনীয় ও ভীরু, কিন্তু মুসলমানরা কিছুতেই তা মানবে না। এরা ভীষণ উচ্চাভিলাষী, কূটকৌশলী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। ... এটা নিঃসন্দেহ যে, আইনে হস্তক্ষেপ করে এদের ক্ষেপালে এরা নিশ্চিত সুযোগ পেলেই স্বাধীন হবার চেষ্টা করবে। (উদ্ধৃত, সিরাজুল ২০০২: ১৮৬)[১৪]

ভারতীয় মুসলমানদের ব্যাপারে শাসকপক্ষের এই সন্দেহ-অবিশ্বাস পরেও বহুদিন অব্যাহত ছিল। সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে তা আরো বেড়ে যায়।[১৫] ছাপাখানার মুসলমান মালিকদের সম্পর্কে জেম্‌স্‌ লঙ্‌ (লঙ্‌ ১৯৮৮: আট) লিখেছিলেন: 'I would be unwilling to take returns and descriptions from Mohamedans on mere trust. – I found too a reluctance to afford me any information.'

মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে ব্রিটিশ ইতিহাসতত্ত্বের বয়ান কলকাতার নব্যহিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছিল। আঠার শতকের শেষাংশ ও উনিশ শতকে বাংলার উচ্চবর্ণ হিন্দুদের তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষমতায়ন হয় – এই বাস্তবতাই হয়ত স্বীকৃতির মূল কারণ। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, 'Muslim tyranny myth'-এর ব্যাপারে

বাংলার শিক্ষিত হিন্দু মহলে যে মতৈক্য দেখা গেছে তা রীতিমত নজিরবিহীন। রামমোহন রায় মুসলমান ঐতিহ্যে খুব গভীরভাবে শিক্ষিত ছিলেন; ইসলাম-প্রীতির জন্য তাঁকে হিন্দুসমাজে নিন্দিত হতে হয়েছিল (অসিত ১৯৬৫: ১০৫-০৬)। কিন্তু 'মুসলিম স্বৈরশাসন' সম্পর্কে তাঁর মনেও কোনো দ্বিধা ছিল না। এ ব্যাপারে অনাচারী ইয়ংবেঙ্গল, যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার বা হিন্দু জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের মতের কোনো অমিল দেখা যায় না (Sarkar 2000: 19-20)। ইউরোপীয়রা নিজেদের ইতিহাসের যে কালবিভাজন ভারতের ইতিহাসে আরোপ করেছিল, তার অনুকরণে ইতিহাসের মূল কালক্রমটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এরকম যে – অতীতকাল হিন্দু গৌরবের যুগ, মধ্যযুগ মুসলমান দুঃশাসন ও তার পতনের কাল, আর আধুনিক যুগ নবজাগরণের।[১৬] ইতিহাস-ব্যাখ্যার এই ধারা কেবল ব্রিটিশ-হিন্দু ঐক্য নিশ্চিত করে না, দুই পক্ষের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধও অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। বস্তুত, নবজাগরণ বা জাতীয়তাবাদের মতো উনিশ শতকের প্রধান ভাবাদর্শিক কাঠামোগুলোর আবশ্যিক উপাদান ছিল মুসলমান 'অপর':

> A break had taken place with pre-19th century Indo-islamic culture through the displacement of Persian by English, and more generally, by the myth of 'renaissance' itself, for awakening has to presuppose a dark age, Anglo-Indian historiography played a crucial part, through Tod, Elliot and Dowson, for example. Above all, perhaps the Muslim tyranny syndrome provided a convenient justification for the intelligentsia's fairly abject acceptance of foreign rule. And when patriotic sentiments did start developing as from the 1860s, the Muslims could still serve as useful whipping-boys. (Sarkar 2000: 77-78)

বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ায় এই মতাদর্শের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (1982: 108) হ্যালহেডের চিঠিপত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্য দলিল থেকে জানিয়েছেন, তিনি দুটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখেছিলেন। এক. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করা; দুই. বিদ্বান পণ্ডিত হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। বাংলা যেহেতু তিনি তখন সামান্যই জানতেন, আর পরেও কখনো বাংলাচর্চা করেননি, সেহেতু ভাষাপ্রেমের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। চর্চার বিষয় হিসাবে কেরির বাংলা বেছে নেওয়ার কারণ সম্পর্কে ডেভিড কফ পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন: 'Carey chose Bengali not for its inherent beauty but for its potential usefulness as the most effective medium for reaching the masses of Bengal.' (Kopf 1969: 92) দীর্ঘদিন যাঁরা বাংলাচর্চায় রত ছিলেন – যেমন উইলিয়াম কেরি – এই ভাষার প্রতি তাঁদের বিশেষ অনুরাগও হয়ত ছিল। কিন্তু হ্যালহেড-ফরস্টার-কেরির – বাংলা ভাষা-সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রভাবশালী আর দীর্ঘমেয়াদি তত্ত্বের তিন জনকের – চর্চা প্রয়োজনীয় আর কেজো চর্চা হিসাবেই বিবেচ্য। কেউ চাইলে একে 'বিশুদ্ধ' ভাষাতত্ত্বচর্চা হিসাবেও দেখতে পারেন। তাহলে প্রশ্ন জাগে, এঁরা তিনজন, এবং সমসাময়িক আরো অনেক ইংরেজ যে একই স্বরে-সুরে সংস্কৃত ও সংস্কৃতায়িত বাংলার প্রশংসার পাশাপাশি ফারসি-হিন্দুস্থানির তীব্র নিন্দা করলেন,[১৭] তার ভিত্তি কী?

বাংলা ভাষার নানা মত-পথের বহু ভাষ্যকার একে রাজনৈতিকভাবেই পাঠ করেছেন। গোলাম মুরশিদ (১৩৯৯: ২০৩) লিখেছেন, 'বাংলা ভাষার প্রতি ইংরেজ শাসকদের বিশেষ কোনো প্রেম ছিল না। স্থানীয় ভাষা হিসেবে এর উপযোগিতা এবং সম্ভব হলে একে ফারসির বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানোই ছিল কম্পানির লক্ষ্য'। হ্যালহেড প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'সদ্য ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানদের ভাষা হিশেবে আরবি-ফারসিকে তিনি হয়তো যদ্দুর সম্ভব এড়াতে

চেষ্টা করে থাকবেন' (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ১৮৬)। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, 'সাহেবরা সুবিধা পাইলেই আরবী পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন; ফলে দশ পনের বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল' (সজনীকান্ত ১৩৫৩: ২৮)। কেরির অভিধান প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'বাংলা ভাষাকে উর্দ্দু-কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যেভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারিলে আজিকার দিনে হিন্দুস্থানী-বিরোধী সম্প্রদায় আনন্দিত হইবেন' (সজনীকান্ত ১৩৫৩: ১২৮)। বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস-লেখক নির্মল দাশ ফরস্টারের অভিধানের ভূমিকায় লক্ষ করেছেন 'পারসী ভাষার প্রতি অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ রাজপুরুষদের বিরূপতা' (নির্মল ২০০০: ৪৩)। হ্যালহেডকেও তিনি এই 'বিরূপ'দের তালিকায় রেখেছেন। সবিতা চট্টোপাধ্যায় ভাষাচর্চার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক আরো খুলে দেখিয়েছেন: 'সদ্য পরাভূত ইসলাম শক্তিকে দুর্বল করিতে হইলে তাহাদের প্রবর্তিত রাজভাষার পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, অথচ তড়িৎগতিতে সম্পূর্ণ বৈদেশিক ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন সম্ভব ছিল না। এই জন্য বাঙ্গালার প্রতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের দৃষ্টি পড়িয়াছিল' (সবিতা ১৯৭২: ১৪৬-৪৭)। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৭২: ৩৪) ভাষাবিরোধের সঙ্গে সম্প্রদায়-বিরোধকেও মিলিয়েছেন: 'সাহেবরা সুবিধা পেলেই ফারসি-আরবি শব্দকে বাদ দিয়ে বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সংস্কৃত-ঘেঁষা করতে চাইতেন। মুসলমানদের কাছ থেকে ইংরেজ ভারত অধিকার করেছিল, তাই বোধ হয় মুসলমানদের প্রতি কোনোরূপ সদয়ভাব না দেখিয়ে নিরীহ হিন্দুদের উপরই আকর্ষণটা স্পষ্টতর করবার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল'। বাংলা গদ্যের ইতিহাসকার শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতপ্রীতি আর ফারসিবিদ্বেষকে একই উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া হিসাবে পড়েছেন – পুরো প্রক্রিয়াটিকে দেখেছেন ইংরেজির প্রতিষ্ঠার সিঁড়িরূপে:

> রাজশক্তির সুপ্রতিষ্ঠার জন্যে ফার্সিকে ক্রমশ দূরীভূত করে ইংরেজিকে শাসনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল নবগঠিত বৈদেশিক সরকারের নীতি। ১৭৭৩ সালে 'নিয়ামক আইন' বা regulating act প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হবার পর থেকে ইংরেজ জাতি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে। প্রথমে দেশজ ভাষাগুলোকে উৎসাহ দিয়ে ফার্সি প্রভাবের উচ্ছেদ সাধন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। নতুন ভাষা ইংরেজির পথ সুগম করার জন্যেই ফার্সিকে অপসারণের সংকল্প নিয়ে ইংরেজ সরকার, বিদেশি খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক ও পাশ্চাত্যপন্থী শিক্ষাবিদ্‌রা বাংলা ভাষায় প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃত ও দেশি শব্দের ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। উনিশ শতকে রচিত কেরি ও অন্যান্য ধর্মযাজকের লেখায় ফার্সির বিজাতীয় প্রভাব দূর করার ঐ ইচ্ছার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। (শ্যামল ১৩৬৬: ৬৫)

প্রধানত 'বিজাতীয়' বা 'বিদেশি' ছাপ এঁকে দিয়েই 'মুসলমানি' উপাদানগুলোকে বাতিল করার বুদ্ধিবৃত্তিক পাটাতন তৈরি করা হয়েছিল। মুসলমান শাসনকে বিদেশি শাসন হিসাবে প্রতিপন্ন করা আর আরবি-ফারসি শব্দকে বিদেশি উপাদান হিসাবে গণ্য করার কাজটা উপনিবেশ আমলের এই যুগে সমান্তরালভাবে চলছিল। এ ব্যাপারে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী আর দেশীয় হিন্দু অভিজাতদের মতৈক্য ছিল অভূতপূর্ব। দোহাই পাড়া হয়েছিল ভাষার 'বিশুদ্ধতা'র। প্রাচ্যবিদ্যা আর তুলনামূলক-ঐতিহাসিক শব্দবিদ্যা ছিল এর জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি। কিন্তু 'জ্ঞানতত্ত্ব' যাই হোক, পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্যে জাতিবিদ্বেষের প্রচণ্ডতা গোপন থাকেনি (দেবপ্রসাদ ২০০৬: ১৩০-৪০)। ভাষার বিশুদ্ধতার ধারণা – আগেই বলা হয়েছে – ঔপনিবেশিক প্রকল্পের সঙ্গে খাপ খায়। এর অংশ হিসাবে কেবল আরবি-ফারসি নয়, বাংলা ভাষার প্রচুর দেশীয় উপাদান আর বাগভঙ্গিও বাতিল হয়েছে। কিন্তু 'বিদেশি' শব্দ কোনো ভাষাকে 'অবিশুদ্ধ' করে,

এই মত অন্তত ইংরেজিভাষীদের ক্ষেত্রে এত জোরালো হতে পারে না। কারণ, ইংরেজি শব্দভাণ্ডারের বিপুল অংশ, কিছু ব্যাকরণিক রূপ ও ধ্বনিসংস্থান ফরাসি থেকে ধার করা (Sapir 2004: 159)। বিপুল ফরাসি শব্দ ইংরেজিতে ঢুকে পড়ার প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে:

> In the period after 1250 the conditions under which French words had been making their way into English were supplemented by a new and powerful factor: those who had been accustomed to speak French were turning increasingly to the use of English. Whether to supply deficiencies in the English vocabulary or in their own imperfect command of the vocabulary, or perhaps merely yielding to a natural impulse to use a word long familiar to them and to those they addressed, the upper classes carried over into English an ashtonishing number of common French words. In changing from French to English they transferred much of their governmental and administrative vocabulary, their ecclesiastical, legal, and military terms, their familiar words of fashion, food, and social life, the vocabulary of art, learning, and medicine. (Baugh and Cable 2002: 168-69)

এখানে ফরাসি শব্দ ইংরেজিতে ঢুকে পড়ার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে বাংলায় ফারসি শব্দের আমদানির বেশ কতকটা মিল আছে। যদিও বাংলার ক্ষেত্রে আমদানির পরিমাণ ইংরেজির তুলনায় যৎসামান্য। আবার 'বিদেশি' ভাষার পরিচয়ও বেশ গোলমেলে। আরবি-ফারসি নিঃসন্দেহে বিদেশি ভাষা। কিন্তু হিন্দুস্থানি, উর্দু বা হিন্দি কোনো অর্থেই বিদেশি নয়। এসব তথ্য ওই পর্বের ভাষা-কারিগরদের অজানা থাকার কোনো কারণ নেই। ফারসি যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীরই অন্তর্গত, সে তথ্যও সর্বত্র অনুল্লিখিত থেকে গেছে। তাই বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন-পর্বের 'আরবি-ফারসি' কাণ্ডকে নিছক ভাষাতত্ত্ব আকারে পাঠ করলে অতিরিক্ত সারল্যের আশ্রয় নেওয়া হয়। এটা সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নেরই একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে 'নিজ' ও 'অপরে'র নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয়।

বাংলা ভাষার উপনিবেশায়নে মুসলমান সম্প্রদায়ের 'অপরায়ণ' কেবল ভাষায় নয়, সংস্কৃতি-রাজনীতিতেও সুদূরপ্রসারী কুফল ফলিয়েছে।

৩.৩.৪ সাহেব-পণ্ডিত ঐক্য

ইউরোপীয়দের সঙ্গে বাঙালির প্রথম পরিচয়ের পর নিজ প্রয়োজনে ইউরোপীয়রা বাংলা ভাষা অন্তত আংশিকভাবে আয়ত্ত করতে বাধ্য হয়। নইলে তাদের ব্যবসাপাতির অসুবিধা হত। তাদের প্রয়োজন ছিল 'ভাষার কতকগুলি শব্দ, প্রকাশভঙ্গি, অভ্যস্ত ধরন, রশিদ-পাট্টা-চুক্তি-জামিন-কবলা ইত্যাদির আকার, পারিবারিক-সামাজিক-ব্যবসায়িক জীবনে পারস্পরিক সম্বন্ধজ্ঞান ইত্যাদি আয়ত্ত করা' (দেবেশ ১৯৮৭: ১৪)। ১৭৭০-এর দশকে ইংরেজদের প্রয়োজনে সংকলিত দুটি শব্দকোষ (সরস্বতী ২০০০: ৩৪-৩৭) পরীক্ষা করলে এ কথার সত্যতা পাওয়া যায়। এসব শব্দকোষে চালু শব্দেরই প্রাধান্য ছিল – দেশজ, আঞ্চলিক, আরবি-ফারসি-হিন্দুস্থানি শব্দ নির্বিচারে গৃহীত হয়েছে। চালু ভাষা রপ্ত করতে হলে এর বাইরে যাওয়ার উপায়ও থাকে না। কিন্তু ভাষা যখন যুক্ত হয়ে পড়ে ঔপনিবেশিক প্রকল্পের সঙ্গে[১৮], তখন ভাষা 'কেমন' – এই প্রশ্ন আর গুরুত্বপূর্ণ থাকে না; বিবেচ্য হয় 'কী হওয়া উচিত'। সংস্কৃতের আদলে বাংলাকে

'বিশুদ্ধ' করার জ্ঞানগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে 'কী হওয়া উচিত' প্রশ্নের একটা সুরাহা হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে 'যাবনী মিশাল' চলতি বাংলা, এমনকি সাধারণ্যে চালু বাংলা কখনো গ্রহণ করেননি, তার বেশুমার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে চালু বাংলাকে 'বিশুদ্ধ' করার একটা প্রকল্প তাঁদের থাকাই স্বাভাবিক। প্রকল্পের এই ঐক্য উপনিবেশায়নের ওই বিশেষ পর্বে তৈরি করেছে সাহেব-পণ্ডিত ঐক্য।

বাংলা ভাষাচর্চার সঙ্গে যুক্ত অন্তত চারজন – ফরস্টার, উইলকিন্স, কেরি ও কোলব্রুক – সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন (Qayyum 1982: 16-19)। চর্চার এই বিশেষ ধরনের জন্যই ইংরেজদের নিয়োগকৃত মুনশির পদে সংস্কৃতজানা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আবদুল কাইউম (1982: 53-55) জানাচ্ছেন, হ্যালহেডের একজন পূর্ববঙ্গীয় মুনশি ছিল, যাঁর কাছে তিনি ফারসি ও হিন্দুস্থানি শিখতেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে স্থানচ্যুত করে ব্যাকরণ রচনার সহায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত – হ্যালহেডের ভাষায়, 'বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ'। এই পণ্ডিতের কাছ থেকে শেখা বানান, উচ্চারণ আর প্রত্যক্ষরীকরণ মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সাহেব-পণ্ডিত যৌথতায় নিষ্পন্ন সংস্কৃতায়ন আসলে কিভাবে কাজ করেছিল। আবদুল কাইউম এর অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছেন। এখানে একটি উদ্ধৃত করা হল:

> The average, educated Bengali of the present day would pronounce the Sanskrit words *Mahadeva*, *Siva* and *Devata* as *Mahadeb*, *Shib* and *Debata*; the Sanskrit voiced labiodental 'v' becomes in Bengali a voiced labial plosive 'b'. In the 'Ancient and Authentic' book-list, however, Halhed transcribes these words phonetically as *Mahadev*, *Shev* and *Dewta* thus retaining a suggestion of the 'v' pronounced by the Bengali Brahmin, whose speech undoubtedly bore the deep imprint of his long training in Sanskrit. (Qayyum 1982: 57)

পণ্ডিতের ওপর নির্ভর করা ছাড়া হ্যালহেডের উপায়ও ছিল না। আগেই বলা হয়েছে, তিনি বাংলা শিখেছিলেন অতি সামান্য, আর খুব ভালো সংস্কৃতও শিখে উঠতে পারেননি। সাহেব জানতেন, 'বিশুদ্ধ' বাংলা কেমন হবে, জানতেন ভাষা-বিশ্লেষণের তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতি। আর তাঁকে উপাত্ত সরবরাহ করেছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। দুজনের মত ও দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক ছিল না।[১৯]

সাহেব-পণ্ডিত ঐক্যের দ্বিতীয় নজির পাওয়া যায় আইনের অনুবাদে। অনুবাদক হিসাবে নাম না থাকলেও আইনগ্রন্থের বাংলা সংস্করণগুলোতে মুনশিদের বিরাট ভূমিকা ছিল। হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণে 'বিশুদ্ধ' বাংলার যে প্রস্তাব করেছেন, আইনের বইগুলোতে – কাল-সামীপ্যের জন্যই সম্ভবত – তার প্রভাব বিশেষ পড়েনি। কিন্তু ফরস্টারের মুনশিদের রচনায় ক্রমবর্ধমান সংস্কৃতায়নের উদাহরণ পাওয়া যায়। গোলাম মুরশিদ এরকম এক উদাহরণ দিয়েছেন:

> ১৭৯৭ সালের আইনসমূহের শেষে যে 'খোলাষা' অথবা নির্ঘণ্ট আছে, তার শেষে প্রথম বারের মতো 'তমামে'র পরিবর্তে 'সমাপ্ত' লেখা হয়। এই খোলাষা তৈরি হয় ১৭৯৯ অথবা ১৮০০ সালে। কিন্তু ফরস্টার অথবা তাঁর মুনশিরা 'তমামে'র বদলে 'সমাপ্ত' লিখেই খুশি হননি, দু তিন বছরের মধ্যেই তাঁরা 'সমাপ্তে'র পরিবর্তে 'ইত্যবসান' লিখতে আরম্ভ করেন। (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ১৮২)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গদ্য-গ্রন্থমালায় সাহেব-পণ্ডিত ঐক্যের তৃতীয় দফার সাক্ষাৎ মেলে। এই গ্রন্থমালা রচিত হয়েছে উইলিয়াম কেরির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। কেরির রচনা প্রথমে সরল ও সহজ ছিল (সুকুমার ১৪০৩: ১১; গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ১৮৩)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগ দেওয়ার পর তাঁর ঝোঁক বাড়তে থাকে সংস্কৃতের দিকে। সুকুমার সেন লিখেছেন, 'মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাবে পড়িয়া কেরি সংস্কৃত শব্দের ভক্ত হইলেন। তাহার ফলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলির ভাষায় সংস্কৃতের ছায়া গাঢ়তর হইতে লাগিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ের স্টাইলের বাজারদর বাড়িতে লাগিল'। (সুকুমার ১৪০৩: ১১)

পণ্ডিতি স্টাইলের বাংলার বাজারদর বাড়ার চূড়ান্ত প্রমাণ মেলে সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংস্কৃত-পণ্ডিত-নির্ভরতা থেকে। *সমাচার দর্পণ* কাগজে লেখা ও সম্পাদনা-সহায়তার জন্য দেশীয় পণ্ডিতদের ভিতর থেকে বাংলা লেখকদের একটি শ্রেণি তৈরি করা হয়েছিল। এই পণ্ডিত-লেখকদের ওপর তাঁদের নির্ভরতা এতটাই ছিল যে, কখনো ছুটির পর পণ্ডিতেরা যদি কাজে না ফিরতেন তাহলে কাগজের প্রকাশ বন্ধ থাকত। ১৮৩৩ সনের ২৬ অক্টোবর তারিখে *সমাচার দর্পণ*-সম্পাদক জানান, 'আমারদের পণ্ডিতগণ আগামি সোমবার পর্য্যন্ত স্ব২ বাটী হইতে প্রত্যাগমণ হইবেন না অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন২ সংবাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন' (ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৩৯: ভূমিকা)। কেবল সাহেবদের পত্রিকায় নয়, দেশীয়দের পত্রিকায়ও – যেমন, রামমোহন রায়ের *সংবাদ কৌমুদী* বা ইয়ংবেঙ্গলের *জ্ঞানান্বেষণ* – লেখক হিসাবে সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা নিযুক্ত হয়েছেন (দেবেশ ১৯৯০: ২৯-৩১)।

দেবেশ রায় (১৯৯০: ৭১-৭২) সাহেব-পণ্ডিতের এই ঐক্যকে ব্যাখ্যা করেছেন ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র আর ব্রাহ্মণ্য আমলাতন্ত্রের ঐতিহাসিক সংযোগ হিসাবে। লিখেছেন: 'ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসি ছিল বিকাশের পথে। আর স্মার্ত নৈয়ায়িক ব্যুরোক্রেসি ছিল পচনের পথে। ... দুই ভিন্ন কালে, ভিন্ন কারণে এই দুই ব্যুরোক্রেসির জন্ম। কিন্তু আরেক ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যে এই দুই ব্যুরোক্রেসির সংযোগ ঘটে যায়' (দেবেশ ১৯৯০: ৭১)। সংযোগের মূল কারণ ছিল – আগেই বলা হয়েছে – শাসন-সম্পর্কিত। বাঙালি-ভারতীয় হিন্দু সমাজজীবনে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু জীবনাদর্শের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত ছিল প্রধানত স্মার্ত-নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ্য আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে। এর বিধিবিধানেই নির্ধারিত হত বাঙালি হিন্দুর পারিবারিক-সামাজিক সংগঠন থেকে শুরু করে সম্পত্তির অধিকার পর্যন্ত সব কিছু। তাই উপনিবেশিতের বড় অংশকে কব্জা করার জন্য ইংরেজরা খুব সহজেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ওপর নির্ভর করতে পেরেছে। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা সাহেবদের যোগ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। 'সাহেবরা বাংলা জানতেন না – কিন্তু তাঁরা বাংলা গদ্যে কী লেখা হবে, সেই বিষয়টি অতি স্পষ্টভাবে জানতেন। সংস্কৃত পণ্ডিতরাও বাংলা গদ্য জানতেন না – কিন্তু তাঁরা ঐ বিষয়ের উপযুক্ত ভাষা কী হতে পারে তার একটা আন্দাজ জানতেন' (দেবেশ ১৯৯০: ৬৯)। ফলে কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের পারস্পরিকতা তো ছিলই। কিন্তু সাহেব-পণ্ডিতের ভিতর, ইংরেজি ও সংস্কৃতের ভিতর, এই কার্যকর আপোসরফার অন্য একটি কারণও ছিল। 'ইংরেজদের দিক থেকে সংস্কৃত পণ্ডিতরা যেমন বাংলা ভাষার সাহেববোধ্য রূপের মাধ্যম হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি হিন্দু ব্রাহ্মণদের দিক থেকে সাহেবরা হয়েছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণদের 'লুপ্ত-গৌরব' পুনরুদ্ধারের মাধ্যম'। (দেবেশ ১৯৯০: ৭২)

৩.৪ উপনিবেশায়নের ফল: বাংলা ভাষার রূপান্তর

ইংরেজ আমলের আগের বাংলা গদ্যের যে তালিকা এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে (সুকুমার ১৯৯৮, আনিসুজ্জামান ১৯৮২, ১৯৮৪, গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯, দেবেশ ১৯৮৭, Sen 1921), পরিমাণে তা রীতিমত বিপুল। এ থেকে নিশ্চিত করে বলা যায়, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের আগেই বাংলা গদ্য বেশ শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শুরুতে 'নতুন অভিভাবকতায় ... বাংলা গদ্যের নবযাত্রা শুরু' হয় (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ৮৯)। প্রধানত ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে আদানপ্রদানের ফলেই গদ্যের চেহারা ও চরিত্র পালটে যায়। বদলটা হয়েছিল – বলা ভালো, বদলানো হয়েছিল – আসলে সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই – ইংরেজি ও সংস্কৃতের ছাঁচে। তাতে চাপা পড়ে যায় বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রতিভা ও সম্ভাবনা। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন:

> A wholesale change was brought on by the advent of the English. The Bengali style flowed for a time into an altogether new channel. The style of this transition-period presents uncouth forms of expression – it is sometimes abnormally pedantic and sometimes unintelligible. … We shall see that certain mannerisms and characteristics of the old prose style were latterly given up on account of the influence of English and Sanskrit. (Sen 1921: 42)

পরাধীন একটি দেশে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই প্রাথমিক প্রয়োজনে এই নতুন গদ্য তৈরি হয়েছিল। ইউরোপীয় লেখকদের বাংলা ব্যাকরণগুলোর সাক্ষ্য ব্যবহার করে বলা যায়, তাঁরা 'যতটা না বাংলা ভাষা বুঝতে শিখতে চাইছিলেন, তার চাইতে বেশি চাইছিলেন – বাংলা ভাষাটাকে নিজেদের মতো করে বোঝাতে-শিখাতে' (দেবেশ ২০০৩: ৫১)। এ কারণেই অন্য ভাষায় গদ্যের বিকাশের ধারার সঙ্গে বাংলার মিল পাওয়া যাবে না। এমনকি ভারতের অন্য কোনো ভাষার ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ সাম্রাজ্যশক্তির নিয়ন্ত্রণে গদ্যের নতুন মানচিত্র গড়ে ওঠেনি। কিন্তু কলকাতাই যেহেতু ছিল সাম্রাজ্যবিস্তারের আরম্ভস্থান, বাংলা ভাষাকে তাই হয়ে উঠতে হয়েছিল সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিপূরক বাহন। উপনিবেশায়নের সামাজিক প্রক্রিয়া এখানে ভাষানির্মাণের পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। 'ভাষার নিজস্ব প্রবণতা, কথ্যভাষায়, বা গদ্যের লিখিত রূপের কোনো অস্পষ্ট পূর্ব-আভাস বাংলা গদ্যের আদর্শ হয়ে' ওঠেনি (দেবেশ ১৯৯০: ৮৮)। এ ছিল অতীতের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছেদ, আর সম্পূর্ণ নতুন এক যাত্রা। সে 'যাত্রায় অনেক বিত্ত সংগৃহীত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘরের অনেকদিনের সঞ্চয়ও হারিয়ে গিয়েছিল'। (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ৮৯)

৩.৪.১ ঘরের সঞ্চয়: পুরোনো বাংলা গদ্য

উনিশ শতকের ছাপা হরফে বাংলা গদ্যের বিপুলতা আর বৈচিত্র্য এমন চোখ-ধাঁধানো রূপ পেয়েছে যে, আগের গদ্য নিবিড়ভাবে পাঠ করার অবকাশ ঐতিহাসিকেরা বিশেষ পাননি (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ১৮; ভক্তিমাধব ১৯৮৮: v)। এর এক কারণ গদ্য আর সাহিত্যিক গদ্যকে একাকার করে গুলিয়ে ফেলা – উপনিবেশিত সমাজের বিশিষ্ট এলিটপনা যার অন্যতম উৎস (৩.৫ দ্রষ্টব্য)। অন্য কারণটি আরো গভীর। 'যে-তত্ত্বজ্ঞান ও যুক্তিবোধ, যে-পরিশীলন ও মননশীলতা থাকলে গদ্যের আবির্ভাব ঘটে, অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, পাশ্চাত্য প্রভাবের আগে আমাদের দেশে তার বিকাশ হওয়া সম্ভবপর ছিল না' (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ১৫)। বলা যায়, ঔপনিবেশিকতা কেবল বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত ধারণা আর গদ্যকেই গ্রাস করেনি, বাংলা গদ্যের ইতিহাসকেও প্রচণ্ডভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে।[২০] সেই নিয়ন্ত্রণ

খানিকটা শিথিল করে পেছনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, মুদ্রণ-সংস্কৃতির আগে গদ্যের যে ধরনের চর্চা সম্ভব, বাংলা ভাষায় মোটের ওপর সে চর্চা ছিল।

পুরোনো কাব্যের পয়ারের বন্ধনের মধ্যে গদ্যবাক্যের শব্দবিন্যাস আর গড়ন বিস্তর পাওয়া যায়। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের 'ধনিয়া মৌরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া/ নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া' বা 'উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান' কিংবা কৃত্তিবাসী *রামায়ণে*র 'গুরুস্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে' প্রভৃতি গঠনের দিক থেকে একেবারেই গদ্য (ভক্তিমাধব ১৯৮৮: ৮)। কিন্তু সাহিত্যরচনায় ব্যবহৃত না হলেও গদ্য যে প্রয়োজনের জগতে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকেই ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে, বাক্যের গড়ন আর সার্বিক প্রকাশভঙ্গি কাঠামোগত পূর্ণতা পেয়ে গেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ত্রিপুরা থেকে প্রাপ্ত সপ্তদশ শতাব্দীর দানপত্রে (ভক্তিমাধব ১৯৮৮: ৩০-৩৩)। এই বাংলা দানপত্রগুলির ভাষায় চার পুরুষের ব্যবধানেও অটুট একটি শৈলী বিদ্যমান। কল্যাণমাণিক্য ও তাঁর প্রপৌত্র রত্নমাণিক্যের দানপত্রের ভাষায় ও বানানে কোনো তফাত ঘটেনি। বোঝা যায়, সরকারি কাজে লম্বা সময় ধরে গদ্য ব্যবহৃত হওয়ায় একটা বাঁধা ছকও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই ছকে বাংলা বাক্যের আদর্শ রূপটি বিদ্যমান। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় দানপত্র থেকে একটি বাক্য (... সরকার উদয়পুর পরগণা নূরনগর মৌজে বাউর খাড় অজ্জঙ্গলাতে শত দ্রোণ ভূমি প্রীতে শ্রীমুকুন্দ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্যকে দিলাম ...।) বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সতের শতকের মধ্যেই বাংলা বাক্যের কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার অবস্থানগত ক্রম স্থির হয়ে বাক্য-কাঠামোটি পূর্ণতা পেয়েছিল। এই কাঠামোই প্রয়োজনমতো সম্প্রসারক-সহযোগে স্পষ্ট ভাব প্রকাশ করেছে। শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিদেশি শব্দের পাশাপাশি তৎসম ও তদ্ভবের অবস্থান। ফারসি 'কারকোন' পদটিতে পূর্বে শ্রী ও পরে বহুবচনাত্মক 'বর্গ' যুক্ত হয়ে 'শ্রীকারকোন বর্গ' + 'এ' = 'শ্রীকারকোনবর্গে' হয়েছে। আরবি 'তারিখ' শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ 'তাং' বহু-ব্যবহারের পরিচিতির কারণেই তাম্রপত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। বোঝা যায়, বিদেশি শব্দসম্ভার প্রয়োজনের জগতে তখন থেকেই আধিপত্য শুরু করেছে।

শুধু রাজকাজে নয়, সতের শতক থেকে বাংলা গদ্যের বিচিত্রগামিতাও লক্ষণীয়। 'ষোড়শ শতকের শেষদিকে, বিশেষতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে, বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছিল, তাঁরা বাংলা গদ্যেই তত্ত্বকথা বলার চেষ্টা করেছিলেন' (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ১৯-২০)। এই ধারায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হয় বহু বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, ধর্মপূজা-বিধানসহ বহু ধর্মীয় সাহিত্য। পাওয়া গেছে কথকতার ঢঙে রচিত পুরাণকথা, যা কাব্য, সংস্কৃত শ্লোক, সংস্কৃত থেকে অনূদিত অংশ আর কথোপকথনের সমন্বয়ে রচিত। বৈষ্ণবদের এই 'কড়চা বইগুলিই পাদরিদের রচনার আদর্শ যোগাইয়াছিল' (সুকুমার ১৯৯৮: ১২)। পর্তুগিজ পাদরিদের রচিত মানোএল দা আসসুম্পসাঁওয়ের নামাঙ্কিত *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* এবং দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়োর নামাঙ্কিত *ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ* থেকে পরপর দুটি অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হল:

> ১. সন হাজার পাঁচ শহ নব্বই বছর খ্রীস্তর জর্ম্ম বাদে, ফ্লান্দেস্ দেশে জিরার্দিমন্তে শুহরে এক বেপারীয়ে আর বেপারীয়ে বিস্তর রূপার মোহর ধার দিল। যে জনে ধার লইল, আপনার দেশে গিয়া রূপার মোহর মহাজনেরে ফিরিয়া পেঠাইল। সেও করজ পাইয়া কটপত্র রাখিল। এক বছর বাদে বেপারীয়ে পুনর্ব্বার জেরার্দিমন্তে গেল; মহাজনের সাথে দেখা হইল। মহাজনে আর বার ধন চাহিলঃ সে কহিলঃ আমি তোমার করজ পেঠাইয়াছিলাম, এবং তুমিও করজ পাইলাঃ এহা জানি। মহাজনে কিরা খাইয়া কহিলঃ আমি যদি করজ পাইয়াছিলাম, এহি অগ্নির মধ্যে আমার শরীর পুড়িয়া যাউক। এমত মিথ্যা কিরা কহিলঃ এবং এমত শাস্তি পাইলঃ রাইত হইল; কেহ কেহ যাহার যাহার ঘরে ঘরে

> গেল। মহাজনে শীতের কারণ আগুনের কাছে রহিল। দুই পহর রাইত্রে আগুনে মহাজনেরে ধরিল। সে পুড়িয়া গেল, এবং শরীর আঙ্গরা হইলঃ এবং আত্মা নরকে গেল। (মানোএল ১৩৪৬: ২৪০-৪১)
>
> ২. রামের এক স্ত্রী, তাহান নাম সীতা, আর দুই পুত্রো লব আর কুশ তাহান ভাই লকোণ, রাজা অযোধ্যা বাপের সত্যো পালিতে বোনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবোণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে লঙ্কাত থাক্যা আনিতে বিস্তর যুর্দো করিলেন, বালিরে মারি তাহার স্ত্রী তারা সুসীবেরে দিলেন, সে বালির ভাই, তাহারে রাজখণ্ড দিলেন, বিস্তর রাখ্যোস বধ করিলেন ... (দোম আন্তোনিয়ো ১৯৩৭: ৩৭)

বিদেশি উচ্চারণের স্পর্শ, রোমান হরফে প্রকাশের ঝামেলা, কিছু উচ্চারণ ও শব্দরূপের আঞ্চলিকতা ইত্যাদি বাদ দিলে এই গদ্যের সারল্য, স্পষ্টতা আর গড়ন-সুষমা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য (সবিতা ১৯৭২, ভক্তিমাধব ১৯৮৮)। কিন্তু ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় এই গদ্য পাঠ করেছেন একেবারে অন্যদিক থেকে। পর্তুগিজ পাদরিদের এই প্রাঞ্জল গদ্যকে বিচ্ছিন্ন প্রয়াস হিসাবে দেখা বা বিদেশিদের বাংলা হিসাবে বর্ণনার প্রচলিত ধারা সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'মানোএলের গদ্য কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ... পর্তুগীজদের বাংলা বলে পৃথক কোনো বাংলা ছিল না, জাতীয় জীবনে প্রচলিত গদ্যধারাই মানোএল সারস্বত সাধনায় গ্রহণ করেছিলেন' (ভক্তিমাধব ১৯৮৮: ১৫৩)। বস্তুত ইউরোপীয় অভিজ্ঞতায় আস্ত পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ছাপার হরফে প্রকাশ করার কারণে এই বইগুলোকে বিচ্ছিন্ন ও একক প্রচেষ্টারূপে দেখা বিবেচনা-পদ্ধতি হিসাবে বিভ্রান্তিকর। এই রচনাগুলো আসলে প্রমাণ করে আঠার শতকের মধ্যেই বাংলা গদ্য ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও সুষ্ঠু গড়ন অর্জন করে নিয়েছিল। তার ফলে বিদেশির পক্ষেও এই গদ্যভঙ্গি রপ্ত করা অসম্ভব হয়নি। ব্যাকরণের আলোচনায় আগেই বলা হয়েছে, পর্তুগিজ পাদরিরা বাঙালিকে বাংলা শেখাতে চাননি, বাঙালির বাংলাই শিখতে চেয়েছিলেন। সেই বাংলা আঠার শতকের গোড়ায় এত বেশি চর্চিত ছিল যে, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সুগঠিত ও সুষম গদ্যবাক্য রচনা করতে পারতেন। উদাহরণ হিসাবে ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় রচিত একটি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন: 'মহাপ্রসাদ সর্ব্বলোককে দিয়া যে থাকে তাহা সাড়ে তিন অংশ করিয়া একাংশ ধামাতিকর্ণীর একাংশ পণ্ডিতের একাংশ দেউল্যার' (এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি ৫৪৩৮ থেকে উদ্ধৃত, ভক্তিমাধব ১৯৮৮: ১০৯)। অসমাপিকা ক্রিয়া আর বিভক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগে এই বাক্য শুধু অর্থপ্রকাশক নয়, রচনাসামর্থ্যেরও পরিচায়ক। সমাজে প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই এ ধরনের গদ্য লিখতে পারতেন – এ কথা স্বীকার না করলে একজন সাধারণ কর্মকার পণ্ডিতের এই বাক্যরচনার সম্ভাব্যতা ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আসলে আঠার শতকের মধ্যে – হ্যালহেডের ব্যাকরণ রচনার আগেই – বাংলা গদ্য প্রবন্ধ-রচনার উপযোগী হয়ে ওঠে (শ্যামল ১৩৬৬: ৬১)। 'বক্তব্যবিষয়ের বর্ণনায় ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে বিষয়টির সম্পূর্ণ বিবরণ রচনা' করার সামর্থ্য তৈরি হয়। বাংলা গদ্যে সাহিত্যের কোনো রীতি দেখা না গেলেও তা সুসংবদ্ধভাবে মনোভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান লিখেছেন:

> ষোল থেকে আঠারো শতক অবধি বাংলা গদ্যের নিদর্শন প্রধানতঃ চিঠিপত্রে ও দলিল-দস্তাবেজে আবদ্ধ, এই প্রচলিত ধারণা এখন সংশোধনের যোগ্য। ধর্মবোধকে আশ্রয় করে সেযুগে যেমন কাব্যসৃষ্টি হচ্ছিল, তেমনি, পরিমাণে অপেক্ষাকৃত কম হলেও, গদ্যচর্চা চলছিল ধর্মসাধনার তত্ত্বগত দিক নিয়ে। এরই ফলে বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বঘটিত নিবন্ধ ও

Dhaka University Institutional Repository

> খ্রীষ্টধর্মমতের ব্যাখ্যা এবং শ্রাদ্ধবিধি ও নিগমকথা সম্পর্কে গদ্যরচনা পাই। অন্যদিকে ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-বিষয়ক রচনা থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, গদ্যচর্চা শুধু ধর্মবিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ৭৩)

এটাই স্বাভাবিক। একটি কর্মকোলাহলময় সমৃদ্ধ জনপদে জীবনের বিচিত্র প্রয়োজনে গদ্য ব্যবহৃত হওয়ারই কথা। উপনিবেশিতের হীনমন্যতাবশত এদিকটি বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হয়নি। ১১৯৪ সালের ১৫ আষাঢ় খিদিরপুরের বিখ্যাত ঘোষাল পরিবারের কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল এবং তার পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল বড়লাটের কাছে একটি পত্র লেখেন (সুরেন্দ্রনাথ ১৯৪২: ২০১-০৫; ১৯৯৯: ৪৩৫-৩৬)। ছাপার অক্ষরে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা লম্বা এই পত্রে সুশৃঙ্খল ভাষায় একটি দুস্থালয় গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সম্ভাব্য করণীয়ের আঠার দফা তালিকা। এর গদ্য সরল। প্রচলিত তদ্ভব, আরবি-ফারসি আর তৎসমের সুচারু বিন্যাসে পত্রটি রচিত। এই গদ্য আসলে সমকালে প্রচলিত বাংলা গদ্য, যাকে হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণে বাতিল করে দিয়েছিলেন। হ্যালহেডের সেই বর্জন দুই দশকের মধ্যে উপনিবেশিত কলকাতায় প্রায় সর্বজনীন স্বীকৃতিও পেয়েছিল। অথচ সমকালীন গদ্যের বেশিরভাগ নমুনায় এই গদ্যরীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

প্যারিসের 'বিবলিওথেক ন্যাশিওনেল' থেকে পাওয়া অসাঁর সংগ্রহের অনেকগুলো চিঠি সম্পাদনা করে বের করেছেন দেবেশ রায় (১৯৮৭)। আনিসুজ্জামান (১৯৮৪: ৩২) মনে করেন, আদর্শ নমুনাপত্র হিসাবে এগুলো লিখিত হয়েছিল। পারিবারিক চিঠি ছাড়াও এতে বৈষয়িক চিঠি আছে, নানারকম দলিলের নমুনাও আছে। 'প্যারিসে রক্ষিত এই দুই খণ্ডই সম্ভবতঃ আদর্শপত্র ও দলিল লিখনপ্রণালীর প্রাচীনতম নমুনা' (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ৩৩)। আনিসুজ্জামান নিজেও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে দুহাজারের বেশি বাণিজ্যিক পত্র আবিষ্কার করেন (আনিসুজ্জামান ১৯৮২)। এর আগে সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রকাশ করেছিলেন *প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন* (সুরেন্দ্রনাথ ১৯৪২)।[২১] এই বিপুল নমুনা বিশ্লেষণে হয়ত দেখা যেতে পারে যে 'বাংলা গদ্যে ব্রিটিশ প্রভাব কার্যকর হওয়ার আগেই, অন্তত আঠার শতকে, উত্তরবাংলার কোচবিহার থেকে শুরু করে ভাগীরথী-তীর পর্যন্ত গদ্যভাষার একটি রূপ প্রচলিত ছিল' (দেবেশ ১৯৮৭: ১৮)। এই যে প্রায় সমরূপ গদ্যের বিপুল নমুনা পাওয়া যাচ্ছে[২২], তার বৈশিষ্ট্য কী? ১ বৈশাখ, ১১৮৮ সালের এক চিঠি উদ্ধৃত করে আনিসুজ্জামান লিখেছেন:

> যতিচিহ্ন বসিয়ে নিলে ধরা পড়বে যে, এর ভাষা সরল, বাক্য ছোট। বৈষ্ণব নিবন্ধে যে সরল বাক্যপ্রবাহ আমরা দেখেছি, তার সঙ্গে এর তুলনা চলে। ... আবার সাধারণ লোকের মধ্যে সম্পাদিত দলিল-দস্তাবেজে ব্যক্তিগত পত্রের মতোই এই সরল ও প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি দেখা যায়। (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ৮০)

অন্যত্র ঢাকার কুঠি থেকে প্রেরিত পত্র প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> সমসাময়িক ব্যক্তিগত পত্রে এমন অলংকৃত পাঠ তো পাওয়াই যায় না, বরঞ্চ আনুষ্ঠানিক চিঠিপত্রেও অনেক সময় কুঠির চিঠির মতো সরল পাঠ পাওয়া যায়। অলংকৃত ও সহজ পাঠের রেওয়াজ দুই যে পাশাপাশি চলে এসেছে অনেককাল ধরে, তা সহজেই বোঝা যায়। পাঠ ও স্বাক্ষরের অংশ ছাড়া কিছু চিঠির ভাষা আটপৌরে বাংলা, কিছু চিঠিতে আরবি-ফারসি-হিন্দুস্থানি শব্দ বহুল ব্যবহৃত, কিছু চিঠিতে আঞ্চলিক শব্দেরও মিশেল আছে। আরবি-ফারসি-হিন্দুস্থানি শব্দ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিষয়ের অনুরোধে সন্নিবেশিত হয়েছে। (আনিসুজ্জামান ১৯৮২: ৪)

Dhaka University Institutional Repository

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় ১৭০৭-৯৪ সময়ের অনেকগুলো চিঠির ভাষা-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন:

> পত্রগুলি ছেদচিহ্ন-বিরল, কিন্তু ভাবপ্রকাশে কোনো বাধা ঘটে না। রচনায় তৎসম শব্দ বিদেশি শব্দের সঙ্গে সহজ ঋজুতায় মিশে রয়েছে, স্থানে স্থানে হিন্দুস্তানি প্রভাব কোথাও কোথাও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘ বাক্য ও ক্ষুদ্রায়ত বাক্যের পাশাপাশি অবস্থানে এক প্রকারের রীতিবৈশিষ্ট্য কোথাও বা আত্মপ্রকাশ করেছে। উদ্দেশ্য বিধেয় ও তাদের সম্প্রসারক, অস্ত্যর্থক ও নাস্ত্যর্থক বাক্যের পদবিধান, বিশেষণ প্রয়োগ প্রভৃতি বাক্যের জটিল গ্রন্থনায় একটি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। গদ্যগঠনের এই বিচিত্র রূপন্যাস পত্রগুলিকে গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দেবে। (ভক্তিমাধব ১৯৮৮: ৭১)

আজকের পাঠকের কাছে ওই গদ্য জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হয় কেন, তারও ব্যাখ্যা করেছেন আনিসুজ্জামান (১৯৮৪)। তখন যতিচিহ্নের প্রচলন হয়নি। পদবিন্যাসও আলাদা ছিল। তাছাড়া:

> ঐ পারিভাষিক শব্দগুলোর সঙ্গে এখন আমাদের যোগ রহিত হয়ে গেছে। সতেরো-আঠারো শতকে পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। যতিচিহ্নের অভাব কাউকে পীড়িত করত না। বাক্যের প্রথমাংশে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে পরবর্তী অংশে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ চলত। পারিভাষিক শব্দও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অপরিচিত শব্দ ছিল না। পারিভাষিক শব্দ ছাড়াও বহু আরবি-ফারসি-হিন্দি এবং আঠারো শতকের শেষে কিছু ইংরেজি শব্দ ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। ঢাকা কুঠির চিঠিপত্রে এরকম শতাধিক শব্দ পাওয়া যায়, যা এখন আমরা ভাষায় ব্যবহার করি না। কিন্তু এসব শব্দ তখন অপণ্ডিতেরাই ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং এর অর্থ জ্ঞাপনে ও গ্রহণে অসুবিধে হতো বলে মনে হয় না। (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ৮২-৮৩)

অসুবিধা হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই গদ্য ছিল সমকালীন চলতি বাংলার খুবই কাছের। ১৭৯৫ সালের এক নথি থেকে লম্বা উদ্ধৃতি দিয়ে আনিসুজ্জামান লিখেছেন, 'সওয়াল-জবাবের যে বিবরণ আছে, তাতে তখনকার কথ্য-বাংলার পরিচয় ধরা পড়েছে বলে মনে করি। ... মুখের কথা হয়তো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ না করে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখানেও বাক্যের সংক্ষিপ্ততা এবং প্রকাশের সারল্য বাংলা গদ্যের মূল প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ' (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ৮৬-৮৭)। এই সওয়াল-জবাবে আরবি-ফারসির সংখ্যা রীতিমতো প্রচুর। এ থেকে মনে হয়, আমজনতার জবানে ওই সময়ে বিস্তর আরবি-ফারসি শব্দ ছিল, যেমন ছিল তখনকার গদ্যে। আরবি-ফারসির দেদার আমদানির কারণ নিশ্চয়ই মুসলমানদের শাসন; কিন্তু ব্যবহারের দিক থেকে এবং চলমান জীবনের কর্মপ্রক্রিয়ায় ভাষাটি জমে ওঠার দিক থেকে এতে হিন্দু-মুসলমানের অনায়াস যৌথতা ছিল। শুধু তাই নয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয়, আনুষ্ঠানিক গদ্য হিসাবে এর প্রতিষ্ঠায় বাংলার হিন্দু সমাজের অবদানই বেশি। সুশীলকুমার দে (De 1962: 253-54) এই বাংলাকে বলেছেন কায়স্থদের ভাষা। কারণ আদালতের কর্মচারী আর ব্যবসায়ী কায়স্থরা এই ভাষা ব্যবহার করত। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় বাংলার প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে এ রকম বাংলায় লেখা বিশেষ ধাঁচের পত্রাদির ব্যাপকতা লক্ষ করে লিখেছেন, 'সেযুগে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের যে দুর্বার প্রভাব আলোচ্য দেশখণ্ডের রাজসভাগুলিতে প্রসারিত হয়েছিল, এ তারই নিদর্শন বলে গৃহীত হতে পারে' (ভক্তিমাধব ১৯৮৮: ৭০)। আনিসুজ্জামান (১৯৮৪: ৮৩) ধর্মমত ও সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে লেখা নিবন্ধ ও গ্রন্থের সাধারণ ভাষার সঙ্গে চিঠিপত্র ও

দলিলপত্রের ভাষার অভিন্নতা লক্ষ করেছেন। সঙ্গত কারণেই দেবেশ রায় (১৯৮৭) অনুমান করেছেন, প্রাক-ব্রিটিশ এই গদ্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কথিত 'বিষয়ী লোকে'র ভাষা। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে শাস্ত্রী লিখেছেন:

> আমাদের দেশে সেকালে ভদ্রসমাজে তিনপ্রকার বাংলা ভাষা চালু ছিল। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে-সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত, তাঁহাদের বাংলায় অনেক উর্দু শব্দ মিশানো থাকিত। যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন বহু সংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাংলায় উর্দু ও সংস্কৃত দুই মিশানো থাকিত। কবি ও পাঁচালিওয়ালারা এই ভাষায় গীত বাঁধিত। মোটামুটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিষয়ী-লোক, ও আদালতের লোক এই তিন দল লোকের তিনরকম বাংলা ছিল। বিষয়ী লোকের যে বাংলা তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাংলা শিখিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত। (হরপ্রসাদ ২০০০/বিঃ ৫৬২)

কালবৈগুণ্যে উপনিবেশায়ন-প্রকল্পের ধারায় এই ভাষাই 'মুসলমানি বাংলা'-রূপে চিহ্নিত হয়ে পরিত্যক্ত হয়। ঔপনিবেশিক ছেদ প্রবহমান বাংলা গদ্যের সঙ্গে বাঙালির নাড়ির যোগ ছিন্ন করে।

৩.৪.২ পরিবর্তিত মনোভাব ও নতুন গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠা

ঔপনিবেশিক প্রভাব কার্যকর হওয়ার আগের আর পরের বাংলা গদ্য একেবারেই আলাদা। পুরোনো গদ্যে 'এমন এক গড়ন ধরা পড়ে যা আমাদের অভ্যস্ত নয়, এমন-কি আমাদের অভ্যস্ত গদ্যের প্রাথমিক বা প্রাক-প্রাথমিক রূপও নয়' (দেবেশ ১৯৮৭: ১৬)। সেই গদ্য বদলে ফেলার জন্য জোরালো অনুশাসন জারি করেছিলেন হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণে। সেই অনুশাসন – আগেই বলা হয়েছে – গৃহীতও হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজির আদর্শে আর সংস্কৃতের ছাঁচে বাংলা গদ্যকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা কোনো একরোখা প্রক্রিয়ায় ঘটেনি। সেখানে নানা স্তরপরম্পরা আছে, ছেদ ও ধারাবাহিকতা আছে। বদলটা যে রাতারাতি হতে পারেনি, বা হয়নি – মোটা দাগে বলা যায় – তার দুই কারণ। এক. গদ্য-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির সামষ্টিকতা হয়ত সম্ভব, কিন্তু গদ্য রচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিভা-চাহিদা-রুচির বহুত্ব এড়ানো কঠিন। দুই. ব্যাকরণ রচনা আর অভিধান সংকলনের কাজ যতটা যান্ত্রিকভাবে করা যায়, গদ্যরচনা মোটেই তত যান্ত্রিক কাজ নয়। গদ্যের নিজস্ব ইতিহাস থাকে, অভ্যস্ততা থাকে; উৎপাদক-ভোক্তার সম্মতিরও দরকার হয়। বাংলা গদ্যে ঔপনিবেশিক প্রভাব কার্যকর হওয়ার পথে এই দিকগুলো যে কাজ করছিল, তা প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

আইন-অনুবাদ ধারার প্রথম অনুবাদক জোনাথান ডানকান আইনের অনুবাদ শুরু করেন ১৭৮২-৮৩ সালে। তাঁর অনুবাদে আরবি-ফারসি ও তৎসমের সাম্য রক্ষিত হয়েছে, আর পদক্রমের স্বাভাবিকত্বও অক্ষুণ্ন থেকেছে (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ৫৪)। সারল্য ও পাঠযোগ্যতায় ডানকানের অনুবাদ এই ধারার শ্রেষ্ঠ রচনা (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ৮৪; গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ৬৮)। স্পষ্টতই তাঁর গদ্য সমকালীন চালু গদ্যেরই অনুসৃতি। গোলাম মুরশিদ অনুমান করেছেন, একজন হিন্দু মুনশি ডানকানের হয়ে অনুবাদগুলো করেছেন (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ৬৮)। এই মুনশি কিংবা ডানকান নিজে পরের সংস্করণগুলোতে বানান-শব্দ-পদক্রম 'প্রমিত'করণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 'সংস্কৃতায়নে'র ধারণা তখনো জেঁকে না বসায় এই 'প্রমিত'করণ – গোলাম মুরশিদের মতে – গদ্যের জটিলতা বাড়ায়নি, বরং পাঠযোগ্যতা বাড়িয়েছে। যাঁর হাতে 'সংস্কৃতায়নের সজ্ঞান প্রয়াস' (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ১২৩)

শুরু, সেই হেনরি পিটস ফরস্টার এবং তাঁর হিন্দু মুনশিরাও 'তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের একটা প্রশংসনীয় ভারসাম্য আনতে পেরেছেন'। তাঁদের অনুবাদও যথেষ্ট সাবলীল। আইনের অনুবাদগুলোর প্রতিটিরই পরের সংস্করণে 'সংস্কৃতায়নে'র মাত্রা ক্রমশ বেড়েছে। তাতে বোঝা যায়, বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত পরিবর্তিত ধারণা দ্রুত প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল। এ কথা খ্রিস্টান ধর্ম-সংক্রান্ত গদ্যের ক্ষেত্রেও সত্য। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রথম বই *মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত* সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন, 'ভাষা তদ্ভব-শব্দবহুল, কথ্যভাষানুযায়ী ও সহজ। ... তদ্ভব শব্দবাহুল্যের দরুন ভাষা বেশ সরল এবং পরবর্তী কালের সংশোধিত (অর্থাৎ সংস্কৃতায়িত) সংস্করণগুলোর তুলনায় সহজবোধ্য'। (সুকুমার ১৯৯৮: ২২)

তবে ইংরেজি থেকে অনূদিত গদ্যে প্রথম থেকেই ইংরেজির পদক্রম অনুসৃত হচ্ছিল। আইন-অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে গিয়ে ইংরেজি বাক্যের দৈর্ঘ্য রক্ষিত হয়েছে; তাতে বাংলা বাক্যের স্বভাব অক্ষুণ্ন থাকেনি (সুকুমার ১৯৯৮: ২২; আনিসুজ্জামান ১৯৮৪: ৮৩)। তা সত্ত্বেও আইনের অনুবাদ ছিল মোটের ওপর প্রাঞ্জল। সুকুমার সেন (১৯৯৮: ২১) লিখেছেন: 'বিস্ময়ের বিষয় এই যে আইনের অনুবাদে যে প্রাঞ্জলতা প্রথম হইতেই দেখা দিয়াছে অন্য অনুবাদ ও স্বাধীন রচনায় সে প্রাঞ্জলতা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়কেও দুর্লভ ছিল'। এর কারণ আইন, প্রশাসন ও জমিজমা-সংক্রান্ত পরিভাষা আর বয়ান পুরোনো বাংলা গদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।[২৩] কুচবিহারের রাজা ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত ১৭৭২-এর সন্ধিপত্রে 'signed sealed and constituted' অর্থে 'দস্তখত করিলেন, মোহর করিলেন এবং সমাধা করিলেন' ব্যবহার করা হয়েছে (পূর্ণেন্দু ১৯৮২: ১৫)। সেকালের বাংলা ভাষায় মজুত এই ধরনের সম্পদের অকুণ্ঠিত ব্যবহারই আইনের তরজমার বহু-কথিত সরসতার কারণ। এই সরসতা বহুদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায় নতুন ধারার প্রতিষ্ঠায় – মূলত কেরির অভিভাবকত্বে ফোর্ট উইলিয়াম গ্রন্থমালায়।

উইলিয়াম কেরির প্রথম দিকের রচনা সরল ছিল; পরে সংস্কৃতায়িত হয়েছে। 'তাঁহার এই ভাষাগত পরিবর্তনের ইতিহাস তাঁহার 'কথোপকথন' বইখানির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ মিলাইয়া পড়িলে এবং তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত বাইবেলের সংস্করণগুলি দেখিলে জানা যাইবে, – তিনি কতটা সংস্কৃত ছাঁদের অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন' (সুকুমার ১৪০৩: ১৩)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম পুস্তক *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে* পুরোনো জমানার খানিকটা ধারাবাহিকতা ছিল – অন্তত আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারের দিক থেকে। কিন্তু এই রীতি উইলিয়াম কেরির অনুমোদন পায়নি বলেই মনে হয় (অসিত ২০০৩: ৪০; মুহম্মদ আবূ তালিব ১৯৭৯: ৪)। সম্ভবত কেরির পরামর্শেই রামরাম বসু পরের বইতে রচনারীতি আর শব্দভঙ্গি একেবারে বদলে ফেলেছিলেন। তা সত্ত্বেও কেরির নিজের রচনা বা সংকলিত গ্রন্থ *কথোপকথন* ও *ইতিহাসমালায়* ভঙ্গির বৈচিত্র্য আছে, কোথাও কোথাও সারল্যও আছে। কিন্তু তাঁর নিজের গদ্যরীতি যেমনই হোক না কেন, 'ধারণা হিশেবে তিনি সংস্কৃতায়নের প্রবক্তা ছিলেন। ভালো বাংলা লিখতে হলে সংস্কৃত জানা আবশ্যিক – এ বিশ্বাসও তাঁর অনড় ছিল' (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ১৮৫)। অন্তত বাংলা ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের (১৮০৫) সময় থেকে কেরি প্রসঙ্গে এ কথা নিশ্চিন্তে বলা যায়। নিজের ধারণা বাস্তবায়নের জন্য তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ছিল; পর্যাপ্ত সময়ও তিনি পেয়েছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো সংস্কৃতের খ্যাতিমান পণ্ডিতকে সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন । হ্যালহেড থেকে কেরি পর্যন্ত বাংলা ভাষার 'শুদ্ধতা' ও 'উন্নতি'র যে ধ্যানধারণা ক্রমশ গড়ে উঠছিল,

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগে তা বাস্তবায়িত হওয়ার সমস্ত উপাদানই মজুত ছিল। এর ফলে নতুন রীতিতে বাংলা গদ্যের কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে, তার উদাহরণ দিয়েছেন সুকুমার সেন:

> তিনি (কেরি) সংস্কৃতের প্রলেপ দিয়া বাঙ্গালা খড়ুয়া বাংলাঘরকে মেরামত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এ কাজে ভালো সহকারী পাইয়াছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ের মতো সহযোগী পণ্ডিতকে। পণ্ডিতের হাতে যে বাঙ্গালা গদ্য কেমন মার খাইয়াছিল তাহার নমুনা ইতিহাসমালা হইতে ... উদ্ধৃত করিতেছি।
> ‘সদসদ বিবেচক বিজ্ঞ কোন লোক অন্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়ালেন যে উত্তম কিম্বা অধম বর্গেতে সুন্দর এবং কুৎসিত লোকেরা কোন বস্তুতে ভূষিত হইলে সর্বত্র আদরণীয় হয় আর তাহারদের সুখ্যাতিরূপ সৌরভ পবন কর্তৃক বাহিত হইয়া নানা দিগ্‌দেশীয় লোকেরদিগের মন হরণ করে যেমন শশী আত্মকিরণ প্রকাশেতে পৃথিবীমণ্ডল দীপ্ত করেন’ (।) (সুকুমার ১৯৯৮: ২৬)

ইতিহাসমালা ছোট ছোট কাহিনির সংকলন। পুরোনো গদ্যে এ ধরনের কাহিনি সাবলীল ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এ বইয়েও যেখানে ‘সংস্কৃত প্রলেপ নাই’, সেখানে এই সারল্যের নমুনা আছে। কিন্তু একেবারেই অপ্রয়োজনে, গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীনভাবে যখন এই গদ্য লেখা হয়, তখন নিঃশংসয়ে প্রমাণিত হয় যে, ‘বিশুদ্ধ’ ও ‘উন্নত’ নতুন বাংলা গদ্যের তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক গ্রাহ্যতা তৈরি হয়ে গেছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যগ্রন্থগুলোর প্রভাব পরবর্তী বাংলা গদ্যে বিশেষ পড়েনি – এমন একটা মত বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিকদের অনেকে প্রচার করেছেন। তাঁদের মতে, কলেজের গণ্ডির মধ্যেই বইগুলো ব্যবহৃত হয়েছে; অত্যধিক মূল্যের কারণে বাঙালি সমাজে বিশেষ চালু হয়নি। সজনীকান্ত দাস এই মত খারিজ করে দিয়ে লিখেছেন:

> শুধু ‘তোতা ইতিহাসে’র প্রচার দেখাইয়া প্রমাণ করা যায়, এই ধরণের উক্তি ভ্রান্ত। এই পুস্তকগুলি শুধু সে যুগে নয়, দীর্ঘ পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত বহুল প্রচারিত হইয়াছিল; শুধু সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে নয়, বহু সংগ্রহ-পুস্তকে স্থান পাইয়া এবং পাঠ্য রূপে নির্ব্বাচিত হইয়া ছাত্রছাত্রীগণের ভাষা-শিক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। যে কয়টি ‘তোতা ইতিহাসে’র সন্ধান আমরা পাইয়াছি, তাহার তালিকা দেখিলেই আমাদের উক্তির প্রমাণ মিলিবে। (সজনীকান্ত ১৩৫৩: ১৭৪)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের *প্রবোধচন্দ্রিকা* ‘ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের, হিন্দু কলেজের, হুগলী কলেজের এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে দীর্ঘকাল প্রচলিত’ থাকার খবর দিয়েছেন সুকুমার সেন (সুকুমার ১৯৯৮: ৩১)। এমনকি রচনারীতি ‘নীরস, গুরুগম্ভীর, তৎসম শব্দবহুল এবং ভাষাপ্রবাহে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আড়ষ্ট’ হওয়া সত্ত্বেও হরপ্রসাদ রায়ের *পুরুষপরীক্ষা* গ্রন্থের – ১৮২৬ সালের লন্ডন সংস্করণ আর ১৮৬৬ সালের মার্জিত সংস্করণসহ অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল (অসিত ২০০৩: ৬১)। অন্য কয়েকটি বই বা বইয়ের অংশবিশেষের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। ফলে বাংলা গদ্যের ধারায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ যুগকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া, যতটা ভাবা হয়, কলকাতার বাঙালি সমাজ সাহেব-সমাজ থেকে মোটেই তত আলাদা ছিল না (২.৭.২ দ্রষ্টব্য)। স্কুল চালানো, পাঠ্যপুস্তক রচনা, স্কুল বুক সোসাইটির কার্যক্রম, পত্রপত্রিকা প্রকাশ – সব কাজেই সাহেব-পণ্ডিত-শিক্ষিত বাঙালির একাকারতা দেখা গেছে। ফলে প্রভাবশালী জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারণা হিসাবে নতুন মত ও গদ্যের চর্চা বাঙালি সমাজের অগোচর থাকার কোনো কারণ ছিল না। বিশেষত, বাংলা ভাষা আর বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট মতৈক্য ছিল। বস্তুত ‘১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়ার আগেই সংস্কৃত-

প্রভাবিত বাংলা লেখার রীতি নীতিগতভাবে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করে' (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ১৮৫)। ওই শতকের তিনের দশকে কলকাতার পত্রপত্রিকায় বাংলা গদ্যরীতি সম্পর্কে পত্রিকার তরফে বা পাঠকের মতরূপে যেসব লেখা ছাপা হয়েছিল, তা থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। 'ইয়ংবেঙ্গলই হোক আর সংস্কৃত পণ্ডিতই হোক, সবাই চেয়েছেন বাংলাভাষার সংস্কৃতনির্ভরতা রক্ষা করতে'। (দেবেশ ১৯৯০: ৫৪)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বইগুলি কিন্তু এ রকম একমুখী গদ্যপ্রয়াসের পরিচয় বহন করে না। কেরির *কথোপকথনে* আছে বহু ধরনের কথ্যগদ্যের নিদর্শন, রামরাম বসুর *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে* ফারসিপ্রধান রচনাপ্রয়াসের নমুনা, আবার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের *প্রবোধচন্দ্রিকায়* বহুরীতির পরিবেশন। কলেজ কর্তৃপক্ষের চাহিদার সঙ্গে এই রীতিভিন্নতার সম্পর্ক আছে; লেখকদের রুচি আর ক্ষমতাও অনেক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু *প্রবোধচন্দ্রিকায়* কথ্য-বাংলার স্থানলাভ এই রীতির প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষপাত নির্দেশ করে না। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা, বহুবর্ণময়ত্বপ্রযুক্ত একদ্ব্যক্ষর পশুপক্ষিভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্য-ভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বোত্তমা এই নিশ্চয়। অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড় দেশীয় ভাষা উত্তমা, – সর্ব্বোত্তমা সংস্কৃত-ভাষাবাহুল্যহেতুক' (মৃত্যুঞ্জয় ১৩১১: ২)। এই ঘোষণার পর কথ্য-বাংলার নমুনা কেবল সংস্কৃত-বাংলার মহিমাই ঘোষণা করতে পারে।[২৪] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লক্ষ করেছেন, 'The colloquial, occasionally attempted to be represented in a work like Carey's 'Dialogues', went along its own line, and the stilted Sanskritic 'sadhu bhasa' carefully avoided its contamination.' (Chatterji 2002: 135) এই গ্রন্থমালায় যে রীতিভিন্নতা পাওয়া যায়, তার আরেক কারণ নির্দেশ করেছেন সুকুমার সেন:

> যে বইগুলি প্রধানভাবে সংস্কৃতের অনুবাদ তাহাতে পণ্ডিতি পদ্ধতির ভালো পরিচয় মিলে। রামরাম বসু সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন না, এবং তাঁহার বই দুটি সংস্কৃতের অনুবাদ নয়। সেইজন্য রামরামের রচনারীতি সাধুভাষার অনুযায়ী হইলেও ঠিক পণ্ডিতি পদ্ধতির নয়। তারিণীচরণের বই ইংরেজীর অনুবাদ, সেইজন্য তাঁহার লেখায় প্রায়ই বাঙ্গালা ভাষার অন্বয় নাই। যে বইগুলি ফারসী মূল হইতে গৃহীত এবং যাহা মুসলমান আমলের ইতিহাস ঘটিত সেগুলিতে আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। (সুকুমার ১৯৯৮: ২৪)

স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও *রাজাবলির* মুসলমান শাসনের বৃত্তান্তে আরবি-ফারসি শব্দ এড়াতে পারেননি। কিন্তু সমকালীন প্রতাপ আর উত্তরকালীন প্রভাবের কথা বিচার করলে সংস্কৃত-বাংলার একচ্ছত্র প্রতিপত্তি চোখে পড়ে। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন:

> রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমালা'; কেরীর 'ডায়ালগ্স ...' এবং গোলক শর্ম্মার 'হিতোপদেশ' – 'বত্রিশ সিংহাসনে'র পূর্ব্বগামী ও সাময়িক হইলেও পরবর্ত্তী বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় 'বত্রিশ সিংহাসনে'র ভাষাই উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরী রীতিতে স্থায়ী হইয়াছে। (সজনীকান্ত ১৩৫৩: ১৫৭)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েরও একই মত:

> The works of the pundits did not affect the living Bengali speech at all: their legacy to posterity was a labored prose style, like 18th century and 19th century journalistic Johnsonese in English; and this labored prose in the hands of capable authors like Aksaya-

Kumar Datta, Isvara Vidyasagara, and Bankim Chandra Chatterji in his earlier novels, as well as a host of lesser names, became an admirable instrument of expression, and formed the basis of the literary dialect of the present day. (Chatterji 2002: 221)

বাংলা ভাষা ও গদ্যরীতি-সংক্রান্ত মনোভাবের আমূল পরিবর্তনের কারণেই এমন হয়েছে। পবিত্র সরকার (১৯৯২: ৭৮-৭৯) লক্ষ করেছেন, উনিশ শতকের আগে বাংলা গদ্যে কয়েক ধরনের গদ্য চর্চিত হলেও রীতিগুলোর মধ্যে কোনোটির একক শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। বলা যায়, রীতিগুলোর অবস্থান ছিল আড়াআড়ি – খাড়াখাড়ি নয়। উপনিবেশায়ন-পরবর্তী বাংলা গদ্যে শ্রেষ্ঠরীতির ধারণা তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক দিক থেকে চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হ্যালহেডের ব্যাকরণে এই ধারণার প্রথম প্রস্তাব, আর ফোর্ট উইলিয়াম গ্রন্থমালায় প্রক্রিয়াটি কাঠামোগত ভিত্তি অর্জন করে। ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত *প্রবোধচন্দ্রিকা*র ভূমিকায় (মৃত্যুঞ্জয় ১৩১১) জে. সি. মার্শম্যান লিখেছেন:

… he has drawn so freely on the Sungskrit, that the uninitiated student may possibly find it difficult to comprehend some of the sentences at the first glance. All words of foreign parentage, however, he has carefully excluded.

'pure Bengalee'-তে লেখা এ বইয়ের অপ্রচলিত শব্দ পাঠকের কষ্টের কারণ হবে, এ কথা উল্লেখ করে মার্শম্যান লিখেছেন:

Yet he will be amply repaid for his labour by the purity of its diction, and by the opportunity which it will afford him of appreciating the resources of the Bengalee language. Any person who can comprehend the present work, and enter into the spirit of its beauties, may justly consider himself master of the language.

১৮৩০-এর দশকে *সমাচার দর্পণ*, *বঙ্গদূত* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠকের চিঠিপত্র আর সমকালীন বিশেষজ্ঞদের মতামতের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, নতুন বাংলা গদ্যের এই 'উঁচুরীতি' কলকাতার সমাজে একপ্রকার সাধারণ সম্মতি পেয়েছিল (নির্মল ২০০০: ১৫৬)।

৩.৪.৩ উপনিবেশায়নের ফল: বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন

বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন অতি পুরোনো এবং অব্যাহত প্রক্রিয়া। প্রাকৃতের কালেও সংস্কৃত থেকে বিপুল শব্দ ধার করা হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এই শব্দঋণ আর ধ্বনি ও রূপগত বদলের মধ্য দিয়ে ধার করা শব্দের আত্মীকরণ ছিল মধ্য ও নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলোর বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:

OIA words had their natural change in MIA, and in that case they represented the original, basic stratum of the language. But with the general recognition of Sanskrit as the undisputed representative of an earlier stage of IA, borrowing from it freely began in MIA (especially in the second and third stages); and thus fresh elements were added to the vernaculars, which became naturalised, and were subjected to the subsequent phonetic modification of the dialect into which they were introduced. This process of borrowing from Sanskrit was repeated at various times in the later history of IA; and this fact of Sanskrit interfering with the natural development of the language by being always ready to supply new words by the

> hundred, and occasionally a new form here and there, is a note-worthy thing in the development of middle and new Indo-Aryan. (Chatterji 2002: 54)

এই প্রক্রিয়ায় গৃহীত নতুন সংস্কৃত শব্দ ঋণী ভাষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে। আখেরে শব্দগুলো ভাষার নিজস্ব উপাদান হিসাবে জনগোষ্ঠীর বাগযন্ত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। নমুনা হিসাবে *চর্যাপদের* শব্দভাণ্ডারের উল্লেখ করা যেতে পারে। সুনীতিকুমারের হিসাবে *চর্যা*র হাজার দুয়েক শব্দের মধ্যে ৩১০টি সংস্কৃত শব্দ। কিন্তু এর অনেকগুলোই 'equally tadbhava and tatsama in form' (Chatterji 2002: 218-19)। কারণ এর বড় অংশই প্রাকৃতের কালে গৃহীত হওয়ায় বাংলার নিজস্ব উপাদান হয়ে গেছে। সে হিসাবে, তাঁর মতে, *চর্যা*য় খাঁটি তৎসমের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০০; শতকরা পাঁচ ভাগের মতো। এই পরিমাণের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর হিসাবের মিল আছে (হরপ্রসাদ ২০০০/বিঃ ৩৮০-৪১৯)। শাস্ত্রী আরো দেখিয়েছেন, দুই-চারটি বাদে *চর্যা*র সংস্কৃত শব্দগুলো বাংলায় আজো প্রচলিত। *চর্যা*র পরে সংস্কৃত শব্দ ধারের পরিমাণ বেড়েছে। চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের এক হিসাবে দেখা যায়, অন্তত বানানের দিক থেকে তৎসমের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ১২.৫ ভাগ (Chatterji 2002: 219)। মধ্যযুগের কোনো কোনো কাব্যে সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ মোট শব্দের প্রায় এক তৃতীয়াংশ (Chatterji 2002: 220; Grierson 1903: 16)। এর মধ্যে আছে বহু নামশব্দ, আছে হিন্দুধর্মের অনুশাসন আর পুরোনো কাহিনির সঙ্গে যুক্ত শব্দ। শব্দগুলোর উচ্চারণ প্রায়শই পরিবর্তিত হয়েছে, কোথাও কোথাও বানানও। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, মানুষের জীবনযাপন আর চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দগুলো ব্যাপকভাবে মুখের ভাষায় যুক্ত হয়েছে, বা অন্তত বোধগম্যতার সীমানায় এসেছে। এর অধিকাংশই সরল আর ছোট আকারের শব্দ। তা না হলে জনপ্রিয় লোকগাথায় ৩৩.২ ভাগ (Chatterji 2002: 220) সংস্কৃত শব্দ থাকতে পারত না। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, আলাওল, কাশীরাম দাস বা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মতো কবির অসামান্য লোকগ্রাহ্যতা প্রমাণ করে, বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খেয়ে যাওয়া অঙ্গীভূত সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ বিস্তর।

উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার সংস্কৃতায়ন একেবারেই আলাদা জিনিস। আগের অন্তত তিনশ বছরের চর্চায় বাংলা শব্দভাণ্ডার ও বাগভঙ্গির যে ধারা গড়ে উঠেছিল, 'অশুদ্ধ' অভিধায় সেগুলো বাতিল করে দেওয়া ভিন্নতার মূল কারণ। আগের গদ্য কমবেশি মুখের ভাষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। নতুন ধারায় ছিল খোদ মুখের ভাষাকেই বদলে ফেলার প্রস্তাব। অচলিত সংস্কৃত আমদানির পরিমাণ ছিল অসহ্য-রকমের বেশি। ছিল বানান, শব্দগঠন, ব্যাকরণচিহ্ন, বড় যৌগিক শব্দ এবং দীর্ঘ বাক্যের জটিলতা। আর 'this ornate, over-Sanskritised style evolved not by accident, but by design.' (Das 1966: 123)

ঠিক কতটা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হলে তাকে মাত্রাতিরিক্ত বলা যাবে, তা নির্ধারণ করা সহজ নয়। শিশিরকুমার দাশ (1966: 123) এর একটা কেজো ব্যাখ্যা দিয়েছেন: বাঙালি পাঠক যখন কিছু পড়তে গিয়ে বোধ করে যে, সে বাংলা পড়ছে না, সংস্কৃত পড়ছে, তখন তাকে অতিরিক্ত বলতেই হবে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বহু বইয়ের বেলায় এরকমটাই ঘটেছে। *হিতোপদেশ* গোলকনাথ শর্মা অনুবাদ করেছিলেন ১৮০১ সালে, আর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮০৮ সালে। দুজনের বইয়ের দুই অনুচ্ছেদ করে বিশ্লেষণ করে শিশিরকুমার দাশ (1966: 42-43) দেখিয়েছেন, তাতে সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৪ ও ৭৫ শতাংশ। বাকি শব্দ তদ্ভব। কোনো আরবি-ফারসি শব্দ এ অংশে ব্যবহৃত

হয়নি। হরপ্রসাদ রায়ের *পুরুষপরীক্ষা* গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা শতকরা ৮৮ ভাগ, যার খুব সামান্য অংশই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় (Grierson 1903: 16)। *প্রবোধচন্দ্রিকায়* এই হার আরো বেশি – শিশিরকুমার দাশ (1966: 123) এক অংশ হিসাব করে পেয়েছেন শতকরা ৯২টি। গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে পুরোনো বাংলার এক-তৃতীয়াংশের তুলনায় এই সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে বেশি। দুই-তিন-চার বা তারও বেশি শব্দের সমাস এ গদ্যের আরেক শব্দস্বভাব। এতে সংস্কৃত যৌগিক শব্দ প্রায়শ হুবহু প্রত্যক্ষরীকরণ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, সংস্কৃত 'কুমুদিনীনায়কচন্দ্রাম'কে মৃত্যুঞ্জয় লিখেছেন 'কুমুদিনী নায়ক চন্দ্র'। শব্দগুলো এখানে পৃথক করে লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু একত্র না করলে এর কোনো অর্থ হয় না। বস্তুত, সংখ্যার হিসাবে বা যৌগিক শব্দের প্রাবল্যে এই পরিবর্তনের ভয়াবহতা সামান্যই বোঝা যাবে। পুরোনো বাংলায় যেখানে বাংলা ভাষায় আত্মীকৃত শব্দ হিসাবে দরকারি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হত, নতুন রীতিতে সেখানে অচলিত সংস্কৃত শব্দের পরিমাণই বেশি। কথাটা এভাবে বলা যায়: আগে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ আসলে বাংলা ভাষারই শব্দ; আর নতুন গদ্যে আমদানি করা হয়েছে সংস্কৃত শব্দ। শুধু 'তৎসম' অভিধায় এই দুই প্রজাতির শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে না।

এই বিপুল পরিমাণ শব্দ আমদানির অন্যতম প্রধান কারণ প্রচলিত শব্দ-পরিহার। জর্জ গ্রিয়ার্সন লিখেছেন:

> When the advent of English there arose a demand for prose literature, and the task of supplying it fell into the hands of Sanskritridden pundits. Anything more monostrous than this prose dialect, as it existed in the first half of the nineteenth century, it is difficult to conceive; books were written excellent in their subjects eloquent in their thoughts, but in a language from which something like ninety percent of the genune Bengali vocabulary was excluded, and its place supplied by the words borrowed from Sanskrit, which the writers themselves could not pronounce. (Grierson 1912: 251)

গ্রিয়ার্সন এখানে শতকরা নব্বইটি 'প্রকৃত বাংলা শব্দ' বলতে কোন সব শব্দের কথা বলেছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে তিনি ওই কথার নিশ্চয়তা দিতে পাদটীকায় লিখেছেন, 'this estimate is based on actual counting'। এ কথার সমর্থন মেলে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যে। 'আমাদের ভাষাসংকট' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিত মহাশয়েরা যে গদ্য রচনা করে গিয়েছেন তাতে ফারসি আরবির স্পর্শমাত্র নেই। তাঁদের ঐ তিরস্করণী বুদ্ধির প্রতাপে বাংলা ভাষা থেকে শুধু যে আরবি-ফারসি বেরিয়ে গেল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য তদ্ভব কথাও সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত হল' (প্রমথ ২০০৯: ২৮০)। যেসব শব্দ বিতাড়িত হয়, তাদের শূন্যস্থান পূরণ করে সংস্কৃত শব্দাদি (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ১৮৭)। এমনকি ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে এই ঘটনা ঘটেছে। গোলাম মুরশিদ (১৩৯৯: ১৯৪) বর্জন-গ্রহণের একটি লম্বা তালিকা দিয়ে লিখেছেন, 'মোট কথা, তদ্ভব, দেশি এবং আরবি-ফারসি ক্রিয়াপদের জায়গা নিল সংস্কৃত ক্রিয়াপদ'। তিনি প্রচলিত 'স্বাভাবিক রীতির বিকল্প হিশেবে সংস্কৃত রীতির আমদানিকে' বলেছেন 'চেষ্টাকৃত সংস্কৃতায়ন'। আর শিশিরকুমার দাশ (1966: 88) ওই সময়ের গদ্যে লক্ষ করেছেন 'ছদ্ম-সংস্কৃতায়নে'র ছড়াছড়ি। ভুল সাদৃশ্যের মাধ্যমে ভুল শব্দ গঠন এবং ভুল অর্থে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার – এ দুটি ছদ্ম-সংস্কৃতায়নের মূল বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের সংস্কৃতায়ন আরো বেশি করে প্রমাণ করে যে, সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার এ যুগে ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল।

ছদ্ম-সংস্কৃতায়নের ধারা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে সম্ভবত বানানের ক্ষেত্রে। এর সঙ্গে অবশ্য উচ্চারণের প্রসঙ্গও জড়িত। নতুন ধার করা সংস্কৃত শব্দগুলো সংস্কৃতরীতিতেই লেখা হয়েছে। তাতে উচ্চারণের সমস্যা তৈরি হলেও বানান-সমিতির দিক থেকে কিছু সুবিধাও হয়েছে। কিন্তু সমস্যা প্রগাঢ় হয়েছে তখনই, যখন প্রচলিত 'তৎসম' শব্দগুলোর প্রচলিত রূপকে আমলে না এনে মূল সংস্কৃতের সঙ্গে মিলিয়ে বানান ঠিক করা হয়েছে। তদুপরি তদ্ভব ও অন্য শ্রেণির শব্দের ক্ষেত্রেও বানান-সংস্কৃতায়নের প্রবণতা ছিল অতি প্রবল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> Under the tutelage of the Pandits well acquainted with Sanskrit, whose influence was great at the beginning of the 19th century, when the modern literary style was established for prose (and when printing was introduced), a rigid adherence to the correct orthography for Sanskrit words naturally came in, brought in a needed uniformity for *tatsama* words, in the place of the chaos which reigned before. But the scholastic tendency went beyond its legitimate area, and sought to model the spelling of vernacular tadbhavas on their Sanskrit prototypes and on theories of orthography. (Chatterji 2002: 220-21)

এই প্রবণতা উচ্চারণের সঙ্গে বানানের গভীর ফারাক তৈরি করেছে – এমনকি সংস্কৃত থেকে নতুন আমদানি করা শব্দের ক্ষেত্রেও। কারণ, সংস্কৃত উচ্চারণ-অনুযায়ী এই বানান ঠিক করা হয়েছে, কিন্তু বাঙালির উচ্চারণে তদ্দিনে শব্দগুলোর উচ্চারণরূপ গেছে বদলে। 'As regards the pronunciation of these Sanskrit words, an extraordinary state of affairs exists – paralleled, I believe, in no other language in the world.' – এ মন্তব্য গ্রিয়ার্সনের (Grierson 1903: 14)। বলা যায়, অ-সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে এ সংকট হয়েছে আরো বেশি। ফলে বাংলা শব্দের উচ্চারণ ও বানানের সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে আর বানান বিধিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ওই ছদ্ম-সংস্কৃতায়ন তৈরি করেছে দীর্ঘমেয়াদি সংকট, পরের দুশ বছরেও যার সুরাহা হয়নি।

সংস্কৃতায়নের ওই যুগে সংস্কৃত কেবল শব্দ-আকারেই আসেনি, এসেছে ব্যাকরণিক চিহ্ন আর বাক্য-আকারেও। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়: 'শুধু অসংখ্য কথা যে বেরিয়ে গেল তাই নয়, ভাষার কলকব্জাও সব বদলে গেল। দ্বারা সহিত কর্তৃক পরন্তু অপিচ যদ্যপি সাৎ প্রভৃতির সাহায্য ছাড়া উক্ত সাধুভাষায় পদ আর বাক্য হতে পারত না' (প্রমথ ২০০৯: ২৮০)। বাংলার প্রচলিত বহুবচনচিহ্নের বদলে সংস্কৃত চিহ্নগুলো এসময় গদ্যে জেঁকে বসে। সবচেয়ে বেশি এসেছে লিঙ্গচিহ্ন, যা বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য-বিরোধী। পরিবর্তন এসেছে বাক্যের গঠন ও আকারেও। *প্রবোধচন্দ্রিকা*র সংস্কৃতায়িত বাংলায় দেখা যায় লম্বা লম্বা বাক্য – কোনো কোনোটি প্রায় আধ-পৃষ্ঠা পর্যন্ত লম্বা। বাক্যাংশ, সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ইত্যাদির যোগে পরিকল্পিত কিন্তু অতি দুর্বোধ্য এসব বাক্য। আসলে সংস্কৃত ও বাংলার সম্পর্ক-সংক্রান্ত আর বাংলার উন্নতি-সংক্রান্ত তত্ত্বের ছায়ায় বাংলা গদ্য এ সময়ে হয়ে উঠেছিল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যপ্রকাশের উর্বর এলাকা। তাঁরা সংস্কৃতায়িত রীতিকে ভালো মনে করতেন। বাংলার একটি 'উঁচুরীতি' প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু ফল দেখে নিশ্চিন্তে বলা যায়, এ কাজের জন্য তাঁরা নির্বাচিত হলেও উপযুক্ত ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে সুশীলকুমার দের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> These learned pundits, who traded upon the general ignorance of the people and treated the vernacular with contempt, knew nothing of old Bengali literature, but with a confidence born of untraining and in their eagerness to display their classical learning, they affected a

> pedantic Sanskritised style which was more than what the language could bear. Their very erudition proved their greatest disqualification; and their unwieldy style and its uncouth form, betraying all the absurd defects of an untrained hand, were wholly out of accord with the genious of the language. (De 1962: 252)

গদ্যে পাণ্ডিত্য ও শক্তিমত্তা জাহির করার কথা বলেছেন দীনেশচন্দ্র সেনও (1921: 73); সেসঙ্গে সংকটের জন্য দায়ী করেছেন 'a foolish lack of common sense'কে। চলতি বাংলার সঙ্গে অপরিচয় আর ঘৃণা এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতার উৎস।

৩.৪.৪ উপনিবেশায়নের ফল: ইংরেজ ও ইংরেজির প্রভাব

ইংরেজি ভাষা বাংলাভাষীদের কাছে প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের ভাষা। তাই ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির রচনায় ইংরেজির নানারকম প্রভাব পড়ারই কথা। বাংলার ক্ষেত্রে এ প্রভাব দ্রুততর হয়েছে আরো দুই কারণে। এক. ইংরেজ লেখকদের বাংলা গদ্যচর্চা; দুই. অন্তত উনিশ শতকের তিন দশক পর্যন্ত গদ্যচর্চার প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব।

ধর্মপুস্তকই হোক আর পাঠ্যপুস্তকই হোক – ইংরেজ-রচিত গদ্যের বড় অংশ ছিল ইংরেজি থেকে অনুবাদ বা ইংরেজি গদ্যের অনুসরণে লেখা। তাদের বাংলাবিদ্যা যথেষ্ট পাকা না হওয়ায় এসব রচনায় স্বভাবতই ইংরেজির ভাব-স্বভাব রক্ষিত হয়েছে। ফলে বাংলার বিশিষ্টতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজ লেখকেরা সরল বাংলাই লিখতে চেয়েছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার বাগবিধিতে কোনো দখল না থাকায় এবং ইংরেজি বাক্যরীতিতে বাংলা লেখায় তাদের প্রয়াস শোচনীয়-রকমে ব্যর্থ হয় (Sen 1921: 86-91)। এই ইংরেজি রীতির বাংলা সংশ্লিষ্ট বাঙালি লেখকদেরও প্রভাবিত করেছে। শিশিরকুমার দাশ (1966: 97) লক্ষ করেছেন, ইংরেজি বাক্যের প্রভাবে রামরাম বসুর গদ্যে বাংলার স্বাভাবিক পদক্রম ও বাগবিধি বহুক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়েছে। তাঁর অনুমান, কেরির সঙ্গে বাইবেল অনুবাদের অভিজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। যাঁরা স্বাধীনভাবে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন, তাঁরাও ইংরেজির গড়ন অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া এসব গদ্যে খুব দ্রুত ইংরেজি ভাবের শব্দ ও পরিভাষা ঢুকে পড়ছিল। মার্শম্যানের *বাংলার ইতিহাসের* একটি খণ্ড অনুবাদ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মূল ইংরেজি বইয়ের প্রভাব ফুটে উঠেছে অনুবাদের ভাষাতেও। 'সুলতান সুজা বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া আগমন করিলেন', 'মুরশিদ জামাতাকে আপনার ডেপুটি করিয়া উড়িষ্যাতে পাঠাইয়া দেন' – প্রশাসনিক শব্দের ব্যবহারই জানিয়ে দিচ্ছে যে এই ইতিহাসের রচয়িতা ইংরেজ (পার্থ ২০০১: ১৩৪)।

ফোর্ট উইলিয়াম গ্রন্থমালায় এরকম প্রভাব অল্প-বিস্তর দেখা যায়। রামমোহন রায়ের গদ্যেই ইংরেজির প্রভাব প্রথমবারের মতো প্রকট হয়ে ওঠে (শিশির ১৯৯৯: ৯৫)। *সংবাদ প্রভাকরের* গদ্যে এ প্রভাব গভীরতর ভিত্তি পায়। পরবর্তী বাংলা গদ্যের মূলধারায় গ্রহণ-বর্জনের অব্যাহত প্রক্রিয়ায় এই প্রভাব গভীর শিকড় গজিয়েছে – অন্তত বাক্যগঠনের ভঙ্গিতে এর মাত্রা সংস্কৃতায়নের চেয়েও বেশি। উনিশ শতকের বাংলা গদ্যে ইংরেজির প্রত্যক্ষ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অপূর্বকুমার রায় (১৯৭৬)। তাঁর আলোচনা থেকে প্রভাবের কয়েকটি এলাকা ও ধরন নিচে উল্লেখ করা হল:

ক) বর্তমানকালে 'হওয়া' ক্রিয়ার ব্যবহার: পষ্ট রূপে প্রকাশ করিবার শিল্পবিদ্যা 'হয়' ব্যাকরণ (গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, *ইংরাজী ব্যাকরণ*, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩)। ইহা সুবন্ত প্রকরণীয় 'হয়' (*রামমোহন রায় গ্রন্থাবলী* ৭, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, পৃ. ৬)।

খ) কর্তা ও কর্মের মাঝখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার: এই কথার দৃষ্টান্ত স্থল 'হইয়াছে' সিমিরামিস রাণী (পীয়ার্সন, *প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়*, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৬৭)।

গ) সংযোজক অব্যয় 'এবং/ ও' প্রভৃতির ব্যবহার: ইংরেজি বাক্যগঠনরীতি অনুসরণ করে বাংলায় 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরু করতে দেখা যায়। তাছাড়া, বাংলা বাক্যরীতির অনুসরণে যেখানে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ব্যবহার করা উচিত সেখানে ইংরেজিরীতির অনুসরণে অনেকসময়ে 'এবং' শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন, 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরু: এবং ভগবান মনু সকাম ও নিষ্কামের বিবরণ ... (*রামমোহন গ্রন্থাবলী* ৩, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, পৃ. ৮)।
ক্রিয়াবাচক বিশেষণের পরিবর্তে 'এবং/ ও' ব্যবহার: ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন 'এবং' কহিলেন ... (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, *বত্রিশ সিংহাসন*, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৮)।

ঘ) খণ্ডবাক্যের সজ্জা: ইহা অতি আহলাদের বিষয় যে এখন তুমি এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে (*রামমোহন গ্রন্থাবলী* ৩, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, পৃ. ১২)।

ঙ) সাপেক্ষ বা সমুচ্চয়ী সর্বনাম: এক গাধা যে এক ছোট কুকুরের সহিত এক বাটীতে থাকিত ... (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট*, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৬)।

চ) নিত্য বা পরস্পর-সম্বন্ধী অব্যয়: তাহারা হয় এমন সকল ক্রিয়া যে [যাহারা] অন্য ক্রিয়া সকলের অগ্রে থাকিয়া ... (গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, *ইংরাজী ব্যাকরণ*, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫৭)।

ছ) Neither … nor-এর প্রভাবে গঠিত বাংলা বাক্যের নমুনা: সেখানে 'না' পথিকবাস ছিল যে তাহাতে উত্তরে এবং 'না' কোনো মনুষ্য ছিল যে ... (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *দি ওরিয়েন্টালিষ্ট ফেবুলিষ্ট*, পৃ. ৩২)।

জ) ইংরেজি প্রকাশভঙ্গির অনুসরণ: ইংরেজি well gentleman or sir-এর প্রভাবে 'ভাল মহাশয়'; fell asleep-এর প্রভাবে 'নিদ্রায় পড়িলাম'; on the contrary-র প্রভাবে 'পক্ষান্তরে' শব্দের ব্যবহার; it seems to me that-এর প্রভাবে 'আমার বোধ হয় যে' ব্যবহার। ব্যাপকভাবে আমদানি হয় ইংরেজি indefinite article-এর ব্যবহার, যা বাংলায় দরকার হয় না। ইংরেজি 'true passive'-এর ব্যবহার শুরু হয়। এ ধরনের উদাহরণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন – 'আমি দৃষ্ট হই'। এছাড়া ইংরেজি শব্দের আমদানি তো ছিলই।

উপরোল্লিখিত প্রভাবগুলো মূলত বাহ্যিক। বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে এর অনেকগুলোরই যে বিশেষ সামঞ্জস্য নেই, তা সাদা চোখেই ধরা পড়ে। ফলে এর বেশির ভাগই অনতিবিলম্বে বাংলা গদ্য থেকে ঝরে পড়েছিল (অপূর্ব ১৯৭৬: ৯৭-৯৮)। ১৮৩৯ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত *ধর্মপুস্তকের অন্তভাগে*র গদ্য উদ্ধৃত করেছেন সুকুমার সেন (১৯৯৮: ২৩)। তাতে দেখা যায়, এমনকি ফিরিঙ্গি বাংলা গদ্যও বেশ প্রাঞ্জল আর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। পবিত্র সরকার (১৯৯২: ৭৯) 'শব্দ, পদগঠন, অন্বয়, গুঁজে দেওয়া বাক্যাংশের (parenthesis) ব্যবহার, সংবর্তন (transformations – যেমন ক্রিয়া ও কর্ম বা অব্যয়পদের স্থানপরিবর্তন), অনুচ্ছেদগঠন, বিরামচিহ্ন-যোজন ইত্যাদি' মিলিয়ে ইংরেজি গদ্যরীতির এক সর্বাত্মক প্রভাবের উল্লেখ করেছেন, যা এখনো খতিয়ে দেখা হয়নি। বাংলা গদ্যের উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ায় পবিত্র সরকার-কথিত এই 'সর্বাত্মক' প্রভাবও অবশ্য গৌণ ব্যাপার। কারণ, এই প্রভাব

আসলে ঋণ, যা 'উন্নত' ভাষা থেকে 'অনুন্নত' ভাষায় গৃহীত হয়। উপনিবেশায়ন গোড়ায় এই 'উন্নতি' আর 'অনুন্নতি'র ধারণাটা তৈরি করেছিল। আদতে বাংলা ভাষা সত্যি একটি অপভাষা কি না সে প্রশ্ন কখনো উত্থাপিতই হয়নি। সংস্কৃতের ঐতিহ্য আর ইংরেজির সমকালীন দাপটে বাংলা ভাষার সমর্থকেরাও এর হীনতা বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। এ হীনতার উদাহরণ হিসাবে বারবার উত্থাপিত হয়েছে কথ্য-বাংলার রূপবৈচিত্র্য আর একটি মানরূপের অভাবের কথা। বাংলা গদ্যের নব্যযুগের প্রধান মুরুব্বি উইলিয়াম কেরি বাংলা ভাষার উপভাষাবৈচিত্র্য আর বাগভঙ্গির বিশিষ্টতাকে বারবার সমস্যারূপেই চিহ্নিত করেছেন। অথচ স্বদেশীয় বাংলা চর্চাকারীরা এই যুক্তি একবারও তোলেননি যে 'কোনো জীবন্ত ভাষার কথ্য রূপবৈচিত্র্য সে ভাষার সম্পন্নতারই প্রমাণ' (দেবেশ ১৯৯০: ৫৬)। আর মানরূপ সম্পর্কে বলা যায়, প্রভাবশালী জনসমাজের কথ্যরূপের ভিতেই এর বনিয়াদ গড়ে ওঠার কথা – অতীতের আর ভিনদেশের বরাতে নয়। কিন্তু উপনিবেশে ইতিহাসের কার্যকারণের বিপর্যয়ই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। উপনিবেশে ইংরেজির উপস্থিতি কেবল একটি ভাষার উপস্থিতি নয় – তা ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব বা 'হেজিমনি'র সঙ্গে যুক্ত। কলকাতায় ইংরেজিচর্চা আর বাংলা পরিহারের যে বাস্তবতা তৈরি হয়েছিল, নিছক 'ভাষিক প্রভাব' তা ব্যাখ্যার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, বাংলা গদ্যের জন্য ইংরেজির ছক আর সংস্কৃতের ছক – দুইই ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় কর্তার ইচ্ছাতেই গৃহীত হয়েছিল।

এই দুই ছক বাংলা গদ্যের আপন বৈশিষ্ট্যগুলোকে কিভাবে ভিতর থেকে বদলে দিচ্ছিল তার নানা আলামত মুদ্রিত হয়ে আছে *সমাচার দর্পণে*র গদ্যে (দেবেশ ১৯৯০)।[২৫] সেখানে সাহেব-পণ্ডিতের পারস্পরিক প্রয়োজনবোধ থেকে একটি ধরন বাংলা গদ্যে অনিবার্য হয়ে ওঠে। ইংরেজি বাক্যগঠনপদ্ধতির সন্নিহিত বাক্যগঠন করতে হবে – সাহেবরা যাতে বাক্যের অর্থ বুঝতে পারেন। আবার সে গঠন সংস্কৃত বাক্যগঠনপদ্ধতির সন্নিহিতও হতে হবে – যাতে পণ্ডিতেরা সে ধরনে লিখতে পারেন। এই দুই বিপরীত প্রয়োজনে বাংলা গদ্য একই সঙ্গে বিশেষণবহুল ও সমাপিকা ক্রিয়াবহুল হয়ে ওঠে (দেবেশ ১৯৯০: ৯৫)। দেবেশ রায় এর কারণ নমুনাসহ ব্যাখ্যা করেছেন:

> অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের ভিতরে যে কাজগুলো করতে পারত, অসমাপিকা ব্যবহার না করে সেগুলো নিষ্পন্ন করতে পণ্ডিতরা সংস্কৃত রচনারীতির সমাসসন্ধিবহুল, অনেক সময় প্রত্যয়নিষ্পন্ন বিশেষণ পদের ব্যবহার ঘটালেন। এই ধরনের বিশেষণপদ একটিমাত্র শব্দ হওয়ায় ও তার সঙ্গে বিশেষ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হওয়ায় সাহেবদের পক্ষে এই বিশেষণের ব্যবহার বুঝে ওঠা সহজতর ছিল। 'মেয়েটি কাঁদতে-কাঁদতে আসছে', 'রোরুদ্যমানা মেয়েটি আসছে' – এই দুই বাক্যের মধ্যে প্রথমটি, বাংলা যিনি জানেন না, তাঁর পক্ষে কঠিন। কারণ, 'কাঁদতে-কাঁদতে' এই অসমাপিকা পদটি ক্রিয়াকে বোঝাচ্ছে না কর্তাকে বোঝাচ্ছে এটা তিনি সহজে ধরতে নাও পারেন। তাঁর কাছে পরের বাক্যটির 'রোরুদ্যমানা'র সঙ্গে 'মেয়েটি'র সম্পর্ক সহজবোধ্য। কিন্তু শুধুই বাংলায় কথা বলেন এমন কারো পক্ষে দ্বিতীয় বাক্যটি কঠিনতর, কারণ সেখানে শব্দার্থ ও বিশেষণের লিঙ্গ জানার সমস্যা আছে। (দেবেশ ১৯৯০: ৯৪-৯৫)

বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও শক্তির জায়গা অসমাপিকা ক্রিয়ার বিচিত্র ব্যবহার। পুরোনো গদ্যে এ বৈচিত্র্য বিকশিত হচ্ছিল। নতুন গদ্যে তা লোপ পেয়ে ইংরেজি রীতি-অনুযায়ী বাক্য ক্রিয়ানির্ভর হল, আর সেই গঠনের ভিতর নৈয়ায়িক রীতিতে হেতুবাচক ক্লজ বা সমাসবদ্ধ বিশেষণ গুরুত্ব পেল। ইংরেজিতেও হেতুবাচক ক্লজ ব্যবহারের রীতি (whereas, as because, because of, so that, on account of) প্রচলিত থাকায় এক্ষেত্রে দুপক্ষের সমঝোতায় সমস্যা হয়নি। সব মিলিয়ে এ সময়ের গদ্যের – বিশেষত *সমাচার দর্পণের* – বৈশিষ্ট্যকে এভাবে তালিকাবদ্ধ করা যায়

(দেবেশ ১৯৯০: ১০৪): ১) বাক্যগুলো সমাপিকা ক্রিয়ানির্ভর, ২) অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম, ৩) অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার না করে ক) বাক্যগুলোকে সংযোজক অব্যয় (এবং, ও) দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে, খ) সমাসবদ্ধ বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, গ) যেহেতু-সেহেতু, যথা-তথা ইত্যাদি শব্দ দিয়ে বাক্যগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে, ঘ) -হেতু, -নিবন্ধন, -প্রযুক্ত ইত্যাদি হেতুবাচক সমাসকারক শব্দপ্রয়োগে বাক্যগুলির পরম্পরা নির্দিষ্ট হয়েছে। মোদ্দা কথায়, বাঙালিকে তার নিজের ভাষা সাহেবদের কাছ থেকে শিখতে হচ্ছিল (দেবেশ ১৯৯০: ৮৮)।

কিন্তু উপরে যা বলা হল, তাও তো একদিক থেকে বাক্যের গঠন আর ভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত। পরিবর্তনটা এসেছিল ভাষার মর্ম বা আত্মার দিক থেকেও – বাঙালির উপনিবেশিত অংশের মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গেই তার যোগ। সেই কাণ্ডে প্রধান কুশীলব ছিল ইংরেজি ভাষা। ইংরেজির জন্য উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর আকুলতা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথম পাদে। শাসক-শাসিতের যৌথ আগ্রহে এই আকুলতা ক্রমাগত বেড়ে কাজের ক্ষেত্র থেকে বাংলাকে সম্পূর্ণরূপে বাইরে ঠেলে দেয়। রচনাবলির সত্তর বছর পূর্তিতে লেখা অবতরণিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিতসমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন; সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি – চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন-কি, মুখের কথায়’ (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১: ১৩)। এ মন্তব্যে যে কোনো বাড়াবাড়ি নেই, তার সাক্ষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ‘বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা’য় তিনি লিখেছেন:

> লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য, মিটিং, লেক্চর্, এড্রেস্, প্রোসিডিংস্, সমুদয় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখন ষোল আনা কখন বারো আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে। (বঙ্কিম ১৯৮৯: ২৫৮)

বঙ্কিমচন্দ্র এর কারণও নির্দেশ করেছেন:

> ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান-মর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান-মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল তাহা ভস্মে ঘৃত। (বঙ্কিম ১৯৮৯: ২৫৮)

এ প্রবন্ধে ‘বঙ্গসরস্বতীর তরফ থেকে’ বঙ্কিমচন্দ্র যে ‘আরজি, জবাব ও সওয়ালজবাব’ করেছেন, তাকে নজির ধরে প্রমথ চৌধুরী ‘বাংলার ভবিষ্যৎ’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘সে যুগে ছিল ইংরেজির রেওয়াজ এবং ইংরেজিরই প্রতিপত্তি। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়, অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়, ইংরেজি লিখতেন, ইংরেজি ছাড়া আর কিছু লিখতেনও না, এবং সম্ভবত কথাবার্তাও কইতেন ঐ রাজভাষাতেই’ (প্রমথ ২০০৯: ১২৪)। উপনিবেশের ওই দ্বিভাষিক পরিস্থিতিতে ইংরেজির এই আদর-কদরের বিপরীতে পাল্লা দিয়ে কমেছে বাংলার দাম।[২৬] বাংলা ভাষার ইতিহাস লিখবেন শুনে ইন্সপেক্টর দীননাথ দীনেশচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন, ‘বাঙ্গলা ভাষা কি সত্যই এত বড় একটা জিনিষ হয়ে

দাঁড়িয়েছে যে, এর একটা ইতিহাস লেখা চলে, আর কে সে বই পড়বে বল দেখি!' (দীনেশ ২০০৮: ১৫৫)। দীননাথ সেন তখন পূর্ববঙ্গের শিক্ষাবিভাগের একচ্ছত্র সম্রাট। দীনেশ সেন আরো লিখেছেন (দীনেশ ২০০৮: ১৫৬): 'শুধু দীননাথ সেন মহাশয় নহে, বঙ্গভাষাটা যে একটা ভাষাই নয়, ইহাই ছিল তখনকার ধারণা। ইহার ইতিহাসের আবার কোন একটা মূল্য আছে – ইহা বন্ধু ও সুহৃদ্বর্গের মধ্যে কেহই বিশ্বাস করিতেন না'। নানা কারণে – প্রধানত জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের প্রয়োজনে – উনিশ শতকের শেষাংশ থেকে বাংলার চর্চা বেড়েছে। সেই চর্চার ফলও হয়েছে ক্ষেত্রবিশেষে চোখ-ধাঁধানো। কিন্তু ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির বাস্তব হিসাব-নিকাশের প্রেক্ষাপটেই বাংলা বিকশিত হয়েছে কেবল 'সাহিত্যিক ভাষা' হিসাবে।[২৭] রাষ্ট্রযন্ত্র বা উচ্চশিক্ষার ভাষা হিসাবে বিপুল মানুষের এই ভাষা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি – সেকালেও না, একালেও না।

কলকাতার ইংরেজি-শিক্ষিত নব্যসমাজ বাংলার চর্চা খুব সামান্যই করেছে। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর পত্রিকা *জ্ঞানান্বেষণে*র প্রথম সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তখন একটি কাগজে মন্তব্য করা হয়েছিল, 'বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভালো পারেন না … অথচ বাঙ্গালা সমাচার কাগজের সম্পাদক না হইলে নয়' (উদ্ধৃত, দেবেশ ১৯৯০: ৩১)। এই মন্তব্য যে নিছক কথার কথা নয়, তার প্রমাণ এই যে, এই কাগজের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের পর রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ সক্রিয় থাকলেও লেখার মূল দায়িত্ব পালন করেছেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের মতো নিয়োগকৃত পণ্ডিত-লেখকেরা। 'মাতৃভাষা-অনভিজ্ঞ শিক্ষিত বাঙালির কাছে বাংলা-না-জানা সাহেবদের মতোই এ ছাড়া যেন কোনো উপায় ছিল না' (দেবেশ ১৯৯০: ৩১)। রাজনারায়ণ বসু সেকালের ছাত্রদের বাংলা-বিদ্যার দুরবস্থার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।[২৮] সে বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, এ দুরবস্থার প্রধান কারণ ছিল মুখের ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতায়িত নতুন বাংলার প্রতাপ। কারণ যাই হোক, নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চর্চার তালিকা থেকে যে বাংলা বাদ পড়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলার বদলে ইংরেজির গ্রহণ কেবল একটি ভাষার পরিবর্তন নয় – খোদ জীবনদৃষ্টি আর চারপাশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্রমটাই উলটে যাওয়া। সেই উলটানো সম্পর্ককে স্বাভাবিক ভেবে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মাধ্যমেই বাংলায় সবচেয়ে গভীর ঔপনিবেশিক প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে। নগুগি ওয়া থিওঙ্গো আফ্রিকার বাস্তবতায় এ অবস্থার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছেন:

> Take language as communication. Imposing a foreign language, and suppressing the native languages as spoken and written, were already breaking the harmony previously existing between the African child and the three aspects of language. Since the new language as a means of communication was a product of and was reflecting the 'real language of life' elsewhere, it could never as spoken or written properly reflect or imitate the real life of that community. … This resulted in the disassociation of the sensibility of that child from his natural and social environment, what we might call colonial alienation. The alienation became reinforced in the teaching of history, geography, music, where bourgeois Europe was always the centre of the universe. (Thiong'o 2007: 16-17)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'প্যারীচাঁদ মিত্র' প্রবন্ধে সমকালীন বাংলা গদ্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ভিন্ন ভাবে-ভাষায় এই বিচ্ছিন্নতার কথাই বলেছেন – ভাবের বিচ্ছিন্নতা থেকে জাত গদ্যের বিচ্ছিন্নতার কথা:

> অনেক সময় তাঁহার [প্যারীচাঁদ মিত্রের] ভাব আসিত ইংরাজিতে, সেগুলিকে বাংলা করিতে তাঁহার বিশেষ বেগ পাইতে হইত। আবার সেগুলি সহজ হইলেও চলিত বাংলা হইত না। সে ইংরাজি-বাংলা হইত। এই ইংরাজি-বাংলাটাই শেষ ইংরাজি-শিক্ষিত মহলে বড়োই চলিয়া গিয়াছে। সেটা কিন্তু সংস্কৃত চলার চেয়ে খারাপ হইয়াছে। ... ইংরাজি-নবিশ বাংলা লিখিতে গেলেই এই দোষ করিবেন এবং তাহাতে এই ভাষা বাঙালিদের পক্ষে দুর্বোধও হইবে। যাঁহারা রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি লিখেন, এই কারণে তাঁহাদের ভাষা লোকের কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়, এবং তাঁহাদের বইও চলে না। (হরপ্রসাদ ২০০০/বিঃ ১৫১)

আসলে নতুন গদ্যের একটা বড় অংশ থেকে বাঙালির কণ্ঠস্বর লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। এমনিতেই মুখের ভাষা যখন লিখিত ভাষার আকার নেয় তখন তার চেহারা বদলে যায়। আর বাংলার ক্ষেত্রে তো মুখের ভাষাকে বিয়োগ করেই লেখার ভাষা গড়ে উঠছিল। দেবেশ রায় (১৯৯০: ১৭৪-২৪০) দেখিয়েছেন, পুরোনো চিঠিপত্রের বিধিবদ্ধ কাঠামোতেও লেখকের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার পড়া যায়। নতুন জমানায় প্রচলিত বাগভঙ্গি আর শব্দভাণ্ডার বর্জিত হওয়ার পাশাপাশি লেখার বিষয়েরও গুরুতর বদল হয়েছিল। নগুগি ওয়া থিওঙ্গো যাকে বলেছেন ইউরোকেন্দ্রিক বিশ্বদৃষ্টি আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন ভাবের ইংরেজিয়ানা, তা বড় অংশে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যে বিষয়গুলো তখন চর্চার বিষয় হয়ে আসছিল, যেগুলো জীবন ও জগতের মূলভিত্তি-আকারে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল, সেগুলোর সঙ্গে বাঙালি ও বাংলার কোনো যোগ ছিল না। এর মধ্যে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি', 'উদারনীতি', 'উপযোগবাদ' বা 'ইতিহাস' যেমন ছিল, তেমনি ছিল 'ধর্ম', 'বিজ্ঞান', 'জাতীয়তাবাদে'র মতো বিষয়-আশয়। এসব বিষয় বা সংশ্লিষ্ট পরিভাষা পশ্চিমে বিকশিত হয়েছিল কয়েকশ বছর ধরে। সমাজবিকাশের নিজস্ব নিয়মে ওই জনগোষ্ঠীর একটি অংশ এগুলো রপ্ত করেছিল। ভারতীয় জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার কোনো যোগ বা মিল এর সঙ্গে ছিল না। অন্য সংস্কৃতির শব্দ হুবহু ব্যবহার করলে অর্থের যে বিকৃতির আশঙ্কা থাকে, তা ঠেকানোর কথাও তখন ভাবনায় আসেনি। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে তুষ্ট ইংরেজি-শিক্ষিত গোষ্ঠী স্বভাবতই এই মোহে পড়েছিল যে, শব্দগুলো তাদেরও। একে বলা যায় ভাষার 'সংকেতক' ও 'গ্রাহকে'র ভূমিকা-বিপর্যয়, যা অনিবার্যভাবে অর্থের ইতিহাসের বিপর্যয় তৈরি করে। বাংলা গদ্য তৈরি হচ্ছিল এই বিপর্যয়ের মধ্যে। তাতে রাষ্ট্রের আলোচনা চলছিল এমন এক জনগোষ্ঠীর জন্য, যারা রাষ্ট্রপরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত; মানবতাবাদ প্রচারিত হচ্ছিল এমন পরিস্থিতিতে, যখন ভূমিতে জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার তলের সঙ্গে কোনো সঙ্গতি না রেখেই – বলা যায় বাস্তব-নিরপেক্ষভাবেই – কথা তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। দেবেশ রায় একে বলেছেন অনুবাদ গদ্য: 'একটি ভাষা তৈরি হচ্ছে যার প্রাথমিক ব্যবহার ঘটেছে অনুবাদে – ভাষার অনুবাদ নয় – বর্তমান অভিজ্ঞতার অনুবাদ, ইতিহাসের ব্যাখ্যার অনুবাদ, আর এই দুইয়ের মিশ্রণে চৈতন্যের অনুবাদ' (দেবেশ ১৯৯০: ৬৯)। এভাবে নতুন গদ্য জন্মক্ষণেই জীবনবিচ্ছিন্নতার বীজাণুতে আক্রান্ত হয়ে গেল।[২৯]

৩.৫ গদ্য ও ভাষাবোধের সার্বিক পরিবর্তন

বস্তুত উপনিবেশিত বাংলা গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর জনবিচ্ছিন্নতা। সতের শতকের শেষের দিকে ইংরেজি বাক্যের বর্তমান রূপ তৈরি হয়েছে। জাতীয় বিপ্লবের সময়ে ইংরেজি গদ্য সাধারণ মানুষের ভাষাকে আলিঙ্গন করেছিল। 'পিউরিটান কিংবা প্রটেস্টান্ট, রাজনৈতিক প্রচারপত্রের লেখক কিংবা সাংবাদিক, বিজ্ঞানী এবং এমনকি রয়েল

সোসাইটি পর্যন্ত 'শিল্পশ্রমিক, দেশের প্রান্তীয় মানুষ আর ব্যবসায়ীদের ভাষা' অবলম্বন করেছিল' (Bhattacharya 1975: 223-24)। ঔপনিবেশিক বাংলা গদ্যের দশা ছিল এর ঠিক বিপরীত। গড়ন-যুগে জনমানুষের মুখের ভাষা থেকে সরে গিয়ে তা ভর করেছে সাধুরীতির অনড় ভঙ্গিতে। এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য:

> I believe, the cleavage cannot be explained in literary term alone; to find anything like a complete answer, one must go beyond the frontiers of literature. For prose, like language, is a social product. And therefore, the contradictions of our nineteenth century prose reflect the dialectics of our nineteenth-century society: the estrangement of our prose from 'the language of artisans, countrymen' mirrors the alienation and identity crisis of the newly emergent urban *bhadralok*. (Bhattacharya 1975: 223)

উপনিবেশিত সমাজের গড়নের মধ্যেই গদ্যের সংকোচক-নীতির প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত লুকিয়ে আছে। কোনো জাতীয় প্রকল্প না থাকায় জাতীয় ভাষা প্রতিষ্ঠার বদলে ভদ্রলোকদের গোষ্ঠীভাষা প্রতিষ্ঠার দিকেই ঝোঁকটা ছিল প্রবল।[৩০] সমসাময়িক বাংলা ভাষাচর্চার 'অভদ্র' ধারার কথা মনে রাখলে উপনিবেশিত গদ্যের গোষ্ঠীবদ্ধতার দিকটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে।

আঠার শতকের শেষে ও উনিশ শতকের গোড়ায় 'মানসম্মত' সাহিত্যকর্ম না হলেও 'অশিক্ষিত' কবিওয়ালা, যাত্রাকার, কথাকার ও পাঁচালিকারেরা একেবারেই দেশি অনুপ্রেরণায় বাংলা লিখছিলেন। এঁদের ভাষা সম্পর্কে সুশীলকুমার দে লিখেছেন:

> A little Sanskritised on the one hand and a little Persianised on the other, the language preserved the equipoise perfectly and drew its nerve and vigour from the soil itself. It was so direct in its simplicity, so dignified in its colloquial ease, and so artful in its want of art that it never failed to appeal. (De 1962: 258)

পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের তুলনায় এই সাহিত্য ভালো কি খারাপ সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এঁদের অনেকে সমকালেই জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি পেয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ করার বিষয়, বাংলা ভাষা পুনর্নির্মাণের ঔপনিবেশিক যজ্ঞে এই লেখকদের একজনেরও ডাক পড়েনি। বই ছাপা আর পড়ার জগতের খবরও এখানে প্রাসঙ্গিক। ১৮১৬ সালে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* ছাপিয়ে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছাপার জগতে এক নতুন যুগের সূচনা করেন (অনিন্দিতা ২০১১: ১০)। ওই বছরের মধ্যেই *রামায়ণ* আর *মহাভারত*ও মুদ্রিত হয় (Kamal 1977: 11)। এই বইগুলো অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। উনিশ শতকের শেষাংশেও 'বটতলার বই' বলে পরিচিত বইয়ের জনপ্রিয়তা কমেনি, বরং বেড়েছে; আর শিক্ষিত ভদ্রজনগোষ্ঠীও ছিল এসব বইয়ের উৎসাহী ভোক্তা (গৌতম ২০১১; অনিন্দিতা ২০১১)। জনপ্রিয় এই ভাষা সার্বিকভাবে পরবর্তী গদ্যকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছে। কিন্তু সচেতনভাবে নির্মিত প্রভাবশালী বয়ানে কখনো এর ঠাঁই হয়নি। 'ভাষার সংস্কৃতায়ন, কথ্যভাষা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা এবং 'অশ্লীলতা'-দোষে দুষ্ট সমস্ত প্রকার সাহিত্য ও লোককলা বর্জনের প্রবণতার দ্বারা উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি গড়ে তোলে তাদের আদর্শ সাহিত্যসম্ভার' (অনিন্দিতা ২০১১: ৪)। অন্তত 'বিদ্যাসাগরী গদ্য' পর্যন্ত এই চালু 'সাহিত্যিক' ভাষার সমস্ত ছোঁয়া যে এড়িয়ে চলা হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছাপা বই

ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর* (Kamal 1977: 190)। এ বইয়ের কিছু অংশ পুরোনো ঘরানার ভাষার নমুনা হিসাবে নিচে উদ্ধৃত করা হল:

১. কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা ৷৷
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে ৷৷
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে ৷৷ (বিদ্যার রূপবর্ণন)

২. বিদ্যা করেছিল পণ   বিদ্যা করেছিল পণ।
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন ৷৷
পণে জাতি কেবা চায় পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় ৷৷
দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ ৷৷ (রাজার নিকট চোরের পরিচয়)

প্রথম অংশে তৎসম শব্দের প্রাধান্য। পুরোনো বাংলা সাহিত্যের তৎসমবহুল রচনারীতির – আলাওল বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখায় যে রীতির দেখা পাওয়া যায় – সঙ্গে এর যোগ। এই তৎসম শব্দগুলো তৎসমই – সংস্কৃত নয়। এগুলো আজো একইরূপে ব্যবহৃত হয়। যৌগিক শব্দগুলো দুইটি পদযোগে গঠিত – যা বাংলা ভাষার বর্তমান শব্দস্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সবচেয়ে বড় কথা ক্রিয়াপদের স্বাভাবিকতা আর উচ্চারণভঙ্গির সুস্পষ্ট রেখাপাত বাক্যের গড়নে – কাব্যিক ভাষার বিশিষ্টতার মধ্যেও – কোনো কৃত্রিমতা তৈরি হতে দেয়নি। দ্বিতীয় অংশ ভারতচন্দ্রের অসামান্য বাকচাতুরির নমুনা। কিন্তু সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যদি শব্দতালিকা আর উচ্চারণভঙ্গি পরীক্ষা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে বর্তমান বাংলা ভাষার সঙ্গে তার একবিন্দু ফারাক নেই। গ্রন্থটির অসামান্য জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ যে এর ভাষার স্বাভাবিকতা, তাতে সন্দেহ করা চলে না।

নতুন গদ্যের জন্য সমকালীন গদ্য বাদ দিয়ে পুরোনো কাব্যের বরাত দেওয়া হয়েছিল। নতুন গদ্যের সংস্কৃতবাহুল্যের সমান্তরালে সাধারণত নজির টানা হয় পুরোনো কাব্যের সংস্কৃতায়িত ভাষার। এ দুটি তত্ত্বত ঠিক হতেও পারে। কিন্তু বাস্তবে নানা প্রত্যক্ষ কারণে কৃত্রিম উচ্চারণভঙ্গির যে নতুন গদ্য উৎকৃষ্ট গদ্য বলে প্রতিষ্ঠা পায়, তাতে পুরোনো পদ্যেরও কোনো ছায়া ছিল না। এ প্রসঙ্গে গ্রিয়ার্সনের মন্তব্য:

> Their language (Chandi-das, Kasiram, Kritti-bas, Mukunda-ram, Bharat-chandra) offers a marked contrast to the pandit-ridden language of the present century. They wrote in genune nervous Bengali, and the conspicuous success of many of them shows how baseless is the contention of some writers of the present day, that Bengali needs the help of its huge imported Sanskrit vocabulary to express anything except the simplest ideas. (Grierson1903: 16)

পুরোনো পদ্য ভিন্ন জনসমাজে গদ্য-পদ্য আকারে পুরো উনিশ শতক জুড়েই চর্চিত হতে থাকে। বটতলার প্রকাশনার বিপুল সমৃদ্ধিই তার প্রমাণ। এখানে ভাষার যেমন একটা অবিচ্ছিন্নতা ছিল ঠিক তেমনি জনসংস্কৃতিতেও ছিল ধারাবাহিকতা। যেমন, যাকে ব্যাপকভাবে পরে 'দোভাষী পুথি' বা 'মুসলমানি বাংলা' বলা হয়েছে, পুরো উনিশ শতক জুড়ে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজে সেই ভাষার রচনা বিপুল পরিমাণে রচিত ও পঠিত হয়েছে। *গোলে বকাওলি*, *ইছফ জোলেখা*, *লায়লি মজনু*, *সাহানামা* প্রভৃতি জনপ্রিয় বইয়ের অনুবাদক, প্রকাশক আর ভোক্তার তালিকায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল প্রচুর (গৌতম ২০১১: ২২৫-৩০; সুমন্ত ২০১১: ১১৮)। সব মিলিয়ে কবিগান, পাঁচালি, যাত্রাপালা থেকে শুরু করে মুসলমানি পুথি পর্যন্ত হিসাবে ধরলে দেখা যাবে, ছোট্ট ভদ্রসমাজের সংস্কৃতপনা-ইংরেজিয়ানার বাইরে পুরোনো সংস্কৃতির একটা বলিষ্ঠ অনুবর্তন চলছিল। তাতে কী ভাষায় কী সংস্কৃতিতে মেশামিশিটাই বেশি – বিরোধ অনেক শমিত। এই বস্তু ভদ্রঘরেও হানা দিয়েছে বারবার। কিন্তু জনবিচ্ছিন্নতার গভীর দেয়াল ভেদ করে নতুন সংস্কৃতি বা নতুন গদ্য তা থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করতে পারেনি। ভাষা সমাজের সুরেই কথা বলেছে।

নতুন সাহিত্যিক গদ্যকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (2002: 134) বলেছেন 'doubly artificial language'। এই বানানো গদ্যের প্রধান সঙ্কট দাঁড়াল এই যে, নতুন ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত নন এমন মানুষের কাছে এই গদ্য পৌঁছাতে পারেনি।[৩১] এমনকি শিক্ষিত শ্রেণির একটা বড় অংশের কাছেও যে এ গদ্য বিশেষ সুখকর ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসুর বর্ণনায় (টীকা ২৮ দ্রষ্টব্য)। এর কারণ, কেবল আমজনতার ভাষা নয়, এই গদ্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা থেকেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছিল। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন তাঁর প্রভাবশালী গ্রন্থ *Imagined Communities* (1983)-এ দেখিয়েছেন, ছাপাখানার দৌলতে ধ্রুপদী ভাষা ও উঁচুকোটির সংস্কৃতির নিচে কিন্তু কথ্যভাষার উপরে ভাষার একটা লেখ্যরূপ গড়ে ওঠে, যা জাতীয়তার পরিচয় তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই মানরূপ কিন্তু প্রভাবশালী উপভাষার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে এবং ক্রমে কথ্যরূপ থেকে আলাদা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইংরেজির ক্ষেত্রে এমনই হয়েছিল:

> The recognizably 'modern' form of English may be said to have arrived within Britain from the fifteenth century onwards, when the East Midlands dialect became adopted as 'standard' by, for example, Caxton and Wycliffe, for their first printed works. … The distinction between the standard form of a national language and local and class variants which are called dialects, should be familiar; although it may be news that the contest between the forces of standardization and localization, on written and spoken levels, goes back such a long time. But it is important to remember that it is a distinction which has been constructed over time, the standard form being traceable back to a dialect which gained prestige and acceptance for sociopolitical and economic reasons – including at times its adoption as a literary medium, for example in the case of the poet Chaucer's use of Southern, London-based version of what was becoming the dominant Midlands dialect towards the end of the fifteenth century. (Walder 1998: 45)

শুধু ইংরেজি নয়, বিখ্যাত ইউরোপীয় ভাষাগুলোর বেশিরভাগের ক্ষেত্রে এ রকম ইতিহাস পাওয়া যায় – পরভাষা বা ধ্রুপদী ভাষা পরিহার করে জনপ্রিয় লোকভাষা অবলম্বনে মানভাষার পত্তন (Anderson 1983: 67-79)। বাংলার ক্ষেত্রেও ছাপাখানা নিঃসন্দেহে প্রভাবশালী গদ্যরীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে অবিকশিত-অগঠিত মধ্যবিত্ত নিজের মুখের ভাষাকে ‘মানভাষা’ দাবির হিম্মৎ বা কাণ্ডজ্ঞান দেখাতে পারেনি। দাসত্ব করেছে ধ্রুপদী ভাষার; মেনে নিয়েছে শাসকের দাবি, বশ্যতা মেনেছে শাসকের ভাষার। তাতে মানভাষার ক্রম গেছে উলটে। ভাষা জিব থেকে কলমে না এসে কলম থেকে জিবে আসার চেষ্টা করেছে। ফল হয়েছে কথার ভাষায় লেখার ভাষায় দুরারোগ্য ফারাক। সে এমনই যে, উনিশ শতকের শেষাংশেও শ্যামাচরণ গাঙ্গুলিকে লিখতে হয়েছে:

> Some difference … between written language and spoken may be unavoidable from the very nature of things – nay desirable; but it is certainly as desirable that this difference should be at its minimum. In our Bengali language, however, the divergence between its spoken and written forms, is about as wide as it well can be; … (Ganguli 1990: 15)

পরের বছর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও একই কথা লিখেছিলেন: ‘বাঙ্গালার লিখিত ও কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। … একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা’। (বঙ্কিম ১৯৮৯: ৩৩৯)

ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতেই কেবল এমনটা সম্ভব।

টীকা

১. হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন, 'It is scarcely believed that Bengal ever possessed a native and peculiar dialect of its own, distinct from that idiom which, under the name of Moor's, has been supposed to prevail over all India.' (Halhed 1980: ii) ইংরেজরা যে হিন্দুস্থানিকে এ অঞ্চলের ভাষা মনে করত এবং বাংলার ব্যাপকতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, তার ইশারা ফরস্টার এবং কেরির লেখায়ও পাওয়া যায়।

২. 'Since Bengal was the immediate cultural frame of reference for that policy's realization, the Bengali language became the first Sanskritic-derived vernacular to be studied systematically by Englishmen.' (Kopf 1969: 19-20)

৩. প্রাচ্যবাদীদের ধ্রুপদী শাস্ত্রচর্চা সম্পর্কে এডওয়ার্ড সাইদের মন্তব্য:

> What the European took from the classical oriental past was a vision (and thousands of facts and artifacts) which only he could employ to the best advantage; to the modern oriental he gave facilitation and amelioration – and, too, the benefit of his judgement as to what was best for the modern orient. (Said 1995: 79)

৪. এ সম্পর্কে বিপরীত মতই অবশ্য বেশি পাওয়া যায়। সুশীলকুমার দে (1962), সজনীকান্ত দাস (১৩৫৩), সবিতা চট্টোপাধ্যায় (১৯৭২), দেবেশ রায় (১৯৯০) কিংবা গোলাম মুরশিদের (১৩৯৯) মতো অনেকেই মনে করেন, বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের সাহেবদের সক্রিয়তা প্রধান নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে।

৫. ধ্রুপদী ভাষার অনুকরণে চালু ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন সমকালীন ইউরোপের স্বাভাবিক চর্চা। নব্য-ইউরোপীয় ভাষাগুলোর ব্যাকরণচর্চায় লাতিনের প্রভাব এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অন্যদিকে, ভারতীয় ঐতিহ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা জ্ঞানচর্চার প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসাবে বিবেচিত হত। ফলে বাংলা সংস্কৃতের কন্যা হিসাবে সাব্যস্ত হওয়ার পর সংস্কৃতের ছাঁচে বাংলা ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে কোনো জ্ঞানগত বাধা আর ছিল না। তবে হ্যালহেডের নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন উইলিয়াম জোন্সের ফারসি ব্যাকরণ দ্বারা। জোন্স যেমন ফারসি ব্যাকরণে আরবির ছক ব্যবহার করেছিলেন, হ্যালহেড তেমনি বাংলা ব্যাকরণে যথাসম্ভব সংস্কৃতের উদাহরণ টেনেছেন। আবদুল কাইউমের হিসাবে হ্যালহেডের ব্যাকরণে অন্তত ৬৫ বার সংস্কৃতের প্রসঙ্গ এসেছে (Qayyum 1982: 88)।

৬. বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়নকে বাড়াবাড়ি-রকমের মূল্য দিয়েছেন সবিতা চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু কেরির অভিধানের সংস্কৃত-বাহুল্য তাঁরও অনুমোদন পায়নি। তিনি লিখেছেন:

> প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাভাষায় যে সংস্কৃত শব্দেরই আধিপত্য কেরী ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের মতে তিনি সংস্কৃত প্রীতিতে বাঙ্গালাভাষার প্রতি যেন অনিচ্ছায় সামান্য অত্যাচারই করিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে তাঁহার বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধানে 'অক্রিয়মান', 'তিনকাল', 'পরপূর্বাস্ত্রী', 'হেলিতমুখ-তুস্যাকৃতি', 'এতৎপ্রতিষ্ঠাপ্রতিবন্ধক', 'অকল্পিততা', 'এতৎপ্রত্যয়ধ্বংসক' প্রভৃতি শব্দ যথেচ্ছ সংকলিত হইয়াছে। এইসব শব্দ লেখায়, বা বলায় – বাঙ্গালাভাষায় কোথাও ব্যবহৃত হয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কেরী সংগৃহীত বাঙ্গালা শব্দের মধ্যে বরদাস্ত, কায়েম, ওকালৎ – ইহা হইতে উকিল, ওকালতি প্রভৃতি বিদেশী শব্দগুলি যতদূর বাঙ্গালা, 'মাছ' বুঝাইতে 'কঙ্কত্রোটি' সেরূপ নহে। শব্দটি কুত্রাপি বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অত্যধিক সংস্কৃতপ্রীতির ফলে, সংস্কৃত পণ্ডিতগণের

সাহায্যে ও প্রভাবে এবং সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালার জন্ম – এই সূত্রটি সরবে ঘোষণা করিতে গিয়াই এই বিপদ ঘটিয়াছে। চোঙ্গার মতো মুখওয়ালা থলে বুঝাইতে কেরীর অভিধানকে অনুসরণ করিয়া যদি 'হেলিতমুখ-তুম্ব্যাকৃতি' বাঙ্গালাভাষায় চালু হইত তবে এখন আমরা যে বাঙ্গালা পাইতেছি তাহা পাইতে হয়ত আরও একশত বৎসর সময় লাগিত। (সবিতা ১৯৭২: ২৩৫)

৭. বাংলা বর্ণমালা সম্পর্কে মানোএল লিখেছেন:

> একই দেশবাসীর মধ্যে লিখনরীতিতে বিশেষ প্রভেদ আছে; কারণ কেহ কেহ একজাতীয় বর্ণ ব্যবহার করে, অন্যে অন্যজাতীয় বর্ণ প্রয়োগ করে, বিশেষ বিশেষ বর্ণের সঙ্গতিবিষয়ে ঐক্যমতের সম্ভাবনা অদ্যাপি নাই; সহজেই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে গণ্ডগোল হইতে পারে। ... ব্রাহ্মণেরা, যাঁহারা এই বর্ণমালা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী, তাঁহারা মূলেই ভুল করিয়াছিলেন, এবং বাক্যাংশের (syllable) স্থলে বরং একটি বর্ণ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বর্ণমালাটি নষ্ট করিতে বসিলেন। (মানোএল ১৯৩১: ৩৯)

৮. পরোক্ষ কিন্তু জোরালো সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে মোহাম্মদ আবদুল কাইউম জানিয়েছেন (Qayyum 1982: 90-94), হ্যালহেডের হাতে আসসুম্পসাঁওয়ের *Vocabulario* পৌঁছেছিল এবং তিনি এটি রপ্ত করার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু মাঝপথে এ চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। কেন? কাইউম অনুমান করেছেন – এবং পারিপার্শ্বিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে করা এই অনুমান গ্রহণযোগ্য – যে, 'The *Vocabulario* … was over-hastily abandoned by Halhed because of his preoccupation with 'pure' Bengali as exhibited in 'Authentic' books.' হ্যালহেডের জন্য এই শব্দকোষ বিব্রতকর ছিল। সহকারী পণ্ডিত মারফত যে শব্দরূপের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, এই কোষের সঙ্গে তার মিল ছিল খুব সামান্য। এর উচ্চারণভঙ্গি বাংলার কথ্য উচ্চারণভঙ্গি, সংস্কৃতায়িত নয়। এতে পূর্ববঙ্গীয় শব্দ ও উচ্চারণভঙ্গির প্রাবল্য ছিল। এসবই ছিল হ্যালহেডের অভিজ্ঞতা ও তার পরামর্শক-শিক্ষকের মতানুযায়ী আদর্শ বাংলার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কাইউমের মতে, আস্‌সুম্পসাঁওয়ের কাজ ঠিকমতো পর্যালোচনা করলে হ্যালহেডের কাজ বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় সম্ভবত আরো সফল হত; কিন্তু না করায় হ্যালহেড – তাঁর নিজের দাবি মোতাবেক – বাংলা ভাষা নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কাজ করতে পেরেছেন। এ এক 'নতুন' বাংলা ভাষা।

৯. সুব্রত দাশগুপ্ত একটি সরল 'বিপরীতার্থক শব্দজোড়' তৈরি করে এই গ্রহণ-বর্জনের গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক পরিণাম নির্দেশ করেছেন:

> The story of this cognitive revolution began, as we have seen, not with Indians but with British – the British Orientalists, in particular. … it is their production of an 'orientalist cognitive identity' about India that is of huge interest. At its core is a schema representing the concept of an Indian 'golden age' in antiquity, along with an interconnecting wave of beliefs, facts, and values pertaining to that 'golden age'. Other particularly significant aspects of the orientalist cognitive identity is the comparative stance as an element of cognitive style; and a feeling of admiration for this 'golden age'. In Freud's terms, the orientalist cognitive identity was a positive one.
>
> Counterpoising the British orientalists, there were the British Anglicists – people like James Mill, who never set foot in India and Thomas Babington Macaulay, who did. And they brought to the table a schema about both the Indian past and Indian present that represented

> – again in Freud's term – a 'negative' identity. Together, the orientalist 'positive' and the Anglicist 'negative' cognitive identities constituted the seed of the new shared cognitive identity for the Indian intelligentsia. (Dasgupta 2007: 237-38)

১০. নতুন ক্ষমতাকাঠামোয় এই ধরনের কিছু কিছু আনুকূল্য মুসলমান সমাজও পেয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে তা হিন্দু সমাজের সঙ্গে তুলনীয় নয় (৩.৩.৩ দ্রষ্টব্য)।

১১. উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে একই সঙ্গে পশ্চিমা শাস্ত্র আর সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতদের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটে পুরোনো জমানার সংস্কৃত-পণ্ডিতদের আধিপত্য হ্রাস পায়। এ সময়ের এবং পরবর্তীকালের অনেক রচনায় – যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় – 'ভট্টাচার্যগোষ্ঠী' আর 'টুলোর পণ্ডিত'দের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে দেখা গেছে। এই ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণ পশ্চিমা শিক্ষার যোগ, ব্রাহ্মণ বা সংস্কৃতের বিয়োগ নয়। একে বলা যায়, গভীরতর জ্ঞানতাত্ত্বিক উপনিবেশায়ন। উনিশ শতকের প্রথমাংশে কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তির জন্য কেবল সংস্কৃতের বিদ্যাই যথেষ্ট ছিল।

১২. মেনে নেওয়ার পেছনে শাসকশ্রেণির 'প্রাচ্যবাদী' মনোভাব হয়ত কাজ করে গেছে। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

> শাসকবর্গের পক্ষে এটা মনে করা খুবই যুক্তিসংগত ছিল যে সমাজের সর্বস্তরে ব্রাহ্মণদের যে আধিপত্য আছে তা কাজে লাগাতে পারলে তাদের লাভ বৈ ক্ষতি নেই। বেনারস সংস্কৃত কলেজের নিয়মাবলি রচনার মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য অভিমান ও সংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাবে। নিয়মাবলির খসড়া প্রস্তাব অনুসারে, এক চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনো বিভাগে অব্রাহ্মণদের অধ্যাপনার সুযোগ থাকবে না; শিক্ষার্থীদের বছরে চারবার রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে পরীক্ষা দিতে হলেও, হিন্দুধর্মমতে যেসব তত্ত্ব অতি পবিত্র বলে গণ্য সেসবের পরীক্ষা কেবল ব্রাহ্মণেরাই নেবেন; গুহ্য বিদ্যাসমূহের পরীক্ষার দায়িত্বে থাকবে রেসিডেন্ট অনুমোদিত ব্রাহ্মণদের বিশেষ কমিটি; কলেজের শৃঙ্খলাবিধি সব দিক থেকে ধর্মসম্মত হওয়া চাই, মনুসংহিতার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ও নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে রক্ষিত হওয়া উচিত; ... স্পষ্টতই কোম্পানির অধিকর্তারা অধিকারভেদ তত্ত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুলতে চাননি তখন। (শিবাজী ১৯৯১: ৯৭)

১৩. এ ব্যাপারে সুমিত সরকারের সতর্ক মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'The English educated found very few Muslim among their peers, due to factors not yet fully explored but certainly not unconcerned with the socio-economic patterns of post-permanent settlement Bengal.' (Sarkar 2000: 77)

১৪. ফারসি রাজভাষা হিসাবে বহাল থাকা ইংরেজদের এই ঔপনিবেশিক নীতিরই প্রতিফলন (২.৫ দ্রষ্টব্য)। একে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধহীনতা বা মুসলমানপ্রীতি হিসাবে দেখার সুযোগ নেই। রাজভাষা হিসাবে ফারসি বলবৎ থাকায় রাজকর্মচারী সৃষ্টির জন্যই কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৩৯: ভূমিকা)। একই কারণে পরে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। রাজকার্যে মুসলমানদের নিয়োগ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দ্রুত হ্রাস পায়। আর ১৮৩৭-এর বহু আগে থেকেই সরকারি কাজকর্মে ফারসির ব্যবহার উঠে যায় বললেই চলে (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ২০৩)।

১৫. কলকাতার পত্রপত্রিকায় সিপাহি বিদ্রোহের রাজদ্রোহের জন্য বিশেষভাবে মুসলমান সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের মনোভাব আর সক্রিয়তা ছিল ভদ্রলোক হিন্দুর বিপরীত। ২৯/৬/১৮৫৭ তারিখের *সংবাদ প্রভাকরে* লেখা হয়:

অবোধ যবনেরা উপস্থিত বিদ্রোহ সময়ে গবর্ণমেন্টের সাহায্যার্থ কোন প্রকার সদনুষ্ঠান না করাতে তাহারদিগের রাজভক্তির সংপূর্ণ বিপরীতাচরণ প্রচার হইয়াছে এবং বিজ্ঞ লোকেরা তাহারদিগকে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ জানিয়াছেন, দয়াবান সুবিচারক ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট সকল প্রকার ধর্ম্মাবলম্বি প্রজাদিগের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া সুশৃঙ্খল নিয়ম সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, সকল প্রজাকেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সমান স্বাধীনতা দিয়াছেন ... তাহারা রাজকৃত এইরূপ সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াও বর্ত্তমান সময়ে রাজানুকুলতা স্বভাব কিছুই প্রকাশ করিলেক না। হায় কি অকৃতজ্ঞ! (বিনয় ১৯৬২: ২৩৬)

১৬. উনিশ শতকের বিখ্যাত ইতিহাসকার শিবনাথ শাস্ত্রী এই ছকেই তাঁর কথা সাজিয়েছেন। তিনি ভারতের মুসলিম শাসনে কেবল 'মধ্যযুগীয় অন্ধকার'ই দেখেননি, হিন্দুদের অবনতির জন্যও ওই শাসনকে দায়ী করেছেন:

বলিতে ক্লেশ হয়, ক্ষোভে অশ্রুবারি সম্বরণ করা যায় না, মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে, হিন্দু রাজত্বের অভ্যুদয়ে ও প্রভাব কালে প্রাচীন গ্রীক পর্য্যটক ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ যে হিন্দু জাতিকে সাহসী, সত্য-নিষ্ঠ, সরল-প্রকৃতি, আতিথেয়, স্বদার-নিরত দেখিয়া গিয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতাতে সেই জাতিকে যেন সেই সমস্ত সদ্‌গুণে বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছিল। ... মুসলমান রাজাদিগের দৃষ্টান্তে যেসব প্রথা চালু হয় ... প্রথমে ধনীদের মধ্যে স্ত্রীজাতির অবরোধ ও বহুবিবাহ প্রথা। ... দ্বিতীয়তঃ পুরুষদিগের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা। ... এইটি মুসলমান অধিকারের সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক। ... এই কারণে দেখিতে পাই মুসলমান অধিকারকালে যে সকল সংস্কৃত কাব্য রচিত হইয়াছে তাহার রুচি বিকৃত। ... মুসলমান অধিকারের তৃতীয় অনিষ্ট ফল তোষামদজীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনাপরতা। ... দেশের এরূপ দুর্দশা না হইলে মেকলে বাঙ্গালি জাতির প্রতি যেরূপ কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা করিবার সুযোগ পাইতেন না। (শিবনাথ ১৯৫৭: ৩৯-৪০)

ইংরেজ ইতিহাসতত্ত্ব ভারতকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিল, তার সঙ্গে এই উচ্চারণের একবিন্দুও ফারাক নেই।

১৭. ক) বাংলা ভাষা সম্পর্কে হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন, 'It is much better calculated both for public and private affairs by its plainness, its precission and regularity of construction, than the flowery sentences and modulated periods of the Persian'. (Halhed 1980: xvii) ফারসির প্রসঙ্গ এখানে যেভাবে উত্থাপিত হয়েছে, তার ভাষিক তাৎপর্যের তুলনায় রাজনৈতিক তাৎপর্যই প্রধান। খ) ১৭৮৩ নাগাদ কোলব্রুক তাঁর পিতাকে চিঠিতে জানাচ্ছেন: 'Persian is too dry to entice and is so seldom of use that I seek its acquisition very leisurely.' (উদ্ধৃত, নির্মল ২০০০: ৪৩)। গ) ফরস্টার তাঁর অভিধানের ভূমিকায় ফারসির পরিবর্তে বাংলা গ্রহণের পক্ষে লম্বা যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর এই আলোচনা বাস্তবসম্মত। কিন্তু এই আলোচনায় বা অভিধান-সংকলনের ক্ষেত্রে তাঁর ফারসি-বিদ্বেষ গোপন থাকেনি:

Superficial as this undertaking is, it will nevertheless assist in forming an idea of the richness of the language, and tend to show its capability of being applied to every species of composition, and of expressing every idea of the mind, without the use of Persian or Arabick pedantisms:- which, as far as my limited knowledge has enabled me, I have studiously endeavoured to avoid, which I have been solicitous to restore to their proper rank, the pure Bongalee terms, whose places they had usurped. (Forster 1799: 1)

এ সম্পর্কে গোলাম মুরশিদ লিখেছেন:

> ফরস্টারের সংস্কৃতপ্রীতি এবং আরবি-ফারসি-বিরাগ তাঁর অভিধান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। হয়তো যে-মুনশিদের সহায়তায় তিনি অভিধান সংকলনের কাজ করেছিলেন, তাঁদের মনোভাবও এ ব্যাপারে ক্রিয়াশীল ছিলো। তাঁর এই সংস্কৃতপ্রীতি এবং সজ্ঞানে আরবি-ফারসি তথা মুসলমানি সংস্কৃতিকে এড়িয়ে যাবার প্রমাণস্বরূপ তাঁর অভিধান থেকে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করা যাক: ... God: ঈশ্বর, ভগবান, দেবতা, বিধাতা। prophet: মুনি, ঋষি। water: জল, নীর, অপ, বারি, বার, পানীয়, কীলাল, পয়, সলিল। ... ফরস্টার যে কেবল তৎসম শব্দ অথবা প্রামাণ্য বা শুদ্ধ তদ্ভব শব্দই তাঁর অভিধানে ব্যবহার করেছেন, তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে থাইক্যা, দেউল্যাহ ইত্যাদির মতো অপিনিহিতি স্তরের 'অশুদ্ধ' শব্দও তাঁর অভিধানে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতি প্রভাবিত শব্দ এড়িয়ে গেছেন। (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ১১৯)

ঘ) হিন্দুস্থানি প্রসঙ্গে হ্যালহেডের ব্যাকরণের ভূমিকায় করা লম্বা আলোচনা অগ্রাহ্য করে উইলিয়াম কেরি তাঁর অভিধানের ভূমিকায় প্রচার করেছেন ভুল তথ্য: 'It is certain, that the present languages of India, especially those of the northern provinces, are almost wholly derived from the Sungskrita, that dialect of Hindoosthanee excepted which is spoken by the higher Moosulmans.' (Carey 1825: iii)

১৮. 'সভ্যকরণ' প্রকল্পের সঙ্গে ভাষার প্রশ্নটি সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে সবসময়েই যুক্ত ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বরাবরই উঁচু 'সভ্যতা'র প্রচারক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। আর 'Part of 'civilization' was, needles to say, language.' (Philipson 2003: 45)

১৯. আবদুল কাইউমের বর্ণনা থেকে মনে হয়, হ্যালহেড পশ্চিমবঙ্গীয় পণ্ডিতের প্রভাবেই সংস্কৃতায়নের পথ ধরেছিলেন। তিনি উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে একে ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু কোনো একজন বা কিছু সংখ্যক ব্যক্তির প্রভাব দিয়ে সংস্কৃতায়নের মতো গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার কূলকিনারা করা যাবে না। একে ঔপনিবেশিক শাসনের একটি বিশেষ পর্বের বাস্তবতা হিসাবেই দেখতে হবে।

২০. হাতেগোনা দু-চারটা বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে। যাঁরা উনিশ শতকের আগের গদ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদের আলোচনার ভঙ্গি থেকে পুরোনো গদ্যের অনুপস্থিতি আরো বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সজনীকান্ত দাস ১৭৪৩ সাল পর্যন্ত বাংলা গদ্যের এক অন্ধকার যুগ কল্পনা করেছেন (সজনীকান্ত ১৩৫৩: ৭)। এর পরের গদ্য সম্পর্কেও তাঁর অবিমিশ্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। সুশীলকুমার দে লিখেছেন: 'Before 1800, it may be doubted whether, in spite of the large number of old philosophical and religious prose-works now discovered, there is a single Bengali prose-work of any importance… .' (De 1962: 251) পবিত্র সরকার পুরোনো গদ্যের রীতিগুলোর মধ্যে লক্ষ করেছেন বিচ্ছিন্নতা। লিখেছেন:

> বাংলা গদ্যরচনার মূল ধারাটির সূত্রপাত হওয়ার আগে অনেকগুলি পৃথক পৃথক বা সমান্তরাল ধারা ছিল – অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রীতির ব্যবহার হত, চিঠিপত্রের গদ্য একরকম, দলিল-দস্তাবেজের গদ্য বা কড়চার গদ্য আরেক রকম। বাংলা গদ্যের এই পর্বে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের (মডেলের) চেয়ে একাধিক সমান্তরাল আদর্শের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু এইসব গদ্যরীতির মধ্যে কোনো interaction বা আদান-প্রদান বা দ্বন্দ্বের সম্পর্ক ছিল না। গদ্যসাহিত্যের আরম্ভের আগের এই বিচ্ছিন্ন গদ্যচেষ্টা কোনো ধারাবাহিক গদ্যেতিহাসের অন্তর্গত নয়। (পবিত্র ১৯৯২: ৮৬)

'সাহিত্য' বা 'সাহিত্যিক গদ্য' হিসাবে বিবেচনা করলে এসব মন্তব্যের কিছু সত্যতা পাওয়া যাবে। কিন্তু এঁরা নিছক গদ্য হিসাবেও পুরোনো গদ্যের তাৎপর্য খুঁজে পাননি, বা খুঁজতে চাননি।

২১. এর সঙ্গে যোগ করা যায় কলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ভাষাও। গোলাম মুরশিদ ১৭৮৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনের খবর দিয়েছেন:

> দসঞি জুলাই ১৭৮৪ ইংরেজি মোতাবেক ২৯ আসাড় সন ১১৯১ বাঙ্গলা পুরানা আদালতের ঘরে সরতি খেলা হইবেক একারণ ছোটবড় সকলকে সংবাদ দেয়া জাইতেছে যে তিন হাজার সরতির কাগজ এক এক কাগজ দস মোহরের ... ইহার মধ্যে দুই হাজার এক সত সরতির কাগজ দাখিল হইয়াছে নয় সত সরতির কাগজ বাকী আছে জাহার বাসনা হয় বাঙ্গাল বেঙ্ক মেজর মেটকাফ সাহেবের বাটিতে গিয়া দাখিল করো ... (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ১৬৬-৬৭)

তাঁর মতে, এই ভাষায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়, এই ভাষাই ছিল সবচেয়ে বেশি লোকের বোধগম্য ও জনপ্রিয়।

২২. এখানে নমুনা হিসাবে দুটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল। প্রথমটি অসাঁর সংগ্রহের:

> এ বৎসর মোকাম রাজগঞ্জ মাহো অগ্রহায়ণ মাসে চাল (?) সাত হাজার মোন (মণ) খরিদ করিয়া আনিয়া মনিবকে চাল (?) ওজন এবং নওয়াজীমা কাগজপত্র হিসাব কিতাব মোহাসিবা দিয়া ফরসা হইয়াছি (।) এখন মনিবের সরকারের মোহরির শ্রী রাজীব লোচন সরকার আমার নামে চারিসও (শত) টাকা বরামদ মনিবের কাছে দিয়াছিলেন এবং সহরের সকল লোকের কাছে কহিয়া বেড়ান তাহা আপন মনিবের কাছে নালিষ (নালিশ) করিলাম (।) তিহো কহিলেন আমি জানি না তোমরা যেখানে পার বুঝ (।) তাহাতে জমিদার সাহেবের কাছে নালিষ (নালিশ) করিয়া আছি (করিয়াছি) (।) জমিদার সরকার মহুরিকে (?) জিঙ্গাসা (জিজ্ঞাসা) করিলেন (।) তাহাতে সরকার মহুরি (?) কহিলেক আমী (আমি) তহমত দিয় নাই (।) অতএব আমি সাবুদ করিয়া দিব। জদ্ববি (যদ্যপি) সাবুদ করিতে না পারি তবে সাহেবের সরকারি গুনাগার দিব এতদর্থে মচলেখা (মুচলেখা) দিলাম ইতি (দেবেশ ১৯৮৭: ৭৭)

এতে সম্পাদক কিছু বিরামচিহ্ন যোগ করেছেন। কয়েকটি শব্দের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত বানানরূপ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ সেন সংকলিত *প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলনের* ১১ নম্বর পত্রের অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

> আমাকে এবং আমার ছাওয়াল শ্রীমান ভগবন্ত নারায়ণ কুঙর সহিতে বেহুরমত করিআ পহরাতে কয়দ করিআ আনিলেন গোসাঞির তরফ লোকে বাড়ির ঘর খুদিআ মাল আমওয়াল লুট তরাজ করিল আমারদিগেক রঙ্গপুর মোকামে আনিআ পহরাতে কয়দ করিআ রাখিআছেন আমার ছাওআলকে বেড়ি দিআ রাখিআছেন কুম্পানি বাহাদুরের সরণাগত লইআ আমী আওলাদ বুনিআদ সমেত খানে ওয়রান হইলাম নওআব জাফরালী খাঁ বাহাদুর কম্পানিতে মুলুক দখল দেলাইআ তাহার আওলাদ বুনিআদ সমেত কুম্পানি বাহাদুর কাইম রাখিআছেন এবং আর২ যে লোক কুম্পানি বাহাদুরের সরণাগত লইআছে তাঁহারা সকলে কাইম আছে ...। (সুরেন্দ্রনাথ ১৯৪২: ১২)

২৩. আইনের অনুবাদ গদ্যরীতির দিক থেকে কোনো নতুন সূচনা ছিল না। সুকুমার সেনের মতো অন্য প্রায় সব ঐতিহাসিক যে এ বাবদ 'বিস্ময়' প্রকাশ করেছেন, তা আসলে ইতিহাসের কালক্রম-সম্পর্কিত এক ঔপনিবেশিক জটিলতা। এ ইতিহাসে ধরেই নেওয়া হয়, উনিশ শতক থেকেই গদ্যের সূত্রপাত। উনিশ শতকের শুরুটা নতুন এক গদ্যের শুরুর সময় বটে, কিন্তু একই সঙ্গে তা পুরোনো এক গদ্যের একধরনের সমাপ্তিরও সময়। আইনের অনুবাদে নতুন যুগের ছায়া আছে – প্রতিষ্ঠা নয়; আর আছে পুরোনো গদ্যের সামর্থ্যের ছাপ।

২৪. এই কথ্যবাংলার সাফল্য সম্পর্কেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন (1921:71) বলেছেন, পৃষ্ঠপোষকের চাওয়া পূরণ করতেই *প্রবোধচন্দ্রিকার* একাংশ কথ্য-বাংলায় লেখা হয়েছে। কিন্তু পণ্ডিতদের জন্য এ ছিল অনিচ্ছায় ঢেঁকি গেলার

মতো। … 'Their subsequent efforts to write the colloquial style and even slang in order to please their sponsor will remind one of the dance of the elephant in the garden of Eden described by Milton to please Adam and Eve.'

২৫. *সমাচার দর্পণ* সেকালের অত্যন্ত প্রভাবশালী পত্রিকা। ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার কারণেই পত্রিকাটির একটি ইংরেজি-বাংলা সংস্করণ আর পরে সপ্তাহে দুই সংখ্যা বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল (Kamal 1977: 26)। আরো উল্লেখ্য, এই মিশনারি পত্রিকা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছিল পূর্ণমাত্রায়। মাত্র এক-চতুর্থাংশ ডাকমাশুলে এই পত্রিকা পাঠানো যেত; আর সরকার প্রতি সংখ্যার অন্তত ১০০ কপি কিনে অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করত (Kamal 1977: 25)। এর আগে প্রকাশিত *দিগদর্শন* পত্রিকার মোট ৬১,২৫০ কপি কিনেছিল কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (Kamal 1977: 24)। অর্থাৎ এই পত্রিকাগুলো সব অর্থেই সমকালের পাঠ্য-গদ্যের প্রধান জোগানদাতা।

২৬. ঔপনিবেশিক দ্বিভাষিক পরিস্থিতি কিছুতেই দুটি ভাষার সহাবস্থান নয়। আলবেয়ার মেমি এ অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন 'Linguistic drama' হিসাবে। লিখেছেন:

> Colonial bilingualism cannot be compared to just any linguistic dualism. Possession of two languages is not merely a matter of having two tools, but actually means participation in two psychical and cultural realms. Here the two worlds symbolized and conveyed by the two tongues are in conflict; they are those of the colonizer and the colonized. … In short, colonial bilingualism is neither a purely bilingual situation in which an indigenous tongue coexist with a purist's language (both belonging to the same world of feeling), nor a simple polyglot richness benefitting from an extra but relatively neuter alphabet; it is a linguistic drama. (Memmi 1976: 107-08)

২৭. আলবেয়ার মেমি উপনিবেশে প্রভুর ভাষার রাজত্ব বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> The entire bureaucracy, the entire court system, all industry hears and uses the colonizers language. Likewise, highway markings, railroad station signs, street signs and receipts make the colonized feel like a foreigner in his own country. (Memmi 1976: 106-07)

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় ভাষার পরিসর সংকীর্ণ হতে বাধ্য। উপনিবেশায়নশাস্ত্রের তাত্ত্বিকেরা একে ব্যাখ্যা করেছেন 'প্রাইভেট-পাবলিক' বৈপরীত্যে। পাবলিক পরিসরে ঠাঁই না হওয়ায় উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর সৃজনশীলতা-সক্রিয়তা দখল করে প্রাইভেট পরিসর। তাতে পরিবারের অনুশাসন বা ধর্মাচারের মতো উপাদানগুলো জেঁকে বসে। মাতৃভাষার চর্চাটাও একই যুক্তিতে প্রাইভেট পরিসরের বিষয় হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষাংশে জাতীয়তাবাদী তৎপরতার অংশ হিসাবে বাংলা ভাষাচর্চা বিশেষ মূল্য পেলেও মূলত সাহিত্যের চর্চাকেই সক্রিয়তার প্রধান ও প্রায় একমাত্র পরিসর হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার বদলে সাহিত্যকেই বেছে নেওয়া হয়েছে জাতীয় জাগরণের মূলমন্ত্র হিসাবে।

২৮. রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন:

> সে সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অতি ভীষণ পদার্থ ছিল। আমাদিগের সময়ের কালেজের প্রথম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে একদিন কালেজে যাইবার সময় রাস্তায় একজন সামান্য লোক একটি বাঙ্গালা লেখা পড়িয়া তাহার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইতে অনুরোধ করে। তিনি সে লেখাটি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার এতদূর লজ্জা উপস্থিত হইল যে,

> ললাটে স্বেদবিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল। ইহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কাগজ ফিরাইয়া লইয়া বলিল 'বাবু! এ ইডিবিডি করা নয়, বাঙ্গালার ঘানি'। এক বার এই সময়ের শিক্ষিত আমার একটি বন্ধু বয়স্ক অবস্থায় আমার বাসায় একদিন আসিয়া বলিলেন, 'আজ একটা বড় শুভ সমাচার শুনিলাম'। আমরা আস্তে ব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি সমাচার'? তিনি বলিলেন, 'সোমপ্রকাশাদি সম্বাদপত্রে নাকি আন্দোলন হচ্ছে যে তিনটা 'স' উঠে গিয়ে একটা 'স' হবে, তাহলেই আমার বাঙ্গালা লেখার সুবিধা হবে'। তিনি একবার এক সভায় 'অভিনন্দন-পত্র' শব্দের পরিবর্তে 'রঘুনন্দন-পত্র' বলে ফেলেছিলেন। ঐ সময়ে কালেজে শিক্ষিত কোন ব্যক্তি কোন প্রধান বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহকারী পণ্ডিতকে ব্যাঘ্র শব্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'পণ্ডিত মহাশয়! এই শব্দের উচ্চারণ ব্র্যাঘ্‌ঘ না?' পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'উহার উচ্চারণ ব্যাঘ্র'। অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, 'আমি তাই ত বলছি ব্র্যাঘ্‌ঘ ব্র্যাঘ্‌ঘ'। উল্লিখিত সময়ের আর এক ব্যক্তিকে কোন প্রয়োজন উপলক্ষে বক্ষু খানসামা নামক কোন খানসামার নাম লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল; তিনি 'বক্ষু' শব্দ কি প্রকারে লিখিবেন ভাবিয়া আকুল। যদি 'বক্ষু' লিখেন, তাহা হইলে লোকে মনে করিবে যে, কি মূর্খ! 'কষ' এইরূপ না লিখিয়া 'ক্ষ' লিখিলেই হইত, আর যদি 'বক্ষু' লিখেন তাহা হইলে লোকে 'বক্‌খু' উচ্চারণ করিবার সম্ভাবনা। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি ইংরাজী অক্ষর x এর সাহায্য লইয়া 'বx' এইরূপ লিখিলেন। প্রথম প্রথম যাহারা কালেজে পড়িতেন, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা বিদ্যা এইরূপ ছিল। (রাজনারায়ণ ১৪০২: ৩১৪)

শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সংস্কৃত-বাংলা শিক্ষিতসমাজ মোটামুটি রপ্ত করে নিয়েছিল; যদিও ব্যাপকভাবে বাংলার চর্চা শুরু হয়েছে আরো অনেক পরে।

২৯. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রসঙ্গে যখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিম ১৯৮৯: ৭৬৯) লেখেন – 'আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয় – হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের – আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা'। – তখন তিনি আসলে নতুন ভাষা ও সাহিত্য থেকে বাঙালির স্বর খসে পড়ার কথাই বলেন। তিনি স্বভাবতই নতুন অবস্থাকে 'উন্নতি' বলেই চিহ্নিত করেছেন। লিখেছেন: 'বাঙ্গালার অবস্থা ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না'। তাঁর এই অনুমান সত্য হতেও পারে। কিন্তু নতুন অবস্থায় 'আমাদের' অংশে যে টান পড়েছে, তাঁর মন্তব্যে সে কথার পষ্ট ঘোষণা আছে।

৩০. মার্কসের ভাষা-সম্পর্কিত মতামতের ব্যাখ্যাসূত্রে আজফার হোসেন লিখেছেন:

> Language is not a static and universal system of symbols but is produced, distributed, exchanged and consumed within a determinate horizon of historical and human relations in response to determinate and changing social needs. (Hussain 2003: 181)

উপনিবেশিত বাংলার ভাষাপরিস্থিতিতে এ কথার তাৎপর্য প্রায় আক্ষরিকভাবেই উপলব্ধি করা যায়। উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর সুবিধাভোগী অংশ, সুবিধাভোগী অংশের সঙ্গে শাসকপক্ষের লেনদেন আর বঞ্চিত বিপুল জনমানুষের বাস্তবতার ছকে একদিকে যেমন বাংলা গদ্যের রূপান্তরিত ভাবভঙ্গি মিলে যায়, অন্যদিকে তেমনি জনমানুষের ভাষার বিরাট কিন্তু মর্যাদাহীন ধারাও সেই ছকে এঁটে যায়। ক্ষমতা-কাঠামোর অদলবদলে কোথাও কোথাও এ দুইয়ের মিলমিশও হয়েছে; কিন্তু ফারাকটা মুছে যায়নি।

৩১. আবদুল কাইউমের ভাষায়: 'The unfortunate consequence of all this Sanskritisation has been that, though educated Bengalis found it possible to recognize and understand large amount of vocabulary

Dhaka University Institutional Repository

in cognate languages, which had been Sanskritised to the same level as their own, uneducated Bengalis found the speech and writings of the educated only a shade more intelligible than Sanskrit.' (Qayyum 1982: 243)

প্রায় একই সিদ্ধান্ত গ্রিয়ার্সনেরও: 'Literary Bengali is divorced from the comprehension of every native to whom it has not been specilly taught.' (Griearson 1912: 251)

এঁরা দুজনই অবশ্য সংস্কৃত শব্দের মাত্রাতিরিক্ত আমদানিকে এই অবস্থার একমাত্র কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু, যেমনটা আগেই বলা হয়েছে, আনকোরা সংস্কৃত শব্দের আমদানি পুরো প্রক্রিয়ার একাংশ মাত্র – গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সম্পূর্ণ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
উনিশ শতকে বাংলা গদ্য ও বাংলা ভাষাচর্চার ধারা

৪.১ 'মূলধারা'র গদ্যচর্চা: রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতার কথা মনে রেখে বলা যায়, রামমোহন রায়ই প্রথম বাঙালি লেখক যিনি ব্যক্তিগত উৎসাহে-উদ্যোগে ব্যাপকভাবে বাংলা গদ্য লিখেছিলেন। তিনি ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। সে ব্যাকরণে বাংলা ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর গভীর সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় (শিশির ১৯৯৯: ৯৩; মনিরুজ্জামান ১৯৯৪: ৬১; নির্মল ২০০০)। গদ্যরচনার ক্ষেত্রেও তিনি বাংলা ভাষার প্রস্তাবিত ওই বৈশিষ্ট্যের প্রতি অনুগত থাকার বিশেষ চেষ্টা করেছেন (শিশির ১৯৯৯: ৯২-৯৪; রাজনারায়ণ ১৯৭৩: ১৫; সুকুমার ১৪০৩: ১৯; Das 1966: 154-55)। তা সত্ত্বেও তাঁর গদ্য মোটের ওপর 'সংস্কৃতশাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের' রচনাপদ্ধতির অনুসরণই হয়েছে (পবিত্র ২০০০: ২৭); খুব স্বাধীন সত্তা লাভ করেনি। তত্ত্বীয় জ্ঞান আর আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও রামমোহন গদ্যের প্রভাবশালী ধারাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। উপনিবেশিত নতুন বাংলা গদ্যের প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার ধারায় রামমোহনের গদ্য তাই গুরুত্বপূর্ণ নিশানা হিসাবে পাঠ্য।

রামমোহন বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য আছে, কিন্তু অচলিত সংস্কৃত শব্দ খুবই কম। তাঁর ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দগুলো আসলে পারিভাষিক শব্দ। 'ব্রহ্ম', 'চৈতন্যনিষ্ঠতা', 'জড়রূপা', 'ঈক্ষণকর্তা', 'ঈক্ষতি', 'চিত্তশুদ্ধি', 'নানার্থবাচী', 'জগৎকারণত্ব', 'অপ্যয়' প্রভৃতি শব্দকে রামমোহনের সংস্কৃতপ্রীতির নমুনা হিসাবে দেখা ঠিক হবে না, কারণ এগুলো ধর্ম-দর্শনের পারিভাষিক শব্দ মাত্র (শিশির ১৯৯৯: ৯২)। সংস্কৃতের অনুসরণে সমাসবদ্ধ পদ বা যৌগিক শব্দগঠনের যে রেওয়াজ ওই নতুন গদ্যে গড়ে উঠেছিল, রামমোহন তাও এড়িয়ে চলেছেন। এক হিসাবে দেখা গেছে, রামমোহন রায়ের গদ্যে যৌগিক শব্দের ব্যবহার মৃত্যুঞ্জয় ও বিদ্যাসাগরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কম – আনুপাতিক হিসাবে ৮ : ২৪ : ১৯ (Das 1966: 140)। বিপরীতে কারক-বিভক্তি বা অনুসর্গের ব্যবহার তাঁর রচনায় ওই দুজনের গদ্যের তুলনায় বেশি। অর্থাৎ রামমোহনের লেখা অন্তত এই ক্ষেত্রে, শুধু সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে দেখলে, বাংলা ভাষার প্রকৃতির কাছাকাছি (শিশির ১৯৯৯: ৯৩)। কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও একথা বলার উপায় নেই যে, রামমোহনের গদ্য পুরোনো বাংলা গদ্যের স্মৃতিবাহী বা সরল। তাঁর গদ্যের প্রাঞ্জলতার পক্ষে অবশ্য সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বহু-উদ্ধৃত মন্তব্য স্মরণীয়: 'দেওয়ানজী জলের মত বাঙ্গালা লিখিতেন' (উদ্ধৃত, সুকুমার ১৪০৩: ১৯)। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতে, রামমোহন সংস্কৃত ছাড়িয়া এবং 'সাধুভাষার' কাছ না ঘেঁষিয়া সাধারণের বোধ্য ভাষায় বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তার করিয়া অসৎ আচরণ করিয়াছেন (সুকুমার ১৪০৩: ১৯)। এ মন্তব্যের মধ্যে প্রকারান্তরে রামমোহনের গদ্যের সারল্যের স্বীকৃতি আছে। কিন্তু এই গদ্যকে সরল বা 'ভালো' বলা যায় কেবল – সুকুমার সেনের ভাষায় – 'কলেজি রচনার সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে' (সুকুমার ১৪০৩: ১৯)। রাজনারায়ণ বসুও তুলনামূলক বিচারেই রামমোহনের গদ্যের প্রশংসা করেছেন। *প্রতাপাদিত্য চরিত্র*, *প্রবোধচন্দ্রিকা* আর *পুরুষপরীক্ষা* গ্রন্থের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'উল্লিখিত

গ্রন্থসকল এমন অপকৃষ্ট ভাষায় লিখিত যে, রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অন্যায় হয় না' (রাজনারায়ণ ১৯৭৩: ১৫)।

বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির যে স্বীকৃতি রামমোহনের ব্যাকরণে পাওয়া যায়, তা ওইকালের সাপেক্ষে রীতিমতো বিস্ময়কর। তা সত্ত্বেও তিনি যে আদতে বাংলা গদ্যের গ্রহণযোগ্য কোনো রীতিতে তাঁর কেজো[২] রচনাবলি লিখে উঠতে পারেননি, তার অন্যতম কারণ – সংস্কৃতের আশ্রয় ছেড়ে তিনি গিয়েছেন ইংরেজির দিকে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্যে ইংরেজির প্রভাব সর্বপ্রথম রামমোহন রায়ের গদ্যেই বিশেষভাবে প্রকট; আর এর ফল খুব সুখকর হয়েছে তা বলা চলে না (শিশির ১৯৯৯: ৯৫)। ইংরেজি বাক্যের ক্লজের অনুকরণ, 'লোকটি যে কাল আসিয়াছিল'-ধরনের বাক্যগঠন, সাপেক্ষ সর্বনামের অতিরিক্ত প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, অসমাপিকা ব্যবহার না করে দুই ক্রিয়ার মাঝে ইংরেজির মতো 'এবং' ব্যবহার ইত্যাদি রামমোহনের গদ্যে প্রচুর পাওয়া যায়। নতুন গদ্যের প্রথম জমানায় ইংরেজির প্রভাবে আসা এসব বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালের বাংলায় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছিল (৩.৪.৪ দ্রষ্টব্য)। রামমোহনের রচনায় এই বৈশিষ্ট্যগুলোর দেদার আমদানি তাঁর লেখাকে ভঙ্গির দিক থেকে যেমন অস্বাভাবিক করেছে, বোধের দিক থেকেও তেমনি জটিল ও দুর্বোধ্য করেছে। ইংরেজির পদক্রমে তাঁর বাক্যের আকারও হয়েছে বড়। জটিলতার সে আরেক কারণ। রামমোহন নিজেও তাঁর গদ্যের জটিলতার কথা জানতেন। *বেদান্তগ্রন্থে*র ভূমিকায় তিনি পাঠককে ব্যাকুলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর বাক্যের জটিলতা আর বাক্যের দীর্ঘতা দেখে বিভ্রান্ত বা হতাশ না হয়ে পাঠক যেন আগে ক্রিয়াটিকে শনাক্ত করেন, তারপর ক্রিয়ার সূত্র ধরে কর্তা খুঁজে বের করেন। একবার কর্তা-ক্রিয়ার সম্পর্কটি ধরতে পারলেই বাক্যের অর্থ অনুধাবনে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

কিন্তু সমস্যা আসলে থেকেই গেছে। সে সমস্যা প্রধানত নতুন গদ্যে অনভ্যস্ততার সমস্যা। রামমোহন এই গদ্যই লিখেছেন। ফলে লেখার ক্ষেত্রে তিনি নিজে যেমন মুসিবতে পড়েছেন, তেমনি পাঠকের সম্ভাব্য সংকটও টের পেয়েছেন। তাঁর মতে, এ গদ্যে 'অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র বা কাব্য বর্ণনে আইসে না; ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না – ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়' (রামমোহন ১৯৯৮: ৭)। অথচ পুরোনো গদ্যে শাস্ত্র ও তত্ত্বকথা বিস্তর বলা হয়েছে (আনিসুজ্জামান ১৯৮৪)। আর কাব্যের ক্ষেত্রে তো বলা যায়, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে*র মতো গ্রন্থ একাধারে কাব্য ও শাস্ত্র হিসাবে যুগোত্তর সাফল্য দেখিয়েছিল। রামমোহন রায় তাহলে পুরোনো সেই ভাষার কথা বলছেন না। বলছেন নতুন শুরু হওয়া গদ্যের কথা। সেকথা পষ্ট করেছেন খানিক পরেই:

> যাহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন, যাহা, যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন, তাহা, সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। (রামমোহন ১৯৯৮: ৭)

কিন্তু রামমোহনের গদ্যের অস্বাভাবিকতা কেবল বাক্যের গড়নে নয়, শব্দব্যবহারের ভঙ্গিতেও প্রকট। এই অস্বাভাবিকতার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। তিনি জানতেন, সংস্কৃত সমাস বাংলা ভাষার প্রকৃতি-বিরোধী। বহুপদী সমাস বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। এ ধারণা থেকে সমাসবদ্ধ পদগুলো তিনি ভেঙে লিখেছেন –

'নির্ব্বাহের যোগ্য' বা 'তত্ত্বের বিচার' আকারে লিখেছেন। কিন্তু দুই শব্দের যোগের ক্ষেত্রে – আগের বা পরের – বাংলায় 'বির্ব্বাহযোগ্য' বা 'তত্ত্ববিচার'ই অধিকতর স্বাভাবিক। পুরোনো বাংলা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাবই এ ধরনের বিভ্রান্তিকর শব্দভঙ্গির কারণ। রামমোহন রায়ের কাল ছিল দেশি উপাদানগুলোর সঙ্গে নবগঠিত শিক্ষিতশ্রেণির বিচ্ছেদের কাল। তিনি সেই সমাজের সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁর পক্ষেও সেই ব্যাপক বিচ্ছিন্নতার কুফল এড়ানো সম্ভব হয়নি। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য (Bhattacharya 1975: 221) উদাহরণ হিসাবে বলেছেন, 'সে নগর হইতে গেল' – এই বাক্যের 'হইতে'কে রামমোহন রায় বলেছেন 'প্রিপজিশন'। তাছাড়া জীবিত ভাষার সঙ্গে পরিচয় না থাকার কারণেই তিনি 'কপুলা'র পক্ষে এতটা ওকালতি করে নিজের গদ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন, বাংলা গদ্যের মূলপ্রকৃতির সঙ্গে যা একেবারেই বেমানান। লোকপ্রচলিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিস্ময়কর অজ্ঞতা ও উন্নাসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় ছন্দ-আলোচনায়ও। তিনি লিখেছেন, 'গৌড়দেশে না গীতের শৃঙ্খলা আছে, না গৌড় দেশীয় ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য উত্তমরূপে আছে, সুতরাং ইহার ছন্দঃ প্রকরণ জানিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই' (রামমোহন ১৯৯৮: ৪১১)। এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, কেবল লোকগান আর লোকসাহিত্য সম্পর্কেই তিনি অজ্ঞ ছিলেন না, বৈষ্ণবপদ বা মঙ্গলকাব্য সম্পর্কেও তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। ফলে বাংলার অতি প্রচলিত ও বিকশিত পয়ার ছন্দের নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা তিনি করে উঠতে পারেননি (রামমোহন ১৯৯৮: ৪১১-১২; Bhattacharya 1975: 222)।

গদ্যের একটি সরল-স্বাভাবিক রূপ গড়ার ক্ষেত্রে রামমোহনের ব্যর্থতাকে তাই কেবল নতুনের দ্বিধা হিসাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এর কারণ, সমর্থ বাংলা গদ্য আগেই ছিল। স্পষ্টতই ভাষার এই রূপ নতুন চেতনার সঙ্গে যুক্ত, যে চেতনা আবার বাস্তবের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। চিন্তার মার্কসীয় ঘরানায় এ তিনের সম্পর্কটি বেশ পষ্ট। *জার্মান ইডিওলজি* মোতাবেক 'চিন্তা ও ভাষা – এ দুটির একটিও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কিছু নয়, তাদের নিজস্ব অস্তিত্বও আলাদা করে নেই – তারা বাস্তব জীবনের অভিপ্রকাশ মাত্র' (পবিত্র ১৪১২: ৯)। এদের সম্পর্ক অবশ্য মোটেই সরল নয় – দ্বান্দ্বিক ও পারস্পরিক। বলা যায়:

> Language does not simply reflect the world and consciousness as such, nor does consciousness simply reflect the world and so on, but … language itself mediates between consciousness and the world, and … in turn, the world and consciousness simultaneously mediate the very production of language itself. (Hussain 2003: 186)

উপনিবেশিত মনস্তত্ত্বের শৃঙ্খলে জাত রামমোহনের গদ্য সম্পর্কে এই মন্তব্য কতটা প্রাসঙ্গিক, তা বোঝা যায় মার্টিন লুথারের (১৪৮৩-১৫৪৬) গদ্যের সঙ্গে তাঁর গদ্যের তুলনা করলে। লুথার কৃষক পরিবারের সন্তান হলেও তাঁকে কৃষকপ্রেমিক বলা যাবে না কিছুতেই। বরং জার্মান কৃষকেরা বিদ্রোহ করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছিলেন (সিরাজুল ২০০৩: ৩০)। তা সত্ত্বেও তাঁর ভাষা মোটেই লাতিন-ঘেঁষা ছিল না। তিনি চলে গেছেন কৃষকের মুখের ভাষার দিকে। কৃষকসহ গণমানুষের ভাষা থেকেই সংগ্রহ করেছেন প্রচলিত শব্দ, ভাষাভঙ্গি, প্রবাদ, রূপক। এক বন্ধুকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, বন্ধুর শহরে পাওয়া যায় এমনসব গান-কবিতা – সে লোকমুখেরই হোক, কি পাণ্ডুলিপির বা ছাপানো – তাঁর জন্য সংগ্রহ করে পাঠাতে (Bhattacharya 1975: 221)। নিজের অনুবাদে এগুলো ব্যবহার করে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। এমনকি ধর্মতাত্ত্বিক কোনো অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও লাতিন প্রকাশভঙ্গি বাদ দিয়ে তিনি সাধারণ

মানুষের মুখের ভাষার ছন্দস্পন্দন অনুসরণ করেছেন। লুথারের এই উদ্যোগ আর দৃষ্টিভঙ্গির ফল হয়েছিল বৈপ্লবিক – বুর্জোয়া আকাঙ্ক্ষার দিক থেকেই বৈপ্লবিক। হাইনরিখ হাইনে লিখেছেন:

> I do not know, how Luther's language came into being, but I do know that through his Bible the Lutheran language has spread throughout Germany. It is still supreme there. … and this old book is a source of constant rejuvenation for our language. All the expressions, all the phrases found in Luther's Bible are German; writers can make use of them, and since this book is in the hands of the poorest of the people there is no need for them to be given technical instruction in order to express themselves in a literary form. (উদ্ধৃত, Bhattacharya 1975: 215)

লুথারের প্রকল্পের গণমুখিতার ফল কী হয়েছিল তা ইউরোপীয় ইতিহাসে সুবিদিত। হাইনরিখ হাইনের মন্তব্যে ভাষার দিক থেকেও তাঁর সুদূরপ্রসারী ভূমিকার খবর পাওয়া গেল। জনগণের টেক্সটে জনগণের ভাষা সঞ্চিত হওয়াটা কেবল সমকালের কর্তব্যই সম্পাদন করেনি, ভাবীকালের সাহিত্যের জনবিচ্ছিন্নতাও রোধ করেছে। বিস্ময়কর নয়, লুথারের জীবদ্দশায় ওই বাইবেলের ৩৭৭টি সংস্করণ হয়েছিল (সিরাজুল ২০০৩: ৩১)। রামমোহনের ক্ষেত্রে এরকম কিছু তিনি নিজেও ভাবেননি, তাঁর সমশ্রেণির অন্যদের ভাবনায়ও তা আসেনি। অথচ আসতে পারত। আসার কথা ছিল। ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার উৎকর্ষের বরাতই তো নতুন যুগের পরিবর্তিত ধ্যানধারণার বৈধতার ভিত্তি। সেই ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার সর্বস্তরে, কাজে কাজেই ভাষার ক্ষেত্রেও, যে জনসংশ্লিষ্টতার মাহাত্ম্য ছিল, স্বাধীন পরিবেশে বুর্জোয়া বিকাশের ধারায় তার প্রভাব পড়লে বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে যোগ রাখার আভ্যন্তর প্রেরণাও আসত। কিন্তু উপনিবেশিত কলকাতায় সেকথা ভাবার অবকাশ ছিল না। তাই রামমোহন রায়ের মতো প্রতিভাবান মানুষ গোষ্ঠীভাষার বাইরে যেতে পারেন না। তাই সংস্কৃতরীতি থেকে যথাসম্ভব বাঁচতে চাইলেও তাঁর গদ্য সংস্কৃতায়িত থেকে যায়।[২] সংস্কৃতের ছোঁয়াচ খানিকটা কমাতে গিয়ে তিনি বরং বাঁধা পড়েন ইংরেজির আরো অচেনা শৃঙ্খলে। জনভাষার দিকে তিনি যেতে পারেন না। পুরোনো সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর প্রতিভা আর চিন্তার বাহন হয়ে তাঁর গদ্য বাঙালির ধ্রুপদী পাঠ্যতালিকায় উঠে আসে না।

ধর্ম-দর্শনের জটিল বিষয় প্রথমবারের মতো লিখেছেন বলে রামমোহন রায় গদ্যের সুস্থিত রূপ গড়তে পারেননি – এমন অনুমানও করা যায় না। এ ধরনের আলোচনা পুরোনো বাংলায় গদ্যে-পদ্যে বিস্তর হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসু *বিশ্বকোষে*র আলোচনায় 'অজ্ঞাতনামা-অনূদিত' *বেদান্তদর্শনে*র পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'এই জীর্ণ পুস্তকখানি দেখিয়া বোধ হইল ইংরাজপ্রভাবের বহু পূর্ব্বে এখানি লিখিত হইয়াছে, ইহার ভাষা সরল ও সুখপাঠ্য। রামমোহন রায়ের অনুবাদ অপেক্ষা এই অনুবাদ অধিকতর সুখবোধ্য ও প্রাঞ্জল। ইহাতে সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাস বা সুদীর্ঘ সমাসবহুল পদ নাই। অতি সরল বাঙ্গালায় এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে' (নগেন্দ্র ১৩১৪: ১৯৫)। কিন্তু সেকালের সামাজিক ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী এ 'সরল বাঙ্গালা' অভিজাত মহলে কল্কে পায়নি; রামমোহন রায় এবং তাঁর শ্রেণির গদ্যই বাংলা গদ্যের 'মূলধারা' হিসাবে বিকশিত হয়ে ক্রমশ স্থিতি ও মাধুর্য অর্জন করেছে।

এই বিকাশের পথে সব ভাষার গদ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সংবাদ-সাময়িকপত্র। বাংলা গদ্যের নতুন ধারার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। প্রমথনাথ বিশী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> গদ্যসাহিত্যকে সাহিত্যিক গদ্যে পৌঁছতে গেলে মাঝখানে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগকে অতিক্রম করতে বাধ্য হয়, ওটা একেবারেই অপরিহার্য্য। ওতে গদ্যসাহিত্যের নমনীয়তা বাড়ে, শব্দসম্ভার বাড়ে, সর্ব্বকাজে ব্যবহারযোগ্যতা বাড়ে, আর সেই সঙ্গে বাড়ে সর্ব্বজনের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা। এই সব শক্তি অর্জ্জিত না হওয়া অবধি গদ্যসাহিত্য সাহিত্যিক গদ্যে পরিণত হতে পারে না। (প্রমথনাথ ও বিজিতকুমার ১৯৬০: ৬০)

একদিক থেকে এর কারণ বেশ সরল। পত্রিকার সাফল্য নির্ভর করে তার পাঠকপ্রিয়তার ওপর। ফলে পত্রিকায় এমন ভাষা ব্যবহারের একটা জোরালো চাপ থাকে যে ভাষা লোকে বুঝবে। প্রকাশভঙ্গির দুর্বলতা, সামঞ্জস্যহীন বাক্যগঠন আর অপ্রচলিত শব্দব্যবহার সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রকে নিয়ত জনবিচ্ছিন্ন করে। বহু বাংলা সংবাদপত্র এ সবের মীমাংসা করতে না পেরে অকালে বন্ধ হয়ে গেছে (Das 1966: 169)। অন্য কারণটি আরো গভীর। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বা শ্রীরামপুর মিশনের গদ্যের ক্ষেত্রে পাঠকসমাজের গ্রহণবর্জনের কোনো সুযোগ ছিল না। এই ভাষা ছিল উপর থেকে আরোপিত। কিন্তু সংবাদপত্রের গদ্যকে নিয়ত পাঠকের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাতে করে একদিকে পাঠকের সঙ্গে সংগতির কথা বিবেচনায় রেখে গদ্যশৈলী ঠিক করতে হয়, অন্যদিকে আবার সেই গদ্য পড়ে পাঠকের পাঠাভ্যাসও গড়ে ওঠে। ফলে সীমিত অর্থে হলেও সাময়িকপত্রের গদ্যে দশের অংশগ্রহণ থাকে।[৩] বলা যায়, উনিশ শতকের প্রথম পর্বের বাংলা গদ্য ছিল শ্রেণিকক্ষের গদ্য, আর দ্বিতীয় পর্বের গদ্য সংবাদপত্রের গদ্য (Das 1966: 169)। এই দ্বিতীয় পর্বের গদ্যের দোষত্রুটি যাই থাক, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল পাঠকের বোধগম্য হয়ে ওঠা (দেবেশ ১৯৯০: ৬০)।

সেই বোধগম্যতারও ইতরবিশেষ ছিল। দেবেশ রায় লক্ষ করেছেন, 'উনিশ শতকের প্রথম ত্রিশ বছর পর্যন্ত, বাংলা গদ্যের আদিপর্বের ইতিহাস ধারাবাহিক প্রয়াসের ইতিহাস নয়, বারবার নতুন করে আরম্ভের ইতিহাস' (দেবেশ ১৯৯০: ১৪)। এই অর্থে যে, 'যে বিশিষ্ট উপাদানগুলোর ব্যবহার ও বিন্যাসে বাংলা গদ্যের বিশেষ ধরনটি' গঠিত হচ্ছিল, 'সেই উপাদানগুলোর বিকাশের কোনো ধারাবাহিকতা' পাওয়া যায় না। অবিকশিত মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা আর সক্রিয়তার ফারাকের কারণেই এমনটা হচ্ছিল। কিন্তু সেই ফারাকের মধ্যেও সাময়িকপত্রে চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য যেন তৈরি হয়ে উঠছিল 'বিদ্যাসাগরী' পর্বের জন্য। তাতে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ক্রিয়াশীল ছিল বাংলা ভাষা ও উৎকৃষ্ট গদ্য সম্পর্কে গড়ে ওঠা প্রভাবশালী ধারণাগুলো (৩.৫ দ্রষ্টব্য)। নতুন গদ্যের উপযোগিতা আর সৌন্দর্যের দিক নিশ্চিত করার জন্য দরকার ছিল লেখক-পাঠকের প্রস্তুতি। *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার পাতায়, বলা যায়, সেই প্রস্তুতির স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গেছে। এ পত্রিকার গদ্য সম্পর্কে শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন:

> 1. In vocabulary *Tattvabodhini* tended to be more Sanskritic than were some previous papers. It is also to be noted that Sanskrit tended to replace the Persian words; for example *khetra*, *udyan*, *nagar* etc., began to gain currency as the expense of *jami*, *bagan*, *sahar* etc. (Das 1966: 4)
>
> 2. The writers in the missionary and other earlier newspapers of the third decade quite frequently wrote in a style which approached the colloquial but the writers of the *Tattvabodhini* and other writings of the fifth decade of the century seemed to prefer the Sanskritised style termed by us, *literary Bengali*. … Their writing is symptomatic of a move away from the colloquial style of Bengali. (Das 1966: 210)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আসলে সংস্কৃতায়িত বাংলার সুষমা আর সামর্থ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। শিশিরকুমার দাশ একে বলেছেন 'দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কৃতায়ন'। এই প্রতিষ্ঠার একদিকে ছিল অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সফল লেখক, অন্যদিকে ছিল শিক্ষিত পাঠককুল। পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এসেছে বিষয়ের সমুন্নতি থেকে। পশ্চিমা বিষয়-আশয় আর ভারতীয় ধ্রুপদীযুগের নানা বিষয়ের প্রতাপ ছিল *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায়। স্বভাবতই সংস্কৃত শব্দের ভারিক্কি এর সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খেয়ে যায়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজি গদ্যের মূল উপাদান আর অনুমানগুলো এতে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় পশ্চিমা জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন আর প্রচার প্রথম সার্থকভাবে করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। 'রচনার বিষয়বস্তুর উপযোগিতা অনুসারে তাঁহার লেখা ছিল প্রকাশক্ষম, বাহুল্যবর্জিত, ব্যবহারোপযোগী এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট। এই কারণেই অক্ষয়কুমারের রচনারীতি তৎসমশব্দবহুল' (সুকুমার ১৯৯৮: ৪৭)। কিন্তু কেবল বিষয়ের বরাতে তাঁর গদ্যের 'মাত্রাতিরিক্ত' সংস্কৃত-নির্ভরতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শিশিরকুমার দাশ বিস্তর নমুনাযোগে দেখিয়েছেন (Das 1966: 192-94), দরকার ছিল না, অক্ষয়কুমারের রচনার এমন জায়গায়ও সংস্কৃত শব্দের হার অতি উঁচু। যৌগিক শব্দ, শব্দরূপ, লিঙ্গচিহ্ন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তিনি দেদার সংস্কৃত আমদানি করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকীয় সাধুগদ্যের সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন প্রধানত বাক্যকাঠামোর শৃঙ্খলা আর সুষমা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। বাংলা সাধুগদ্যের 'ওজস্বিতা ও মাধুর্য' তাঁর রচনায় প্রথম 'পূর্ণাঙ্গ' রূপ লাভ করে (সুকুমার ১৯৯৮: ৪৮-৪৯)। সংস্কৃত শব্দ ও যৌগিক শব্দের বাহুল্য, প্রচলিত ক্রিয়াপদের স্থলে 'তৎসম ভাববচনসংবলিত' ক্রিয়াপদ ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমেই তাঁর গদ্যের এই মহিমান্বিত রূপ সম্ভবপর হয়েছে। এক হিসাবে দেখা যায়, *বেতালপঞ্চবিংশতি* ও *শকুন্তলা*য় সংস্কৃত শব্দের শতকরা হার যথাক্রমে ৬৩.৬ এবং ৬৪.৮ (Das 1966: 229)। এ অংশগুলোতে একটিও আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। অর্থাৎ, *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার গদ্যের শব্দস্বভাব ও গদ্যের উৎকর্ষ-সম্পর্কিত অনুমান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-পর্ব থেকে মোটেই আলাদা নয়। তদুপরি পঞ্চাশের দশকে এই গদ্যের চর্চা হয়েছে মূলত সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের হাতে (De 1962: 263)। তাঁদের গদ্যে বিদ্যাসাগরের সাফল্য খুব কমক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ন থেকেছে। এই গদ্যের বিরুদ্ধে যে নানাধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে[৪], বহু লেখকের ব্যর্থতা তার এক উল্লেখযোগ্য কারণ। কিন্তু প্রধানত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যে সংস্কৃতায়িত সাধু গদ্যের এমন এক ধ্রুপদী রূপ গড়ে উঠেছিল, বহু পরিবর্তন-পরিমার্জনের মধ্যেও যে ছাঁচের ছায়া বাংলা গদ্য বহন করে চলেছে। এড়াতে পারেনি। হয়ত এড়াতে চায়ওনি।

৪.২ বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত নয়া তত্ত্বের উৎপাদন-পুনরুৎপাদন: ব্যাকরণ ও অভিধান

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কোনো চলতি বা আদর্শ ভাষার ভিত্তিতে ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নের ব্যাপারটা ঘটেনি। সংস্কৃত ও ইংরেজির ছাঁচে এক কল্পিত আদর্শের বরাতে ব্যাকরণ-অভিধান রচিত হয়েছে। আর বাংলা গদ্য বারবার সেই কল্পিত ছাঁচে নিজেকে গড়তে চেয়েছে। এই কারণেই সংস্কৃতায়িত গদ্য তৈরির পৌনঃপুনিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও – এবং এদিক-ওদিক কিছু প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও – গদ্যরচয়িতারা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কোনো আমূল পরিবর্তনের কথা ভাবেননি। তত্ত্বের প্রশ্রয়ে তাঁদের উদ্যমের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। সেই তত্ত্বের প্রাথমিক রূপায়ণে বাঙালি পণ্ডিতদের হাত ছিল। কিন্তু, যেমনটা আগেই বলা হয়েছে (৩.৩.১ দ্রষ্টব্য), মূল কাজটা হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির

প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান আর সক্রিয়তায়। সাহেব-পণ্ডিত যৌথতায় গড়ে ওঠা এই তত্ত্ব পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় হুবহু পুনরাবৃত্ত হতে থাকে পুরো উনিশ শতক জুড়ে। এমনকি পরেও, অন্তত ব্যাকরণের ক্ষেত্রে, কিছু সংযোজন-বিয়োজনসহ বাংলা ভাষা-ব্যাখ্যার ওই মূল ছাঁচ অক্ষুণ্ন থেকে যায়। বলা যায়, উনিশ শতকে 'মূলধারা'র গদ্যচর্চা আর ব্যাকরণ-অভিধান প্রণয়ন পরস্পরের প্রভাবে সমানতালে চলছিল।

এই পারস্পরিকতা জেঁকে না বসলে বাংলা ব্যাকরণের রূপ কী হতে পারত, তার কিঞ্চিৎ নমুনা পাওয়া যায় মানোএল দা আসসুম্পসাঁওয়ের ব্যাকরণে। তাঁর ব্যাকরণে অসঙ্গতি বিস্তর। অসঙ্গতির অন্যতম কারণ লাতিনের সঙ্গে বাংলাকে মিলিয়ে পড়ার অবাস্তব বাসনা (নির্মল ২০০০: ২৫-২৬)। কিন্তু অঞ্চলবিশেষের মুখের ভাষা অবলম্বন করায় বাংলা ভাষার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে তিনি সাফল্যও দেখিয়েছেন। বাংলা ভাষার লিঙ্গ ও বচন-বৈশিষ্ট্য তিনি ঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছেন (নির্মল ২০০০: ২৯-৩০), পরের বহু ব্যাকরণে যেক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌গতি দেখা গেছে। তাঁর ব্যাকরণে পাওয়া যায় 'যে জন ভাল হএ, ভাল কার্য্য করিয়া তে জন স্বর্গে যায়'-ধরনের বাক্য, পদক্রমের স্বাভাবিকতা ও শৃঙ্খলায় যেগুলো বাংলা বাক্যের পুরোনো সুষ্ঠুতার নজির হয়ে আছে (মানোএল ১৯৩১: ২২; সিরাজুদ্দীন ২০০৬: ১৪৮)।[৫] এসবই আসসুম্পসাঁওয়ের ব্যাকরণের প্রগতিশীলতা। তার ভিত কাঁচা, কিন্তু খাঁটি। এই ভিতের আশ্রয়ে বাংলা ব্যাকরণের প্রগতি হতে পারত। হ্যালহেড এই পথ পরিহার করে আশ্রয় নিয়েছিলেন সংস্কৃতের (৩.৩.১ দ্রষ্টব্য)। কেরির ধারাবাহিক সাধনায় বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ছাঁচের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

আসলে একে শুধু ছাঁচ বলাও মুশকিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুবাদই বাংলা ব্যাকরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ১৭৯৮ সালের ১৬ জানুয়ারি এক চিঠিতে উইলিয়াম কেরি সাটক্লিফকে জানিয়েছেন, তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের ইংরেজি অনুবাদ করছেন (নৈঋতা ২০১০: ১৩৩)। এই সূত্রে পরবর্তীকালে জানা যায়, যে ব্যাকরণটি তিনি অনুবাদ করছিলেন তা ছিল বোপদেবের *মুগ্ধবোধ* ব্যাকরণ। নৈঋতা ভট্টাচার্য লক্ষ করেছেন, কেরির ব্যাকরণের বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনাংশ আর উদাহরণ নেওয়া হয়েছে *মুগ্ধবোধ* ব্যাকরণ থেকে। এ ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮০৫) পরবর্তী বাংলা ব্যাকরণের আদর্শ হিসাবে কাজ করেছে। তাই বলা যায়, বাংলা স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ আসলে *মুগ্ধবোধের*ই উত্তরসূরি (নৈঋতা ২০১০: ১৩২)। ভাষা-বর্ণনার সূক্ষ্মতা আর সমগ্রতায় সংস্কৃত ব্যাকরণধারার জুড়ি নেই। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণ সেই ঐশ্বর্যের ভাগ পায়নি। ভাষা-বর্ণনার মূলনীতি বা দার্শনিকতার অনুসরণ না করে বাংলা ব্যাকরণে হুবহু বর্ণিত-বিষয় ও উদাহরণ গ্রহণ করায় এই ঋণ বোঝা হয়েই এসেছে – সম্পদ হয়ে ওঠেনি। বিপরীতে, সংস্কৃত ব্যাকরণের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা বাংলা ব্যাকরণের সঙ্গী হয়েছে। ওই ব্যাকরণচর্চার মূলে ছিল দেবভাষার শুদ্ধতা নিশ্চিত করা। তাই ভাষার প্রগতি বা বিবর্তনের তুলনায় ভাষার বিশুদ্ধিগত চিরন্তন মান বা আদর্শ সংস্থানের ব্যাপারেই সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন (নির্মল ২০০০: ৩)। এ কারণেই সংস্কৃত ব্যাকরণ মোটের ওপর ঔচিত্যমূলক। বাংলা ব্যাকরণে এই বৈশিষ্ট্যের অনুবর্তন দেখা যায়। তাছাড়া, গুরুশিষ্য-পরম্পরায় চর্চার বিশেষ ধরনের কারণে সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্টতার বদলে অকারণ দুর্বোধ্যতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে (সিরাজুদ্দীন ২০০৬: ১৫২)। সংস্কৃত এক অর্থে গোষ্ঠীভাষা, এর ব্যাকরণও ছিল গোষ্ঠীবিশেষের পাঠ্য। উপনিবেশিত বাঙালি অভিজাতশ্রেণিও প্রায় অনুরূপ জনবিচ্ছিন্নতার শিকার। এ বাস্তবতায় সংস্কৃত ব্যাকরণের ও আলোচ্য ভাষার সংকীর্ণতা নিয়ে কলকাতায় কোনো আপত্তি ওঠেনি। এখানেও সমাজের ক্ষুদ্র অংশের ভাষা নিয়েই

চলেছে ব্যাকরণের কায়কারবার – তাদের মুখের ভাষা নয়, কেবল লেখার আদর্শ ভাষা নিয়ে ব্যাকরণ লেখা হয়েছে (সিরাজুদ্দীন ২০০৬: ১৪৮)।

প্রধানত স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ হিসাবে উনিশ শতকে একের পর এক ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্যাকরণগুলো জড়িয়ে পড়েছে এক দুষ্টচক্রে: ছাত্রদের 'প্রাকৃত তথা লৌকিক' বাংলা না শিখিয়ে শেখানো হত 'একটি পুনর্গঠিত শিষ্টরূপ', যে 'পুনর্গঠনের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা' (নির্মল ২০০০: ১৫৫)। এই সংস্কৃতায়িত ভাষার ব্যাকরণ স্বভাবতই সংস্কৃত ব্যাকরণের হুবহু অনুকরণ হত। বিপরীতে সেই ব্যাকরণ থেকে ছাত্ররা সংস্কৃতায়িত বাংলা শিখত। তত্ত্ব এভাবে চর্চার এক অনমনীয় শৃঙ্খল তৈরি করে।[৬] ভগবচ্চন্দ্র (ভগবানচন্দ্র) বিশারদ ১৮৪০ সালে প্রকাশ করেন *সাধু ভাষার ব্যাকরণ সার সংগ্রহ*। ভূমিকায় তিনি বলেছেন (নির্মল ২০০০: ১৭৫-৭৬), আদিতে ভারতে সংস্কৃতের উত্তম চর্চা ছিল, বোপদেবাদি বৈয়াকরণেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন, অতঃপর মুসলমান আক্রমণের পর থেকে দেশে ফারসির প্রভাব বর্ধিত হয় এবং সংস্কৃতের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। বর্তমানে সরকার ফারসি বর্জন করে সাধুভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। 'অতএব ঐ সাধুভাষার ব্যাকরণ এক্ষণে অত্যাবশ্যক, কারণ সংস্কৃতজ্ঞান ব্যতীত সাধুভাষা রচনাদি জ্ঞান হওয়া সুকঠিন এবং ঐ সংস্কৃতভাষাও এমত কঠিন যে তাহাতে বহুতর পরিশ্রম ব্যতিরেকে সুন্দররূপে শিক্ষাসিদ্ধি সম্ভাব্য নহে এবং অন্য ভাষা ও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান এককালে কৃতিসাধ্য করা অসাধ্য'। ভূমিকায় লেখকের যে সংকল্প, রচনায় তিনি তা সম্পন্ন করেছেন। অর্থাৎ বইটি আগাগোড়া সংস্কৃত ব্যাকরণের ঢঙে লিখিত। সূত্রে সংহতির প্রয়োজনে বাংলা ভাষার পক্ষে অনুপযোগী সমাস, সন্ধিবদ্ধ পদ ও লিঙ্গ-সাপেক্ষ বিশেষণ ব্যবহারেও তিনি দ্বিধা করেননি (নির্মল ২০০০: ১৭৬)। একই বছর ব্রজকিশোর গুপ্ত *বঙ্গভাষা ব্যাকরণ* নামে একখানি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'এই ব্যাকরণ একপ্রকার সংস্কৃত ব্যাকরণের ছায়াস্বরূপ অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণে যে২ প্রকরণ যে২ রীত্যনুসারে লিখিত আছে ইহাতেও প্রায় তত্তৎ প্রকরণ তত্তদ্‌রীত্যনুসারে লিখিত হইল' (উদ্ধৃত, নির্মল ২০০০: ১৮২)। ব্রজকিশোর অবশ্য বাংলার লৌকিক রূপটিকেও স্বীকার করে নিয়ে তাকে সংস্কৃতরীতিতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তিনি ভূমিকায় যা বলেছেন, তা ওই যুগের বাংলা ভাষা-পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তিনি লিখেছেন:

> যদ্যপি ভদ্র সমাজে কেবল সাধু ভাষার লেখন আলাপনাদি প্রশংসনীয় এবং ভাষার লেখনাদি ঘৃণিত হয় তথাপি বহুজনের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্যত্ব প্রযুক্ত স্বদেশীয় ভাষাকে ঘৃণা না করিয়া আমি সংস্কৃত ভাষার রীত্যনুসারে তাহার রীতিবদ্ধ করিয়া অনেক২ ভাষা কথা লিখিলাম, বিজ্ঞ মহাশয়েরা আমার এই দোষ ক্ষমা করিবেন। (উদ্ধৃত, নির্মল ২০০০: ১৮২)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ ধরনের ব্যাকরণকেই বলেছেন 'Grammars of Sanskrit masquerading as Bengali grammar, in which the genuine Bengali forms have been branded as vulgur (asadhu) beside the so-called 'polite' (sadhu) forms borrowed from Sanskrit.' (Chatterji 2002: xv) অথচ অন্য উদাহরণও হাতের কাছে ছিল। বাঙালির মধ্যে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা রামমোহন রায় বাংলা ভাষা-বর্ণনার তত্ত্বও প্রস্তাব করেছিলেন। 'বাংলা ভাষার সূত্রগুলো বিশ্লেষণ ও ভাষিক উপাদানগুলির স্বতন্ত্র অবস্থান ও প্রকৃতি চিহ্নিতকরণে এবং সেক্ষেত্রে পরিভাষার ব্যবহারে বিদেশিদের ভ্রান্ত প্রক্রিয়া এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের নীতি

প্রয়োগ তিনি সমর্থন করেননি' (মনিরুজ্জামান ১৯৯৪: ৬১)। ফলে তাঁর ব্যাকরণ থেকে সংস্কৃত সন্ধির আলোচনা বাদ পড়ে, আগ্রহীদের তিনি সন্ধির জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ার পরামর্শ দেন; করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও সম্বোধন পরিহার করে বাংলা কারকব্যাখ্যার আলাদা তরিকা প্রস্তাব করেন; স্ত্রীপ্রত্যয় এবং অপরাপর কিছু প্রত্যয়ের কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যাখ্যা হাজির করেন। তারচেয়ে বড় কথা, কিছু সংস্কৃত উপাদান যে বাংলা ভাষায় বাংলার প্রকৃতিই মেনে চলে – এ সত্যও তিনি দেখিয়ে দেন (নির্মল ২০০০: ১৩৭-৪২)। কিন্তু রামমোহনের ব্যাকরণের এসব 'বাংলামি' – তিনি নিজে অভিজাত সমাজের প্রতাপশালী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও – গৃহীত হয়নি। স্কুলে পড়ানোর জন্য তাঁর ব্যাকরণের একটি সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে 'রামমোহনের মৌলিকতা অনেকক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়ে তদানীন্তন বিদ্যালয়পাঠ্য অন্যান্য বাংলা ব্যাকরণের ছাঁচে ব্যাকরণখানির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে' (নির্মল ২০০০: ১৭১)। পরের দশকগুলোতে – ১৯০০ সালের আশপাশটায় নবব্যাকরণ আন্দোলনের আগে পর্যন্ত – বৈয়াকরণ রামমোহন তাঁর বই ও তত্ত্বসহ পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়েছিলেন।[৭]

আরো কেউ কেউ প্রতিষ্ঠিত ছকের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। শ্যামাচরণ সরকারের ব্যাকরণ এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে, ১৮৫২ সালে বাংলা সংস্করণ। এই বইতে প্রথমবারের মতো শিষ্ট বাংলার পাশাপাশি লৌকিক কথ্যরূপের পরিচয় দেওয়া হয় (নির্মল ২০০০: ১৯৪)। দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু কথ্যভাষার আলোচনাই স্থান পেয়েছে। এমনকি কথোপকথনের ভাষার আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্যও – যা লেখার বাংলায় নেই – তিনি সূত্রবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। বইটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল, জনপ্রিয়ও হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরসহ পণ্ডিতসমাজে এই ব্যাকরণ প্রত্যাখ্যাত হয় (Qayyum 1982: 244)। আরেকটি ব্যাকরণের খবর দিয়েছেন প্রবাল দাশগুপ্ত (১৩৯৪) – লোহারাম শিরোরত্নের *বাঙ্গলা ব্যাকরণ*। এই বইটি ১৮৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বেশ জনপ্রিয় এই ব্যাকরণে লোহারাম সংস্কৃতের আধিপত্য মেনে নিয়েছিলেন এবং সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ও অন্য উপাদান আমদানি করেন। কিন্তু, প্রবাল দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন, বহুক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতার মধ্যেই তিনি দারুণ সব মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়ে ব্যাকরণে প্রগতির রাস্তা তৈরি করেন, যেগুলো পরে আর অনুসৃত হয়নি। কেন? কেন বিভিন্ন ব্যাকরণের 'প্রগতিশীল' উপাদানগুলো অনুসৃত হয়নি? বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস-রচয়িতা নির্মল দাশ (২০০০: ১৫৭) এর কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, বিদ্যালয়গুলোতে বাংলা পড়াতেন নর্মাল স্কুলের ছাত্ররা, যে স্কুল সংস্কৃত কলেজের অঙ্গীভূত। ব্যাকরণ বইয়ের লেখকও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত। এ কারণেই 'উনিশ শতকের অনেক ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণই সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রায় বঙ্গানুবাদে পর্যবসিত হয়েছে'। আর 'যেখানে ব্যক্তিবিশেষের উদারতায় এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে সেখানে সেই উদার ব্যতিক্রম পণ্ডিত মহলে প্রবলভাবে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হয়েছে'। তথ্যের দিক থেকে নির্মল দাশের এই বয়ান সম্ভবত ঠিকই আছে। কিন্তু এতে ফলকে হাজির করা হয়েছে কারণরূপে। আদতে সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা যে বাংলা ভাষার একচ্ছত্র অভিভাবক হয়ে উঠলো, তার পেছনে তো আছে এই ধারণা যে, বাংলা একটি 'অনুন্নত' ও 'অমার্জিত' ভাষা, আর কেবল সংস্কৃতায়নের মাধ্যমেই বাংলার 'বিশুদ্ধ' রূপ পাওয়া সম্ভব। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগে এ ধারণাকে কার্যকরভাবে কেউ চ্যালেঞ্জ করেননি (৪.৫ দ্রষ্টব্য)। এমনকি যাঁরা 'অপর ভাষা'য় লিখেছেন, তাঁদেরও মূল বিবেচনা ছিল কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টিশীলতার সংকট, আর পাঠকের বোধগম্যতার

সংকট। মুখের ভাষার লেখ্যরূপের অনুকূলে কোনো তত্ত্ব প্রস্তাবিত হয়নি। ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড বাংলা ভাষার তত্ত্ব ও প্রয়োগে একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়েই জায়মান থেকেছে।

ব্যাকরণের মতো অভিধানেও সেই আধিপত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। 'বাঙালিদের সাধুভাষা চর্চায় সহায়তা করার জন্য একদিকে যেমন সাধুভাষার ব্যাকরণ রচিত হতে থাকে, অন্যদিকে বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা অভিধান সংকলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়' (সরস্বতী ২০০০: ৮১)। বিদেশিদের বাংলা শেখার প্রয়োজনে সংকলিত হয়েছিল দ্বিভাষী অভিধান। আর বাঙালিদের নতুন বাংলা শেখানোর প্রয়োজনে প্রকাশিত হতে থাকে একভাষী অভিধান।[৮] *বঙ্গভাষাভিধান* সংকলন করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। স্কুল বুক সোসাইটির ১৮১৭-১৮ বর্ষের কার্যবিবরণে এ অভিধান সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, এটি আসলে তদানীন্তন সংস্কৃতঘনিষ্ঠ সাধুভাষা অনুশীলনের সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে সংকলিত হয়েছিল (সরস্বতী ২০০০: ৮১)। এরপর প্রকাশিত হয়েছে বহু একভাষী অভিধান (সরস্বতী ২০০০: ৮১-৯৩)। যেমন, *শব্দসিন্ধু* – পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় (১২২৪); *শব্দকল্পলতিকা* – জগন্নাথ মল্লিক (১৮৩১); *শব্দকল্পতরঙ্গিণী* – জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক (১৮৪১); *শব্দার্থপ্রকাশাভিধান* – শ্রীতারাচন্দ্রশর্মা (১২৪৫, আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে: সর্বলোক হিতার্থে সংস্কৃত ও গৌড়ীয় সাধুভাষায় অকারাদি ক্ষকারন্ত সার্থক শব্দ সংকলন পূর্বক মুদ্রাঙ্কিত হইল); *বঙ্গাভিধান* – হলধর ন্যায়রত্ন (১২৪৬, আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে: বঙ্গদেশে প্রচলিত সংস্কৃতানুযায়ি সাধু শব্দ সংগ্রহ); *শব্দাম্বুধি* – মুক্তরাম বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ সংকলিত (১৮৫৪, আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে, বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত বহুতর সংস্কৃত শব্দ সহকৃত গৌড়ীয় সাধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের অর্থপ্রকাশক গ্রন্থ); *বঙ্গভাষাভিধান* – কাশীনাথ ভট্টাচার্য ইত্যাদি। এর অনেকগুলো আসলে সংস্কৃত *অমরকোষ* ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দসংকলনের অনুকরণ। অধিকাংশ অভিধান নিষ্ঠার সঙ্গে কেবল সংস্কৃত ও তৎসম শব্দ সংকলন করেছে।

অভিধান সংকলনের ক্ষেত্রে সেকালের বাংলা ভাষানীতি কতটা নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করেছে, তা বোঝা যায় কিছু 'ফারসি অভিধান' থেকে। ১৮৩৮ সালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার *পারসীক অভিধান* সংকলন করেন। ভূমিকায় সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তর্কালঙ্কার লিখেছেন:

> ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন যে স্বকীয় ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা লুক্কায়িত হইয়া চিরকাল বিহার করিতেছে এবং তাঁহারা আর বিদেশীয় ভাষার অপেক্ষা না করিয়াই কেবল স্বদেশীয় ভাষা দ্বারা লিখন পঠন ও কথোপকথনাদি ব্যবহার করিয়া আপ্যায়িত হইবেন এবং স্বকীয় বস্তু সত্ত্বে পরকীয় বস্তু ব্যবহার করাতে যে লজ্জা ও গ্লানি তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এবং প্রধান ও অপ্রধান বিচারস্থলে বিদেশীয় ভাষা ও অক্ষর ব্যবহার না করিয়া স্বস্ব দেশ ভাষা ও অক্ষরেতেই বিচারীয় লিপ্যাদি করিতে সম্প্রতি যে রাজাজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতেও সম্পূর্ণ উপকারপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন। (উদ্ধৃত, সরস্বতী ২০০০: ১৫৬)

একই বছর নীলকমল মুস্তোফী *পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান* প্রকাশ করেন। ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত হয় *পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান*। এ গ্রন্থে লেখকের নাম ছাপা হয়নি। এই দুই অভিধানও – ভূমিকার সাক্ষ্য মোতাবেক – একই লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছিল (সরস্বতী ২০০০: ৭১)।

অভিধানগুলোর পরিকল্পনা, সংকলিত শব্দের ধরন আর ভূমিকার স্বীকৃতি থেকে প্রতীয়মান হয়, পুরো ভাষাপরিকল্পনার ব্যাপারটা আরবি-ফারসি আর সংস্কৃতের একটা বৈপরীত্যের মধ্যে গিয়ে ঠেকেছিল – প্রচলিত শব্দের মধ্যে যেসব আরবি-ফারসি লোকে চেনে না, সেগুলো চিনিয়ে দেওয়া, যাতে সেগুলো বাদ দেওয়া যায়; আর যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার লোকে জানে না বা জানায় ঘাটতি আছে, সেগুলো শিখিয়ে দেওয়া, যাতে নতুন ব্যবহারের ভ্রান্তি এড়ানো যায়। তত্ত্বের প্রগাঢ় প্রশ্রয় থাকায় কাজটা গোপনে বা আড়ালে-আবডালে ঘটেনি; বরং অভিধান-সংকলকরা দায়িত্ব হিসাবেই কাজটা করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা হিসাবে হলধর ন্যায়রত্নের অভিধানের (১২৪৬) ভূমিকা পাঠ করা যেতে পারে:

> Sometime ago a dictionary was printed in which all the Persian and Arabic words which have entered into the Bengali language were carefully pointed out, so as to assist learners in finding out at once what foreign words have been admitted into it; for of this many have not a perfect knowledge. Under the idea that a dictionary would be found useful in which all the Sungskrit words which are usefull in the Bengalee language are pointed out, I have now undertaken this work.
>
> The Sungskrit words which are used in the Bengalee language are generally understood, and much used; but many who are not acquainted with the Sungskrit, find a difficulty in knowing how to spell them correctly; to prevent errors in this respect, all the Sunskrit words are classed separately in this dictionary. It contains 6264 words, which have been placed according to the order of the letters. (উদ্ধৃত, সরস্বতী ২০০০: ১৫৯)

এই দুই 'শত্রু-মিত্রে'র লড়াইয়ে সাধারণভাবে তদ্ভব বা দেশি উপাদানগুলো উল্লেখের যোগ্য হয়ে ওঠেনি। এসব শব্দ যেখানে সম্পূর্ণ বর্জিত হয়নি সেখানেও গুরুত্বের বিচারে বঞ্চিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তারাপদ চক্রবর্তীর অভিধানের উল্লেখ করা যায়। তাঁর বাংলা-ইংরেজি অভিধান প্রকাশিত হয় ১৮২৭ সালে। মূলত সাধু বাংলার ভিত্তিতেই তিনি অভিধান প্রণয়ন করেছেন। ফলে শব্দ নির্বাচনে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। ভূমিকায় পরিষ্কারভাবে সে কথা জানিয়েও দিয়েছেন:

> Persian and Arabic words, which have been intermixed with our language since the Mohamedan conquest, but which are now falling into disuse as fast as the cultivation of pure Bengalee is extending, can not be considered as constituting a part of it, and accordingly do not find a place in this book. (উদ্ধৃত, সরস্বতী ২০০০: ৬১)

তদ্ভব শব্দের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বেশ কৌতুককর। এ ধরনের শব্দ তিনি বর্জন না করলেও অর্থনির্দেশের সময়ে তৎসম শব্দের উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন, 'মাসী' শব্দটি তাঁর অভিধানে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু এখানে তার অর্থ দেননি, অর্থ দিয়েছেন 'মাতৃস্বসা' মুখশব্দের ক্ষেত্রে। মাসীর ক্ষেত্রে লিখেছেন মাসী, S. see 'মাতৃস্বসা'; মিছার ক্ষেত্রে লিখেছেন মিছা, a, see মিথ্যা (সরস্বতী ২০০০: ৬১)।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর *বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে*র (১৯১৬) প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন, 'বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দই কি, বিশুদ্ধ বৈদেশিক শব্দই কি, আর দেশীয় অনার্য শব্দই কি – যাহা ভাষায় প্রচলিত আছে তাহা ভাষার

অভিধানে স্থান পাইবার যোগ্য' (জ্ঞানেন্দ্র ২০১১: ৩৪)। বাস্তবে এই ধারণা কার্যকর করতে বাংলা অভিধানগুলোর আরো অনেক সময় লেগেছিল; কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে অভিধান সংকলনের এই তত্ত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মানোএলের পর্তুগিজ-বাংলা অভিধানে কিন্তু এই সহজ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মানোএল 'যে সব শব্দ বাংলাভাষীদের মৌখিক বচনে প্রচলিত দেখেছেন সে সমস্ত শব্দকেই তাঁর সংগ্রহে স্থান দিয়েছেন' (সামসুন ১৯৯৪: ১৪৩)। মাঝের অন্তত দেড়শ বছর বাংলা অভিধানে এই সহজ বুদ্ধির কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। বলা যায়, বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত ঔপনিবেশিক মতাদর্শের নিশ্ছিদ্র আধিপত্যেই এই সুদীর্ঘকাল বাংলা ভাষার তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক চর্চা হয়েছে।

৪.৩ 'অপর ভাষা'র গদ্য: কথ্য-বাংলার লেখ্যরূপ ও 'আলালি-হুতোমি' পর্ব

সাধুভাষার বিপরীতে 'অপর ভাষা' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিখ্যাত 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা'। পরের জমানায় 'অপর' কথাটির সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসব ভারি অর্থ জুড়ে গেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারে সম্ভবত অত জটিলতা ছিল না। তিনি সম্ভবত ভিন্নভাবের একটা গোত্র বোঝাতেই 'সাধুভাষা'র বিপরীতে শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। আসলে সেকালের ভাষাপরিস্থিতিতে শব্দটি কোনো অস্পষ্টতা তৈরি করেনি। 'বিভাজনে এ নিয়ে কোনো তর্ক ছিল না যে অপর ভাষা বলতে কী বোঝায়' (দেবেশ ২০০৩: ১০)। কিন্তু উনিশ শতক তো বটেই, বিশ শতকের একটা বড় অংশ জুড়েও বাংলা ভাষাচর্চার অঙ্গনে কথ্য-বাংলা এতটাই অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল যে, এর 'অপরতা' সম্পর্কে – শব্দটির 'ভারি' অর্থেও – কোনো সন্দেহ করা চলে না।

বাংলা গদ্যচর্চার ধারা, গদ্যের ইতিহাসচর্চার ধারা, আর ব্যাকরণ-অভিধান চর্চার ধারা থেকে প্রতীয়মান হয়, এই 'অপরতা'র প্রাথমিক কিন্তু প্রভাবশালী নিয়ামক ছিল আরবি-ফারসি তথা 'মুসলমানি' শব্দ। হ্যালহেড থেকে শুরু করে নতুন বাংলার তাত্ত্বিকদের সকলেই বাংলা ভাষার 'বিশুদ্ধতা' নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হিসাবে আরবি-ফারসি শব্দকে দায়ী করেছেন। অন্তত এক শতক ধরে অভিজাত ভাষা-ব্যবহারকারীদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো ভিন্নমত দেখা যায়নি। আরবি-ফারসির বিপরীতে সংস্কৃত – এই ছকেই যে ভাষাচর্চার মূলস্রোত আবর্তিত হয়েছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় অভিধান-সংকলনের ধারায় (৪.২ দ্রষ্টব্য)। প্রকৃত কাণ্ড আরো অনেক গভীর ও বিস্তৃত। বাংলা গদ্যের ইতিহাসের প্রায় যে কোনো আলোচনায় জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এই বৈপরীত্যের বোধ কাজ করে গেছে। মনোমোহন ঘোষ তাঁর বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন এভাবে – '১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একখানি দানপত্রের ভাষায় আরবী পারশী শব্দ থাকলেও তাতে প্রাঞ্জলতার অভাব নেই' (মনোমোহন ১৯৪১)। এই বাক্য নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, কতগুলো প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত অনুমানের সমর্থনে বা বিরোধিতায় ভর করে বাক্যটি দাঁড়িয়ে আছে। যেমন, 'আরবি-ফারসি' শব্দের ব্যাপারটি অন্য সবকিছু থেকে আলাদা করে বিবেচ্য; এ ধরনের শব্দ থাকলে ভাষা প্রাঞ্জল হওয়ার কথা নয়; ভাষার প্রাঞ্জলতার বিষয়টি কেবল আরবি-ফারসির উপস্থিতি-অনুপস্থিতির সঙ্গেই জড়িত ইত্যাদি। মনোমোহন ঘোষের লেখায় এ বাক্য কোনো বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়। 'প্রাক্-আধুনিক' বাংলা গদ্যের যে উদাহরণগুলো তিনি দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে বিবেচনার প্রথম ও প্রধান উপাদান হয়েছে আরবি-ফারসি। শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই নয়। একই স্বর ও সুরের বাক্য পাওয়া যাবে বাংলা গদ্যের যে কোনো বয়ানে। স্পষ্টতই সংস্কৃতবহুল বাংলা গদ্যের পরবর্তী

ইতিহাস আর আরবি-ফারসি-বিতাড়ন অভিযানের দীর্ঘ ইতিহাস সামনে থাকার কারণেই গদ্যের বিবেচনায় আরবি-ফারসি প্রসঙ্গ এত কেন্দ্রিকতা পেয়েছে। বাংলা ভাষার ঔপনিবেশিক নির্মাণে আরবি-ফারসি কেবল শাব্দ-উপাদান হয়েই থাকেনি, তৈরি করেছে বিশেষ 'বর্গ', যার সাপেক্ষে নির্ণীত হবে 'ভালো' বা 'খারাপ' গদ্য।

রামরাম বসুর *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র*-সম্পর্কিত ভাষ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করলেই উপরের কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই বইয়ের গদ্য উইলিয়াম কেরির অনুমোদন পায়নি সম্ভবত আরবি-ফারসি শব্দের কারণেই। সজনীকান্ত দাস জানাচ্ছেন, অব্যবহিত পরের কালেও এই গদ্য গৃহীত হয়নি: 'রামরাম বসু ফার্সী জবানকে মানিতে গিয়া বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে তাঁহার ভাষা 'কদর্য্য' বিশেষণে বিশেষিত হইয়া পরবর্ত্তী কালে পণ্ডিতজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ওয়েঞ্জার, ইয়েট্স এবং নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাদের সংগ্রহপুস্তকে রামরাম বসুকে স্থান দেন নাই' (সজনীকান্ত ১৩৫৩: ১৪৮)। শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৩৬৬) দেখিয়েছেন, রামরাম বসুর গদ্যের আরবি-ফারসির পরিমাণ ও প্রয়োগ সঙ্গত। তাঁর মতে, 'রামরামের রচনায় ফার্সির ব্যবহার ভারতচন্দ্রের চেয়ে খুব বেশি নয়। তাঁর রচনা ভারতচন্দ্রের কাব্যের তৃতীয় খণ্ড অপেক্ষা বেশি দুর্বোধ্যও নয়' (শ্যামল ১৩৬৬: ৭৬)। দেখা যাচ্ছে, এই দুই বিরোধী মতের নিয়ামক ভূমিকায় আছে আরবি-ফারসি শব্দ। কিন্তু রামরামের রচনায় এরূপ শব্দের পরিমাণ কত? শিশিরকুমার দাশ হিসাব করে দেখিয়েছেন (Das 1966: 84-86), এই বইতে মোট শব্দ আছে ১৪,৯৭৬টি। তার মধ্যে ২১৮টি আরবি-ফারসি শব্দ মোট ৫১১ বার ব্যবহৃত হয়েছে। শতকরা হার ৩.৪। তিনি আরো দেখিয়েছেন, ২১৮টির মধ্যে ১২২টি প্রশাসনিক, ৫৯টি সামরিক, ২০টি বিভিন্ন বস্তুর নাম। ফলে বসু কোনোভাবেই ফারসিপ্রীতি বা সংস্কৃতবিদ্বেষ দেখাননি। একটি অনুচ্ছেদের হিসাব দিয়েছেন শিশিরকুমার, যেখানে একজন হিন্দু রাজার রাজধানীর বর্ণনা আছে। এখানে সংস্কৃত ও ফারসির অনুপাত ৩৩৩ : ২৭। তাঁর সিদ্ধান্ত: 'সমালোচকদের বড় অংশ রামরাম বসুর উপর অবিচার করেছেন'। যাঁরা 'অবিচার' করেননি – যেমন সুকুমার সেন (১৯৯৮) বা দীনেশচন্দ্র সেন (1921) – তাঁদেরও দেখাতে হয়েছে যে, রামরামের গদ্যে আরবি-ফারসির ব্যবহার 'সুষ্ঠু ও সঙ্গত' কিংবা আরবি-ফারসির ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁর গদ্য 'সুখপাঠ্য'। এ বাস্তবতা থেকে বর্গ হিসাবে আরবি-ফারসির প্রতাপ অনুধাবন করা যায়। কোনো সন্দেহ নেই, এর ফলে বিবেচনার আঙিনা থেকে 'বাংলা গদ্য' তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণে বাদ পড়ে গেছে। বড় হয়ে উঠেছে 'সংস্কৃতবহুল গদ্য' বনাম 'আরবি-ফারসিবহুল গদ্য'। অথচ শব্দসম্ভার গদ্যশৈলীর অপেক্ষাকৃত গৌণ ব্যাপার। গুরুত্বপূর্ণ হল, শব্দগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন, শব্দের বিন্যাস, প্রতিদিনকার কথ্যভাষার – দেবেশ রায়ের (দেবেশ ২০০৩: ৯) ভাষায় 'মানুষের জিব ও গলার তাপে'র – সঙ্গে সম্পর্ক থাকা না থাকা। বাংলা গদ্যের ভাষ্যকারেরা এসব দিকে নজর দেওয়ার ফুরসত বড় একটা পাননি। লিপ্ত থেকেছেন মূলত শব্দসম্ভারের উৎস নিয়ে।

অথচ আরবি-ফারসি শব্দবহুল চলতি বাংলা বাতিল করতে গিয়ে বা বাতিলের পাশাপাশি বাদ পড়েছে তদ্ভব ও দেশি শব্দের বিপুল ভাণ্ডার, উচ্চারণভঙ্গি ও বাগবিধি। এখানে সম্প্রদায়গত 'অপরতা'র সঙ্গে মিলেছে শ্রেণিগত 'অপরতা'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অননুকরণীয় ভঙ্গিতে এই বাস্তবতার বর্ণনা দিয়েছেন:

> একদল আছেন, তাঁহারা চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁটকাইয়া উঠেন; বলেন – 'ওটা ইতুরে কথা'। উহার বদলে তাঁহারা সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিতে চান। আমরা বলি, 'সময় আর কাটে না', তাঁহারা বলেন, 'কাটে না, ছি! – ও ইতুরে কথা'। বলেন, 'সময় কর্তন হয় না'। আমরা কথায় বলি, 'বাড়িয়ে গুছিয়ে লও'। তাঁহারা বলেন, 'ছি! ও ইতুরে কথা। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া লও'। আমরা বলি, 'দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়', তাঁহারা বলেন,

> ‘দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়’। আমরা কথায় বলি, ‘এটা গালগল্প’, তাঁহারা বলেন, ‘স্বকপোলকল্পিত’। আমরা বলি, ‘ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল’, তাঁহারা বলেন, ‘কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল’। এইরূপে তাঁহারা কেতাবের ভাষাকে কথা কওয়ার ভাষা হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইংরাজি ও সংস্কৃত পড়িতে যত কষ্ট হয়, তাঁহাদের সাধু ভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়। (হরপ্রসাদ ২০০০/২: ৩৬৮)

এর আগে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ও (1990) চলিত শব্দ ও বাগভঙ্গি বাদ দেওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।

কিন্তু সাধারণভাবে শব্দসম্ভারের পরিমাণগত বিবেচনা যতটা হয়েছে প্রকৃতিগত আলোচনা ততটা হয়নি। অন্য ভাষার একটি শব্দ কোনো ভাষায় গৃহীত হলে ঋণী ভাষার স্বভাব মোতাবেক তার নানা বদল ঘটে। শব্দটি ধ্বনিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যাকরণিক নানা রূপের জন্য প্রস্তুত হয়। তারচেয়ে বড় কথা, মুখের জবানে ব্যবহৃত হয়ে তার পুরোনো ধার-ভার বদলে গিয়ে ঋণী ভাষার সুর-স্বর আর বাগভঙ্গির সঙ্গে কালে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শব্দটি তখন আর আগের ভাষার শব্দ থাকে না। নতুন ভাষার শব্দভাণ্ডারের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।[৯] লেখ্য ভাষায় আনকোরা শব্দ আমদানি সম্পূর্ণ অন্য মামলা। মুখের ভাষা থেকে লেখার ভাষায় আসা শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। বাংলা ভাষার আরবি-ফারসি বর্গ বিবেচনার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারগুলো মোটেই আমলে আনা হয়নি। ফলে মুখের বাংলা, চলতি বাংলা আর আরবি-ফারসিবহুল বাংলার কোনো সুষ্ঠু বিবেচনাধারা গড়ে ওঠেনি।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *কলিকাতা কমলালয়* (১৮২৩) গ্রন্থে ভদ্রলোকদের পক্ষে পরিত্যাজ্য ‘যাবনিক ভাষা’র শব্দের এক তালিকা দিয়েছেন (ভবানী ২০০৩: ৪৭৮-৮৪)। ১৮২ শব্দের এই তালিকায় অধিকাংশ শব্দই নিরীহ ও বহুলপ্রচলিত। এগুলোর বদলে ‘সাধুভাষা’য় ব্যবহার্য শব্দের তালিকাও যোগ করেছেন তিনি। সঙ্গে অন্তত ১০৯ শব্দের আরেকটি তালিকা দিয়েছেন (ভবানী ২০০৩: ৪৮৪-৮৬), যেগুলোর প্রতিশব্দ ‘সংস্কৃত বা তদনুযায়ি শব্দেও নাই’। এসব শব্দের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত: ‘সন্ধ্যাপূজা ও দৈবকর্ম্মে পিতৃকর্ম্মে ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করিলেই দোষ হইতে পারে বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে কিম্বা হাস্য পরীহাসাদি সময়ে ব্যবহার করণে কি দোষ’ (ভবানী ২০০৩: ৪৮৬)। বোধগম্যতার সমস্যা আর বাস্তব প্রয়োজনের কথাও তুলেছেন তিনি: ‘অন্য জাতীয় ভাষা না কহিলে পরে সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা ব্যবহার করিলে অনেকে বুঝিতে পারে না তবে কিরূপে বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়’ (ভবানী ২০০৩: ৪৮৬)। আরবি-ফারসি শব্দ পরিহারের এরূপ প্রবণতা প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন, ‘এই ব্যাপারটা শ্রেণীগত হলেও, এটি চেহারা নিল সাম্প্রদায়িক। এর কারণ ভদ্রলোকেরা প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু, এবং বাতিল শব্দগুলোর অধিকাংশই ছিল মুসলিম শাসনের স্মারকচিহ্ন’ (সিরাজুল ২০০৩: ৮৩)। আসলেই সমকালীন চর্চায় আর উত্তরকালীন বিবেচনায় ‘সাম্প্রদায়িক’ দিকটাই সবসময়ে সামনে এসেছে, ‘শ্রেণিগত’ দিক নয়। বাস্তব অবস্থার ফিরিস্তি দিয়েছেন বলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়ানে বরং একটা নিগূঢ় সত্য ধরা পড়েছে – বিশেষ বিশেষ ব্যবহারে ভাষা আলাদা হতেও পারে, কিন্তু ‘বিষয় কর্ম্মে’ চলতি ভাষা দরকার। উনিশ শতকের ‘সাহিত্যিক’ ও ‘উন্নত’ ভাষার প্রবল প্রতাপের মধ্যে ‘অপর ভাষা’ এই বিষয়ী লোকের ব্যবহারেই সতেজ ও গতিশীল থেকে যায়। তাতে তাজা থাকে বাংলার স্বাভাবিক ভঙ্গি, তদ্ভব ও দেশি শব্দের সম্ভার আর চালু আরবি-ফারসি বিপুল শব্দ। ভাষা ও গদ্যরীতির বিচারে ‘অপর ভাষা’র শ্রেণিগত পাঠ তাই খুবই সম্ভব; কিন্তু বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত ঔপনিবেশিক তত্ত্বের চাপে তা বিভ্রান্তিকরভাবে সাম্প্রদায়িক রূপ নেয় – পরিচিত হয় ‘মুসলমানি বাংলা’ নামে।

এই বিভ্রান্তির নমুনা হিসাবে উনিশ শতকের প্রতিনিধি-স্থানীয় লেখক রাজনারায়ণ বসুর একটি মন্তব্য খতিয়ে দেখা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন:

> মুসলমানী বাঙ্গালার দৃষ্টান্তস্বরূপ 'গোলেবকোয়ালি' গ্রন্থের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া একটি অংশ পাঠ করিতেছি : -
> শুন হে মুমিন সব করিয়া ধ্যায়ান।
> বকাওলির এই পুথি এই কেতাবের নাম।।
> দফা দফা কতবার ছাপা হয়েছিল।
> রসিক লোকেতে তাহা চুমিয়া লইল।।
> রসিক লোকের বড়া খাহেষ দেখিয়া।
> ছাপাইনু পুথি আমি মেহন্নত করিয়া।।
> যে জন খাহেষদার খাহেষ হইবে।
> বটতলা যাইলে পর আলবত্তা পাইবে।।
> মহম্মদ আজিমুদ্দিন দপ্তরী জানিবে নাম মোর।
> মস্তফাই ছাপাখানা দরিয়া কিনার।।
> কম্পোজ কেরেট আর যত কিছু ভার।
> হীন সদরদ্দিন জানিবে নাম তার।।

বিখ্যাত *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়* (১৯৭৩) রাজনারায়ণ বসু এই বাংলাকে 'মুসলমানী বাঙ্গালা' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই অংশে এক 'আলবত্তা' ছাড়া এমন শব্দ আর একটিও নেই, যা আজতক লেখ্য-বাংলায় – কথ্য তো বটেই – ব্যবহৃত হয় না। তাহলে বাংলায় প্রচলিত কিছু আরবি-ফারসি উৎসের শব্দই কি এই নামায়নের কারণ? সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলায় ফারসি উৎসের শব্দের কিছু হিসাব দিয়েছেন:

> In Rai Bahadur Yogesh Chandra Vidyanidhi's Dictionary, the number of Persian words is less than 1450: the total number of words in this 'Sabda-Kosa' does not seem to exceed 18,000, on a rough computation; and as these are mostly folk-words, the percentage of Persian words in the popular Bengali of west Bengal and west central Bengal, as presented in this Dictionary, would be about 8%. This is slightly higher than what we find in the living Calcutta colloquial of the Hutom Pecar Naksa: in 15 pages of this book, taken at random, containing some 3000 words at the rate of 200 words per page, 213 Persian words occur: the percentage is thus 7.1 for the speech of educated Hindus of Calcutta over 50 years ago; and this would seem to hold good at the present day as well. (Chatterji 2002: 222-23)

তিনি আরো জানাচ্ছেন, বাঙালি মুসলমানের ঘরে ব্যবহৃত ভাষায় এই হার শতকরা ১৫ ভাগ হতে পারে (Chatterji 2002: 211)। কিন্তু এই হিসাবেও ইতরবিশেষ আছে। প্রমথ চৌধুরীর *রায়তের কথা* প্রবন্ধে আরবি-ফারসি শব্দের পরিমাণ, সুনীতিকুমারের হিসাবে, শতকরা ১৩.৪ (Chatterji 2002: 222)। তাঁর মতে, জমিজমা আর আইনি শব্দের কারণেই এই শ্রেণির শব্দের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের শেষাংশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের বাড়তি-কমতির সঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের

গভীর সম্পর্ক আছে।[১০] আছে গোষ্ঠীভাষা হিসাবে চর্চিত হওয়ার ইতিহাস। কাজী আবদুল মান্নান বিস্তারিত তথ্য-উপাত্তসহ দেখিয়েছেন, কথিত 'দোভাষী পুথি'র ভাষা একটি সাহিত্যিক ভাষা; এবং বাঙালি মুসলমানের তৎকালীন কথ্য ভাষার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই (Mannan 1966: 202-227)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খেয়াল করেছেন, মুসলমানি বাংলার পুথিতে আরবি-ফারসি শব্দের হার কোথাও কোথাও শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ পর্যন্ত দেখা যায় (Chatterji 2002: 211)। এই বাহুল্যের এক কারণ, পণ্ডিতি বাংলার প্রতিক্রিয়াঃ 'It is the Maulavi's reply to the pandit's sadhu-bhasa of the early and middle part of the 19th century.' (Chatterji 2002: 211) কারণ যাই হোক[১১], বাংলার ক্ষেত্রে এই হার কিছুতেই স্বাভাবিক নয়। কিন্তু *গোলেবকাওলি*র মতো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পঠিত রচনাগুলোতে – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হিসাব করা – স্বাভাবিক হারই ছিল, যেমন ছিল আঠার শতকের শেষ বা উনিশ শতকের প্রথমাংশের কথ্য-বাংলায় (৩.৪.১ দ্রষ্টব্য; Mannan 1966: 193)। তা সত্ত্বেও প্রায় সকলে রাজনারায়ণ বসুর মতোই এ ভাষাকে চিহ্নিত করেছেন 'মুসলমানি বাংলা' হিসাবে। এই চিহ্নায়নের গলদটি বোঝা যাবে অন্য কিছু গদ্য-নমুনা থেকে। এক হিসাবে দেখা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *আবার অতি অল্প হইল* বইয়ে তৎসম শব্দের শতকরা হার ১৫.২৩, তদ্ভবের ৫৫.২৩ আর আরবি-ফারসির ২৬.৬৬ (Das 1966: 229)। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক (১৯৮৫) অপরাধ জগতের ভাষার যে শব্দতালিকা দিয়েছেন, তাতে আরবি-ফারসি শব্দের হার অনেক বেশি। এগুলোকে নিশ্চয়ই 'মুসলমানি বাংলা' বলা যাবে না। বলা হয়ও না। বোঝা যায়, 'মুসলমানি বাংলা' বর্গটা বিশুদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তিতে চিহ্নিত হয়নি, যদিও ব্যবহারিক দিক থেকে এ চিহ্নায়নের ধারা বেশ প্রতাপশালী ছিল, এবং অনেকাংশে এখনো আছে (Mannan 1966: 182-188)।

এর ফলে 'সাধুভাষা' নয়, এমন বাংলার 'অপরতা' জোরদার হয়েছে। একদিকে প্রশ্নটি শ্রেণির – উনিশ শতকের উপনিবেশিত-শিক্ষিত শ্রেণির সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিচ্ছিন্নতা আর তাদের ভাষার বিচ্ছিন্নতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অন্যদিকে মুসলমান 'অপরে'র (৩.৩.৩ দ্রষ্টব্য) সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলতি বাংলার একটা বড় অংশ সম্প্রদায়গত বিবেচনার অঙ্গীভূত হয়েছে। দুইয়ে মিলে – পবিত্র সরকারের (১৯৯৯: ৪৬) ভাষায়, উন্নাসিকের বিদ্বেষ আর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মিলে – বাংলা ভাষার 'মূলধারা'র সঙ্গে 'অপর ভাষা'র এমন এক জল-অচল সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, ভারতবর্ষের অন্য ভাষাগুলোর ক্ষেত্রেও যার তুল্য কোনো নজির পাওয়া যায় না।

এ বিচ্ছেদের কারণেই প্যারীচাঁদ মিত্র যখন গদ্যে চলতি শব্দ আর বাগভঙ্গি নিয়ে এলেন, তখন তা অনেকের কাছে 'বৈপ্লবিক' মনে হয়েছিল। সমকালেই এ গদ্যের স্বীকৃতি মিলেছে। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'উহাতেই প্রথম এই বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ' (বঙ্কিম ১৯৮৯: ৭৯৪-৯৫)। অন্যত্র – 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে – তাঁর উচ্ছ্বাসের মাত্রা আরো অনেক বেশিঃ 'সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল' (বঙ্কিম ১৯৮৯: ৩৪০)। নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছিলেনঃ 'The work has been written in a simple style and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and acquaintance with Hindu domestic life, it will perhaps be found useful.' (প্যারীচাঁদ ২০০৩: ৩৯)। এই লক্ষ্যের সাফল্য সম্পর্কে তিনি খোদ বিদেশিদের কাছেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। জেম্‌স্

লঙের (লঙ্ ১৯৮৮: ৬) মনে হয়েছে এই ভাষা ‘ব্যঙ্গাত্মক ও বলিষ্ঠ’। বীম্‌স্ লক্ষ করেছেন (উদ্ধৃত, বিজনবিহারী ১৯৭৭: ১৬৪), ‘He puts into the mouth of each of his characters the appropriate method of talking, and thus exhibits to the full the extensive range of vulgar idioms which his language possesses.’

বিদেশিদের বাংলা বাগভঙ্গি শেখানোর উদ্দেশে *আলালের ঘরের দুলাল* রচিত হলেও *মাসিক পত্রিকা* কিন্তু প্রকাশিত হচ্ছিল দেশীয়দের জন্যই। অন্তত পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্য হিসাবে ছাপা হওয়া কথাগুলো এই অনুমানকে সমর্থন করে: ‘এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই’ (উদ্ধৃত, সুকুমার ১৯৯৮: ৬৩)। এই সম্পাদকীয় মন্তব্য উপনিবেশিত বাংলা গদ্যের বেহাল দশারই সাক্ষ্য। এখানে যে ‘স্ত্রীলোকের’ কথা বলা হয়েছে, তাঁরা নিঃসন্দেহে ভদ্র ঘরেরই মানুষ। নতুন যুগের ভাব-স্বভাব তাঁদের কাছে পৌঁছানো দরকার। কিন্তু উপনিবেশিত গদ্যে সে কাজ করা যাচ্ছে না। কাজেই আশ্রয় নিতে হয়েছে ভিন্নরীতির। সে রীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন:

> আলালের ঘরের দুলালের ভাষার প্রধান গুণ ইহার ভাষা সর্বসাধারণের বোধগম্য সরস ভাষা। সাধুভাষার যুক্ত ক্রিয়াপদের পরিবর্তে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশী শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ, সমাসযুক্ত পদের পরিবর্জন, কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত ফারসী শব্দের এবং কথ্যভাষাসুলভ বাক্যাংশ বা ইডিয়ম এবং আভাণক বা প্রবাদবাক্যের প্রয়োগ – ইহাই মোটামুটি আলালের ঘরের দুলালের ভাষার বৈশিষ্ট্য আনিয়াছে। (সুকুমার ১৯৯৮: ৬৫)

এ বৈশিষ্ট্যগুলো তো যে কোনো চলতি ভাষারই লক্ষণ। এ ভাষার গুরুত্ব তাহলে গদ্যের বিশেষ চর্চার বিপরীতেই কেবল প্রাপ্তব্য, কোনো ব্যক্তিগত গদ্যশৈলী হিসাবে নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্যে ‘চলিত’ রীতির গদ্য হিসাবেই এ গদ্যের প্রশংসা আছে: ‘প্যারীবাবুর ভাষার খুব জোর, খুব দৌড়। যে ভাষায় লিখিলে ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল হায়’, ইহা সেই ভাষা – যেহেতু ইহা চলিত ভাষা। এই ভাষায় যে লেখে ও যে পড়ে, তাহাদের মধ্যে ভাষা বলিয়া একটা পর্দাই থাকে না’ (হরপ্রসাদ ২০০০/২: ১৫০)। বিপরীতে ‘চলিত ভাষা থেকে যত দূরে থাকা যায়’-ধরনের গদ্যের বৈশিষ্ট্যও নির্দেশ করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। উদাহরণ দিয়েছেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে: ‘আমি বাল্যকালে এক বৃদ্ধকে তারাশঙ্করের ‘কাদম্বরী’র তর্জমা পড়িয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম – আহা! তারাশঙ্কর কী চমৎকার ভাষাই লিখিয়াছে! অভিধান ভিন্ন এক বর্ণও বোঝা যায় না। এই তো লেখার গাম্ভীর্য’ (হরপ্রসাদ ২০০০/২: ১৪৪)। কিন্তু *কাদম্বরী*র তর্জমা তো ভালো সাধুভাষা হিসাবে গৃহীত হয়নি। হয়েছে বিদ্যাসাগরের গদ্য। সেই গদ্যের সংকটও শনাক্ত করেছেন শাস্ত্রী: ‘সেখানে এই সাধুভাষা মাজা ঘষা, শুনতে মিষ্টি হয়। কিন্তু সে ভাষা ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে’ না’ (হরপ্রসাদ ২০০০/২: ১৫০)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই বিশ্লেষণে গদ্যের মানচিত্রটা অনেক পরিচ্ছন্ন আর যৌক্তিক।

সাধুভাষার বিপরীতে ‘অপর ভাষা’র বড় খোপের মধ্যেই প্যারীচাঁদের এই গদ্য পাঠ্য। এই কারণেই বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ‘আলালি গদ্য’ বলে যে ‘বর্গ’ শনাক্ত করা হয়, তাতে – অন্তত ব্যবহারিক দিক থেকে – মস্ত বড় গলদ আছে। এই অর্থে যে, ‘আলালি গদ্য’ উপনিবেশিত ‘মূলধারা’র গদ্যের রীতিবিশেষ নয়, বা প্যারীচাঁদ মিত্রের ব্যক্তিগত আবিষ্কারও নয় – ‘অপর ভাষা’র সাহিত্যিক ব্যবহার মাত্র। এ কথা *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার* (১৮৬২) বেলায়ও খাটে।

আরো বেশি করে খাটে। কারণ, এ ভাষা 'একেবারে কথ্যভাষার ছাঁদে লেখা। কলিকাতা অঞ্চলের উপভাষার ছাপ ইহাতে সুস্পষ্ট। সাধুভাষার অযথা মিশ্রণ নাই' (সুকুমার ১৯৯৮: ৬৮)। বলা যায়, 'অপর ভাষা'র সাহিত্যিক ব্যবহারে কালীপ্রসন্ন সিংহ অনেক বেশি বলিষ্ঠতা দেখিয়েছেন।

সাধুগদ্যের সংকীর্ণ আওতার মধ্যে বিবেচনা সীমাবদ্ধ রাখার কারণেই বাংলা গদ্যের ইতিহাসে 'আলালি-হুতোমি' গদ্য সম্পূর্ণ নতুন ধারার সূচনা হিসাবে কীর্তিত হয়েছে। আদতে বাংলা ভাষা ও গদ্যের বৃহত্তর চর্চায় এ কোনো নতুন সূচনা নয়; বড়জোর 'মূলধারা'র কোনো লেখকের প্রথম ব্যবহার। দীনেশচন্দ্র সেন (২০০৬: ৪০৩) খুব বিস্তৃত পরিসরে আর লম্বা সময়ের বিবেচনায় বাংলা ভাষার জাত নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে, 'কেতাবী ভাষার দ্বারা ভাষার স্বরূপ নির্ণয় হয় না। ... ভাষার প্রাচীনত্ব এবং যুগ নির্ণয় করা একটু কঠিন কাজ'। এই কঠিন কাজটি তিনি করতে উদ্যোগী হয়েছেন লোকায়ত গল্পগাথা অবলম্বনে। 'পতি হাসে, মালঞ্চ হাসেন, পতি কাঁদে, মালঞ্চ কাঁদেন, পতি কথা কয়, মালঞ্চ কথা কন, পতি হাত-পা নাড়ে, মালঞ্চ আদরে খেলা দেন' – *মালঞ্চমালা* গল্প থেকে এই বাক্য উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন: 'এই কথাগুলি এত সরল ও গ্রাম্য যে বহু শতাব্দীতেও এরূপ ভাষার খুব বেশি পরিবর্তন হয় না'। 'দক্ষিণাবাবু' এ গল্পের ভাষা অনেকটা বদলে দিয়েছেন, এ বিষয়ে তিনি সচেতন। 'তাহা সত্ত্বেও ইহাতে বঙ্গপল্লীর সুপ্রাচীন সুরটি আছে, অপোগণ্ড শিশুর গায়ে দুধের গন্ধের মতো তাহাতে ভুল হইবার অবকাশ নাই'। এর বিপরীতে আছে ব্রাহ্মণ্যযুগের ভিন্ন ভঙ্গি। 'গল্প বলিবার বেদী ব্রাহ্মণঠাকুর দখল করিয়া বসিলেন, বর্ণনা করিতে লাগিলেন, 'ঘোরা রজনী, নিবিড় গাঢ় তমস্বিনী – শান্তা নলিনী' ইত্যাদি'।

অন্যত্র (দীনেশ ২০০৬: ৯৬৩-৬৫) তিনি আরো পষ্ট করে বাংলা ভাষার এই দুই ভাগের বর্ণনা দিয়েছেন। একদিকে আছে 'প্রাকৃত বাংলা', যাকে বহু 'প্রাচীন বাঙ্গালা লেখক 'প্রাকৃত' সংজ্ঞায়ই অভিহিত করিতেন', আর অন্যদিকে পড়বে সংস্কৃত-প্রভাবিত বাংলা। প্রথম ভাগের আদিকাল নবম-দশক শতক, এবং তা এখনো চলমান। এর বৈশিষ্ট্য হল: খাঁটি বাংলা শব্দের বাহুল্য; কোনো পুস্তক বা সাহিত্য থেকে ধার না করে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উপমা চয়ন; বর্ণনার সংক্ষিপ্ততা ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগের উৎপত্তি চোদ্দ শতকে চণ্ডীদাসের কাল থেকে, এবং এই ধারাও এখনো চলমান। এ ধারার বৈশিষ্ট্য: বহু আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ; সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত উপমার ছড়াছড়ি; বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ও পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার পুরো ইতিহাসের ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেন যে সূত্র বানিয়েছেন, তাকে যদি উপনিবেশিত বাংলায় খাটানো হয়, তাহলে দেখা যাবে, দুই ধারায় গুণগত বদল হয়নি, কিন্তু পরিমাণগত বদল হয়েছে বিস্তর। 'প্রাকৃত বাংলা' জাত-মান খুইয়ে এ পর্বে হয়ে উঠেছে 'অপর ভাষা'; আর সংস্কৃতায়িত বাংলায় সংস্কৃতায়নসহ অপরাপর জনবিচ্ছিন্নতা পরিমাণে অনেক বেড়ে তা আভিজাত্যের দিক থেকে একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করেছে। এই আধিপত্যের সবচেয়ে কার্যকর ক্ষেত্র অভিধান-ব্যাকরণ, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি। এসবের বাইরে কথ্য ভাষার লিখিত-রূপের চর্চা থেমে থাকেনি। পত্রপত্রিকায় এ চর্চার বিস্তর নমুনা দেখা যায়। *সমাচার দর্পণে*র পরিকল্পিত ছকের মধ্যেও এমন বিস্তর চিঠি আর নিবন্ধ দেখা যায়, যেখানে বিষয়ের চাপে এবং লেখকের কণ্ঠস্বরের প্রতাপে চলতি গদ্যের সুর অনাহত থেকে গেছে। নমুনা হিসাবে ২১ আগস্ট ১৮১৯ তারিখের পত্রিকায় ছাপা এক নিবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল:

> ১৪ জুলাই শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর আপন কালেজের দারোগা শ্রীযুত হিরূ বাবুকে কহিলেন যে ইস্তক লাগাইদ কতগুলি বালক আমার কালেজে লিখিয়া গুণবান হইয়াছে। দারোগা কহিলেন যে মহারাজ সুন্দররূপে কেহই হইতে পারে নাই। মহারাজ ইহা শুনিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীযুত বসন্ত বাবুকে আজ্ঞা করিলেন যে অদ্যাবধি এই কালেজ তোমার জিম্বা হইল তুমি ইহা তদারক করিবা এবং হাকিম সাহেবকে কহিলেন যে তুমি আমার সরকারে এক শত টাকা দরমাহা পাইতেছ অদ্যাবধি আর অধিক পঞ্চাশ টাকা পাইবা কিন্তু প্রতি মাস বালকেরদের ইন্তাহাম তোমার লইতে হইবেক। মহারাজ এরূপ অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও আপন কালেজের অধিক তদারক করিতেছেন। (ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৩৯: ২৩)

এ রকম চিঠি বা প্রতিবেদন *সমাচার দর্পণে* বিস্তর ছাপা হয়েছে। এর অনেকগুলো নিশ্চয়ই পত্রিকার তরফ থেকেই লেখা। কিন্তু অনেকগুলো যে পাঠকেরা লিখেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। *দর্পণে*র গদ্য পাঠকদের পক্ষে বুঝে ওঠা হয়ত সম্ভব ছিল, কিন্তু অবিকল সেই গদ্য অনুসরণ করা – বিশেষত যাঁরা চিঠিপত্র লিখতেন, তাঁদের পক্ষে – সম্ভব ছিল না। 'গদ্যচর্চার অনুকূল পরিস্থিতিতে এইসব চিঠিপত্রে নানা রকম লেখার উদাহরণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি, দর্পণের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের বাইরের বাংলা গদ্যচর্চার নানা ধরনও দেখা যায়' (দেবেশ ১৯৯০: ১৩৫)। এসব রচনার ভাষার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রচলিত শব্দের বাহুল্য ও বাক্যের মধ্যে কথকতার ভঙ্গি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* সংকলনে (১৩৪০) দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৫-৬৭ পৃষ্ঠায় এক লম্বা চিঠি উদ্ধৃত করেছেন, যাতে ডাকাতির অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়। ডাকাতদলের হাতে জেরবার মানুষেরা আবার থানার লোকদের হাতে কিভাবে নাকাল হয়, তারও বিবরণ আছে। চিঠিতে লেখক এর নিরাকরণের উপায়ও বাতলেছেন। এসব চিঠিতে কথ্য শব্দসম্ভারের প্রাবল্য আর বাক্যের কথ্য গড়ন প্রমাণ করে, অন্যরকম গদ্যের নানা ধাঁচ কেন্দ্রীয় রচনাধারার সমান্তরালে চলছিল।

চলাটাই স্বাভাবিক। পুরোনো গদ্যের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা ভাষাভঙ্গি উনিশ শতকের সমাজেও চালু ছিল। ঔপনিবেশিক কাঠামোর প্রত্যক্ষতার বাইরে লেখ্য ভাষার নানা রূপের মধ্যে সেই ভাষাভঙ্গির সঞ্চার তাই রুদ্ধ হয়নি। ৫ আগস্ট ১৮২৬ তারিখের *সমাচার চন্দ্রিকায়* 'নূতন বিমা আপিস' নিয়ে এক প্রতিবেদন ছাপা হয়। এই প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে দেবেশ রায় লিখেছেন:

> 'আঠার শতকের বাংলা চিঠি' (আনিসুজ্জামান) ও 'আঠার শতকের বাংলা গদ্য' (দেবেশ রায়) – বই দুটিতে আঠার শতকের এমন বহু চিঠির নিদর্শন পাওয়া যাবে যেখানে এমন লেনদেন, এমন বিজ্ঞপ্তি, এমন হিশেবনিকেশের বিবরণ খুব স্পষ্টভাবে আছে। আঠার শতকের সেই লেখালেখি উনিশ শতকের শুরুতেই নিশ্চয়ই লোপ পেয়ে যায়নি – বরং দেশি ব্যবসায়ের এই চিঠিপত্রের ধারা বা বয়ান আধুনিক কালেও চালু আছে। দর্পণে এই ধরনের রচনাগুলিকে অনুবাদ করা হত। চন্দ্রিকায় ভবানীচরণ আঠার শতকের প্রচলিত দেশি ধারাতেই লিখেছেন। (দেবেশ ১৯৯০: ১৮৩-৮৪)

মোটা দাগে বলা যায়, বিদেশি ব্যাপার-স্যাপার তো বটেই, এমনকি দেশি উপাদানগুলো 'অনুবাদ' করে হাজির করার একটা ধারা ঔপনিবেশিক বাংলা গদ্যে তৈরি হয়েছিল। সাহেবরা বা দেশি 'সাহেব'রা পণ্ডিতদের সহায়তায় যে কাগজ বের করতেন, তাতে এ ঘটনা দেদার ঘটেছে। বিপরীতে *চন্দ্রিকা-ভাস্কর-প্রভাকর* প্রভৃতি কাগজে সাংবাদিক-সম্পাদকরাই ছিলেন একাধারে মালিক ও প্রধান লেখক। এসব কাগজে উপনিবেশিত গদ্যের ছক অনেকক্ষেত্রেই

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষিত হয়নি, বরং অনেক গদ্যেই 'বাঙালি কণ্ঠস্বরের খাদ ও চড়া, কম্পন ও ইতস্তত, স্বগতোক্তি ও নাটকীয়োক্তি' (দেবেশ ১৯৯০: ১২৩) শোনা যাচ্ছিল।

এই স্বর-সুর কখনো কখনো গ্রন্থের আকারও পেয়েছে। মুহম্মদ আবূ তালিব (১৯৭৯: ৭-১১) এ ধরনের এক বইয়ের খবর দিয়েছেন। *শাহ মখদুম জীবনী* নামের এই বই প্রকাশিত হয় ১২৪৫ বাংলা সন মোতাবেক ইংরেজি ১৮৩৮ সালে। এর ভাষারীতি পর্যালোচনা করে আবূ তালিব জানিয়েছেন, 'বিদ্যাসাগরের রচনারীতি বিদ্যালঙ্কারের রচনারীতির বিবর্তিত এবং সরলতর রূপ সন্দেহ নেই, কিন্তু *শাহ মখদুম জীবনী*র রচনারীতি এদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে হয়'। তাঁর মতে, কথ্য শব্দসম্ভারের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস আর সরল গড়নের কারণে এ বইয়ের বাক্য 'প্রকাশক্ষম এবং সুন্দর' হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন *নববাবুবিলাস*, *নববিবিবিলাস* এবং এমনকি মৃত্যুঞ্জয় শর্মার *প্রবোধচন্দ্রিকা* (১৮১৩) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, *আলালের ঘরের দুলালে*র বহু আগে থেকেই নিখাদ কথ্যরীতির সাহিত্যিক ব্যবহার চলে এসেছে। তাঁর ভাষায় – 'All these will give a fair idea of the origin of the style followed not only in *Alaler Ghorer Dulal* but also *Hutum Pichar Naksa*.' (Sen 1921: 28) দেবেশ রায়ও অন্যভাবে প্রায় একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন:

> এই দুটি লেখাকে [*আলালের ঘরের দুলাল* ও *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা*] আমরা কাহিনীগদ্যের এক আরম্ভ না ধরে পরিণতিও বলতে পারি। সেই 'সমাচার দর্পণ' থেকেই ত বাংলা কাগজে এই ধরনের কাহিনীগদ্য লেখা হয়ে আসছিল যাকে অনেক সময় সাহিত্যের ইতিহাসে নকশাজাতীয় কৌতুক রচনা বলে বর্ণনা দেওয়া হয়। ... এই ধরনের বিবরণের অভ্যাস গড়ে উঠেছিল প্রায় চল্লিশ বছর ধরে, লেখার অভ্যাসও তৈরি হয়েছে এই সময় জুড়ে ...। (দেবেশ ১৯৯১: ৪)

আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশের আগের দশকগুলোতে কলকাতার সংবাদপত্রে যেসব দীর্ঘ 'সংবাদ-কাহিনী' ছাপা হয়েছে, তার সঙ্গে এ উপন্যাসের সম্পর্ক লক্ষ করেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সরোজ ১৯৮৮: ৬১)।

তার মানেই হল, প্যারীচাঁদ মিত্রের কথিত 'আলালি' আর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমি'রীতি কোনো আনকোরা ধারা তৈরি করেনি – প্রচলিত ধারাতেই সাফল্য দেখিয়েছে। *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার গদ্য বা 'বিদ্যাসাগরী' গদ্যের প্রসার বা সাফল্যের প্রেক্ষাপটে অন্তত শিক্ষিত মহলে ওই ধারা সম্ভবত আরো কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল। তাই প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নের গদ্য অনেক বেশি নতুন বলে প্রতিভাত হয়েছে। কিংবা এমনও হতে পারে, 'আলালি-হুতোমি' ভাষা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সেকালের উপনিবেশিত ভদ্রলোক সমাজের আরেকটি জটিল হিসাব কাজ করেছে। ইংরেজি-শিক্ষিত শ্রেণি বা গোত্রের হিসাব। সুশীলকুমার দে (De 1962: 263) 'আলালি' ভাষার কুলজি টেনেছেন এভাবে: সাহেবি বাংলা প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে মিশনারিদের দ্বারা – প্রভাবিত হয়েছে চলিত এমনকি আদালতি বাংলা দ্বারা, আর শেষে নানা পথ ঘুরে ইংরেজি-শিক্ষিতদের সরল ভাষার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পৌঁছায় 'আলালি' ভাষায়। রেভারেন্ড জেম্‌স্ লঙ্‌ও সরল গদ্যের এই 'আন্দোলনের' সঙ্গে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্পর্ক লক্ষ করেছেন: 'সমাজসংস্কারের প্রবক্তাগণ গত চার বছর যাবত *মাসিক পত্রিকা* নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করছেন। পত্রিকাটিতে আটপৌরে মানুষের বোধগম্য ভাষায় হিন্দুদের সামাজিক কুসংস্কারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মনোরঞ্জক গল্পের সাহায্যে সংস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়' (লঙ্ ১৯৮৮: ৫)। সরল ভাষার সৌন্দর্য আবিষ্কার যে আদতে ইংরেজি

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষারই সুফল, সেকথা বলতে ভোলেননি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: 'তিনি [টেকচাঁদ ঠাকুর] ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন' (বঙ্কিম ১৯৮৯: ৩৪০)। দেখা যাচ্ছে, ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি-শিক্ষিতদের সঙ্গে 'আলালি' ভাষাকে মিলিয়ে পড়ার একটা বাস্তবতা ছিল – রেওয়াজও ছিল। আর ইংরেজির সঙ্গে যুক্ত কোনো বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করা তো সহজ কাজ নয়। তদুপরি, এই চর্চাকারীরা সমকালীন অভিজাত সমাজের মানুষ। তাই একদা 'অপর ভাষা' হিসাবে যা লাপাত্তা ছিল, অভিজাত পঙ্‌ক্তিতে স্থান পেয়ে তা-ই বিবেচনার কেন্দ্রে আসীন হল।

বাংলা গদ্যের 'আলালি-হুতোমি' পর্বকে এভাবে দেখার অন্তত দুটি জোরালো কারণ আছে। প্রথমত, কোথাও চর্চার একটি পুরোনো ধারার সম্প্রসারিত বা সফল রূপ হিসাবে একে বর্ণনা করা হয়নি। অর্থাৎ, 'অপরে'র সঙ্গে যোগের বিষয়টি উহ্য থেকে গেছে। গদ্যের এই রূপটিও – খানিকটা দ্বিধা, খানিক সাফসুতরা করে নেওয়া আর খানিকটা বিশেষ চিহ্নায়নের পথ ধরে – হয়ে উঠেছে 'ভদ্রলোক'দের সম্পত্তি। দ্বিতীয়ত, চর্চাকারীদের সঙ্গে শ্রেণি ও গোত্রগত ঐক্যের কারণে সতর্ক প্রশংসা পেলেও উনিশ শতকের উপনিবেশিত কলকাতায় এই গদ্যের কোনো অনুসারী জোটেনি। বলা যায়, 'অপর ভাষা' 'আলালি-হুতোমি' রূপে জাতে ওঠার পরেও 'অপর'ই থেকে গেছে।

৪.৪ সমন্বয়ের গল্প ও কথিত 'মধ্যপন্থা'

ইতিহাস রচনার স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলা গদ্যের ইতিহাস বইগুলোতে একটা ধারাবাহিকতা আরোপ করা হয়। সেই ধারাবাহিকতা সাধারণত কয়েকজন লেখককে ধরেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বভাবতই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হন এসব আলোচনার প্রধান প্রস্থানবিন্দু। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যেই বিষয় ও রীতির সমন্বয়ে এমন নমুনা পাওয়া যায়, যেগুলোকে বাংলা গদ্যের 'চিরকালীন' নমুনা হিসাবে বর্ণনা করা সম্ভব। তাঁর আগের দুই বিপরীত গদ্যরীতির চূড়ায় হাজির থাকেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর প্যারীচাঁদ মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে এই দুইরীতির একটা সমন্বয় ঘটেছে – এই মত তাঁর প্রায় সমকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আর উত্তরকালেও তার বিরোধিতা হয়নি। এই বয়ান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক কারণ আগের গদ্যের 'চরমপন্থা'। চরমপন্থার বিপরীতে বঙ্কিমের গদ্যে খোঁজা হয়েছে 'মধ্যপন্থী' গদ্য। অন্য কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই 'মধ্যপন্থী' গদ্যের একজন তাত্ত্বিক। বাংলা গদ্যের উন্নতির যেসব সুপারিশ তিনি করেছেন, তাতে বারবার মধ্যপন্থা অবলম্বনের কথা এসেছে। অন্যরা তাঁর প্রস্তাব কার্যত মেনে নিয়েছেন, এবং তাঁর গদ্যেই সেই মধ্যপন্থী গদ্যরীতির আদর্শ খুঁজে পেয়েছেন। উনিশ শতকের উপনিবেশিত বাংলা গদ্যের ঘরের খবর পেতে হলে তাই এই 'সমন্বয়' আর 'মধ্যপন্থা'র হদিশ নেওয়া জরুরি।

টেকচাঁদ ঠাকুরের *আলালের ঘরের দুলাল* প্রকাশের উল্লেখ করে রাজনারায়ণ বসু *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা*য় বলেছেন:

> সেই অবধি দুই প্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, বিদ্যাসাগরী ভাষা ও আলালী ভাষা। কোন ভাষা জয়লাভ করিবে, অনেক দিন পর্যন্ত তাহাতে সন্দেহ ছিল। এক্ষণে যেরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, ঐ দুই ভাষা হইতে উৎপন্ন এক মিশ্রভাষা গ্রন্থকারদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবে। এই মিশ্র ভাষা ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক বিখ্যাত উপন্যাস-রচয়িতা বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (রাজনারায়ণ ১৯৭৩: ১৯)

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রায় একইরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: 'আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতে বঙ্গসাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল। ভাষা সম্পূর্ণ আলালী রহিল না বটে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রী রহিল না, বঙ্কিমী হইয়া দাঁড়াইল' (শিবনাথ ১৯৫৭: ১৩১)। এই 'বঙ্কিমী' রীতির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি: 'বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা ও অপরদিকে আলালী ভাষার মধ্যগা' (শিবনাথ ১৯৫৭: ২৫৩)। দুইরীতি সমন্বয়ের এই মত যে বেশ জনপ্রিয় তা বোঝা যায় যখন রামগতি ন্যায়রত্ন (১৯৯১) আর সুশীলকুমার দে-র (1962) মতো ভিন্নকালের আর দৃষ্টিভঙ্গির পণ্ডিত এ ব্যাপারে একই মত পোষণ করেন। কিন্তু সবাই এ কথা বললেও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য ঠিক কোন কোন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সমন্বয়ের কাজটা করেছে, তা কোথাও বিশ্লেষিত হয়নি।

৪.৪.১ 'বঙ্কিমী' গদ্য

সুকুমার সেন (১৯৯৮: ১০৯) রচনারীতির ক্রমবিকাশের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন: সংস্কৃতঘেঁষা, প্রাকৃতঘেঁষা ও নিজস্বরীতির রচনা। শেষোক্ত রচনার গদ্যকে বলা যায় 'বঙ্কিমী' গদ্য। *কৃষ্ণকান্তের উইল* (*বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৭-৭৮), সুকুমার সেনের মতে, এই শ্রেণির গদ্যে লেখা, যেখানে 'সংস্কৃতঘেঁষা রচনাপদ্ধতি' অনেক 'সরল ও লঘু' হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে সুকুমার সেন নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত করেছেন:

> বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল-দীর্ঘ-বিলম্বিত ঘোর কৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু – তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জল বৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুদ্রিত পদ্মের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরো অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট – স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট – গণ্ড এখনও উজ্জ্বল – অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল। (*কৃষ্ণকান্তের উইল*)

বাংলা গদ্যের শ্রী-শোভার দিক থেকে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ভালো গদ্যের নানা লক্ষণ এ অংশে পাওয়া যায়। কিন্তু একে 'সরল ও লঘু' বলা মুশকিল। যদি তা বলা হয়ও, তাহলে কেবল এ অর্থে যে, পদবিন্যাস ও খণ্ডবাক্যের যোজনায় বাংলা গদ্যের পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত আদর্শের কোনো ব্যত্যয় এখানে ঘটেনি। তাছাড়া অচলিত সংস্কৃত শব্দও নেই বললেই চলে। কিন্তু 'আলালি' বা অন্য কোনো কথ্যরীতির 'সমন্বয়ে'র নজির এখানে পাওয়া যায় না।

রাজসিংহ উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় *বঙ্গদর্শনে*, ১৮৭৮-৭৯ সালে। চতুর্থ সংস্করণে এটি আকারে-প্রকারে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়। এ সংস্করণের ভূমিকায় লেখক নিজেই ভাষার পরিবর্তনের কথা বলেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সংস্কৃত সম্বোধন পদ পরিহার। পরিমার্জনার ফলে এ সংস্করণে 'ভাষা বেশ সরল' হলেও মুখের ভাষার প্রকৃতি অনুসরণের কোনো লক্ষণ এখানেও পাওয়া যায় না। বরং 'নয়ননামা গিরিসঙ্কটে'; 'কুতুবমিনারের বৃহচ্চূড়া'; 'প্রবলবেগে প্রবহমান অশ্রুজল চক্ষুমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া' ইত্যাদির মতো সামঞ্জস্যহীন শব্দব্যবহার, আর 'অস্ত্রসজ্জাভীষণ অশ্বারোহিদল'; 'বিবরে প্রবিশ্যমান মহারথের ন্যায়'; 'পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া বিস্ময়করী মোগলবাহিনী' ইত্যাদির ন্যায় সংস্কৃতরীতির সমাস এ উপন্যাসে বিস্তর পাওয়া যায় (সুকুমার ১৯৯৮: ১১৬)।

এ তো গেল সেসব উপন্যাসের ভাষা, যেগুলোতে বঙ্কিমের নিজস্বরীতির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে করা হয়। এর আগের উপন্যাসগুলোর – যার মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি রচনাও পড়বে – ভাষা সম্পর্কে বলা যায়, 'তাঁহার প্রথম

যুগের উপন্যাস কয়খানি মূলত বিদ্যাসাগরী পদ্ধতিতেই রচিত' (সুকুমার ১৯৯৮: ১১১)। সুকুমার সেন (১৯৯৮: ১০৯-১১৫) অবলম্বনে এ ধারার গদ্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল: এক. 'হেতু'-শব্দের অর্থে '-প্রযুক্ত'; অসমাপিকার অর্থে '-পূর্ব্বক'; সঙ্গ, সঙ্গী অর্থে 'সমভিব্যাহার', 'সমভিব্যাহারী'; পঞ্চমীর অর্থে '-প্রমুখাৎ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ। দুই. সংস্কৃত অনুযায়ী তৎসম শব্দ বা সন্ধি প্রয়োগ। তিন. স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার। চার. সমাসের আড়ম্বর। পাঁচ. সংস্কৃতরীতির বাক্য রচনা। ছয়. সম্বোধনপদে সংস্কৃতরীতির প্রয়োগ। মোটের উপর, উপনিবেশিত বাংলা গদ্য বিদ্যাসাগরের হাতে যে রূপ ও আদর্শ লাভ করেছিল, তার প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই বঙ্কিমচন্দ্রের এ ধারার গদ্যে রক্ষিত হয়েছে। এর ফলে এই দুই গদ্যের স্বরে-সুরেও যথেষ্ট মিল দেখা যায়।[১২] সুকুমার সেন বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস থেকে বেশ কিছু অংশ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, 'গ্রন্থমধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে' অংশগুলো 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া অক্লেশে গৃহীত হইতে পারে' (সুকুমার ১৯৯৮: ১১২)।

বস্তুত, সংস্কৃত ব্যাকরণের আনুগত্যের হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রেই – যেমন, সম্বোধনপদের রূপ, বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গরূপ ইত্যাদি – বিদ্যাসাগরকেও ছাড়িয়ে গেছেন। আদতে তিনি ঐ ব্যাকরণের অনুগতই থাকতে চেয়েছেন। বিশেষত রসরচনায় – যেখানে তিনি সৌন্দর্যসৃষ্টির উছিলায় গদ্যের 'উঁচু'রীতি সম্পর্কিত সমকালীন ধারণার প্রশ্রয় পেয়েছেন। কিন্তু সৃষ্টিশীল কাণ্ডজ্ঞান তাঁকে সেই উঁচু মোকামে সবসময়ে থাকতে দেয়নি। কাঁঠালপাড়ায় *দুর্গেশনন্দিনী* পাঠের আসর বসেছিল। শ্রোতাদের মধ্যে ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরাও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার ব্যাকরণগত শুদ্ধি-অশুদ্ধি নিয়ে। চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলেছিলেন, 'আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ দোষ লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে' (উদ্ধৃত, গৌতম ২০১১: ২৪২)। এই মাধুর্যের সন্ধান সম্ভবত বঙ্কিম নিজেও পেয়েছিলেন। তাই তাঁর গদ্যে – বিশেষত উপন্যাসের গদ্যে – তৈরি হয়েছিল বিপরীতমুখী টান। একদিকে 'আদর্শ' বাংলা গদ্যের তত্ত্বের অনুসরণ করতে গিয়ে সংস্কৃতরীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়েছে, অন্যদিকে বিষয় বা 'স্বাভাবিকতা'র টানে সেই নিয়ম-কানুন ভাঙতেও হয়েছে। তাতে গদ্যে সারল্য এসেছে, ভঙ্গির বৈচিত্র্য আর প্রকাশক্ষমতা বেড়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে তৈরি হয়েছে 'ব্যাকরণগত ভুলে'র অবকাশ। রামগতি ন্যায়রত্ন এ ধরনের 'ভুলে'র বড় তালিকা দিয়েছিলেন *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* বইয়ের প্রথম সংস্করণে। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন লিখেছেন, 'সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বিশেষ পরিচয় থাকিলেও বঙ্কিম সংস্কৃত ব্যাকরণে নিষ্ণাত ছিলেন না। তাঁহার রচনার ব্যাকরণঘটিত অধিকাংশ অশুদ্ধির ইহাই মূল কারণ' (সুকুমার ১৯৯৮: ৮১)। এক অর্থে বাংলা গদ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণঘটিত ভুল খোঁজা হাস্যকর। কিন্তু উনিশ শতকের ভাষাপরিস্থিতিতে এই দৃষ্টিভঙ্গিই 'স্বাভাবিক' ছিল। আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তত্ত্বে ও প্রয়োগে তা মেনেও নিয়েছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ মেনে লিখেছেন বলে সে অনুযায়ী 'ভুল' খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

সরল করে বঙ্কিমের উপন্যাসের গদ্যকে বলা যায় সৌন্দর্যসৃষ্টির গদ্য। যেখানে সৌন্দর্য অপেক্ষা উপযোগের প্রাধান্য ছিল – যেমন বহু প্রবন্ধের গদ্যে – সেখানে পাঠকের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ তৈরির বাসনাই ছিল প্রধান। ফলে এসব ক্ষেত্রে সংস্কৃতরীতির প্রতাপ কমেছে। এই গদ্য একদিকে সরল হয়েছে, অন্যদিকে ব্যাকরণিক ভুলভ্রান্তির দিক থেকে – সুকুমার সেনের (১৯৯৮: ১২২) ভাষায় – 'বিশুদ্ধতর' হয়েছে। শুধু প্রবন্ধে নয়, *রজনী* বা *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসেও এরকম গদ্যের স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সারল্য 'সাধুরীতি'র গদ্য থেকে অবরোহী পন্থায় পাওয়া

সারল্য; কথ্যরীতি থেকে – 'আলালি' বা 'হুতোমি'র মতো – আরোহী পন্থায় পাওয়া নয়। চল্লিশের দশক থেকেই 'বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের হাতে' 'বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে থাকে' যে গদ্য (দেবেশ ১৯৯০: ১৬), এই গদ্য তারই উত্তরসূরি। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য যে 'আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক' ঔপনিবেশিক গদ্যেরই ধারাবাহিকতা, সে কথা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বলেছেন:

> This labored prose in the hands of capable authors like Aksaya-Kumar Datta, Isvara Vidyasagara, and Bankim Chandra Chatterji in his earlier novels, as well as a host of lesser names, became an admirable instrument of expression, and formed the basis of the literary dialect of the present day. (Chatterji 2002: 220-221)

বঙ্কিমের হাতে এই গদ্য শিল্পিত হয়েছে, পাঠযোগ্য হয়েছে, ব্যবহারিক তথা পাঠকের দরবারে পৌঁছানোর প্রয়োজনে সরল হয়েছে। কিন্তু সারল্য কথ্যরীতির একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়; স্বর ও সুরের মামলা আছে, শব্দস্বভাব ও বাগবিধির ভিন্নতা আছে। এসব দিক থেকে 'আলালি-হুতোমি'র সঙ্গে বঙ্কিমের গদ্যের কোনো মিল নেই। তাহলে বঙ্কিমের গদ্য প্রসঙ্গে 'সমন্বয়ে'র গল্প এত মশহুর হয়ে উঠল কেন? একটা কারণ বোধহয় সারল্যের সঙ্গে কথ্যভঙ্গিকে গুলিয়ে ফেলা। অন্য আরেক কারণ অনুমান করা সম্ভব, যা অতটা সরল নয়। উপনিবেশিত অভিজাত গোষ্ঠী নিজেদের জনবিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন, যদিও এই বিচ্ছিন্নতা কাটানোর কোনো সোজা রাস্তা ছিল না। ভাষাগত বিচ্ছিন্নতা এই জনবিচ্ছিন্নতারই প্রকাশ। এ অবস্থায় *মাসিক পত্রিকা* বা *আলালের ঘরের দুলালে* জনভাষা চর্চিত হয়েছে – এই সংবাদ ওই জনগোষ্ঠীর কাছে সম্ভবত এক ধরনের দায়মুক্তির বার্তা বয়ে এনেছিল। মুক্তির বোধটা যে দায়সারা গোছের ছিল, তত খাঁটি ছিল না, তার প্রমাণ – আগেই বলা হয়েছে – এ গদ্যের কোনো প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষ অনুসারী না থাকায় পরোক্ষ অনুসারীর খোঁজ করতে হয়েছে। গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চরম সাফল্য আর তাতে 'সরল' গদ্যের উপস্থিতির প্রেক্ষাপটে একজন পরোক্ষ অনুসারী সাব্যস্ত করার সুযোগ মিলেছে। ঔপনিবেশিক গদ্যের প্রতাপশালী ধারণাকে বৈধ করার জন্য এরূপ 'সমন্বয়'-মিথের দরকার ছিল (৪.৪.৩ দ্রষ্টব্য)।

এই আনুমানিক বিশ্লেষণের পক্ষে-বিপক্ষে প্রমাণ দাখিল করা কঠিন। কারণ, বঙ্কিমী গদ্য ঠিক কোন অর্থে 'আলালি' গদ্যের কতটা শুষে নিয়েছিল, তা কোথাও বিশ্লেষিত হয়নি। এ থেকে মনে হয়, এই 'মিথে'র নির্মাণ পুরোপুরি সচেতনভাবে হয়নি। কিন্তু গদ্যের 'মূলধারা' থেকে 'হুতোমি' গদ্যের বাদ পড়াটা যে সচেতন প্রক্রিয়া, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্তত কোনো কোনো উল্লেখ থেকে এটা জোর দিয়ে বলা যায়। বলা যায়, 'অপর' ভাষার সঙ্গে কতদূর পর্যন্ত আপোস করা যায়, তার একটা মাত্রাজ্ঞান সামষ্টিকভাবেই রক্ষিত হয়েছিল।

৪.৪.২ 'আলালি' বনাম 'হুতোমি'

সমকালে বিশেষ পাত্তা না পেলেও পরের জমানায় – গদ্যের ক্ষেত্রে কথ্যরীতির মহিমা স্বীকৃত হওয়ার প্রেক্ষাপটে – 'হুতোমি' ভাষারীতির বিস্তর প্রশংসা হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শাকে* চিহ্নিত করেছেন কলকাত্তাই কথ্য ভাষায় লেখা প্রথম বই হিসাবে:

> The colloquial of Calcutta made its first eclatant advent in the 'Hutom Pecar Naksa' (1862) *Sketches of the Hooting Owl* of Kali-Prasanna Sinha, which is one of the raciest books in Bengali, a work which is full of life, being sketches of the social life in Calcutta in the

> middle of the 19th century, written in the choicest colloquial spiced with slang terms and unconventional expressions such as a man about the town would use. (Chatterji 2002: 135)

লক্ষণীয়, সুনীতিকুমার কেবল এই বইয়ের গদ্যের প্রশংসা করেননি, বিষয়ের সঙ্গে গদ্যরীতির সফল মেলবন্ধনে উত্তম রসসৃষ্টির কথাও বলেছেন। অন্য অনেকে কথ্যরীতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে *আলালের ঘরের দুলালের* তুলনায় *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শাকে* উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন। এরকম কয়েকটি মত নিচে উদ্ধৃত হল:

এক. 'চলিতভাষায় লিখিত প্রথম গ্রন্থ বোধ হয় হুতোম পেঁচার নক্‌শা। অনেকে বলেন, আলালের ঘরের দুলালও চলিতভাষায় লেখা। এ কথা ঠিক নয়, কারণ এই বইএ প্রচুর গ্রাম্য আর ফারসী শব্দ থাকলেও সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের সাধুরূপই দেখা যায়'। (রাজশেখর ১৩৬৩: ১০০-০১)

দুই. 'প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর নকশাধর্মী বই দুটিতে (লক্ষণীয়, অন্য বইগুলোতে নয়) কথ্যঘেঁষা গদ্যরীতি প্রয়োগ করে এক ধরনের ভাষা-বিপ্লবের সূচনা করলেন' ... আর 'কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতুমে কথ্যরীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটল'। (খগেন্দ্র ১৯৯৫: ১৬৬-১৬৭)

তিন. 'কলিকাতার আঞ্চলিক কথ্য ভঙ্গীর এবং অনভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত অশিষ্ট শব্দ ও বাগ্বিশেষের অজস্র ব্যবহার সত্ত্বেও প্যারীচাঁদের পরীক্ষা ষোল আনা সফল হয় নাই। প্যারীচাঁদ কথ্য ভাষার রীতিটা ঠিকমত ধরিয়াছিলেন, কিন্তু রূপটা পুরোপুরি পারেন নাই। রূপের বিচারে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' অনেক উন্নত'। (বিজন ১৯৭৭: ১৬৬)

চার. 'দুঃসাহসিকতায় 'হুতোম' 'আলাল'-এর চাইতেও কয়েক পা এগিয়ে। বইটি আগাগোড়া সে যুগের অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিতদের মুখের 'কলকাত্তাই' বুলিতে লিখিত। তখনকার কলকাতার সামাজিক জীবনের একটি ব্যঙ্গাত্মক চিত্র'। (হীরেন্দ্র ১৯৮৮: ৯২)

পাঁচ. 'আলালী এবং হুতোমী গদ্য একেবারে খাস কলকেত্তাই মুখের বুলির ভিত্তিতে রচিত হলেও দুই বুলির জাত একটু আলাদা। টেকচাঁদ ঠাকুর তাঁর গ্রন্থের বুলিকে কিঞ্চিৎ মার্জনা করেছেন, অথবা বলা যায়, তাঁর অজান্তে সাহিত্যিক ভাষাছাঁদ তাতে অনুপ্রবেশ করেছে। যদি চুলচেরা বিচার করতেই হয়, খাস কলকেত্তাই বুলির অন্যতম এবং হয়ত একমাত্র প্রতিনিধি হুতোমী গদ্যকেই বলতে হয়'। (মৃণাল ১৯৯৪: ৮৩)

ছয়. 'ভাষার ব্যাপারে কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) অবশ্যি সত্যি সত্যি ছাড়িয়ে গেছেন টেকচাঁদকেও। টেকচাঁদের 'আলালে' সাধু ও কথ্যের মিশ্রণ ঘটেছে, আট বছর পরে লেখা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় কথ্যের সঙ্গে গলাগলি চলেছে রাস্তাঘাটের ভাষার'। (সিরাজুল ২০০৩: ৬৬)

কিন্তু উনিশ শতকে 'হুতোমি' গদ্যের এই মহিমা অপ্রচারিতই থেকে গেছে। বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের অনুমান: 'সম্ভবত হুতোমের চুটকি নকসা অপেক্ষা আলালের আখ্যানবস্তুই পাঠকের মনকে অধিক আকর্ষণ করিয়াছিল' (বিজন ১৯৭৭: ১৬৭)। তাহলে যেখানে প্রশ্নটা শুধুই ভাষার বা গদ্যশৈলীর, সেখানে অন্তত 'হুতোমি'র প্রশংসা পাওয়ার কথা ছিল। তা ঘটেনি। বরং *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার* কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। উদাহরণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার প্রশংসা করি না। (বঙ্কিম ১৯৮৯: ৩৪৩-৪৪)

উনিশ শতকে এর বিপরীতে কোনো প্রভাবশালী মত পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে দেখা দরকার, 'হুতোমি'তে নেই এমন কোন গুণের জন্য অন্তত একটা পক্ষ হিসাবে 'আলালি' গদ্য স্বীকৃতি পেল। বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের মন্তব্যে এই 'গুণে'র খানিক আভাস পাওয়া যায়: 'এ কথা সত্য যে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করিলে বাগ্বিশেষগুলিতে প্রায়শই বক্তার কথ্য ভাষার ভঙ্গীটা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থের ভাষা বিচার করিয়া দেখিলে 'যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়' আলালের ভাষা সর্বতোভাবে তাহার নিদর্শন হইয়াছে এমন কথা বলা যাইবে না' (বিজন ১৯৭৭: ১৬৪)। এ তো গেল ভাষাভঙ্গির দিক। সামগ্রিক রুচি আর সুরের দিকটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় *সাহিত্য ও সাহিত্যিক* গ্রন্থভুক্ত 'প্যারীচাঁদ: আলালের ঘরের দুলাল' নামের একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, 'আলালের ঘরের দুলালে'র অন্তর্গত রুচিটি ভদ্রলোকের' (উদ্ধৃত, সিরাজুল ২০০৩: ৬৪)। তিনি এ রুচির ঘরানাও ব্যাখ্যা করেছেন: ''আলালের ঘরের দুলালে' 'ব্রাহ্মসমাজের আদর্শবাদ' সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। সুশিক্ষা, নীতিবোধ, সুরুচি, সেবাধর্ম, আধ্যাত্মিকতাই (এই আধ্যাত্মিকতা পূজা-পার্বণে নেই, আছে প্রার্থনায় ও উপাসনায়) সমগ্র গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য' (উদ্ধৃত, সিরাজুল ২০০৩: ৯৩)। দেখা যাচ্ছে, ভদ্রলোকের কাতারে ঠাঁই পাওয়ার মতো যথেষ্ট মালমশলা *আলালের ঘরের দুলালে* মজুত ছিল। *হুতোম প্যাঁচার নক্শা* সবদিক থেকে চলে গেছে এই সীমানার ওপারে। এভাবে তা 'শিষ্টরীতি'র সঙ্গে 'সমন্বিত' হওয়ার যোগ্যতাও হারিয়েছে। পবিত্র সরকার 'বাংলা গদ্য: রীতিগত অনুধাবন' প্রবন্ধে বিরোধের এই মূলসূত্রটি খুলে দেখিয়েছেন:

> প্যারীচাঁদের বইয়ের বর্ণনার ভাষা যেখানে নকশার ভঙ্গি নিতে চাইছে সেখানে তা চটুল, কিন্তু পরে, ভিন্নতর উপলক্ষে, যেমন বারানসীতে নায়কের অনুতাপের সময় – তার শিষ্টতা বা 'সাধুতা' সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে না। অর্থাৎ চিত্রণ (উদ্দেশ্য) ও চরিত্র প্রক্ষেপণের জন্য আবহের সঙ্গে জড়িত সজীব ভাষার দ্বারা প্যারীচাঁদ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর গদ্যের সঙ্গে হুতোমের গদ্যের তফাত এইখানে যে, হুতোম একটা ভঙ্গি বা উদ্দেশ্যের modality-ই সর্বাগ্রে বেছে নিয়েছিলেন, তিনি সমস্ত বিষয়কেই বেছেছেন এবং উপস্থিত করেছেন ঐ স-ব্যঙ্গ মশকরার মেজাজে। প্যারীচাঁদের ভাষারীতি 'আলালের ঘরের দুলালে'ও গল্পের মুড অনুযায়ী বদলেছে। একটু পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝব, আসল বিরোধ শিষ্টরীতির সঙ্গে হুতোমী রীতির, প্যারীচাঁদের গদ্যরীতির নয়। (পবিত্র ১৯৯২: ৮৩-৮৪)

উনিশ শতকে বাংলা ভাষার তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক প্রেক্ষাপটে 'হুতোমি'রীতি গৃহীত হওয়ার কোনো বাস্তবতা ছিল না।[১৩] গৃহীত হয়ওনি। জরুরি জিজ্ঞাসা হল, 'আলালি' ভাষা কি গৃহীত হয়েছে? হলে কোন অর্থে কতটা?

৪.৪.৩ কথিত 'মধ্যপন্থা'র স্বরূপ

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের মধ্যপন্থার ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের বরাতে। আবার তিনিই এ ধারণার প্রধান তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠাতা। জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫ বঙ্গাব্দের *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রাচীনপন্থী' আর 'নব্যপন্থী' দলের মত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, নব্য ও প্রাচীন উভয় দলের পরামর্শ বাদ দিয়ে ভাষার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনই কল্যাণকর। পরবর্তীকালের অনেক ভাষাবিশ্লেষক বঙ্কিমচন্দ্রের

এই অবস্থানকে 'মধ্যপন্থা' বলেই মেনে নিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে যে দুই পথ থেকে মধ্যপন্থা এল, সে দুই পথ চিহ্নিত হয়েছে 'চরমপন্থা' হিসাবে।

পবিত্র সরকার লিখেছেন: 'এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী একটি বাংলা শৈলীর সন্ধান করেছেন' (পবিত্র ১৯৯৯: ২৪)। বঙ্কিমচন্দ্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন 'a literature for the people of Bengal' – এই মত সমর্থন করে পবিত্র সরকার লিখেছেন: 'এই people কারা, সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সুনির্ণীত ছিল। তাঁরা হলেন কারিগর ও দোকানিরা, গ্রামের জমিদার ও মফস্বলের উকিল সম্প্রদায়, অফিসের অধস্তন কর্মচারীর দল, আর যে-অসংখ্য মানুষ মাতৃভাষার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চলেছেন তাঁরা' (পবিত্র ১৯৯৯: ২১)। এই উদ্ধৃতিতে সৌভাগ্যক্রমে গ্রামের কৃষকের কথা নেই, কিন্তু জমিদারের কথা আছে। জমিদার তো গ্রামে ছিল না, ছিল শহরে। অফিসের অধস্তন কর্মচারীর দল বঙ্কিমের পাঠক ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। কিন্তু 'কারিগর ও দোকানি'দের উল্লেখ যে এখানে একটি অপপ্রয়োগ, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের people সন্দেহাতীতভাবে এক ক্ষুদ্রগোষ্ঠী – নগরকেন্দ্রিক – ইংরেজশাসন ও ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ অভিভাবকত্বে যার জন্ম। ১৯৪৪ সালে বিনয় সরকার মন্তব্য করেছিলেন: বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সাকুল্যে 'লাখ-তিনেকের জীবনকথা' চর্চিত হয় (বিনয় ২০০৩: ৭৩৫)। বঙ্কিমের সময়ে এই সংখ্যা যে আরো ক্ষুদ্র ছিল তা বলাই বাহুল্য। এই অতি ক্ষুদ্র শ্রেণিকে people বলে চালানো আসলে পাকে-প্রকারে বাংলা ভাষার ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণাকে মেনে নেওয়ারই শামিল।

হুমায়ুন আজাদ (২০০২: ৫৬-৫৭) বঙ্কিমচন্দ্রের 'দল-বিভাজন' মেনে নিয়েছেন, আর বঙ্কিমচন্দ্রকে বর্ণনা করেছেন আপোসপন্থী হিসাবে। তিনি শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বলেছেন 'বাংলাপন্থী', আর শরচ্চন্দ্র ও সতীশচন্দ্রকে বলেছেন 'সংস্কৃতপন্থী'। তাঁর মতে, দুই পক্ষই চরমপন্থী – একপক্ষ 'লৌকিক বাংলার শহীদ'; অন্যপক্ষ 'সংস্কৃতের যূপকাঠে আত্মোৎসর্গকারী'। তাঁর সিদ্ধান্ত: এই দুই চরমপন্থার একটিও বাংলা ভাষা মেনে নেয়নি, তা বয়ে চলেছে মধ্যস্রোতে। এখানে 'বাংলাপন্থী' হিসাবে চিহ্নিত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের মূল ভিত্তি। বঙ্কিম তাঁকে বলেছেন 'নব্যপন্থী'। তাঁর মতে, শ্যামাচরণ বাংলা ভাষার উপর অনেক 'দৌরাত্ম্য' করেছেন। এই 'দৌরাত্ম্যে'র কিছু উদাহরণ 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে আছে। তাতে দেখা যায়, বাংলায় উনিশ শতকে চালু হওয়া কিছু সংস্কৃতায়িত উপাদান পরিহারের সুপারিশ করেছেন শ্যামাচরণ। কিন্তু তিনি কোথাও বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক বা বাংলায় সংস্কৃত শব্দ ধার করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি। তাঁর (Ganguli 1990) প্রধান দাবি ছিল দুটো: এক. যে শব্দ বাংলায় আছে, তা সংস্কৃত থেকে আমদানি করা যাবে না; দুই. সংস্কৃতের উপর বাংলাকে এমন কোনো ব্যাপারে নির্ভরশীল করা যাবে না যাতে করে বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই দুই দাবি এত 'প্রাথমিক' আর 'স্বাভাবিক' যে এর বিপরীতে কোনো 'মধ্যপন্থা'র দাবি সন্দেহজনক। সন্দেহ হয়, 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার ঔপনিবেশিক তত্ত্বকেই নতুন নামে ও ধরনে পুনরুৎপাদন করেছেন।

৪.৪.৩.১ 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে সংস্কৃতবাদীদের সমালোচনার ধরন

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ হিসাবে সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়কে সাব্যস্ত করেছেন। প্রবন্ধের নানা জায়গায় তিনি এদের 'কৃতকর্মে'র নিন্দা করেছেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরা তাচ্ছিল্যের সুরে। সংস্কৃতপন্থীদের মুখপাত্র-স্বরূপ নেওয়া রামগতি ন্যায়রত্নও তাঁর তাচ্ছিল্যের সহজ শিকার। বঙ্কিমচন্দ্রের দিক থেকে এই তাচ্ছিল্যের কারণ খুব

পরিষ্কার: 'ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত কিন্তু ইংরেজি জানেন না – পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাঁহার নিকট পরিচিত নহে'। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য অন্য আরেক কারণ নির্দেশ করেছেন: 'বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, সেই হেতু বিদ্যাসাগরের শিষ্য রামগতি বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে পশ্চাৎপদ হননি। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত করে না নিলেও তাঁকে কারণে অকারণে কটাক্ষ করেছেন' (রামগতি ১৯৯১: ট)।

রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-৯৪) সংস্কৃত কলেজের উপাধি-পাওয়া বিখ্যাত ছাত্র এবং পরে কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কৃতী শিক্ষক। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সম্ভবত সেই পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র বা সমকালীন কলকাতার ইংরেজি-শিক্ষিত অন্য কারো কারো মতো গভীর ছিল না। অনুবাদসহ অন্য কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করলেও *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব*ই তাঁর প্রধান কীর্তি। দীনেশচন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* প্রকাশের আগে ন্যায়রত্নের বইটি ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম বিস্তারিত ইতিহাস। এসব কথা মনে রাখলে বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায়রত্নকে যেভাবে তাচ্ছিল্য করেছেন, সাধারণভাবে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণ কারণ নেই বলেই গভীর কারণ খুঁজে দেখা দরকার।

ন্যায়রত্নের প্রায় পৌনে চারশ পৃষ্ঠার বই থেকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি মাত্র উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। সে অংশে ন্যায়রত্নের মত এই যে, আলালি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করা অনুচিত। কারণ: 'আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে'। জবাবে বঙ্কিমচন্দ্র ঠাট্টা-বিদ্রূপের বান বইয়ে দিয়েছেন। এক জায়গায় লিখেছেন:

> তিনি যে বলিয়াছেন যে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসংকুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমাকীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সতর্কতার সঙ্গে পড়লেই বোঝা যায়, ন্যায়রত্নের মত উপস্থাপন ও তার সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছাকৃত বাকচাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছেন। এ সিদ্ধান্তের দুই কারণ। এক. সামগ্রিক ভাষাপরিকল্পনায় আলালি ভাষার যে মর্যাদা (status) ন্যায়রত্ন স্থির করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে তা থেকে একবিন্দুও বেশি মর্যাদা দেননি। দুই. *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব* বইতে লিখিত ভাষা সম্পর্কে ন্যায়রত্নের যে মত পাওয়া যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের মত তা থেকে মোটেই ভিন্ন নয়। তাঁদের নিজ নিজ জবানিতেই কথাগুলো পেশ করা যাক। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের মত:

> তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। ... টেকচাঁদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। ... গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেননা এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল, এবং অপরিমার্জ্জিত।

একটি 'দরিদ্র, দুর্ব্বল, এবং অপরিমার্জ্জিত' ভাষা কিভাবে সবল ও মার্জিত হয়ে ওঠে, তার আলোচনায় বঙ্কিম যাননি। যেতে চাননি। এমনকি এই ভাষা সম্পর্কে প্রবন্ধের গোড়ায় তিনি যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, তার দায়িত্বও তিনি নেননি। আলালি ভাষা কিভাবে বাংলার 'শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত' করল, তার কোনো হদিশ 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে পাওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে ন্যায়রত্নের লেখা থেকে যে অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার পরের অংশেই ন্যায়রত্ন লিখেছেন: 'আমাদের বিবেচনায় হাস্য পরিহাসাদি লঘু বিষয়ের বর্ণনায় আলালী ভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণ কার্য্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সেইরূপ প্রীতিপদ হয়' (রামগতি ১৯৯১: ২৫৯)। এই মন্তব্যে আলালি ভাষা সম্পর্কে ন্যায়রত্নের যে বিবেচনা প্রকাশ পেয়েছে, তা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে একবর্ণও পৃথক নয়।

এবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গ অর্থাৎ লিখিত ভাষা সম্পর্কে দুজনের মতের তুলনা করা যাক। প্রবন্ধের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাঙ্ক্ষিত লিখিত রীতির একটা ছাঁদ এঁকে দিয়েছেন। এই অঙ্কনে সাহিত্যিক বঙ্কিমের অভিজ্ঞতা ও কাণ্ডজ্ঞানের এক নিপুণ সমবায় ঘটেছে। সেখানে তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষারীতি অনুসরণের সুপারিশ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তবাক্যটি এরূপ:

> নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা, এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

এ প্রসঙ্গে রামগতি ন্যায়রত্নের মত:

> ফলকথা এই যে, পাঠক যেমন নানাপ্রকার, তাঁহাদের রুচিও সেইরূপ নানাপ্রকার; একবিধ রচনা পাঠে সর্ব্ববিধ পাঠকদিগের রুচি চরিতার্থ হওয়া কোনো মতেই সম্ভাবিত নহে – অতএব ভাষা মধ্যে নানা প্রকার রচনারীতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। (রামগতি ১৯৯১: ২৫৯)

এর পরপরই বীম্‌সের আকাদেমি স্থাপনের বিখ্যাত প্রস্তাব (*Treatment of the Nexus* পুস্তকে বর্ণিত) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ন্যায়রত্ন লিখেছেন:

> বাঙ্গালাকে সংস্কৃত ভাষা করিয়া না তুলিয়া এবং উহার মধ্যে রূঢ় স্থানীয় ও অশ্লীল শব্দসকল প্রবেশ করিতে না দিয়া মাঝামাঝিরূপে রচনার ব্যবস্থা করা কর্তব্য, তিনি উক্ত পুস্তকমধ্যেই নিজের, এই যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। (রামগতি ১৯৯১: ২৫৯-৬০)

এই অনুমোদনের পর না মেনে উপায় থাকে না যে, রামগতি ন্যায়রত্নসহ 'সংস্কৃতপন্থী' অন্য অনেক লেখকের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের রোষের কারণ তাঁদের ভাষা-সম্পর্কিত মত নয় – অন্য কিছু। সেই অন্য কারণও বঙ্কিম গোপন করেননি, বা করতে চাননি – ইংরেজি ভাষা ও জ্ঞানে যথেষ্ট পাকা না হওয়াই সংস্কৃতপন্থীদের মূল গলদ। এর ফলে অবশ্য রুচি, শ্লীলতার ধারণা, সৌন্দর্যের বোধ ইত্যাদিতেও গুরুতর ফারাক তৈরি হয়েছে। লক্ষণীয়, ন্যায়রত্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই ভাষার বিবেচনায় 'শ্লীলতা-অশ্লীলতা' প্রসঙ্গকে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু দুজনের পার্থক্যও গুরুতর। ন্যায়রত্ন বড়জোর পুরোনো ভারতের শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধারণার মধ্যেই শ্লীলতার ধারণা খুঁজেছেন; আর বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতীয় ধারণা ইউরোপীয় নৈতিকতা ও রুচির ছাঁদে রূপান্তরিত হয়ে এমন এক মূর্তি পেয়েছে, যা তার আগের গড়নকে আর 'নিজ' বলে চিনতেই চাইছে না। এই নতুন মূর্তি চেনার ক্ষেত্রে আশিস নন্দীর সাক্ষ্য সহায়ক হবে:

> [Bankim Chandra's] novels and essays were an attempt to marginalize the earlier model of critical Hinduism and suggest a new framework of political culture which projected into the Hindu past, into a lost golden age of Hinduism, the qualities of Christianity which seemingly

> gave Christians their strength. … [and it was] grounded in reinterpreted sacred texts but *in reality dependent on core values borrowed from the colonial world view* and then legitimized according to existing concept of sacredness. (Nandy 1989: 22-23; বাঁকা হরফ সংযোজিত)

এ অবস্থাটা তৈরি হয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়াংশে গভীরতর সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের কালে। নতুন কালের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর ছাঁচে নিজের কথাগুলো সাজাতে না পারাই ন্যায়রত্নের সমস্যা। এ কারণেই 'কেবল' সংস্কৃত-জানা এই পণ্ডিত[১৪] উন্নাসিক মশকরার সহজ শিকার।

৪.৪.৩.২ 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে 'নব্যপন্থী'দের সমালোচনার ধরন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধটি লিখেছিলেন শ্যামাচরণের প্রবন্ধের ভিত্তিতে।[১৫] তিনি শ্যামাচরণের প্রবন্ধের প্রশংসা করে লিখেছেন: 'প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসমন্বিত এবং আদরণীয়'। তবে শ্যামাচরণের অনেক মতই বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেননি। গৃহীত-নিগৃহীত মতগুলো খতিয়ে দেখলেই বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থান বোঝা যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র শ্যামাচরণের মতের সমালোচনা করে লিখেছেন:

> বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ উহা তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি জনৈক লিখিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা – একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুইশত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ... এইরূপ তিনি বাঙ্গালা ভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন।

শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি বঙ্কিমচন্দ্রের অভিযোগগুলোর জবাব দিয়েছেন (Ganguly 1990)। এর কয়েকটি নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল:

এক. *রাজসিংহ* উপন্যাসের 'চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সংস্কৃত থেকে আমদানি করা 'বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য' সম্বোধন কারক পরিহারের ঘোষণা দিয়েছিলেন। শ্যামাচরণ সে উদাহরণ টেনে বলেছেন, সম্বোধনের বিপক্ষে যতরকম যুক্তি দাঁড় করানো যায়, তার সব কটিই স্ত্রীপ্রত্যয়ের বেলায়ও একইভাবে খাটে।

দুই. শ্যামাচরণের অভিযোগ: 'ত্ব-প্রত্যয়ান্ত এবং য-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না' বলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপর রীতিমত অবিচার করেছেন। কারণ, ধ্বনি-অনুসারী বানানের সমর্থক হিসাবে তিনি 'ত্ত' (tto) কে 'ত্ব' আকারে লেখার বিরোধিতা করেছেন মাত্র, মোটেই বাদ দেওয়ার কথা বলেননি।

তিন. সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দের ক্ষেত্রে শ্যামাচরণের মত হল, মোটামুটি 'চতুর্দশ' পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ বাংলায় মিশে গেছে। অন্য ক্ষেত্রে বাংলায় প্রচলিত রীতি অনুযায়ীই সংখ্যাবাচক শব্দ লেখা কর্তব্য – 'একশ আটষট্টিবারের সংস্করণ' না লিখে 'অষ্টষষ্ঠ্যধিকশততম সংস্করণ' লেখার আরোপিত রেওয়াজ পরিহার করা উচিত।

চার. শ্যামাচরণের বিরুদ্ধে চালু শব্দ উচ্ছেদের অভিযোগ তুলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। জবাবে শ্যামাচরণ কতগুলো গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। খোদ 'প্রচলিত' শব্দটিকেই তিনি তাঁর প্রশ্নের আওতায় এনেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা: কোনো লেখক একটা শব্দ ধার করে এনে লেখায় ব্যবহার করলেই সে শব্দকে বাংলা ভাষার চালু শব্দ বলা যাবে কি না। তাছাড়া যেসব শব্দকে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচলিত' অভিধা দিয়েছেন, সেগুলো বাংলাভাষী কোনো জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় গৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে কি না। তাঁর সিদ্ধান্ত বেশ সোজাসাপ্টা: কোনো শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচলিত কি না, তা যাচাইয়ের একমাত্র কষ্টিপাথর হল শব্দটি মুখের ভাষায় প্রচলিত হওয়া। তাঁর সিদ্ধান্ত: এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখিত অনেক শব্দকেই বাংলা ভাষার চালু শব্দ বলা যায় না। বিপরীতে শ্যামাচরণ এও খেয়াল করেছেন যে, প্রচলিত শব্দ উচ্ছেদ করা সম্ভব নয় – বঙ্কিমচন্দ্রের এ দাবি অসার। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন: খুব প্রচলিত 'দস্তখত' শব্দের বদলে আজকাল চালু হয়েছে 'স্বাক্ষর' – যার চল আগে ছিল না বললেই চলে। দুই অক্ষরের 'দুরবিন' বাদ দিয়ে শুদ্ধতাবাদীরা এনেছেন চার অক্ষরের 'দূরবীক্ষণ'। অর্থাৎ প্রচলিত শব্দ উচ্ছেদের কাজ আসলে চলছে।

এখানে চারটি মাত্র নমুনা উল্লেখ করা হল। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, ভাষাচিন্তায় দুজনের অবস্থান মেরুদূর। কেবল একটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে খানিকটা মিল পাওয়া যায়। তা হল: অকারণে বাংলা শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার, সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্কহীন বাংলা শব্দ পরিহার এবং 'অকারণে' অচলিত সংস্কৃত শব্দ আমদানির ব্যাপারে সংস্কৃতপন্থী লেখকদের বিরোধিতা। অবশ্য এ ব্যাপারেও শ্যামাচরণ সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত 'অকারণ' শব্দের প্রতি লক্ষ রেখে তিনি লিখেছেন: 'I would give 'অকারণে' the widest sense it can bear. This means that I deny the sufficiency of the কারণs (reasons) which, Bankimchandra thinks, justify the use of মস্তক for মাথা, পত্র for পাতা, and তাম্র for তামা or তাঁবা' (Ganguli 1990: 40-41)।

অর্থাৎ, মিলের দিকটাতেও দুজনের মধ্যে অমিলটাই প্রকট। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে আরো কয়েকটি অংশ আছে যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে শ্যামাচরণের মতের অনুগামী, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বিরাট ফারাক চোখে পড়বে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে শ্যামাচরণ লিখেছেন:

> The vocables in use in Bengali, written and spoken, are divisible into three classes. 1. Sanskrit-derived words, but so much altered from the original forms as to have necessitated their being written differently from Sanskrit. 2. Sanskrit words bodily transferred, which, though retaining their original spelling, are for the most part pronounced in a specifically Bengali way. 3. Words of non-Sanskrit parentage. (Ganguli 1990: 21-22)

এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষ্যটি নিম্নরূপ:

> শ্যামাচরণ বাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা, জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে শ্যামাচরণ বাবুর দোহাই দিলেও দুজনের আপাত-মিলের আড়ালে বিপুল পার্থক্যই বিশেষভাবে নজরে আসে। স্বয়ং শ্যামাচরণ এ পার্থক্যের ব্যাপারটি লক্ষ না করে পারেননি। Appendix অংশের এক জায়গায় তিনি বঙ্কিমের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন এভাবে:

> বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'জল', 'মেঘ' এবং 'সূর্য্য' প্রভৃতি শব্দ তাদের সংস্কৃত রূপ থেকে রূপান্তরিত হয় নাই। যদি শব্দগুলোর রূপ পরিবর্তিত নাও হয়ে থাকে, অর্থাৎ এগুলোর বানান যদি অপরিবর্তিত থেকেও থাকে, ধ্বনির দিক থেকে কিন্তু শব্দগুলোর নিশ্চিত পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা 'জল' হল *Jal* ('অ' ধ্বনি এখানে দীর্ঘ), আর সংস্কৃত 'জল'

> হল *Jala* (এখানে 'অ' হ্রস্ব); বাংলায় 'মেঘে'র উচ্চারণ *Megh* (চালু বাংলায় সরলীকৃত রূপ *Meg*), আর সংস্কৃতে আজকাল শব্দটির উচ্চারণ *Megha* এবং আদিতে ছিল *Maigha*; 'সূর্য্য' বাংলায় *Shurjjo* বা *Shurja*, যেখানে সংস্কৃতে *Surya*। (Ganguli 1990: 38; অনূদিত)

দেখা যাচ্ছে, বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রেই তাঁরা দুজন সম্পূর্ণ আলাদা জায়গায় চলে গেছেন। একজন বাংলা ভাষার শব্দ ও উচ্চারণরূপকে কেন্দ্রে রেখে একটা মানদণ্ড তৈরি করতে চান, অন্যজন সংস্কৃত মানকে মডেল ধরে বাংলা শব্দ ও ধ্বনির আদর্শ রূপ স্থির করতে চান। দুজনের ভাষাচিন্তায় বেশুমার ফারাক। প্রশ্ন জাগে, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র শ্যামাচরণের এত প্রশংসা করলেন কেন। কারণ বোধহয় এই যে, শ্যামাচরণ 'ইংরেজিতে সুশিক্ষিত'। তাঁর প্রবন্ধটি ইংরেজিতে লেখা। পশ্চিমা শাস্ত্রে এবং সংশ্লিষ্ট ভাবপ্রবাহে তাঁর সহজ অধিকারের নানা চিহ্ন প্রবন্ধটিতে উপচে পড়েছে। যে রুচি বা শিক্ষার অভাবে বঙ্কিমচন্দ্র রামগতি ন্যায়রত্নকে 'শিক্ষিত' বলতে পারেননি, সেই রুচি ও শিক্ষা শ্যামাচরণের লেখায় দস্তুরমাফিক হাজির। তাই মতের মিল না হলেও শ্যামাচরণের প্রশংসা করতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি।

৪.৪.৩.৩ 'মধ্যপন্থা'র সামাজিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাকরণ

'বিষয় অনুসারে রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত' – গদ্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মত আজতক নীতিনির্ধারক মত হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। আদতে এ মত সে কালের জনপ্রিয় মতই বটে। যে বছর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ বেরোয়, সে বছরই রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন:

> এমন এমন বিশেষ বিষয় আছে, যাহাতে হয় কেবল বিদ্যাসাগরী ভাষা, নয় কেবল আলালী ভাষা চিরকাল ব্যবহৃত হইবে। পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত কিম্বা বিজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলে বিদ্যাসাগরী ভাষা অবলম্বন করিতেই হইবে, আর শ্লেষাত্মক গদ্যকাব্য, কিম্বা হাস্যকর উপন্যাস কিম্বা নাটক লিখিতে হইলে আলালী ভাষা ব্যবহার করিতেই হইবে। (রাজনারায়ণ ১৯৭৩: ১৯)

খোদ 'আলালি-হুতোমি' গদ্যের জনকদের মনেও এ সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা ছিল না। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'গুরুগম্ভীর' কোনো রচনা 'আলালি' গদ্যে লেখেননি। কালীপ্রসন্নের *মহাভারত*ের ভাষাও বিশুদ্ধ সাধু। এ বাবদ সবচেয়ে ভালো উদাহরণ সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যের 'উঁচু'রূপের প্রতিষ্ঠাতা এই লেখক 'অপর ভাষা'য়ও ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছেন। *অতি অল্প হইল* (১৮৭৩) থেকে একটা অংশ পড়া যাক:

> যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল, ব্রাহ্মণ খেপেছে; মিছামিছি কতকগুলা টাকা খরচ করিয়া, বহি ছাপাইয়া, দোচোখো বিতরণ করিতেছে। আড়াআড়ি বড় মজার জিনিস!!! মেহনৎ ও বুদ্ধি খরচ করিয়া, কতক দূর পড়িয়া দেখিলাম, লোকে যাহা বলিতেছে, তাহা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত নয়। সত্যই খুড়ার দফা রফা হয়েছে। আর তিনি ঘাড় তুলিবেন তার পথ নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর বিদ্যার দৌড় কত, তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল। বলিতে কি, খুড় আমার বড় নির্বোধ; অকারণে, আপনার মান আপনি খোয়াইলেন। চালাকি করিয়া, বহি লিখিয়া, বাহাদুরি দেখাইতে না গেলে, এ ফেসাৎ ঘটিত না। ইহাকেই বলে, নালা কেটে রোগ আনা। (ঈশ্বরচন্দ্র ২০০১: ১০৯০-৯১)

এই অংশে ক্রিয়া ও সর্বনামের ছোট-সরল রূপ আছে। চলতি শব্দ বিস্তর। বাক্য ছোট ও সরল গড়নের। এবং সুর মুখের ভাষার অতি আপন। আসলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। একটি আরেকটিকে টেনে আনে। এর বিপরীতটিও সত্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত-বাংলা ক্রমে সরল হয়ে এসেছে বলে যে ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, তা আদৌ ঠিক নয়। সত্য হল, সরল রূপটি হাজির ছিল, ব্যবহৃতও হয়েছে, কিন্তু স্বীকৃতি পায়নি। স্বীকৃতি না পাওয়ার নজির তো বিদ্যাসাগর স্বয়ং। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঠিকই খেয়াল করেছেন, 'খুড়'র সঙ্গে তর্কে, উষ্মায় কৌতুকে আমরা দেখেছি চলে এসেছেন তিনি 'অপর ভাষা'র (অর্থাৎ চলতি ভাষার) কাছাকাছি, কিন্তু তখন, এই ভাষায় লেখার সময়, তিনি তো আর বিদ্যাসাগর নন, এ ভাষায় তিনি ধারণ করেছেন ছদ্মবেশ, লিখেছেন তিনি বেনামীতে' (সিরাজুল ২০০৩: ৩৯)। অর্থাৎ, বিদ্যাসাগরের সাফল্য 'অপর ভাষা'র মর্যাদার কোনো হেরফের ঘটায়নি,[১৬] যেমন ঘটায়নি প্যারীচাঁদ মিত্র বা কালীপ্রসন্ন সিংহের ক্ষেত্রে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রস্তাবে এই অতি প্রচলিত মতেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। 'বিষয় অনুসারে রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত' – এ কথার নতুন তাৎপর্য তৈরি হত, যদি তিনি কোন ভাষা 'উঁচু' আর কোন ভাষা 'সামান্য' তা স্থির করে না দিতেন। হুতোমি ভাষা তাঁর কাছে কেবল বাতিলযোগ্য নয়, নিন্দনীয়ও বটে। আর 'গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয় টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না' – এই ফায়সালা জানিয়ে তিনি আলালি ভাষাকেও পুরোদস্তুর খারিজ করে দিয়েছেন। পবিত্র সরকার ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

> এই দ্বন্দ্ব ক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব নয়, কারণ আনুভূমিক ক্ষেত্র এবং তার সঙ্গে জড়িত গদ্যরীতি সাধারণত সহাবস্থানই করে থাকে। এ দ্বন্দ্বের চরিত্র হল উলম্ব বা vertical অর্থাৎ, এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব status-এর। অর্থাৎ একটা খাড়া পরিমাপদণ্ডের সবচেয়ে উপরে আছে সমাসক্লিষ্ট সংস্কৃত শব্দবহুল পণ্ডিতি বাংলা, আর তার সবচেয়ে নিচের দিকে আছে কলকাতার তৎকালীন কথ্যভাষা (পরে হুতোমের ভাষায় যার পরিষ্কার চেহারা ফুটে উঠল)। এক্ষেত্রে একটাকে বাদ দিয়ে আর-একটাকে গ্রহণ করার, বা প্রয়োজন হলে দুটোকেই বাদ দিয়ে তৃতীয় একটি রীতিকে গ্রহণ করার কথা উঠল। *বঙ্কিমচন্দ্র উলম্ব দ্বন্দ্বের আনুভূমিক সমাধান দিতে গিয়ে মূল সমস্যাটা একটু ঘুলিয়ে দিয়েছেন*। বিষয়ানুরোধে রীতি আলাদা হবে এতে কোনো সমস্যা নেই – মৌখিকভাবে না হোক, অন্তত কাজে বাঙালি লেখকেরা অধিকাংশত এই নীতিই মেনে এসেছেন। কিন্তু এমন কোনো কোনো বিষয় আছে যেগুলিকে আমরা নিরপেক্ষ বিষয় বলতে পারি – সেগুলির ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প স্টাইল অবলম্বনের সুযোগ আছে। অর্থাৎ উঁচু, নিচু, মাঝারি বা তার মধ্যবর্তী অসংখ্য সম্ভাবনার যে কোনো একটি রীতি বেছে নিয়ে তাতে ঐ বিষয়টি লিখে ফেলা সম্ভব – তর্কের খাতিরে এ কথা ধরে নেওয়া চলে। ... এক্ষেত্রে আমরা দেখছি, বিষয় রীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে না, লেখকের 'উদ্দেশ্য' রীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। (পবিত্র ১৯৯২: ৮০; বাঁকা হরফ সংযোজিত)

লেখকের 'উদ্দেশ্যে'র আওতায় 'অপর ভাষা'র জায়গা না হওয়ার বিস্তর কারণ উপনিবেশিত বাংলায় মজুত ছিল। 'একটা আদর্শ এসেছিল ভিক্টোরীয় ইংরেজি রুচি ও নীতিবোধ থেকে। বহু শব্দ, বহু বাগধারাকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি তখন গ্রাম্য বলে, অশ্লীল বলে, অপরিশীলিত বলে পরিহার করেছিল' (শিশির ১৯৯৯: ১৭৬)। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যসম্পাদনা আর সংশ্লিষ্ট ভূমিকা এই নয়া রুচিবোধের এক অকাট্য দলিল। সাহিত্যকেন্দ্রিকতা ভাষা-বিবেচনার সংকীর্ণতার আরেক – হয়ত প্রধান – কারণ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ সেকালের প্রায় সব বাঙালি লেখকই সাহিত্যকে দেশ ও জাতীয় কল্যাণের প্রধান উপায় ভেবেছেন। 'ইংরেজের অনুকরণ, ভেতরের

চাপ ও বিকল্প সাংস্কৃতিক প্রকাশমাধ্যমের অভাব – এ তিনের কারণে' শিক্ষিত বাঙালি 'সাহিত্যকে উচ্চমূল্য দেবার প্ররোচনা' পায় (সিরাজুল ২০০৩: ১২)। সে মূল্য এতটাই যে, উপযোগবাদী বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও ভাষার বিবেচনাটা কেবল সাহিত্যিক ভাষার মধ্যেই সীমিত থেকে যায়। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার সার্বিক বিবেচনা মোটেই ঠাঁই পায়নি, কেবল 'সাহিত্যিক বাংলা ভাষা'রই নির্দেশনা আছে। মুখের ভাষাকে ভিত্তি করা দূরের কথা, ভাষার যে আরো দশ রকমের ব্যবহার আছে – জনশিক্ষায়, অফিস-আদালত-কোর্ট-কাছারিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে – তার সবকিছুই এই বিবেচনার বাইরে থেকে গেছে।

কিন্তু যে সাহিত্য – বঙ্কিমের ভাষায় – 'বাঙ্গালার ভরসা', সে সাহিত্যের রূপ-স্বরূপ কেমন? এ সাহিত্য কেবল শ্রেণিভিত্তির দিক থেকেই সংকীর্ণ ছিল না, বিষয়ের দিক থেকেও সীমাবদ্ধ ছিল। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র' প্রবন্ধে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এই সীমাবদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন:

> সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনি সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। (বঙ্কিম ১৯৮৯: ৭৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের রচনায় এই বিষয়গত সংকীর্ণতার এক ধরনের অবসান ঘটেছিল। কিন্তু সাহিত্য 'সমকালীন ইতিহাসের বাস্তবতায়' ঢুকতে পারেনি। 'আধুনিক শিল্পসাহিত্য চর্চার এই প্রাথমিক পর্বেই সমাজবাস্তবতার প্রত্যক্ষতা ছেড়ে, মুসলমানি আমলের বাংলা বা পুরাণ-মহাকাব্যের কাহিনি, উপন্যাস ও নাটকের প্রায় একমাত্র বিষয় হয়ে ওঠে। ফলে গদ্যশিল্পে দেশকালের শৈল্পিক প্রত্যক্ষতার জায়গায় এক ধরনের রূপক পরোক্ষতা স্থায়ী হয়ে যায়' (দেবেশ ১৯৭৮: ১৪)। এর প্রধান কারণ অনুবাদ-প্রাধান্য। আগের উদ্ধৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বরাতে যে অনুবাদের কথা বলা হয়েছে, সে অনুবাদ নয়। এ হল কাঙ্ক্ষিত ভাবের অনুবাদ। উনিশ শতকের শেষাংশে কলকাতার উপনিবেশিত শিক্ষিত বাঙালি 'নিজে'র গড়ন-উপাদান হিসাবে প্রাচীন ভারত আর পশ্চিমকে আত্মীকরণ করার মতো লায়েক হয়ে ওঠে। বর্তমানের সঙ্গে যোগ না রেখেই এক কল্পিত বর্তমান আর ভবিষ্যতের ইশারায় নির্মিত হতে থাকে নতুন জাতীয় সংস্কৃতির প্রকল্প। প্রধানত প্রাচ্যবাদী চর্চার প্রভাবে আর সামগ্রিক ঔপনিবেশিক ভাববলয়ের ছকে শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এই উপাদানগুলো সক্রিয় ছিল। কিন্তু শতাব্দীর শেষাংশে দেখা দেয় গভীরতর ভাবানুবাদ আর গভীরতর সম্মিলন-প্রয়াস। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় এ প্রকল্পের সারকথা এভাবে চিহ্নিত হয়েছে:

> The West has a superior culture, but only partially; spiritually, the east is superior. What is needed, now, is the creation of a cultural ideal in which the industries and the sciences of the West can be learnt and emulated while retaining the spiritual greatness of Eastern culture. This is the national-cultural project at its moment of departure. (Chatterjee 1993: 73)

পশ্চিমের শিল্প ও বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্মের যোগসাধন আর এর মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে আদতে পশ্চিমকেই মূর্ত দেখতে চাওয়ার যে অভিলাষ সেকালের প্রধান ভাবুকদের মধ্যে দেখা যায়, বঙ্কিমের সমগ্র সাধনা কার্যত তারই সারাৎসার। এই অভিলাষে ভারতীয় বর্তমানের কোনো স্থান ছিল না – স্থানীয় বর্তমানের হীনতা সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শের কল্যাণে আগেই নিশ্চিত হওয়া গেছে। ভারত কেবল হাজির থাকতে পারে তার ধ্রুপদী রূপে – পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বের কল্যাণে যা শিক্ষিত বাঙলির কাছে আর অচেনা নয়। কিন্তু এই 'অনুপস্থিত' পূর্ব-পশ্চিমের মিলন

তো গণমানুষের কাজ নয়। কেউ আশাও করেনি যে, গণমানুষ এ কাজে গণহারে কামিয়াব হবে। কিন্তু কঠোর 'অনুশীলনে'র মাধ্যমে যে গুটিকতক এ কাজের জন্য যোগ্য হয়ে উঠবেন, তাঁরাই তৈরি করে দেবেন জাতীয় চরিত্র ও সংস্কৃতি। তাঁদের মাধ্যমেই জাতির মধ্যে এ গুণ সঞ্চারিত হবে। ঔপনিবেশিক সমাজের প্রগাঢ়তার এই কালে পুরো প্রকল্পের মধ্যে যে জনবিচ্ছিন্ন আভিজাত্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার পরিচয়ও দিয়েছেন:

> An elitism now becomes inescapable. Because the act of cultural synthesis can, in fact, be performed only by a supremely cultivated and refined intellect. It is a project of national-cultural regeneration in which the intelligentsia leads and the nation follows. (Chatterjee 1993: 73)

বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে এই অভিজাত বুদ্ধিজীবীকুলের প্রধান প্রতিনিধি। তাই 'অপর ভাষা' তাঁর প্রকল্পের গণ্ডিতে আসতেই পারে না। কিন্তু গদ্যের 'উঁচু'রূপে তিনি এক ধরনের সারল্য চান; কারণ, তাঁর বলবার কথা আছে, এবং সে কথা দশের কাছে পৌঁছানোর প্রয়োজন আছে।

দেবেশ রায় (১৯৯১) তাঁর এক প্রস্তাবে এই ভাবাদর্শের সাহিত্যকর্মকে চিহ্নিত করেছেন উপনিবেশিত বাঙালির 'দ্বিতীয় আধুনিকতা' হিসাবে। তাঁর মতে (দেবেশ ১৯৯১: ৩-১৬), ঈশ্বরগুপ্ত আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত একই আধুনিকতার দুই পর্ব নয়; ঠিক তেমনি প্যারীচাঁদ মিত্র আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও একই আধুনিকতার স্তরান্তর নয়। বরং এই দুটো দুই পৃথক পর্বের 'আরম্ভক্ষণ'। ঈশ্বরগুপ্তকে 'খাঁটি বাঙ্গালী কবি' হিসাবে চিহ্নিত করে বঙ্কিমচন্দ্র এর পরোক্ষ কিন্তু জোরালো সাক্ষ্য তৈরি করেছেন। নতুন জমানার নতুন বাঙালি সেই 'খাঁটি' বাঙালিত্বের জন্য বড়জোর স্মৃতিকাতরতায় ভুগতে পারে। এই বাস্তবতা তার আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রক হতে পারে না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের *কবিতাসংগ্রহে*র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র পরিষ্কার লিখেছেন: 'বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না' (বঙ্কিম ১৯৮৯: ৭৬৯)। এ বাস্তবতায় – দেবেশ রায় (১৯৯১: ১১-১২) লিখেছেন – 'বাঙালি বা কলকাত্তাই কণ্ঠের যে বহুস্বর *আলালের ঘরের দুলাল* বা *হুতোম প্যাঁচার নকশা*'য় শোনা যাচ্ছিল তা চাপা পড়ে যায়। কারণ, এসব গদ্যবিবরণে বাঙালির 'অস্পৃশ্য' বাস্তব বড্ড বেশি হাজির; কিন্তু স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষার বাস্তব অনুপস্থিত। এসবের 'বদলে কান অপেক্ষা করছিল একস্বরের, মহৎ কোনো একস্বরের। ... ঠিক সেই সময়ই 'নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন'।'[১৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকল্পে তাই কথ্যবুলির, কাজে কাজেই 'আলালি-হুতোমি'র ঠাঁই হতে পারে না। শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির তিনি প্রশংসা করেন। কারণ, সেখানে ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজিবাহিত জ্ঞানের বরাত আছে। কিন্তু তাঁর নিজের ভাষাপরিস্থিতি ও শ্রেণিপরিস্থিতি তাঁকে সেই মতে থিতু হতে দেয় না। সংস্কৃত-পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের নিন্দা করেন তিনি। কারণ, নতুন যুগের নতুন ভাবপ্রবাহে তিনি অচল। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রচণ্ড চাপে সংস্কৃত স্কুলের সঙ্গেই তাঁর যোগ বজায় থাকে। ফলে তাঁর 'মধ্যপন্থা' কার্যত উপনিবেশিত বাংলা গদ্যের আভ্যন্তর আপোসরফার দিকনির্দেশনা দেয় – সামগ্রিকভাবে বাংলা ভাষা বা বাংলা গদ্যের সীমানা ছুঁতে পারে না। শুধু তাই নয়। তাঁর এবং অন্যদের এই 'মধ্যপন্থা' শেষ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণাকে নতুন তকমায় দীর্ঘমেয়াদি রাজত্বের সামর্থ্যও গড়ে দেয়।

৪.৫ অব্যাহত সংস্কৃতায়ন ও তার প্রতিক্রিয়া

উনিশ শতক জুড়ে বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, যদিও প্রবণতা ও সাফল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির নিরিখে কয়েকটি পর্বও শনাক্ত করা সম্ভব। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পর *তত্ত্ববোধিনী* পর্বে মূলত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাংগঠনিক প্রতিভায় সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে বাংলাচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যালেন্টাইন রিপোর্ট সম্পর্কে তিনি যে অভিমত দিয়েছিলেন, তাতে তিনি পরিষ্কারভাবে বাংলার জন্য সংস্কৃতজ্ঞানের আবশ্যকতা ঘোষণা করেন: 'That the student of the Sanskrit College will be perfect masters of the Bengali language is beyond any possible doubt.' (উদ্ধৃত, অসিত ১৯৮৬: ৩২)। বিদ্যাসাগর তাঁর এই মন্তব্যে কোনো সম্ভাবনার কথা বলেননি, চলমান বর্তমানের কথাই বলেছেন। জেম্‌স্ লঙ্ সেই বর্তমানের সাক্ষী:

> হিন্দুদের ধর্মীয় দিক থেকে সংস্কৃতের চর্চা অধুনা হ্রাস পেয়েছে। পক্ষান্তরে ভাষাতত্ত্ব অনুশীলনের বিষয় হিসেবে এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে বিশিষ্টার্থক শব্দ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতের উপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। ... বাংলা ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য তথ্যের সুষ্ঠু বাহনে পরিণত করার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সুদক্ষ পরিচালনাধীন সংস্কৃত কলেজের অশেষ প্রভাব রয়েছে। সংস্কৃত কলেজকে এখন প্রকৃতপক্ষে একটি ভাষাতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান বলা যায়। (লঙ্ ১৯৮৮: ৫৫)

এই 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানে'র অভিভাবকত্বেই উনিশ শতকের বাংলা ব্যাকরণ ও পাঠ্যপুস্তকে সংস্কৃতের কর্তৃত্ব ব্যাপকতা পায়।

পশ্চিমা জ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চাও অন্য আরেকভাবে সংস্কৃত শব্দ আমদানির কারণ হয়ে উঠেছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> The enormous and evergrowing influence of English on Bengali, in vocabulary, and in some cases in idiom and in expressions, is the most noteworthy thing in new Bengali: and the influence of Sanskrit has been placed on a different footing, at least in the best writers, restricting it to borrowing of words pertaining to higher culture only, and often to coining of new words with the help of Sanskrit vocables, to meet the necessity of having synonyms for terms of western life, institutions and science. (Chatterji 2002: 136)

ব্যাপক অর্থে এ বস্তু পরিভাষা প্রণয়নের ব্যাপার। দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান ও ধারণা উৎপন্ন হয়, সংশ্লিষ্ট পরিভাষাও সেই প্রক্রিয়া থেকেই গড়ে ওঠে। এমনকি অন্য ভাষাভাষীদের প্রভাবেও যদি কোনো স্থানীয় চর্চার পরিসর তৈরি হয়, তাহলেও সে সুযোগ থাকে। উনিশ-বিশ শতকে এ রকম চর্চার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পরিভাষা যে তৈরি হয়নি এমন নয়। তবে পরিমাণে খুবই কম। অধিকাংশ শব্দই হুবহু গৃহীত হয়েছে সংস্কৃত থেকে। কখনো কখনো সংস্কৃতে চালু ছিল না এমন শব্দও সংস্কৃত থেকে তৈরি করা হয়েছে। এর কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশ্চিমা জ্ঞানবিজ্ঞান এদেশে চর্চার বিষয় না হয়ে অনুকরণের বিষয় হওয়ায় এ জ্ঞান ছিল মূলত অনুবাদমূলক। পশ্চিমা 'উঁচু' সংস্কৃতির বিষয় প্রাচ্যের 'উঁচু' সংস্কৃতিতে অনূদিত হওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়েছে। জনজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চর্চায় পরিভাষা তৈরি হলে লোকপ্রচলিত ভাষার দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ থাকে। কলকাতার উপনিবেশিত সমাজে এ সুযোগ কদাচিৎ

হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'নূতন কথা গড়া' প্রবন্ধে (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৫৫২-৫৮) এ সমস্যার বিশদ পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলায় সংস্কৃত শব্দের আমদানিতে অবশ্য লোকপ্রিয় ধর্ম-দর্শন ও সংস্কৃতিরও বিরাট প্রভাব আছে। ছাপাখানার বিস্তারের ফলে উনিশ শতকে হিন্দু ধর্ম-বিষয়ক বিস্তর বই ছাপা হতে থাকে। জেম্‌স্ লঙ্ (১৯৮৮: ৮) ১৮৫৭ সালে কলকাতায় মুদ্রিত পুস্তকের একটা তালিকা দিয়েছেন। এতে দেখা যায়, মোট ৫,৭১,৬৭০ কপি পুস্তকের মধ্যে ১৯টি পঞ্জিকার ১,৩৬,০০০ কপি; জীবনী ও ইতিহাসের ১৫টি পুস্তকের ২০,১৫০ কপি; পৌরাণিক ও হিন্দুধর্ম-বিষয়ক ৮৫টি পুস্তকের ৯৬,১৫০ কপি; নীতিকাহিনী ও নীতিকথা বিষয়ক ১৯টি পুস্তকের ৩৯,৭০০ কপি ছাপা হয়েছে। তিনি আরো লিখেছেন (লঙ্ ১৯৮৮: ২২), 'এখানে সম্ভবত ফি-বছর ২,৫০,০০০ কপি পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। দেশের যেসব জায়গায় অন্য কোনো বাংলা বই পৌঁছতে পারে না, সে সব জায়গায়ও পঞ্জিকা বিক্রয় হয়'। *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *চণ্ডী*, *গঙ্গাভক্তি* প্রভৃতি পুরোনো বইয়ের অব্যাহত জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে লঙ্ জানাচ্ছেন:

> সম্প্রতি হিন্দু যুবকদের নিকট তাদের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, লোকনাথ বসু প্রণীত 'হিন্দু ধর্ম-মর্ম', 'স্মৃতিতর্পণ' বা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষাদান, 'জ্ঞান চন্দ্রাংশু' বা তন্ত্র, মনু ও উপনিষদ সম্পর্কে ১৮টি প্রশ্নের সহজ উত্তর। (লঙ্ ১৯৮৮: ৩৫)

জনসম্পৃক্ততার হিসাবটা মুখ্য হলে এসব রচনায় জনভাষার অংশ বাড়ত; তাতে বিষয় ও ভাষার অন্যরকম তাৎপর্য তৈরি হতে পারত – যেমন হয়েছে মার্টিন লুথারের ক্ষেত্রে (৪.১ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পুরোনো ধর্ম-দর্শনকে নতুন করে প্রচার করা।[১৮] তাহলেও লোকপ্রিয় চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলায় আসা সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার জন্য সবসময়ে গুরুভার হয়নি। তার কারণ, জনমানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন আর আচার-বিশ্বাসের সঙ্গে এ শব্দগুলোর অব্যবহিত যোগ। জেম্‌স্ লঙ্ (১৯৮৮: ১৭) লক্ষ করেছেন, 'প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতো বঙ্গদেশেও স্মরণাতীত কাল থেকে কথকতা অত্যন্ত জনপ্রিয় রীতি হিসাবে প্রচলিত আছে'। এ প্রক্রিয়ায় নিরক্ষর শ্রোতাদের বিরাট অংশের কাছে ধর্ম-দর্শন বা পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু শব্দও ক্রমে পরিচিত হয়ে ওঠে। এসব শব্দের একটা বড় অংশ তাদের ব্যবহারের গণ্ডিভুক্ত হয়। এ ধরনের শব্দ যখন ফের লেখায় ব্যবহৃত হয়, তখন জনসাধারণের মুখের ভাষা হয়ে আসে বলে – শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (1990) মতানুযায়ী – বাংলা ভাষার শব্দ হিসাবেই সেগুলো বিবেচ্য।[১৯]

কিন্তু সংস্কৃত থেকে সরাসরি গৃহীত শব্দের ক্ষেত্রে – সে পারিভাষিক শব্দের অনুবাদের ক্ষেত্রেই হোক কি প্রচলিত বাংলা শব্দের প্রতিশব্দ আকারেই হোক – এ কথা বলা যায় না। উনিশ শতকের শেষদিকে আর বিশ শতকের গোড়ায় এই কেতাবি সংস্কৃতায়নের আরেকটি পর্ব চলেছিল। এর এক উদাহরণ দিয়েছেন সুকুমার সেন (১৯৯৮)। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের ঐতিহাসিক উপন্যাস *বঙ্গাধিপ পরাজয়ের* প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪ সালে। বইটির বিষয় রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনি। সুকুমার সেন লিখেছেন:

> প্রথম খণ্ডের তুলনায় দ্বিতীয় খণ্ডে তৎসম, বিশেষ করিয়া অপ্রচলিত তৎসম, শব্দের প্রয়োগ অনেক বেশী। দ্বিতীয় খণ্ড পুনর্লিখনের কালে গ্রন্থকারের সংস্কৃতশব্দপ্রিয়তা বাড়িয়া গিয়াছিল, সেইজন্য দেখি যে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক তদ্ভব এবং ইংরেজী শব্দের স্থানে তৎসম শব্দ বসান হইয়াছে অথবা শব্দগুলিকে তৎসম রূপ দিবার চেষ্টা

> হইয়াছে। যেমন, 'ঘাম' স্থলে 'ঘর্ম', 'শাকচুন্নি' স্থলে 'শাকচুর্ণী', 'সাইন্টিফিক টেন্ডেন্সির' অর্থ 'বৈজ্ঞানিক প্রাবণ্যের' ইত্যাদি। সহজ তৎসম শব্দের পরিবর্তে কঠিন তৎসম শব্দ – এমন কি ভাব পরিবর্তন করিয়াও – বহুস্থলে দেওয়া হইয়াছে। যেমন, 'প্রাঙ্গণস্বরূপ' স্থলে 'শাদ্বলাজি', ইত্যাদি। (সুকুমার ১৯৯৮: ৮৩)

এ ধরনের আরোপিত সংস্কৃতায়ন বা সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ইতিমধ্যে লেখ্য-বাংলায় চালু হয়ে যাওয়া শব্দ ও ভঙ্গির পুনঃসংশোধনের তাত্ত্বিক আশকারা ঔপনিবেশিক ভাষানীতিতেই ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষাংশে এর প্রবলতা বেড়ে যায় 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' আন্দোলনের নতুন প্রেরণায়।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ ভালো কি মন্দ সে মূল্যবিচার বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। শুধু দরকারি তথ্য হিসাবে এর দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। এক. ইংরেজি-শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাই এই আন্দোলনের ধারক-বাহক[২০]; দুই. ঔপনিবেশিক ভারততত্ত্ব আর প্রাচ্যবাদী চর্চার ফসলই জাতীয়তাবাদের মূলছক প্রণয়নে ব্যবহৃত হয়েছে[২১]। ফলে ঔপনিবেশিক বাংলা ভাষানীতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদী প্রেরণার কোনো বিরোধ ছিল না; বরং যথেষ্ট ঐক্য ছিল। ইউরোপের মতো ভাষাকে জাতীয়তাবাদী উপাদান হিসাবে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দেওয়ার বাস্তবতা ভারতীয় উপমহাদেশে ছিল না। এখানে জাতীয়তার মূলসূত্র হিসাবে গৃহীত হয় হিন্দুত্ব। হিন্দুমেলা, গোহত্যানিবারণী আন্দোলন কিংবা শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে 'জাতীয়তাবাদ আর হিন্দু জাগরণবাদ' সমার্থক হয়ে ওঠে (আনিসুজ্জামান ২০০১: ৭৫; নেপাল ১৯৮৩: ২৮; বিনয় ১৯৮৪: ৩১৩-১৪)। জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের জন্য আরেকটি সুবিধাজনক ধারণা ছিল 'আর্যত্ব'। প্রধানত ম্যাক্সমুলারের দৌলতে ভারতবাসীর হিন্দু পরিচয়ের সঙ্গে আর্য পরিচয় একাকার হয়ে যায়। ১৮৮০-র দশক থেকে এই আর্যপরিচয় বাঙালি ভদ্রলোকদের দারুণভাবে মোহাচ্ছন্ন করতে থাকে, তপন রায়চৌধুরী যাকে বলেছেন social neurosis (অনুরাধা ২০০১: ১০৪)। ডেভিড কফ লক্ষ করেছেন, পুরোনো প্রাচ্যবাদী 'সোনালি অতীত' আর নতুন 'আর্যত্বে'র ধারণায় বিস্তর ফারাক: 'The racist Aryan myth of a Hindu golden age that Max Muller did so much to popularize, and that was influential in later Indian thought, was a radical departure from the cultural beliefs of either Orientalists or *Brahmos*.' (Kopf 1969: 204) কিন্তু ফারাক যাই হোক, কয়েকটি ক্ষেত্রে এ তিনের – হিন্দুত্ব, আর্যত্ব আর সোনালি অতীতের ধারণা – ফল হয়েছে একই। সব কটিরই ভিত্তি ছিল মুসলমান-পূর্ব হিন্দু ভারত – সমকালীন ভারত নয়। একমাত্র সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য-শাস্ত্রের ভিত্তিতেই সেই ভারতের মূর্তি প্রণয়ন সম্ভব। সবক্ষেত্রেই মুসলমান 'অপরে'র বিপরীতে তৈরি হয়েছে 'নিজে'র সুরত (গৌতম ও পার্থ ২০০১: ১৫৩-৫৭; অনুরাধা ২০০১: ৯৫; Chatterjee 1993: 55-56; Kulke and Rothermund 1999: 258-59)। বরং আর্যত্বের ধারণায় আর্য-হিন্দু আর আর্য-ইউরোপীয়র মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে মুসলমান সম্প্রদায়ের 'অপরতা' আরো জোরদার হয়েছে।[২২] জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে তাই বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত ঔপনিবেশিক তত্ত্ব মোটেই ক্ষুণ্ন হয়নি।

সংস্কৃত ও ইংরেজির মতো করে বাংলা ভাষাকে ঢেলে সাজানোর ঔপনিবেশিক প্রকল্প শুরু থেকেই কমবেশি সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। ১৮৩০ সালে *লিটারেরি গেজেট* পত্রে কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজিতে Bengali Works and Writers নামে এক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ সংখ্যা *সমাচার দর্পণে* কাশীপ্রসাদের রচনাটির বক্তব্য সংক্ষেপে ছাপা হয়েছিল। এ লেখার অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত হল:

> শ্রীরামপুরের মিসিনরি সাহেবেরা ইহার পূর্বে [ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আগে] গদ্যরূপে ধর্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ী হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বোধগম্য হইত না। ... বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ গ্রন্থের [মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের *রাজাবলি*] শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাঙ্গলা নহে ... ১৮১৫ সালে তন্নামে বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তক হইতে তরজমা করিয়া হরপ্রসাদ রায় নামক পণ্ডিত তাহা [*পুরুষপরীক্ষা*] প্রকাশ করেন। বাবু কাশীপ্রসাদ ঐ পুস্তকেরও নিন্দাপূর্বক কহেন যে *রাজাবলি* হইতেও ইহার কথার বিন্যাস অপকৃষ্ট। ... অনন্তর ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ... অবিকল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় *ইংগ্লণ্ড দেশীয় উপাখ্যান* গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্বপ্রকারে সকলের উপকার্য হইতে পারে। (উদ্ধৃত, অমিত্র ১৩৭৯: ৩-৪)

উৎকট সংস্কৃত-বাংলার মৌখিক সমালোচনার বিস্তর সংবাদ দিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু (১৯৬১, ১৯৭৩) ও শিবনাথ শাস্ত্রী (১৯৫৭)। রামমোহন রায়ের ব্যাকরণকে (১৮২৬, ১৮৩৩) বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগত মূল অনুমানের দিক থেকে প্রভাবশালী ধারণার বিরোধিতা হিসাবেই দেখতে হবে; কারণ, সংস্কৃত ব্যাকরণের আনুগত্য যথাসম্ভব বাদ দিয়ে তিনি বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়াংশে বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে যেমন সংকীর্ণ সাধু বাংলার সীমা প্রসারিত করার চেষ্টা চলছিল 'আলালি-হুতোমি' গদ্যে, ঠিক তেমনি ব্যাকরণেও কথ্য-বাংলার পরিসর বাড়ছিল। শ্যামাচরণ সরকারের ব্যাকরণ (১৮৫০, ১৮৫২) এ ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক, যেখানে তিনি কথোপকথনের ভাষার বিশিষ্টতা চিহ্নিত করার কাজে আস্ত একটি খণ্ডই বরাদ্দ করেছেন। এতটা না হলেও পরবর্তী অনেক ব্যাকরণেই বাংলা ভাষার কথ্য-উপাদানের স্বীকৃতি দেখা যায় (নির্মল ২০০০)। লক্ষণীয়, গদ্যের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার সীমা বাড়লেও প্রভাবশালী ঔপনিবেশিক তত্ত্বের কোনো বিরোধিতা হয়নি, নতুন কোনো প্রস্তাবও পাওয়া যায়নি। দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটতে থাকে আরো পরে – শতাব্দীর শেষাংশে।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনায়ও বিদেশিদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। একটা কেজো দিক এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে: বিদেশিদের বাংলা শেখা। *আলালের ঘরের দুলালের* ভূমিকায় প্যারীচাঁদ মিত্র একেই নিজের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন (প্যারীচাঁদ ২০০৩: ৩৯)। একই ধরনের কৈফিয়ত দিয়েছিলেন রামমোহন রায় (১৮২৬) এবং শ্যামাচরণ সরকার (১৮৫০)। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় শ্যামাচরণ সরকার বলেছেন, কথ্য-বাংলায় জ্ঞান না থাকায় পণ্ডিতি বাংলায় অভ্যস্ত সাহেবদের কথাবার্তা অত্যন্ত হাস্যকর হয়ে ওঠে:

> A mere superficial and guess-work knowledge of the language used in books and other compositions, cannot answer every purpose of communication; for the idioms and phraseologies of conversation are somewhat different from the written language, and not generally to be found in the books; and thus it is that some of our Sahibs, though good Bengalee scholars, are exposed to remarks and even redicule by speaking the language just as they find it written. (উদ্ধৃত, নির্মল ২০০০: ২২৩)

প্রচলিত গদ্য ও ব্যাকরণ থেকে বিদেশিরা বাংলা ভাষা সম্পর্কে ভুল ধারণা পাচ্ছে – এমন উদ্বেগ জানিয়েছেন শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (Ganguli 1990)। এমনকি গ্রিয়ার্সন *Linguistic Survey of India* (1903)-র সংশ্লিষ্ট খণ্ডের ভূমিকায় অন্তত দুবার বিদেশিদের বাংলা শেখার জটিলতার কথা বলেছেন। এই জটিলতা আসলে লেখ্যরূপ আর

উচ্চারণরূপের ফারাকজনিত জটিলতা। লেখার ভাষায় কথ্য বাগভঙ্গি আর বাগধারার অনুপস্থিতির বাস্তবতা তো ছিলই। লেখ্য-বাংলার এই গলদ বাংলাভাষীদেরও ভুগিয়েছে। কিন্তু নিজের ভাষা উচ্চারণের ক্ষেত্রে লেখ্যরূপকে এড়িয়ে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণরূপ গ্রহণের সুবিধা বাংলাভাষীদের ছিল। বিদেশিরা সেই সুবিধা পায়নি বলেই তাদের উচ্চারণ হাস্যকর হয়ে উঠেছিল – তাদের সমস্যাটাই উপনিবেশিত বাংলা ভাষার সমস্যা বোঝার নিরিখ হয়ে ওঠে। আঠার শতকের শেষে বা উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের চেতনাই মূলত সক্রিয় ছিল বলে বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণ-প্রবণতাকে আমলে আনার অবকাশ ঘটেনি। তখন বিদেশিদের সুবিধামতোই বাংলার রূপরীতি বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু উনিশ শতকের শেষাংশে বাংলা ভাষা প্রত্যক্ষত ঔপনিবেশিক প্রকল্পের অংশ ছিল না। তাই স্বাভাবিক যোগাযোগের ভাষা হিসাবে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণভঙ্গি রপ্ত করার আগ্রহ বিদেশিদের জাগাই স্বাভাবিক।

এই কেজো দিকের বাইরে পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বের পরিবর্তনও বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি বদলের কারণ হয়েছিল। পুরোনো প্রাচ্যতত্ত্বের অবলম্বন ছিল ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্য। ভারতের ক্ষেত্রে তাই জোরটা পড়েছিল সংস্কৃতের ওপর। উনিশ শতকের শেষদিকে ব্যুলারের মতো ভারতবিদ্যাচর্চার পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রাকৃতকে ভারতীয় সংস্কৃতির আধার হিসাবে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। ব্যুলারের সিদ্ধান্ত: 'ভারত সংস্কৃতির উৎসটি আছে ভূতভাষা তথা লোকভাষায়, দেবভাষায় নয়' (গৌতম ২০১১: ১৬)। খোদ ভাষাবিজ্ঞানেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই সময়েই জার্মানিতে নব্যব্যাকরণবিদেরা ধ্বনিতত্ত্বকে প্রায় ব্যতিক্রমহীন নিয়মের ছকে ফেলেছিলেন (গৌতম ২০১১: ১৬)। ফলে 'ধ্বনিবিকৃতি'র বদলে ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র তৈরি হতে থাকে। পাশাপাশি ভাষাপাঠের জগতে গুরুত্ব পেতে থাকে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। একটি ভাষার খাড়াখাড়ি পাঠের তুলনায় সমকালীন একাধিক ভাষার আড়াআড়ি পাঠ স্বভাবতই ভাষার বর্তমানে চালু রূপগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। বীম্‌স্, হর্নলে, কেলগ, লায়াল কিংবা গ্রিয়ার্সনের তুলনামূলক ব্যাকরণ এ সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল (নির্মল ২০০০: ২২৬-২৩৩)। এঁদের আলোচনায় বাংলা স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে আলোচিত হয়নি। কিন্তু 'অন্যান্য ভাষার সঙ্গে তুলনাপ্রসঙ্গে গবেষকেরা বাংলা ভাষার প্রসঙ্গে যেটুকু উল্লেখ করেছেন বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস তাতেই উপকৃত হয়েছে'। (নির্মল ২০০০: ২৩৩)[২৩]

বিদেশিদের কথ্য-বাংলা চর্চায় কিছু গোড়ার গলদ থেকেই গেছে। উদাহরণস্বরূপ বীম্‌সের বিখ্যাত বাংলা ব্যাকরণ *Grammar of the Bengali language – Literary and Colloquial* (১৮৯১; পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ১৮৯৪)-এর কথা বলা যায়। এ ব্যাকরণটি বাংলা ভাষা-আলোচকদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে বইটির আলোচনা করেন। পরে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা *ভারতী* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' নামে বইটির সমালোচনা লেখেন। তাঁরা বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যকার হিসাবে বীম্‌সের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে এও লক্ষ করেছেন, বীম্‌স্ কথ্য ও লেখ্য-বাংলার প্রভেদ ঠিকমতো শনাক্ত করতে পারেননি। তথ্য-উপাত্ত কম থাকায় তাঁর বহু সূত্রই বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য প্রমাণিত হয়েছে।[২৪] বীম্‌স্ বা অন্য ভাষাবিজ্ঞানীদের বাংলা ভাষা-আলোচনা বাংলাভাষী তাত্ত্বিকদের প্রভাবিত করেছে প্রধানত নতুন চোখ তৈরির মাধ্যমে, যেমনটা খেয়াল করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:

> বীম্‌স্ সাহেব তাঁহার ব্যাকরণে যে সমস্ত ভুল করিয়াছেন, সেইগুলি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও মাতৃভাষা সম্বন্ধে আমাদের অনেক শিক্ষালাভ হইতে পারে। অতি পরিচয়বশত ভাষার যে সমস্ত রহস্য সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্নমাত্র উত্থাপিত হয় না, সেইগুলি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং বিদেশীর মধ্যস্থতায় স্বভাষার সহিত যেন নবতর এবং দৃঢ়তর পরিচয় স্থাপিত হয়। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৫৩)

সমসাময়িক ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান আর 'নবতর' পরিচয়ের কার্যকর প্রকাশ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ (১৫ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য)। এ প্রবন্ধকে বলা যায় উপনিবেশিত বাংলা ভাষার বি-উপনিবেশায়নের প্রথম বিস্তারিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব।[২৫] এ প্রস্তাবের সারকথা বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের 'স্বাধিকার-স্বায়ত্তশাসন'। এ ধারায় ক্রমে আবির্ভূত হন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ – হুমায়ুন আজাদ যাঁদের চিহ্নিত করেছেন 'নবব্যাকরণবিদ' বা 'বাঙলাপন্থী' হিসাবে (হুমায়ুন ২০০২: ৩৯)।[২৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই 'নবব্যাকরণবিদ'দেরই একজন; এবং তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনাতেই সবচেয়ে ব্যাপক ও প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ভাষাবিশ্লেষণের বেশ কটি এলাকায় তিনি প্রথমবারের মতো সাফল্যের সঙ্গে সে দৃষ্টিভঙ্গির প্রায়োগিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিষয়ক লেখালেখিতে মুদ্রিত হয়ে আছে বাংলা ভাষাচর্চার সবচেয়ে প্রগতিশীল কয়েকটি দশক, যার তুল্য নজির আগে তো নয়ই, পরেও আর দেখা যায়নি।

টীকা

১.রামমোহনের গদ্য সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন, 'বহুভাষী রামমোহন স্টাইলের দিকে নজর না দিয়া বক্তব্যের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন'। (সুকুমার ১৪০৩: ১৯)

২. রামমোহনের গদ্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ন প্রসঙ্গটি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। ভাষ্যকারেরা মোটামুটি একমত যে, রামমোহন সজ্ঞানে বাড়তি সংস্কৃতায়ন করেননি। 'তবে বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে তিনি বিপুল সংখ্যক আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেন এবং তা পরোক্ষভাবে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত ও প্রভাবিত করেছিলো। রামমোহন নিজেও কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর বানানকে ফোর্ট উইলিআম কলেজী পদ্ধতিতে সংশোধন করে সংস্কৃত রূপ দিয়েছিলেন' (গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯: ১৯৮)। কিন্তু এগুলো পরিমাণগত বিবেচনা। তাঁর গদ্য সেকালের নতুন ধারার গদ্যই বটে, যে ধারার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতায়ন। ব্যক্তি রামমোহনের ক্ষেত্রে তার মাত্রাগত হেরফের হয়েছে মাত্র। আর, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, সেই হেরফের বিশেষ সুখকর হয়নি।

৩. *সমাচার দর্পণ*-প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে (৩.৪.৪ দ্রষ্টব্য), প্রধানত ইংরেজ ও ইংরেজির প্রভাবে এবং সংস্কৃত-পণ্ডিতের সহায়তায় অনেকটা পাঠক-নিরপেক্ষভাবেই বাংলা সংবাদপত্রের প্রাথমিক গদ্যরূপ তৈরি হচ্ছিল। ফলে সংবাদপত্রের ভাষার ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের সুযোগ ছিল অনেক কম। তদুপরি, ওই যুগে বাংলা সংবাদপত্রের পাঠকসমাজও বড় ছিল না। উপনিবেশিত জনসমাজের খুব ছোট্ট অংশ এই প্রক্রিয়ার অংশভাগী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। ফলে এই গদ্যের গণগ্রাহ্যতাকে প্রকৃত বিচারে জনভাষার অভিমুখে যাত্রা হিসাবে দেখার বেশি সুযোগ নেই।

৪. শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায় সমালোচনার একটা ধরন এভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

> একদিকে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অপরদিকে খ্যাতনামা অক্ষয়কুমার দত্ত, এই উভয় যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের প্রভাবে বঙ্গভাষা যখন নবজীবন লাভ করিল, তখন তাহা সংস্কৃতবহুল হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয়বাবু উভয়ে সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত ভাষানুরাগী লোক ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গালাকে যে পরিচ্ছদ পরাইলেন তাহা সংস্কৃতের অলঙ্কারে পরিপূর্ণ হইল। অনেকে এরূপ ভাষাতে প্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের নিকট, বিশেষতঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট, ইহা অস্বাভাবিক, কঠিন ও দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে সময়ে পাঁচজন ইংরাজীশিক্ষিত লোক কলিকাতার কোন বৈঠকখানাতে একত্র বসিলেই এই সংস্কৃত-বহুল ভাষা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইত। অক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া, 'জিগীষা' 'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোনও শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম 'জিগীষা' 'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দের সহিত 'চিঢ়টীমিষা' শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে। (শিবনাথ ১৯৫৭: ১৩০)

৫. পুরোনো ভাষার নজির হিসাবে আসসুম্পসাঁওয়ের ব্যাকরণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। নির্মল দাশ (২০০০: ৩৪) লিখেছেন, 'তাঁর ব্যবহৃত উচ্চারণপদ্ধতি, পদসাধনের সূত্র ও দৃষ্টান্তে নব্যবাংলার পূর্ববর্তী পর্যায়ের কিছু কিছু ঐতিহাসিক উপকরণ রক্ষিত হয়েছে, উনিশ শতকের সংস্কৃতপন্থী লেখকদের পরিমার্জিত গদ্যচর্চার পূর্বে বাংলা ভাষার যে রূপ ও স্বরূপ বিদ্যমান ছিল মনোএলের ব্যাকরণে মোটামুটি তারই চরিত্র আভাসিত হয়েছে'। পরের গদ্যের সঙ্গে আগের গদ্যের সার্বিক বিচ্ছেদ মানোএলের উদাহরণগুলোর গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

৬. বিদেশি বৈয়াকরণদের তুলনায় দেশি পণ্ডিতদের ব্যাকরণগুলোতে সংস্কৃতায়নের হার সাধারণভাবে অনেক বেশি ছিল। যেমন কেরির ব্যাকরণে সংস্কৃতের অনুসরণ সত্ত্বেও দেশজ ও বিদেশি উপাদান পুরোপুরি বাদ পড়েনি। কিন্তু 'বাংলা ভাষায় রচিত ব্যাকরণগুলিতে বহুদিন পর্যন্ত সংস্কৃতের অখণ্ড প্রভাব বজায় ছিল' (নির্মল ২০০০: ১৫৫)। দেশীয়দের সংস্কৃতপ্রীতি আর 'যাবনীমিশাল' চলতি বাংলায় বিদ্বেষের কারণ বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, সবক্ষেত্রেই সংস্কৃতায়নের পক্ষে বরাত দেওয়া হয়েছে সেই তত্ত্বের, যা প্রাচ্যবাদীচর্চা আর সাহেব-পণ্ডিত যৌথতায় আগেই নির্মিত হয়েছিল। *বঙ্গদূত* থেকে *সমাচার দর্পণে* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ তারিখে মুদ্রিত এক নিবন্ধে যেমন বলা হয়েছে:

> বাক্যের শুদ্ধির নিমিত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সাহিত্য দর্শন অবশ্যই কর্ত্তব্য কেননা সংস্কৃতানুযায়ি ভাষাকেই সাধুভাষা কহিয়াছেন এমতে তদ্ব্যাকরণে দৃষ্টি থাকিলেই বঙ্গভাষায় পারিপাট্য সহজেই হইতে পারে। ... যদ্যপি বিদেশজ বর্ণান্তরীয় মহাশয়েরদিগের শিক্ষোপযোগি বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ বর্ণান্তরীয় ভাষায় সঙ্কলিত আছে কিন্তু তাহা স্বদেশীয় লোক শিক্ষার্থে উপকারি নহে এতদ্দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীত্যনুসারে এক ব্যাকরণ এবং ঐরূপে এক অলঙ্কার শাস্ত্রও সংগ্রহ করা উচিত। (ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৩৯: ৫০)

একই পত্রিকায় *বঙ্গদূত* থেকে ৬ মার্চ ১৮৩০-এ ছাপানো আরেক লেখায় বলা হয়েছে:

> এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রাকৃতা উদীচী মহারাষ্ট্রী মাগধী মিশ্রার্দ্ধ মাগধী শকা আভীরী শ্রবন্তী দ্রাবিড়ী ঔড্রীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহ্লিক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা পৈচাশী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং নানাদেশীয় কথা বাঙ্গলা ভাষাতে মিলিতা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যবহার কাণ্ডের তাবৎ শব্দ লুপ্ত হইয়া বহুকাল জবন ও ম্লেচ্ছাধিকারপ্রযুক্ত তজ্জাতীয় ভাষা প্রচলিতা হইয়াছে। ... বিশেষ সুশ্রাব্য এবং সভ্য শৌভ্যভব্যসকলের বক্তব্য যাহা তাহাকেই সুন্দর বচন নিরাকরণপূর্ব্বক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণানুকরণপূর্ব্বক সৃষ্টিকরণ কর্ত্তব্য। (ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৩৯: ৫১)

এই দুই দাবি হ্যালহেড-কেরি-ফরস্টারের দাবির পুনরুক্তি মাত্র। উনিশ শতকের প্রায় সকল ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণের ভূমিকায় এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

৭. রামমোহনের ব্যাকরণের নানা সীমাবদ্ধতা ছিল (নির্মল ২০০০: ১৭৩)। শ্যামাচরণ সরকারের অভিযোগ, বইটি বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধতার জ্ঞান দেয় না, প্রচলিত উপভাষার বাগবিধি সম্পর্কেও বিশেষ সাহায্য করে না। উইলিয়াম অ্যাডাম বলেছেন, বইটি ত্রুটিপূর্ণ ও অগোছালো। এসব সমালোচনা অসত্য নয়। কিন্তু এগুলো বইটির পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ পড়ার মূল কারণও নয়। তা হলে সংক্ষেপিত সংস্করণে ঝেড়েবেছে নেওয়া যেত। সেকালের প্রতাপশালী ব্যাকরণগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, চালু প্রভাবশালী ধ্যানধারণার বাইরে অবস্থান নেওয়াই এই বিস্মৃতির মূল কারণ।

৮. আসলে নয়া জমানায় বাঙালিদের বাংলা ভাষা শিখতে হচ্ছিল ঠিক সেভাবে যেভাবে বিদেশিরা কোনো ভাষা শেখে। বহু-সংখ্যক অভিধানের প্রকাশ আর জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে, নিজেদের ভাষা নতুন করে শেখার ব্যাপারে ভোক্তাদের অসম্মতি ছিল না। আর এ ধরনের অভিধান প্রণয়নের যে 'প্রয়োজন' অনুভূত হয়েছিল, তার পেছনে শাসকপক্ষের ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পুরো ব্যাপারটা পাঠ্যপুস্তকের ভাষার সঙ্গে যুক্ত, ভাষার কোন রীতি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাচ্ছে – তার সঙ্গে যুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই অনেক অভিধান-ব্যাকরণ সরাসরি সরকারি আনুকূল্য পেয়েছে। যেগুলো পায়নি, সেগুলোও কর্তৃপক্ষের বাংলা ভাষানীতির আশকারা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

৯. দীনেশচন্দ্র সেন কর্জ করা শব্দের এই বৈশিষ্ট্য এক বাক্যে এভাবে বর্ণনা করেছেন: 'All alien words must submit to the whims of a language before they are admitted a place in it; this seems to be the law in all countries.' (Sen 1921: 39)

১০. পুরোনো গদ্যের চিঠিপত্র আর দলিল-দস্তাবেজে এই ধরনের শব্দের আধিক্যের এক বড় কারণ বিষয়গত প্রয়োজন আর বাস্তবের টান। কিন্তু এদিক থেকে সেকালের গদ্যের শব্দস্বভাবের আলোচনা হয়নি বললেই চলে।

১১. সেকালের কলকাতার ভাষাপরিস্থিতিতে (৩.১ দ্রষ্টব্য) মিশ্রভাষী – বিশেষত, বাংলা ও হিন্দুস্থানি দুই ভাষা ব্যবহারকারী – জনগোষ্ঠী তৈরি হওয়া খুবই সম্ভব। 'দোভাষী পুথি'র একাংশে আরবি-ফারসি শব্দের বিকট আমদানির পেছনে এই ভাষা-বাস্তবতা সম্ভবত বড় ভূমিকা রেখেছে। কাজী আবদুল মান্নান দেখিয়েছেন, আঠার ও উনিশ শতকে কলকাতা, কলকাতার আশপাশের কিছু অঞ্চল, বারসাতসহ পশ্চিম বাংলার কয়েকটি বড় শহরে বসবাসকারী মুসলমানের একটা বড় অংশ হিন্দুস্থানি-উর্দু-খোট্টা ভাষাভাষী। ফকির গরীবুল্লাহ বা সৈয়দ হামজাসহ পুথিসাহিত্যের বহু কবি এ অঞ্চলেরই মানুষ (Mannan 1966: 225)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'মৌলভি' শব্দের ব্যবহার সম্ভবত আক্ষরিক অর্থেই সত্য। অন্তত জনপ্রিয় পুথিতে প্রচল ভাষার এতটা ব্যত্যয় ঘটতে পারে না।

১২. এ মন্তব্য কোনো অর্থেই বঙ্কিমের গদ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তসূচক মন্তব্য নয়। তাছাড়া এ ধারার উপন্যাসগুলোর ক্ষেত্রেও ভাষাগত সাফল্যের মাত্রা সর্বত্র একরকম নয়। যেমন, *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের ভাষারীতিকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এর কাব্যোৎকর্ষ প্রশ্নাতীত। বর্তমান প্রসঙ্গে সেই উৎকর্ষের অনুসন্ধান জরুরি নয়। ভাষারীতির যে বৈশিষ্ট্যগুলো বঙ্কিমী গদ্যের মূল আকারটা তৈরি করেছে, তার মধ্যে কথ্যভঙ্গির কোনো প্রশ্রয় আছে কি না, তা খতিয়ে দেখাই এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

১৩. এ বাস্তবতা সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন:

> সামাজিক ব্যাকরণই বলে দিল যে, এই ভাষা হবে সাধুভাষা, অপরভাষার কাছাকাছি যাবে সে কালেভদ্রে, কিন্তু কখনো অভিন্ন হয়ে উঠবে না। ... কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল একটি কৃত্রিম শ্রেণী, তার ভাষাতেও সেই কৃত্রিমতা। ভদ্রলোকেরা আপন ভদ্রতা রক্ষার নানাবিধ কৌশলের মধ্যে প্রধান হিসেবে বেছে নিলেন ভাষাগত দূরত্বকে। এটা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। শ্রেণীদূরত্ব নির্দেশে ভাষার মতো বিশ্বস্ত বন্ধু পাওয়া কঠিন। (সিরাজুল ২০০৩: ৮৩)

১৪. উনিশ শতকের বিখ্যাত বাঙালি লেখকদের প্রায় সকলেই সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এবং ওই ভাষাকেন্দ্রিক প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সেই পরিচয় টোল-চতুষ্পাঠী মারফত নয়, বরং প্রাচ্যবাদী ঘরানার চর্চাসূত্রে – অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজি তর্জমায়। ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সনাতন পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষিতদের বিরোধকে সংস্কৃত-বিরোধিতা আকারে পাঠ করা বিভ্রান্তিকর হবে। এ প্রসঙ্গে জেম্স্ লঙের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য: 'বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন, যারা এখন বাংলা ভাষার বাহক ও ধারক, তারা হলেন ইংরেজি থেকে ভাবসম্পদ আহরণ করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ'। (লঙ্ ১৯৮৮: ৫৫)

লক্ষণীয়, সংস্কৃত শব্দ আমদানির দায় পুরোপুরি সংস্কৃত-পণ্ডিতদের ঘাড়ে চাপিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষ্য তৈরি করেছেন, তা অনৈতিহাসিক। এ ভাষ্যে অন্তত দুটি প্রধান পক্ষ দৃষ্টিকটুভাবে রেহাই পেয়ে গেছে। এক পক্ষে আছেন ইউরোপীয় লেখক-পণ্ডিতদের বিরাট কাফেলা, যাঁরা অনুবাদ, গদ্যরচনা, ব্যাকরণ-প্রণয়ন কিংবা অভিধান-সংকলনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতায়নের আদিকাণ্ড সম্পন্ন করেছেন। অন্যপক্ষে পড়বেন ইংরেজি-শিক্ষিত উন্নাসিক বাঙালি গোষ্ঠী, যাঁদের পরিচয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখায় বারবার উঠে এসেছে। বস্তুত ঔপনিবেশিক শাসনের কর্তা পক্ষ ও সহযোগী পক্ষের কোনো উল্লেখই 'বাঙ্গালা ভাষা'

প্রবন্ধে নেই। আছে বেশ সরল একটা বিবৃতি: সংস্কৃতপন্থী পণ্ডিতেরাই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে গৌরববোধ করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের রচনায় সংস্কৃত শব্দ ও শৈলীর চাপ বিদ্যাসাগর বা ন্যায়রত্নের তুলনায় মোটেও কম নয়। আদতে সেকালের ভাষাপরিস্থিতি এত সরল ছিল না। অবস্থাবৈগুণ্যে নানা পক্ষ বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালাই করে নতুন করে গড়তে চাইছিল। সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা সেই অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলেন মাত্র।

১৫. শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের শিরোনাম ‘Bengali, Spoken and Written’। *Calcutta Review*-র cxxx সংখ্যায় (অক্টোবর ১৮৭৭) এই দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। পরে ‘বাঙ্গালা ভাষা’ প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়াও লিখেছিলেন তিনি। বর্ধিত আকারে মূল প্রবন্ধ ও এই প্রতিক্রিয়া (Appendix) ১৯০৬ সালে পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়। এর সবটাই ১৯২৭ সালে লন্ডনের Luzac & Co. কর্তৃক প্রকাশিত শ্যামাচরণের প্রবন্ধসংকলন *Essays and Criticisms*-এর প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। বইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তবে Appendix-সহ প্রবন্ধটি ১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত *বাংলা আকাদেমি পত্রিকা* – ৩-এ ছাপা হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় এ সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬. সেকালে এই হিসাবটা যে কত পাকা ছিল তা বোঝা যায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট প্রবণতা থেকে। বিদ্যাসাগরের *আবার অতি অল্প হইল* বইয়ে শতকরা ১৫.২৩ ভাগ তৎসমের বিপরীতে আরবি-ফারসির সংখ্যা ২৬.৬৬; *শকুন্তলায়* এই হার যথাক্রমে ৬৪.৮ ও ০। এই হিসাব দাখিলের পর শিশিরকুমার দাশের সঙ্গত সিদ্ধান্ত: ‘It is a feature of his style that like Debendranath and Aksaykumar before him wherever possible Vidyasagar avoided Perso-Arabic words, except in his satirical essays, where he sought laughter, not beauty.’ (Das 1966: 229)

১৭. *দুর্গেশনন্দিনী*র পাঠচক্রে উপস্থিত নবীন যুবা আর প্রবীণ পণ্ডিত দুই পক্ষই উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিল। ‘ইংরেজিশিক্ষিত নতুন যুবকদের ভাল লেগেছিল কাহিনীর গুণে, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষিত প্রবীণ পাঠকদের ভাল লেগেছিল সংস্কৃতনির্ভরতার গুণে’ (দেবেশ ১৯৯১:১২)। আসলে এই দুইয়ের মধ্যে অনৈক্য বিশেষ ছিল না। লেখকের স্বরের প্রচণ্ড প্রতাপে পুরোনো দিনের এই কাহিনি সমকালের যাবতীয় লঘুতার বিপরীতে বিষয়ের ‘সমুন্নতি’ তৈরি করতে পেরেছিল, যার সঙ্গে সংস্কৃতায়িত বাংলার আভিজাত্য অনায়াসেই মিশে গেছে।

১৮. কিছুটা ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে রামকৃষ্ণ পরমহংস বা স্বামী বিবেকানন্দের রচনায়। তাঁদের গদ্যের বিখ্যাত কথ্যভঙ্গির সঙ্গে বহুমাত্রিক জনসম্পৃক্ততার খায়েশ সম্ভবত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

১৯. নমুনাস্বরূপ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (1990) থেকে ‘চতুর্দশী’ শব্দের উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে, শব্দটি হিন্দু আচারের অংশ হিসাবে বাঙালির নিত্যদিনের সঙ্গে জড়িত। তাই সংখ্যাবাচক শব্দ হিসাবে ‘চতুর্দশ’ প্রচলিত বাংলা শব্দ হিসাবেই গণ্য হওয়া উচিত।

২০. সুমিত সরকার লিখেছেন: ‘It is of course well known, and hardly in need of restatement, that the crucial ideological and organizational initiatives in the formation of both Hinduism, and, later, Hindutva, came primarily from sections of the new middle class produced by colonial education.’ (Sarkar 1997: 372)

২১. যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের উৎস, ছক ও সীমা সম্পর্কে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ:

> 1. The entire mode of reasoning in Bankim involves an attempt to 'objectify'; the project is to achieve positive knowledge. The 'subject' is a scientific consciousness, distanced from the 'object' which is the Indian, the Bengali, the Hindu (it does not matter which, because all of them are defined in terms of the contraposition between the Eastern and the Western). The material is the archive – historical documents, literary texts, archaeological finds – and the archivist (helpless as he feels about this, there is nothing he can do about it!) the Orientalist scholar – William Jones, H. N. Wilson, Thomas Colebrooke, Albrecht Weber, Friedrich Max Muller, and all the rest of them. (Chatterjee 1993: 58)
>
> 2. Bankim's critique of Orientalist knowledge is not epistemological, or even methodological. His charge is still one of prejudice, from which 'certain Europeans – an extremely limited number happily' suffered. … His critique of Orientalist scholarship remains at the level of technical criteria, showing how *a priori* prejudices could vitiate a truly objective enquiry. It does not extend to questioning the cognitive or explanatory status of the framework of concepts and theoretical relations which defined the science of society. (Chatterjee 1993: 61)

২২. শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদী আবেগের সঙ্গে ভাষাপরিস্থিতির যোগ লক্ষ করেছেন:

> The feeling that impels Bengali Hindus towards Sanskrit is perfectly intelligible. With Sanskrit are associated the days of India's greatest glory; with Persian and Arabic, the days of her defeat, humiliation and bondage. The budding patriotism of Hindus everywhere would therefore naturally eschew Persian and Arabic words as badges of slavery. (Ganguli 1990: 23)

ক্রমবর্ধমান সংস্কৃতায়ন এই বর্জনের বিপরীত প্রক্রিয়া মাত্র।

২৩. বাংলা ভাষাচর্চায় রচনাগুলোর প্রভাব সম্পর্কে নির্মল দাশ লিখেছেন: 'ইউরোপীয়দের তুলনামূলক গবেষণা শুধু বাঙালি সাহিত্যিকদেরই অনুপ্রাণিত করেনি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের রচয়িতারাও এঁদের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজ নিজ ব্যাকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিক-পরিবর্তন করেছেন। চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায়, হৃষীকেশ শাস্ত্রী কিংবা নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ'। (নির্মল ২০০০: ২৩৪)

২৪. হ্যালহেড-কেরিসহ বাংলা ভাষার উপনিবেশায়নপর্বের তাত্ত্বিকদের বেলায়ও এ কথা সত্য। এটা ঠিক, ঔপনিবেশিক ঔদ্ধত্য আর দরকারমাফিক গড়াপেটা করে নেওয়ার তাড়া ওই পর্বের বাংলা ভাষাচর্চার প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিল। কিন্তু এও বলা যাবে, সমকালীন ভাষাশাস্ত্রে পণ্ডিত এই ইউরোপীয়রা তাঁদের জ্ঞান বাংলায় ব্যবহার করেছেন অনেকটা যান্ত্রিকভাবে। অপরিচয়জনিত সংকট তাঁদের কাজে বিস্তর দেখা যায়। তাঁদের ওই একই নীতি যদি 'শিক্ষিত' বাংলাভাষীদের হাতে প্রযুক্ত হত তবে অনেক জটিলতা এড়ানো যেত।

২৫. উপনিবেশায়নের মতো বি-উপনিবেশায়নও জটিল ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। কোনো একক সূত্রে বা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া-আকারে একে ব্যাখ্যা করা মুশকিল। কারণ, 'খাঁটি দেশীয় উপাদান' আর 'উপনিবেশিত উপাদান' কোথাও আলাদা করে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে হাজির থাকে না। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলা ভাষার উপনিবেশায়নের যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে 'বি-উপনিবেশায়ন' কথাটি তার বিপরীত প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য আরেকভাবেও কথাটার পরিচয় দেওয়া চলে। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির অধীনে চর্চিত হওয়ায় বাংলা ভাষা এমন কিছু ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, ইংরেজি বা ফরাসির মতো ভাষার ক্ষেত্রে যা ঘটেনি। বাংলা ভাষার বি-উপনিবেশায়ন তাহলে সেই প্রক্রিয়া, যা বাংলা ভাষাচর্চার নীতিকে 'স্বাধীনভাবে' চর্চিত ভাষাগুলোর সমান্তরাল করে তুলবে।

২৬. হুমায়ুন আজাদ এ আন্দোলনের সূচনাকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (হুমায়ুন ২০০২: ৩৯)। কিন্তু বিশ্লেষণপ্রবণতা আর ঐতিহাসিক কালক্রমের বিচারে এ কৃতিত্ব শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়েরই প্রাপ্য। 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলা সাহিত্যের ভাষা সংক্রান্ত যাবতীয় বক্তব্য শ্যামাচরণের দীক্ষা বহন করে' (পবিত্র ১৯৯৯: ১০)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রত্যক্ষভাবে কিংবা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মারফত পরোক্ষভাবে শ্যামাচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্যামাচরণের প্রবন্ধ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনকি পরবর্তীদের তুলনায়ও গভীর ও ব্যাপক।

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা: বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত ধারণা

৫.১ ঔপনিবেশিকতা ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জীবন কেটেছিল ব্রিটিশ ভারতে। তাঁর জন্মের বছর তিনেক আগেই ভারতে রানির শাসন জারি হয়। বলা যায়, তাঁর জন্ম হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনের স্বর্ণযুগে। পারিবারিক অভিজ্ঞতার মধ্যে – প্রধানত পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর আর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্যাণে – ব্রিটিশ শাসনের আর্থিক-প্রশাসনিক চালচিত্র খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। আবার কলকাতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা ও কর্মকাণ্ডের সূচনাপর্বেই এর সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে যান – প্রধানত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সূত্রে। আমৃত্যু তিনি উপনিবেশিত কলকাতার উৎপাদন-বণ্টন থেকে শুরু করে রাজনীতি-সংস্কৃতির কেন্দ্রভাগে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন। এই সক্রিয়তার পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে তাঁর বিপুল-সংখ্যক প্রবন্ধে। সৃজনশীল রচনায়ও তার প্রত্যক্ষ ছাপ পড়েছে। ইংরেজশাসন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের মোহ ছিল। মোহটা এসেছে পশ্চিমা সভ্যতার সংস্পর্শের সুযোগ আর এর ফলে কলকাতায় বিকশিত নতুন চিন্তাচেতনার বরাতে। আবার এ সম্পর্কে তাঁর এক ধরনের দ্বিধাও ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ নানা অভিজ্ঞতা – প্রধানত শাসকগোষ্ঠীর বর্ণবাদী আচরণ আর দমন-নিপীড়ন – সেই দ্বিধার উৎস। ১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ জন্মোৎসবে পঠিত ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক শাসনে তাঁর আকাঙ্ক্ষার রূপ আর হতাশার চিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শৈশব-কৈশোর কেটেছে এমন এক ভারতবর্ষে যেখানে অন্তত শিক্ষিত ভদ্রসমাজ ইংরেজশাসনকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ছিল মূলত শাসিতের প্রতি শাসকের সদয় আচরণ। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন স্বভাবতই বর্ণবাদী আর নিপীড়ক। এ অবস্থায় উপনিবেশিতের উচ্চারণ প্রায়শই অভিমানের রূপ নিয়েছে। *রাজা প্রজা* গ্রন্থের ‘ইংরাজ ও ভারতবাসী’ (১৩০০) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে সেই অভিমানেরই প্রকাশ ঘটেছে:

> মানুষের অত্যন্ত কাছে যাইবার যে ক্ষমতা সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা। ইংরাজের বিস্তর ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেইটি নাই। সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে, কিন্তু কিছুতেই কাছে আসিতে চাহে না। কোনোমতে উপকারটা সারিয়া ফেলিয়া অমনি তাড়াতাড়ি সরিতে পারিলে বাঁচে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৫: ৬৭৭)[১]

কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের নানা প্রত্যক্ষ চিহ্ন শাসিতের বিশ্বাসে চিড় ধরাতে থাকে। বিশেষত যখন সুশাসন বা ন্যায়বিচারের মতো ঔপনিবেশিক শাসনের মূল দোহাইগুলোও বর্ণবাদী আচরণ থেকে রেহাই পায় না। রবীন্দ্রনাথ আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে এরূপ বর্ণবাদী দ্বিরাচারের উল্লেখ করেছেন। *রাজা প্রজা* গ্রন্থের ‘অপমানের প্রতিকার’ (১৩০১) প্রবন্ধে লিখেছেন:

> স্বজাতীয় প্রাণের পবিত্রতা তাঁহারা মনে মনে অত্যন্ত অধিক করিয়া উপলব্ধি করেন। একজন ইংরাজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিলে নিঃসন্দেহে তাঁহারা দুঃখিত হন। ... কিন্তু তাই বলিয়া তাহার শাস্তিস্বরূপে য়ুরোপীয়ের প্রাণ হরণ করা

> তাঁহারা সমুচিত মনে করিতে পারেন না। ... যে জাতিকে নিজেদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচনা করা যায় সে জাতি সম্বন্ধে আইনের ধারায় অপক্ষপাতের বিধান থাকিলেও বিচারকের অন্তঃকরণে অপক্ষপাত রক্ষিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সে স্থলে প্রমাণের সামান্য ত্রুটি, সাক্ষ্যের সামান্য স্খলন এবং আইনের ভাষাগত তিলমাত্র ছিদ্রও স্বভাবতই এত বৃহৎ হইয়া উঠে যে, ইংরাজ অপরাধী অনায়াসে তাহার মধ্যে দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৫: ৬৯৮-৯৯)

এখানে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তর্গত বর্ণবাদ সম্পর্কে তাঁর নিরাসক্ত কিন্তু পরিচ্ছন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে।[২] অন্যত্র, সাম্রাজ্যবাদকে তিনি দেখেছেন ভাবাদর্শ হিসাবে। *সাহিত্যের পথে* বইয়ের 'বাস্তব' (১৩২১) প্রবন্ধে লিখেছেন: 'বর্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ংকর রুখিয়া উঠিয়াছে। ... অন্য দেশেও এমন ঘটে। ইংলন্ডে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের জ্বরোত্তাপ যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদল ইংরেজ কবির কাব্যে তাহারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকিতেছিল' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১২: ৪৪৭)। বোঝা যায়, সাম্রাজ্যবাদকে তিনি ভাবাদর্শ হিসেবে দেখেছেন, কিন্তু উপনিবেশের সঙ্গে একে কোনো আবশ্যিক-সম্পর্কে সম্পর্কিত করেননি। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী না হয়ে নীতি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পরদেশ শাসন করা, তাঁর মতে, সম্ভবপর। সাম্রাজ্যবাদকে ভাবাদর্শ-আকারে বোঝার ও ব্যাখ্যা করার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ফুটে উঠেছে *রাজা প্রজা* গ্রন্থের 'ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌' (১৩১২) প্রবন্ধে:

> বিলাতে ইম্পীরিয়লিজমের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীন দেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন। ... ভারতবর্ষের মতো এতবড়ো দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গৌরব আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখা ইংরেজের মতো অভিমানী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।
>
> কিন্তু ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌-মন্ত্রে লজ্জা দূর হয়। ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থলাভ তখন সেই মহদুদ্দেশ্যে ইহাকে জাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই 'হিয়ুম্যানিটি'! (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৫: ৭১২-৭১৪)

১৩১২ সালে লেখা এ প্রবন্ধে লেখক সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শ সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। এই আদর্শ যে বড় অন্যায় বৈধ করার অজুহাত হিসাবে বড় বড় বুলি তৈরি করে, সেকথাও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে গ্রিক ইতিহাসবেত্তা থুকিদিদিসের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: 'ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌তত্ত্ব য়ুরোপে [অতি] প্রাচীন এবং যে পলিটিক্‌সের ভিত্তির উপরে ইয়ুরোপীয় সভ্যতা গঠিত তাহার মধ্যে ... নিদারুণ ক্রূরতা প্রচ্ছন্ন আছে'। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৫: ৭১৪)

অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই মতাদর্শকে কেন্দ্রের কিছু লোকের মতাদর্শ হিসাবেই তিনি দেখেছেন, যা জয়ী হয়েছে, বা রাজত্বের মূল আদর্শ হিসাবে কাজ করছে। উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্য সম্পর্কের ধারণায় তিনি পৌঁছাননি। তবে তাঁর লেখায় আধুনিক উপনিবেশের বিশেষত্ব আর এর সঙ্গে বাণিজ্যের যোগ খুব পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। *কালান্তর* গ্রন্থের 'লড়াইয়ের মূল' (১৩২১) প্রবন্ধে লিখেছেন:

> সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে। এক সময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। ...
>
> ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে – তাহা এক দেশের উপর আর-এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে। এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর-কখনো ছিল না। ইয়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১২: ৫৮৪)

বাস্তব পরিস্থিতি ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে আন্তরিক ছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশায়নের অনেক গোপন-গভীর দিকও শনাক্ত করতে পেরেছেন, যদিও পরবর্তীকালে উপনিবেশশাস্ত্রে এগুলোর যেরকম নামায়ন হয়েছে, তাঁর লেখায় সঙ্গত কারণেই সেই নাম-পরিচয় পাওয়া যায় না। যেমন *শিক্ষা* গ্রন্থের 'মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা' (১৩০৭) প্রবন্ধে বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাস বইতে মুসলিম-ভারতবর্ষের ইতিহাস যে আদতে ইংরেজদের বানানো, সেকথা উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন:

> ইংরেজ লেখকের সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কার আমরা শিরোধার্য করিয়া লইতে বাধ্য, এবং সেই-সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো বাংলা বই রচিত হইলে তাহা কোনো বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ... অনেক আধুনিক বাঙালি ঐতিহাসিক মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসকে ইংরাজ-তুলিকার কালিমা হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অক্ষয়বাবু তাঁহার সিরাজচরিতে অন্ধকূপহত্যাকে প্রায় অপ্রমাণ করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন কিন্তু প্রমাণ যতই অমূলক বা তুচ্ছ হউক পরীক্ষাতিতীর্ষু বালক মাত্রই অন্ধকূপহত্যা ব্যাপারকে অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৭: ৩৮৩-৩৮৪)

এখানে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-প্রণয়নকে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেননি, বরং ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক অভিরুচি হিসেবে দেখেছেন। তা হলেও মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের ব্যাপকতা এবং উপনিবেশিতদের উপর তার প্রত্যক্ষ প্রভাবকে তিনি ঠিকঠাক শনাক্ত করেছেন।[৩] এক্ষেত্রে উপনিবেশিতদের কর্তব্যও তিনি নির্দেশ করেছেন, যাকে বি-উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া বলা যায়।

সৃষ্টিশীল রচনাসহ রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রাবন্ধিক গদ্যে উপনিবেশায়ন, ভারতীয় ঔপনিবেশিক শাসন আর বি-উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরো নানা মত-মন্তব্য-বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। কিন্তু বাংলা ভাষাপ্রশ্নে তাঁর এ ধরনের উচ্চারণ এত জোরালো আর পৌনঃপুনিক এবং বাংলা ভাষার বি-উপনিবেশায়নের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত তৎপরতা এত গুরুত্বপূর্ণ যে অন্য কোনো ব্যাপারের সঙ্গে তার তুলনা চলে না।

উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছিল, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত ছিলেন। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইয়ের 'ভাষার কথা' (১৩২৩) প্রবন্ধে তিনি শুধু সেই উল্লেখই করেননি, এর ফল সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন:

> বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়া ছিল, সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি

> পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়া যজ্ঞকর্তার ফরমাশে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৩)

প্রাণহীন কৃত্রিম গদ্য তৈরি হয়েছিল বলেই বাংলা গদ্যের জন্য শেষ পর্যন্ত তা সুখকর হয়নি। তাঁর মতে, স্বভাবের তাগিদে সৃষ্টি হলে গোড়ায় হয়ত গদ্য কাঁচাভাবে শুরু হত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দৃঢ় ভিত্তির উপর তা দাঁড়াতে পারত।[৪] 'প্রাকৃত বাংলা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রয়োজনমত সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত'। পরিষ্কার বোঝা যায়, সংস্কৃত-পণ্ডিত বা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এ বর্ণনাকারীর কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ একটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে – যে প্রক্রিয়ায় একটি ভাষার গদ্যরূপ গড়ে উঠছে সে ভাষার প্রাণধর্ম বা প্রকৃতির স্বীকৃতি ছাড়াই। শুধু যে প্রাণধর্ম অস্বীকৃত হয়েছে তা নয়। নতুন গদ্যের উপাদান হিসাবে বাংলা ভাষার পরিমাণটাও হয়েছে খুব সামান্য: 'গোড়ায় দেখি তা সংস্কৃত ভাষা, কেবল তাহাকে বাংলার নামে চালাইবার জন্য কিছু সামান্য পরিমাণে তাহাতে বাংলার খাদ মিশাল করা হইয়াছে। এ একরকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে এ প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৩-৪)। তাহলে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কারিগর হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, আর ফরমাশকারী হিসাবে সাহেবপক্ষ। এ দুইপক্ষের ভাষানীতির কারণে বাংলা গদ্য শুরুতেই অপূরণীয় ক্ষতির মুখোমুখি হল:

> অল্প মূলধনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশ মুনাফার সঙ্গে সঙ্গে মূলধনকে বাড়াইয়া তোলা, ইহাই ব্যবসার স্বাভাবিক প্রণালী। কিন্তু বাংলা-গদ্যের ব্যবসা মূলধন লইয়া শুরু হয় নাই, মস্ত একটা দেনা লইয়া তার শুরু। সেই দেনাটা খোলসা করিয়া দিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিবার জন্যই তার চেষ্টা। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪)

বাংলা গদ্য যে শেষ পর্যন্ত সেই চেষ্টায় কতকটা সফল হয়েছে, তার কারণ ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় বিশেষ ধরনের বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছে, সামগ্রিক বাংলা ভাষার নয়। বাংলা ভাষা-ব্যবহারকারীরা ক্রমে উপনিবেশিত গদ্যের ফাঁক ও ফাঁকি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, কারণ বাংলাভাষীদের কাছে নিজেদের ভাষার সজীব উপস্থিতির নজির সবসময়েই হাজির ছিল:

> যদি কেবল ইংরেজকে বাংলা শিখাইবার জন্যই বাংলা গদ্যের ব্যবহার হইত, তবে সেই মেকি-বাংলার ফাঁকি আজ পর্যন্ত ধরা পড়িত না। কিন্তু এই গদ্য যতই বাঙালির ব্যবহারে আসিয়াছে ততই তাহার রূপ পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরিবর্তনের গতি কোন দিকে? প্রাকৃত বাংলার দিকে। আজ পর্যন্ত বাংলা গদ্য, সংস্কৃত ভাষার বাধা ভেদ করিয়া, নিজের যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করিবার জন্য যুঝিয়া আসিতেছে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪)

উদ্ধৃত অংশের শেষ বাক্যটি লক্ষণীয়। এখানে সংস্কৃত ভাষার আধিপত্যের কথা আছে, যে আধিপত্য তৈরি হয়েছে, তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে। সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য বাংলা গদ্যের লড়াইয়ের কথাও বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও আসলে এই চলমান লড়াইয়ে অংশ নিয়ে বাংলা গদ্যের মুক্তির উদ্দেশে একদিকে তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করেছেন, অন্যদিকে বাস্তব প্রয়োগের জন্য যথাসাধ্য কাজ করেছেন। কাজের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে বলেই ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষাচর্চার অন্য যেসব সংকট তৈরি হয়েছে, তা শনাক্ত করতেও তাঁর বেগ পেতে হয়নি। 'ভাষার কথা' প্রবন্ধের এক জায়গায় ইংরেজির প্রচণ্ড প্রতাপের মধ্যে বাংলাচর্চা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার ফিরিস্তি দিয়েছেন এভাবে:

> অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও আমাদের দেশে ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। যাঁরা ইংরেজিতে শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁদের পক্ষে ইংরেজিতেই চিন্তা করা সহজ; বিশেষত যে-সকল ভাব ও বিষয় ইংরেজি হইতেই তাঁরা প্রথম লাভ করিয়াছেন সেগুলা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। কাজেই আমাদের ইংরেজি শিক্ষা ও বাংলা ভাষা সদরে অন্দরে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪-৫)

রবীন্দ্রনাথ এখানে ভাবের তথা মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের কথাই বলেছেন এবং সংগত কারণেই এর সঙ্গে বাংলা ভাষাচর্চার চলমান ধারার যোগ আবিষ্কার করেছেন।

বাংলা গদ্যের উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ', 'সংস্কৃত পণ্ডিত' কিংবা 'বিদেশী রাজা' কথাগুলো সবসময়ে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেননি। অন্তত ঐতিহাসিক কালক্রম আর হিসাব-নিকাশের সূক্ষ্ম মাপে কথাগুলোতে ভুল বের করা সম্ভব। অনেকসময়ে তাঁকে সংস্কৃত-বিরোধী বলে মনে হতে পারে, যদি কোনো একটি লেখা থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়। আবার তাঁকে 'পাণ্ডিত্য' বা 'পণ্ডিত'-বিরোধীও মনে হতে পারে, যেমন মনে হয়েছে কেতকী কুশারী ডাইসনের।[৫] রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন, 'বর্তমান সাধু বাংলা গদ্য ভাষার ক্রিয়াপদগুলি গড় উইলিয়মের পণ্ডিতদের হাতে ক্ল্যাসিক ভঙ্গির কাঠিন্য নিয়েছে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৮৩)। প্রত্যুত্তরে দেবপ্রসাদ ঘোষ বহু উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, অন্তত বাংলা সাধু ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্য ঠিক নয় (দেবপ্রসাদ ১৯৯৭: ১৮০-৮৬)। এভাবে বিচ্ছিন্ন মন্তব্য, তথ্য আর ঐতিহাসিক ধারাক্রমের ক্ষেত্রে দীর্ঘ কাল-পরিসরে রচিত রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলো থেকে এমনকি স্ববিরোধও আবিষ্কার করা সম্ভব। কিন্তু বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষার প্রকৃতি যে উপেক্ষিত হয়েছে, আর তার ফলে বাংলা ভাষাচর্চায় দুরপনেয় সংকট তৈরি হয়েছে, সে ব্যাপারে তিনি নিজে যেমন নিশ্চিত ছিলেন, তেমনি অন্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণেও তার জোরালো সমর্থন মেলে। রবীন্দ্রনাথ সেই সংকটকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, আর সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কাজ করেছেন। তাঁর চিন্তা ও কাজের ধরন বোঝা যাবে ভাষা-বিষয়ক রচনার যে কোনো অংশ থেকেই। 'বাংলা ব্যাকরণ' (১৩০৮) প্রবন্ধ থেকে বানান-সংক্রান্ত একটা অংশ নিচে উদ্ধৃত হল:

> আমরা জড়-এর জ এবং যখন-এর য একই রকম উচ্চারণ করি, আলাদারকম লিখি। উপায় নাই। শিশু বাংলাগদ্যের ধাত্রী ছিলেন যাঁহারা, তাঁহারা এই কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছেন। সাবেক কালে যখন শব্দটাকে বর্গ্য জ দিয়ে লেখা চলিত – ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা সংস্কৃতের যৎ শব্দের অনুরোধে বর্গ্য জ-কে অন্তস্থ য করিয়া লইলেন, অথচ ক্ষণ শব্দের মূর্ধন্য ণ-কে বাংলায় দন্ত্য ন-ই রাখলেন। ... সৌভাগ্যক্রমে আধুনিক পণ্ডিতরা খাঁটি বাংলা শব্দকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের রচনাপঙ্‌ক্তির মধ্যে পারতপক্ষে স্থান দেন নাই – কেবল যে-সকল ক্রিয়া ও অব্যয়পদ নহিলে নয়, সেইগুলাকে সংস্কৃত বানানের দ্বারা যথাসাধ্য শোধন করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদের লেখার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন। এইজন্য অধিকাংশ খাস বাংলা কথা সম্বন্ধে এখনো আমাদের অভ্যাস খারাপ হয় নাই; সেগুলার খাঁটি বাংলা বানান চালাইবার সময় এখনো আছে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১৪)

পণ্ডিতেরা সত্যি সত্যি ক্রিয়া আর অব্যয়পদের বাইরে অন্য 'বাংলা' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন কি না, বা ক্রিয়া ও অব্যয়পদের সবগুলো সংস্কৃত-অনুযায়ী সংশোধন করেছিলেন কি না, সে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু এ অংশে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তটি পরিষ্কার: উপনিবেশায়নপর্বে বাংলা বানান-নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলার যুক্তি ব্যবহৃত হয়নি; আর সংস্কৃতের যুক্তিতে যা করা হয়েছে, তাতেও সাম্য রক্ষিত হয়নি। তাঁর লক্ষ্যও পরিচ্ছন্ন: বাংলা বানানের সরলতা,

ব্যবহারযোগ্যতা আর সাম্য আনার লক্ষ্যে বাংলার নিজস্ব প্রকৃতির শরণ নেওয়া দরকার। সেদিক থেকে সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা যে প্রাকৃত বাংলা পারতপক্ষে ব্যবহার করেননি, তা তাঁর কাছে সুবিধাজনকই মনে হয়েছে। কারণ, এতে করে শব্দগুলো উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার আওতায় পড়েনি।

বাংলা ভাষাচর্চার নানা দিকের মতো বাংলা গদ্যচর্চার ধারাবাহিকতায়ও রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন উপনিবেশায়নের অব্যাহত কুফল। এ সংকট থেকে, তাঁর মতে, এমনকি বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রও রেহাই পাননি। 'বাংলা কথ্যভাষা' (১৩৫০) প্রবন্ধে উপনিবেশিত গদ্যচর্চার গোড়ার সংকটই উঠে এসেছে:

> যখন বাংলা ভাষায় গদ্যসাহিত্যের অবতারণা হল তার ভার নিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। দেশের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে প্রতিদিন যে গদ্যবাণী প্রবাহিত হচ্চে তাকে বহুদূরে রেখে সংস্কৃত সরোবর থেকে তাঁরা নালা কেটে যে ভাষার ধারা আনলেন তাকেই নাম দিলেন সাধুভাষা। বাংলা গদ্য সাহিত্যিক ভাষাটা বাঙালির প্রাণের ভিতর থেকে স্বভাবের নিয়মে গড়ে ওঠে নি, এটা ফরমাসে গড়া। বাঙালির রসময় রসনাকে ধিক্কার দিয়ে পণ্ডিতের লেখনী বলে উঠল গদ্য আমি সৃষ্টি করব। তলব দিলে অমরকোষকে, মুগ্ধবোধকে। সে হল একটা অনাসৃষ্টি। তার পর থেকে ক্রমাগতই চেষ্টা চলছে কি করে ভাষার ভিতরকার এই একটা বিদ্‌ঘুটে অসামঞ্জস্যটাকে মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যাসাগর তাকে কিছু পরিমাণে মোলায়েম করে আনলেন – কিন্তু বঙ্গবাণী তবু বললেন 'এহ বাহ্য'। তার পরে এলেন বঙ্কিম। তিনি ভাষার সাধুতার চেয়ে সত্যতার প্রতি বেশি ঝোঁক দেওয়াতে তখনকার কালের পণ্ডিতেরা দুই হাত তুলে বোপদেব অমরের দোহাই পেড়েছিলেন। সেই বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাও আজ প্রায় মরা গাঙের ভাষা হয়ে এসেছে – এখনকার সাহিত্যে ঠিক সেই ভাষার স্রোত চলচে না। অর্থাৎ বাংলা গদ্যসাহিত্যের গোড়ায় যে একটা original sin ঘটেছে কেবলি সেটাকে ক্ষালন করতে হচ্চে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৮-২৯)

বাংলা ভাষা ও গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসের এই ক্ষণটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য original sin বা 'আদিপাপ' কথাটা ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ মূলত ব্যাপারটির তীব্রতা ও অব্যাহত প্রভাবের কথাই বলতে চেয়েছেন। এই তীব্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি আসলে বাংলা ভাষাপ্রশ্নে বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এমনিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কাজের প্রণালি বিপ্লবী ঘরানার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু 'সাহেব-পণ্ডিতের যোগসাজশে তৈরি গদ্যের ভেতর বাংলা ভাষা যে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে', তা তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন; আর এ অবস্থা থেকে বাংলা ভাষাকে উদ্ধারের ব্রতে 'তিনি যখন নামলেন তখন তাঁর বিপ্লবী না হয়ে উপায় ছিল না'। (ফরহাদ ২০০৮: ১৭)

৫.২ বাংলা ভাষার বি-উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের সাফল্যের কারণ

বাংলা ভাষাপ্রশ্নে যে অনমনীয় অবস্থান রবীন্দ্রনাথের লেখায় আর কাজে প্রকাশ পেয়েছে, তার আংশিক আনুকূল্য তিনি পেয়েছেন তাঁর সময় ও প্রতিবেশ থেকে। সময়টা ছিল জাতীয়তাবাদী ভাব ও তৎপরতার উন্মেষ-বিকাশের কাল। অন্তত বাংলা ভাষাভাষী এলাকায় এর অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল বাংলা ভাষা। রাজনারায়ণ বসু (১৯৬১) আর শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৯৫৭) বয়ানে ইংরেজির বদলে বাংলা ব্যবহার আর 'বিশুদ্ধ' বাংলা ব্যবহারের নানা সামষ্টিক উদ্যোগ-আয়োজনের খবর পাওয়া যায়। অবশ্য আনুষ্ঠানিক সভায় বাংলায় বক্তৃতা করার রেওয়াজ চালুর পেছনে ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। 'নাটোরে কংগ্রেসের সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের জেদে এবং জবরদস্তিতে ডব্লু সি ব্যানার্জি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিতে বাধ্য হন। ... কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম

সমাবর্তন ভাষণ দেন রবীন্দ্রনাথ' (অমিতাভ ১৯৯২: ১৫০)। এ কারণে তাঁকে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। তা হলেও, তিনি যে এ কাজে সফল হয়েছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত বাংলায় বক্তৃতা করার রীতি যে প্রচলিত হয়েছিল, তার কারণ, এ ছিল যুগের দাবি।

উনিশ শতকের শেষদিকে সার্বিকভাবে ভাষাচর্চার ধারায় পরিবর্তন আসে, আর বাংলাসহ ভারতীয় ভাষাগুলোর পঠনপাঠনে তাৎপর্যপূর্ণ নতুনত্ব দেখা দেয় (৪.৫ দ্রষ্টব্য)। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠায় (১৮৯৩) এ নতুন ধারার ভাষাচর্চা কার্যকর সাংগঠনিক ভিত্তি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা-বিষয়ক রচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। এখানে তিনি সহযোদ্ধা হিসাবে পেয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যোমকেশ মুস্তফী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো কয়েকজন বিপ্লবী ভাষাচিন্তককে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিস্তার আর গভীরতায় এঁদের সবাইকে ছাড়িয়ে যান। ভাষা-আলোচনায় তাঁর দীর্ঘকালীন সক্রিয়তাও উল্লেখযোগ্য। প্রতিভার বাইরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রবণতা আর তৎপরতার মধ্যে তাঁর এই সাফল্যের কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

৫.২.১ পারিবারিক অভিজ্ঞতা

১৯৩৬ সালে লেখা 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (১৯৩৬) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারংবার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৬: ৩৩৬)। কী সে অভিজ্ঞতা? – 'আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু-পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৬: ৩৩৬)। ঠাকুরবাড়ির বিশেষ আবহের কারণেই রবীন্দ্রনাথ এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে সেই আবহের যোগ কতটা অন্তরঙ্গ আর নিশ্চিত ছিল, তার পরিচয়ও রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন *জীবনস্মৃতি*তে (১৯১২):

> সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছিলেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৯: ৪৯৭)

এই পারিবারিক আবহের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ সেজদাদার কাছে বাল্যেই পেয়ে যান সেই মন্ত্র – 'আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৭৫৪-৫৫) – যা তাঁর সারাজীবনের ভাষাচিন্তার সঙ্গী হয়েছিল।

ছোটবেলায় বাংলায় লেখাপড়া করতে পেরেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ভাগ্যবান ভেবেছেন। একই সময়ে পিতার কাছ থেকে সেকালের সাধু বাংলার কৃত্রিমতা সম্পর্কেও সবক পেয়েছিলেন। *জীবনস্মৃতি*তে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি, যেখানে বাংলা ভাষার 'বাংলাত্ব' সম্পর্কে তাঁর পিতার সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় মেলে। তাঁদের স্কুলের এক শিক্ষক দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংরেজি জীবনী পড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর সহপাঠী ভাগিনেয় বইটি দেবেন্দ্রনাথের কাছে চেয়ে আনতে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> সে মনে করিয়াছিল, সর্বসাধারণের সঙ্গে সচরাচর যে প্রাকৃত বাংলায় কথা কহিয়া থাকি সেটা তাঁহার কাছে চলিবে না। সেইজন্য সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল যে, পিতা বুঝিলেন, আমাদের বাংলা ভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে। পরদিন ... তিনি কহিলেন, 'আজ হইতে তোমাদের আর বাংলা পড়িবার দরকার নাই'। খুশিতে আমাদের মন নাচিতে লাগিল। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৯: ৪৬১)

এভাবে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক শিক্ষায় কেবল মাতৃভাষার মর্যাদা বোঝেননি, 'ভালো বাংলা'র মর্মও অনুধাবন করেছিলেন।[৬] বিশ্লেষকের মন নিয়ে ভাষাকে খুঁটিয়ে দেখার একটা পরিবেশও এ পরিবারে ছিল। বাংলা ভাষার বি-উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওই পর্বের অন্যতম প্রধান রচনা 'উপসর্গের অর্থবিচার' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। এ ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ – প্রত্যেকেই ব্যাকরণের গুরুগম্ভীর তত্ত্বের প্রতি গভীর আকর্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষাতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কিংবা বিখ্যাত বৈয়াকরণ শ্যামাচরণ সরকারসহ সেকালের ভাষাতাত্ত্বিকদের অনেকেই ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন (কৃষ্ণা ১৯৮৭: ৩০)। রবীন্দ্রনাথের ভাষাচর্চার উপযোগী বিশ্লেষণাত্মক মন তৈরিতে এ আবহ নিশ্চয়ই অনুকূল ভূমিকা রেখেছিল।

৫.২.২ সাহিত্যচর্চা ও ভাষাচর্চা

রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষাচর্চার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলাভাষা' প্রবন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখতে পাই – তিনি শাব্দিকও বটেন, কবিও বটেন। শব্দ আর অর্থ, উচ্চারিত ধ্বনি আর তার ভিতরের ব্যঞ্জনা, এই দুইয়ের সম্বন্ধেই কবির মনে স্পর্শকাতরতা ছিল। ভাষার নাড়ীনক্ষত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে জিজ্ঞাসা ছিল, কিন্তু সেই নাড়ীনক্ষত্রের জ্ঞানটাই চরম বস্তু নয়, সে-কথাটা তিনি তাঁর সৃজনী প্রতিভার দ্বারা দেখিয়ে গিয়েছেন। ... সাহিত্য-রচয়িতার প্রতিভা দুই প্রকারের, – এক, 'কারয়িত্রী' – যা সাহিত্য সৃষ্টি করে; আর দুই, 'ভাবয়িত্রী' – যা বিচার ক'রে, সমালোচনা ক'রে উপভোগ করে। এই উভয়বিধ প্রতিভাই যে রবীন্দ্রনাথের ছিল, তা বলা বাহুল্য। তা ছাড়া, শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণিয়ার যোগ্য বৈজ্ঞানিক মনোভাবও তাঁর ছিল। (সুনীতি ১৯৭২: ৫৬)

'বৈজ্ঞানিক মনোভাব' নিশ্চয়ই ছিল। না হলে ভাষা-বিশ্লেষণের কিছু কিছু এলাকায় তিনি বিস্ময়কর সাফল্যের পরিচয় দিতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর ভাষা-সম্পর্কিত ধারণা আর ভাষা-বিশ্লেষণের প্রকৃতি পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, মূলত সাহিত্য রচনার অভিজ্ঞতাই তাঁর ভাষাচর্চার মূল অনুপ্রেরণা। তিনি যে কবি, তিনি যে বাংলা ভাষার নিপুণতম ব্যবহারকারী – এ সত্য তাঁর ভাষাচিন্তায় খুবই প্রত্যক্ষ। তারচেয়ে বড় কথা, বাংলা ভাষা সম্পর্কে কিছু বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছেছেন নিজের অভিজ্ঞতার সূত্রেই। তাঁর নিজের উচ্চারণেই সেকথা বারবার উঠে এসেছে।

নিজের লেখালেখি রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই প্রচলিত সাহিত্যিক ভাষাতেই শুরু করেছিলেন। এ ভাষার জনবিরোধী বৈশিষ্ট্য তিনি তখনো শনাক্ত করতে পারেননি। 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে সেকথাই স্পষ্ট করে বলেছেন:

> ছোটবেলা হইতেই সাহিত্য রচনায় লাগিয়াছি। বোধ করি সেই জন্যই ভাষাটা কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোনো মত ছিল না। যে-বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন, পুঁথির ভাষাতেই পুঁথি লেখা চাই, এ কথায় সন্দেহ করিবার সাহস বা বুদ্ধি ছিল না। তাই, সাহিত্য-ভাষার পথটা এই সরু বহরের পথ, তাহা যে প্রাকৃত বাংলা ভাষার চওড়া বহরের পথ নয়, এই কথাটা বিনা দ্বিধায় মনের মধ্যে পাকা হইয়া গিয়াছিল। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১)

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই 'সরু বহরের পথ'ও যে যথেষ্ট সরু ছিল না – অন্তত সেকালের সাপেক্ষে – তার সমকালীন সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ১৯০৬ সালে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি লক্ষ করেছেন: 'Our living gifted poet-philologer, Babu Rabindranath Tagore, has given literary dignity to such words as বিষ্টি and অঘ্রাণ' (Ganguli 1990: 41)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে কথ্য-বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথকেই দিয়েছেন: 'The actual spoken language gradually came to its own in a mass of unconventional literature, and in ephemeral poetry: and it attained to dignity in the early writings of Rabindranath Tagore.' (Chatterji 2002: 135) তা সত্ত্বেও এ কথা বলা যাবে না যে, ভাষা-বিষয়ক বিপুল লেখায় রবীন্দ্রনাথ যে 'চওড়া বহরের পথে'র প্রস্তাব রেখেছেন, তাঁর নিজের লেখায় তার পূর্ণ প্রতিফলন আছে। প্রবোধচন্দ্র ঘোষ লক্ষ করেছেন, 'তাঁর শব্দভাণ্ডার প্রধানত সংস্কৃতের কাছেই ঋণী' (প্রবোধ ১৯৬৮: ১৫১)। রবীন্দ্রনাথের আদি গদ্য সম্পর্কে দেবেশ রায়ের মত হল: 'বঙ্কিমচন্দ্রের চাইতে রবীন্দ্রনাথের বাক্যগঠন জটিলতর' (দেবেশ ১৯৭৮: ৮৫)। কিন্তু এ জটিলতার কারণ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ নয়; রাবীন্দ্রিক গদ্যের ছন্দও সংস্কৃত শব্দের ধ্বনিগুণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়: 'বিশেষণ বা সংহত উপমা গদ্যের এক ধরনের বিশেষ ছন্দ তৈরি করে – এমনই একটি ছন্দ যা বঙ্কিমের গদ্যের মতো সংস্কৃত শব্দের সমাবেশের উপরই প্রধানত নির্ভরশীল নয়' (দেবেশ ১৯৭৮: ৮৫)। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এখানেই স্থির থাকেননি। তাঁর ভাষা ক্রমে পরিবর্তিত হয়েছে। সেই পরিবর্তনের গতি 'সাধু বা সংস্কৃতধর্মী ভাষা থেকে প্রাকৃত বাংলার দিকে' (প্রবোধ ১৯৬৮: ১৫১)।

এ পরিবর্তন শুধু উপলব্ধি বা কৌতূহল থেকে হয়নি – অভিজ্ঞতা থেকে হয়েছে। 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে তিনি তাঁর সেই সৃষ্টিশীল অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন:

> 'ক্ষণিকা'য় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগাঁয়ের টাট্টুঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য-ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির চেয়ে অনেক বেশি। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৩)

এ আবিষ্কার হয়ত নতুন, কিন্তু প্রাকৃত বাংলা ব্যবহারের এটিই প্রথম প্রয়াস নয়: 'চিঠিপত্রে আমি চিরদিন কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছি। আমার সতের বছর বয়সে লিখিত 'য়ুরোপ যাত্রীর পত্রে' এই ভাষা প্রয়োগের প্রমাণ আছে। তা ছাড়া বক্তৃতাসভায় আমি চিরদিন প্রাকৃত বাংলা ব্যবহার করি ...' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৩)। ব্যবহারের মধ্য দিয়েই ক্রমে এ ভাষার বিশিষ্টতাগুলো আবিষ্কৃত হয়। একই সঙ্গে ধরা পড়তে থাকে সংস্কৃত-বাংলার দুর্বলতা। কাব্যভাষার দিক থেকে তাঁর অভিজ্ঞতাটা হয়েছে মূলত ছন্দকে ঘিরে। *ছন্দ* বইয়ের 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' (১৩৩৮) প্রবন্ধে কবি সে অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন: 'কাব্যলীলা একদিন যখন শুরু করেছিলেম তখন বাংলা সাহিত্যে সাধুভাষারই ছিল একাধিপত্য। অর্থাৎ, তখন ছিল কাটা-কাটা পিঁড়িতে ভাগ-করা ছন্দ' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১১: ৫৮৩)। ভাষা ও ছন্দের ছক বা ছাঁচের এই পরাধীনতা থেকে তিনি মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন চলতি বাংলার সুরে। জে. ডি. অ্যান্ডার্সনকে লেখা এক পত্রে (১৩২১) জানিয়েছেন: 'আমার শেষ বয়সের কাব্য-রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেননা দেখিয়াছি, চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে, তাহার নিজের একটি কলধ্বনি আছে' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১১: ৬৩৮)।

উপরে বাংলা ভাষার স্বভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যেসব মত-মন্তব্য উদ্ধৃত হল, তা তাঁর নিজের সৃষ্টির অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকেও ব্যাপারগুলো তিনি খতিয়ে দেখেছেন। বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমের অবদান তিনি কখনো বিস্মৃত হননি। কিন্তু উপনিবেশিত গদ্যের 'জন্মপাপে' তাঁদের চর্চায় যে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে, তাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন ('ভাষার কথা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; ৫.১-এ উদ্ধৃত)। কাব্যের ক্ষেত্রেও তিনি প্রায় একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। *মেঘনাদবধ কাব্যের* শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁর সংশয় ছিল না। কিন্তু এর কাব্যভাষা সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন না তুলে পারেননি। *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থের 'সাহিত্যরূপ' (১৩৩৫) প্রবন্ধে লিখেছেন:

> বাংলাসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ, মাইকেল বাংলাভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটিমাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাংলাভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি। তাই তিনি যে-ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তাঁর লেখা সন্ততিহীন হল, উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১২: ৫৩৮)

বাংলা কাব্যের ধারায় *মেঘনাদবধের* উত্তরসূরি কেন জোটেনি তার নানা ব্যাখ্যা আছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে ভাষার বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের ধরন থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। সাহিত্যের নানা রূপ আর তার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিজের প্রয়োজনেই তাঁকে খতিয়ে দেখতে হয়েছিল। দেশি-বিদেশি সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে সে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আরো জোরালো হয়েছে। কৃত্রিম ভাষায় সাহিত্য রচনার সংকট সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। উনিশ শতকের উপনিবেশিত কৃত্রিম বাংলা ছাড়াও এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত সাহিত্য হয়েছে তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি। *প্রাচীন সাহিত্য* গ্রন্থের 'কাদম্বরীচিত্র' (১৩০৬) প্রবন্ধে সাহিত্য-রূপ আর ভাষার অন্তর্নিহিত পারস্পরিকতা সম্পর্কে তিনি পরিচ্ছন্ন মন্তব্য করেছেন:

> সংস্কৃত ভাষা কথ্য ভাষা ছিল না বলিয়াই সে ভাষায় ভারতবর্ষের সমস্ত হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই। ইংরাজি অলংকারে যে শ্রেণীর কবিতাকে লিরিক্স্ বলে তাহা মৃত ভাষায় সম্ভবে না। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীতে যে সংস্কৃত গান আছে তাহাতেও গানের লঘুতা ও সরলতা ও অনির্বচনীয় মাধুর্যটুকু পাওয়া যায় না। বাঙালি জয়দেব সংস্কৃত ভাষাতে গান রচনা করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বাঙালি বৈষ্ণব কবিদের বাংলা পদাবলীর সহিত তাহার তুলনা হয় না।
>
> মৃত ভাষায়, পরের ভাষায় গল্পও চলে না। কারণ, গল্পে লঘুতা এবং গতিবেগ আবশ্যক – ভাষা যখন ভাসাইয়া লইয়া যায় না, ভাষাকে যখন ভারের মতো বহন করিয়া চলিতে হয়, তখন তাহাতে গান এবং গল্প সম্ভব হয় না। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৩: ৮০৯)

দেখা যাচ্ছে, বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত কেবল পাণ্ডিত্য বা মনীষায় ভর করে আসেনি, তাঁর সৃষ্টিকর্ম আর পঠন-পাঠনও তাতে জরুরি ভূমিকা রেখেছে। তাই ভাষা-বিশ্লেষকের শৃঙ্খলা তাতে সবসময়ে পাওয়া না গেলেও তার ভিত্তি খুব গভীর আর দৃঢ়।

৫.২.৩ শিক্ষাচিন্তা ও ভাষা

সাহিত্যিক ভাষার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এ অর্থে যে, সাহিত্যে ভাষার এক ধরনের ব্যবহার হয় মাত্র; এবং সেই ব্যবহার সবসময়ে জনসংশ্লিষ্টতার প্রত্যাশা করে না। উনিশ শতকের উপনিবেশিত কলকাতায় ভাষার সাহিত্যিক

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারই মূলত গুরুত্ব পেয়েছে। এই বাস্তবতা উপনিবেশিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ (২.৭ দ্রষ্টব্য)। সাহিত্যিক ভাষা রবীন্দ্রনাথের কাছেও পরম গুরুত্ব পেয়েছে (৫.৩.৪ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর ভাষাচিন্তা ও ভাষা-বিশ্লেষণে ভাষার বিচিত্র ব্যবহার-উপযোগিতা এবং জনসংশ্লিষ্টতার পৌনঃপুনিক উল্লেখ পাওয়া যায়। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ আমজনতার প্রতিনিধিত্ব করেন না; তাঁর ভাষাও – শেষের দিকের সারল্য আর কথ্য-সংশ্লিষ্টতা সত্ত্বেও – গণমানুষের ভাষার সমান্তরালে নেমে আসেনি। তবু তিনি যে তাঁর চিন্তায় ভাষার ব্যবহারগত পরিধি অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পেরেছেন, আর বৃহত্তর জনমানুষকে সেই চিন্তার অঙ্গীভূত করতে পেরেছেন, তার মূলে আছে তাঁর শিক্ষাচিন্তা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা প্রাতিষ্ঠানিক বা পদ্ধতিগত ভাবনার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর প্রস্তাবে শিক্ষা একদিকে ব্যক্তির সামগ্রিক মুক্তি ও জাগরণের মন্ত্র, অন্যদিকে সামষ্টিকভাবে সমাজ-জাতি-রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিকাশের মূল। তাই এর সঙ্গে ভাষার প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ভাষাকে এভাবে দেখলে বিধি বা শুদ্ধতা বা উঁচুমানের তুলনায় ভাষার ব্যবহার-উপযোগিতার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তায় সেই মনোযোগের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

উপনিবেশের সাধারণ ধর্ম-অনুযায়ী ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজির বিকল্পহীন প্রতিষ্ঠা ঘটে। এ অবস্থার বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথ দেশীয় শিক্ষিতসমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে তিনি সে কথা স্মরণ করেছেন:

> বহুকাল পূর্বে যখন বলিয়াছিলাম বাঙালির শিক্ষা বাংলা ভাষার যোগেই হওয়া উচিত তখন বিস্তর শিক্ষিত বাঙালি আমার সঙ্গে যে কেবল মতে মেলেন নাই তা নয় তাঁরা রাগ করিয়াছিলেন। অথচ এ জাতীয় মতের অনৈক্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির মধ্যে পড়ে না। আসল কথা, যাঁরা ইংরেজি শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন, তাঁরা বাংলা শিখিয়া মানুষ হইবার প্রস্তাব শুনিলেই যে উদ্ধত হইয়া ওঠেন, মূলে তার অহংকার। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২)

ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে একটা সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থের ব্যাপার আছে, তা সুবিধাভোগী শ্রেণির বিচ্ছিন্নতাজনিত 'অহংকারে'র উৎস। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন সর্বজনীন শিক্ষার কথা। ফলে তাঁর মত আলাদা হওয়ারই কথা। কিন্তু যারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, তাদের শিক্ষা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ কথা তুলেছেন। সে কথার গোড়ার সত্য এই যে, বাঙালি জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ইংরেজি মাধ্যমে হতেই পারে না। প্রাথমিকভাবে কারণটি বেশ সরল: 'ইংরেজিভাষা ... অত্যন্ত উৎকট বিদেশী' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪৮)। বাংলা ভাষার রূপ ও সংগঠনের সঙ্গে তার অমিল খুব বেশি। ফলে ভাষা আয়ত্ত করতে করতেই শৈশব-কৈশোর পার হয়, ভাবে প্রবেশ করা আর হয় না। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে ভাব-ভাষার এই দ্বিমুখিতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। প্রধান যুক্তিটি এই যে, ইংরেজিতে যারা পড়ে তাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার কোনো মিলন হয় না। ফলে মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য রহিত হয়। একমাত্র বাংলা ভাষাই, তাঁর মতে, এ সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। 'শিক্ষা-সংস্কার' (১৩১৩) প্রবন্ধেও তিনি এ সমস্যার বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। বলেছেন: 'পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত, প্রকাশ করাও কঠিন' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৬: ৫৯২)। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থায় মন 'অপরিণত থাকিয়া যায়', বুদ্ধি 'সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না', 'ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা' জন্মে না।[৭]

এ হল ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষার একদিকের সংকট। অন্য সংকটটি বিচ্ছিন্নতার। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই বিচ্ছিন্নতার বিকট রূপটি তুলে ধরেছেন:

> যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যস্পশ্যা অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরো বেশি প্রবল। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৬: ৩২৯)।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাই যে এই বিচ্ছিন্নতার মূলে, সে কথাও বলেছেন এ প্রবন্ধে। 'রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেবে'র বরাত দিয়ে পুরোনো ব্যবস্থায় শিক্ষার সর্বজনীনতার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, তখন শিক্ষার সঙ্গে মাটি ও মানুষের সম্পর্ক অনেক নিগূঢ় ছিল। নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় একদিকে বিস্তারের দিক থেকে শিক্ষা সংকীর্ণ হয়েছে, অন্যদিকে ভিত্তির দিক থেকে এদেশের আবহের সঙ্গে তার বিচ্যুতি ঘটেছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনায় তাঁর উচ্চারণ এই দুই সংকটকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। আসলে ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো বিরোধ ছিল না। তিনি শিক্ষার যে উদ্দেশ্য বা কাজ সাব্যস্ত করেছেন, পৃথিবীর দেশে দেশে শিক্ষা যে কাজ করেছে, তার সাপেক্ষেই তাঁকে মাতৃভাষার শরণ নিতে হয়েছে। অল্পবয়সে ১২৯০ সালে লেখা 'ন্যাশনাল ফন্ড' প্রবন্ধেই তিনি বলেছিলেন, 'ইংরাজিতে শিক্ষা কখনোই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৭: ৪৪২)। 'শিক্ষার বাহন' (১৩২২) প্রবন্ধে আবার সেকথার অবতারণা করেন: 'বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৯: ৬৮৬)। এখানে ইংরেজির সমস্যাটা সুশিক্ষার তত্ত্বের নয়, একেবারেই বাস্তব সমস্যা – দেশের সব মানুষকে ইংরেজি শিখিয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর নয়। তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনমনীয় দৃঢ়তায় তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলে গেছেন। *রাশিয়ার চিঠি* (১৩৩৮) গ্রন্থে সে দেশের শিক্ষার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

> যখন শুনেছিলুম, এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হু হু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষা – কেবলমাত্র মাথা-গুনতিতেই তার গৌরব। ... কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্ত করে এম. এ. পাস করবার মতন নয়। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১০: ৫৯৫)[৮]

এই 'পাকা রকমের' 'মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত' শিক্ষাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন তাঁর দেশবাসীর জন্য। সে কারণেই জোর পড়েছে মাতৃভাষার দিকে। কারণ সকল মানুষকে এর আওতায় আনা চাই, সব মানুষের মধ্যে এক-একজন মানুষ জাগিয়ে তোলা চাই। তবেই স্বদেশের মূর্তি ফিরবে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব আর মাতৃভাষায় শিক্ষার তত্ত্ব তাই একসূত্রে গাঁথা। যদিও ইংরেজিকে তাঁর রচনায় বারবার 'কাজের ভাষা' আর বাংলাকে 'ভাবের ভাষা' হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তবু তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনা থেকেই বোঝা যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা তাঁর কাছে অবিকল্প হয়েছে কাজের দিক থেকেই। সেই কাজের পরিধিতে শিশুশিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ('শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' বা 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) পর্যন্ত পড়ে। ফলে এই ব্যবহারিক ভাষার সর্বজনীনতা আর প্রস্তুতি নিয়েও তাঁকে ভাবতে হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ নজির পাওয়া যায় বানানের সহজীকরণ সম্পর্কে তাঁর পৌনঃপুনিক উল্লেখে। যেমন, 'শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত পত্র ২' (১৩৪৪)-এ লিখেছেন:

> কেবল আমার মতো অনভিজ্ঞ ও নতুন পোড়োদের পক্ষ থেকে পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে থাকি যে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয় সেখানে সেটা করাই কর্তব্য তাতে জীবে দয়ার প্রমাণ হয়। এ

> ক্ষেত্রে প্রবীণদের অভ্যাস ও আচারনিষ্ঠতার প্রতি সম্মান করতে যাওয়া দুর্বলতা। ... উপরওয়ালা যদি কেউ থাকেন এবং তিনিই যদি নিয়ামক হন, এবং দণ্ডপুরস্কারের দ্বারা তাঁর নিয়ন্তৃত্ব যদি বল পায় তা হলেই বানানের রাজ্যে একটা শৃঙ্খলা হতে পারে। নইলে ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের মতো বিচক্ষণ লোকের দ্বারে দ্বারে মত সংগ্রহ করে বেড়ানো শিক্ষার পক্ষে যতই উপযোগী হোক কাজের পক্ষে হয় না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৮-৮০)

উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর ভাষিক বিচ্ছিন্নতা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ যে নিজেকে বি-উপনিবেশিত এক বাংলা ভাষার প্রধান ভাষ্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, তার পেছনে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার কাজে খাটানোর চিন্তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৫.৩ বাংলা ভাষাচর্চার ধরন প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা-বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন *শব্দতত্ত্ব* প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে *বাংলা শব্দতত্ত্ব* নামে এর একটি নতুন সংস্করণ বের হয়। পরে আরো অনেক প্রবন্ধ, টুকরো আলোচনা-মন্তব্য, পত্রাংশ ইত্যাদি যোগে বড় আকারে বইটি বর্তমান রূপ পায় (তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ ১৩৯১)। ফলে এই বইটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সারাজীবনের (১২৯২ বঙ্গাব্দ থেকে শেষ পর্যন্ত) ভাষাচিন্তার পরিচয় – মত, মতান্তর, বিশ্লেষণ-প্রবণতা, ধারণার বিবর্তন – মুদ্রিত হয়ে আছে। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত তাঁর ভাষা-বিষয়ক দ্বিতীয় ও শেষ গ্রন্থ *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থ হিসাবেই পরিকল্পিত ও মুদ্রিত। এই বই মূলত বাংলাভাষার স্বভাব ও স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারের চেষ্টা। 'একদিকে ভাষার সর্বাঙ্গীণ রূপ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীসুলভ সচেতনতা, অন্যদিকে বাংলাভাষার বিশিষ্ট প্রকৃতিটি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বোধ – রবীন্দ্রনাথের এই বইটিকে সমস্ত পণ্ডিতি আলোচনা থেকে এক অভিনব স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে'। (পবিত্র ১৯৯৯: ৫৩)

ভাষা-আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শই বিনয় দেখিয়েছেন, যদিও মতামতে দৃঢ়তার কোনো কমতি ছিল না। বিনয় দেখানোর একটা মূল কারণ, তিনি প্রথাগত অর্থে বৈয়াকরণ ছিলেন না। 'ভাষার ইঙ্গিত' (১৩১১) প্রবন্ধে লিখেছেনও সে কথা (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৩৬): 'বৈয়াকরণের যে সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই, শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু'। তাহলে তাঁর ব্যাকরণচর্চার বৈধতা কোথায়? তিনি নিজেই বলেছেন: 'বাংলা ভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয়সাধনে আমি ক্লান্তিবোধ করি না'। কিন্তু এই 'পরিচয়সাধনে'র উদ্দেশ্য কী? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমার এই চেষ্টায় কাহারো মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাংলা ভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকার-প্রকার আছে এবং এই আকৃতি-প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণরচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টাসকল সার্থক হইবে'।

সমধর্মী উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের লেখায় আরো পাওয়া যাবে। কিন্তু উদ্ধৃত মন্তব্য কটি পরীক্ষা করলেই তাঁর ভাষাচর্চার কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। বৈয়াকরণের যে 'গুণ ও বিদ্যা'র কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তা আসলে ভাষা-বিশ্লেষণের প্রচলিত বিদ্যা, আর প্রচলিত কাঠামোয় বিশ্লেষণের ক্ষমতা। সমকালীন ভাষাচর্চার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল এবং তিনি অন্তত ভারতীয় ভাষা-সম্পর্কিত রচনাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তী আলোচকগণ এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন (মনিরুজ্জামান ১৪১৯: ৮৫)। তারচেয়ে বড় কথা, তাঁর রচনাতেই সেই পরিচয়ের ছাপ মুদ্রিত হয়ে আছে। কিন্তু তিনি যে প্রচলিত কোনো কাঠামো অনুসরণ করেননি, তা বোঝা যায়।

আসলে তিনি প্রচলিত কাঠামোতে বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছিলেন। পেশ করেছেন নতুন তত্ত্ব ও প্রণালি-পদ্ধতি। উদ্ধৃত মন্তব্যে তিনি বাংলা ভাষার 'সকল প্রকার মূর্তি'র কথা বলেছেন, আর বলেছেন 'তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয়সাধনে'র কথা। দুটিই তাঁর ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষার নিরূপিত কোনো রূপের ভিত্তিতে তিনি 'ভাষাতত্ত্ব' করেননি, খোদ বাংলা ভাষা আবিষ্কারই তাঁর আলোচনা-পর্যালোচনার লক্ষ্য। পরবর্তীদের ভাষা-আলোচনায় উৎসাহী করতে যতবার তিনি মন্তব্য করেছেন, তার সব ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার 'সকল প্রকার মূর্তি'র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর 'তন্ন তন্ন' করে খোঁজার আক্ষরিক প্রমাণ তাঁর লেখাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই খোঁজাখুঁজিরও রকমফের আছে। প্রচলিত অভিধান, ব্যাকরণ আর লিখিত সাহিত্য থেকে উপাত্ত সংগ্রহের পাশাপাশি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কথ্য উৎসের আশ্রয় নিয়েছেন।[৯]

এরপর তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'যোগ্য লোকে'রা তাঁর কাজ থেকে উৎসাহ পাবে। একদিক থেকে তাঁর এই আশা পূরণ হয়েছে। বাংলা ভাষার প্রায় সকল বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক নিজেদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ঋণ স্বীকার করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কোন্ পথ ধরে বাঙলা ভাষার চর্চা করতে হ'বে তা এমন করে তাঁর আগে আর কেউ দেখাতে পারেন নি' (সুনীতি ১৯৭২: ৪৬)। অন্যত্র তিনি ব্যক্তিগত শিক্ষা ও উপলব্ধির উৎস হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন:

> এমন সময় পেয়ে গেলুম রবীন্দ্রনাথের বাঙলা-ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধের সংগ্রহ 'শব্দতত্ত্ব'। এগুলির মধ্যে একটি জিনিস দেখে মনে মনে কবির সমীক্ষাশক্তির শত-সহস্র সাধুবাদ দিতে লাগ্‌লুম। এমন ক'রে তাঁর পূর্বে বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আর কারও তো চোখে পড়ে নি! আর বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু যে ধ'রেছেন তা নয়, বৈশিষ্ট্যগুলি কেমনভাবে কাজ ক'রছে সে বিষয়ে যেন তাঁর একটা দিব্য দৃষ্টি এসে গিয়েছে। ইউরোপের যেসব ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত, সাধারণ মানুষের ভাষা নিয়ে কাজ ক'রেছেন, তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতি তো আমার জন্য তৈরিই ছিল। তা ছাড়া, সহজ মোটা কথা যা আমরা সকলেই জানি, তার ভিতরে কী সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিষয়ক বা ভাব-বিষয়ক রীতি কাজ ক'র্‌ছে, সেটা আমার কাছে এ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাক্‌ছিল, তার কতকগুলি বিষয়ে ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া গেল। এই জন্যেই আমার মনে হ'ল যে, বাঙলা ভাষাতত্ত্বের বা বাঙলাভাষার ইতিহাসের আলোচকদের মধ্যে একজন পাইওনিয়র বা অগ্রণী পথিকৃৎ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। (সুনীতি ১৯৭২: ৫৫)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জানিয়েছেন, 'রবীন্দ্রনাথের গবেষণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা বাংলাভাষার স্বর-সাম্যের নিয়ম (Law of Harmonic Sequence or vocalic Harmony) আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৪: ৬৩)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বাংলা ভাষার 'স্বতন্ত্র আকার-প্রকারে'র কথা ছিল, এবং সেই আকার-প্রকার থেকে তত্ত্ব নির্ণয়ের কথা ছিল। ভাষ্যকারেরা মোটামুটি একমত যে, তাঁর সে আশা অপূর্ণ থেকে গেছে। যেমন, সুনীল সেনগুপ্ত লিখেছেন (সুনীল ১৯৮৯: ১০): 'যে অভাব মেটানোর কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তা আজও মেটেনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা আমাদের যেভাবে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিল তার কাছাকাছি আমরা পৌঁছতে পারিনি'। তাঁর চিন্তার সঙ্গে পরিচয়ের অভাব এর কারণ নয় – চিন্তার উচ্চাভিলাষই, সম্ভবত, মূল কারণ। চিন্তার এই অভিলাষকে সরল করে এভাবে বর্ণনা করা যায়: কোনো কাঠামোর অধীনে বিশ্লেষণ না করে বিশ্লেষণ থেকে ভাষা-কাঠামোর উপলব্ধিতে পৌঁছানো।

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ভাষার কাঠামোকে তুলনা করেছেন কোঠাবাড়ির সঙ্গে। তাতে সমগ্র তুলনাটা দাঁড়িয়েছে এ রকম: ‘কোঠাবাড়ির প্রধান মসলা ইঁট, তার পরে চুন-সুর্‌কির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইঁট, বাংলায় তাকে বলি ‘কথা’। নানারকম শব্দচিহ্নের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা’ (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৫৯৯)। জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক জীবনযাপনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষার নানা উপাদানের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু কাঠামোটা ঠিকই থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> দু-তিনশো বছর আগেকার ভাষার সঙ্গে পরের ভাষার তফাত ঘটে আসছেই। তবু বিশেষ জাতের ভাষার মূল স্বভাবটা থেকে যায়, কেবল তার আচারের কিছু কিছু বদল হয়ে চলে। সেইজন্যেই প্রাচীন বাংলাভাষা বদল হতে হতে আধুনিক বাংলায় এসে দাঁড়িয়েছে, অমিল আছে যথেষ্ট, তবু তার স্বভাবের কাঠামোটাকে নিয়ে আছে তার ঐক্য। ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কাঠামোর বিচার করে ভাষার জাত নির্ণয় করেন। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৫৯৯)

অর্থাৎ, বিশেষ উপাদানের পরিবর্তন বা বাড়তি-কমতি নয়, ভাষার স্বাতন্ত্র্য তার স্বভাবে, তার আকারে, যা তাকে অন্য ভাষা থেকে পৃথক করে। ভাষার এই স্বাতন্ত্র্য কত গভীর আর অপরিবর্তনীয় তা বোঝা যায় সাপিরের মন্তব্য থেকে। সাপির লিখেছেন, ‘Language is probably the most self-contained, the most massively resistant of all social phenomena. It is easier to kill it off than to disintegrate its individual form.’ (Sapir 2004: 170)

কাঠামো যদি ভাষার প্রধান পরিচয় হয়, তাহলে ভাষা-বিশ্লেষকের কাজ হবে সেই কাঠামোর পরিচয় নিয়ে তার সাপেক্ষে ব্যাকরণ রচনা করা। অন্য উপকরণ-উপাদানগুলো বিশ্লেষিত হবে কাঠামোর সাপেক্ষে, আবার উপকরণ-উপাদানগুলোর পরিচয়ের সাপেক্ষেই কাঠামোর পরিচয় নির্ধারিত হবে। কাজের দিক থেকে কথাটার মানে দাঁড়ায় এ রকম: ভাষার উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষিত হওয়ার উপায় নেই; যদি করতেই হয়, বৃহত্তর কাঠামোর সাপেক্ষেই করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের আলোচনায় এ রকমই করেছেন। ব্যাকরণকারের যে দায়িত্ব তিনি সাব্যস্ত করেছেন, তাতেও এ প্রক্রিয়ার কথাই বলা হয়েছে। বিখ্যাত ‘বাংলা ব্যাকরণ’ প্রবন্ধে লিখেছেন:

> প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধামত বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়। উর্দু ভাষায় পারসি আরবি কথা ঢের আছে, কিন্তু সে কেবল আপনার ছাঁচেই চতুর ভাষাতত্ত্ববিদের কাছে হিন্দির বৈমাত্র সহোদর বলিয়া ধরা পড়িয়া গেছে। আমাদের বাঙালি কেহ যদি মাথায় হ্যাট, পায়ে বুট, গলায় কলার এবং সর্বাঙ্গে বিলাতি পোশাক পরেন, তবু তাঁহার রঙে এবং দেহের ছাঁচে কুল-লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ। বাংলায় সংস্কৃত শব্দ কটা আছে, তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে চেনা যায় না, কিন্তু কোন বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে বিশেষরূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কি ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১১)

নিজের রচনায় রবীন্দ্রনাথ এ প্রণালি-পদ্ধতি প্রায় হুবহু মান্য করেছেন। তত্ত্ব প্রণয়ন আর তার আংশিক বাস্তবায়ন রবীন্দ্রনাথকে আসলে প্রতিষ্ঠা দেয় ‘আধুনিক’ ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে; যদিও তিনি ‘ভাষাবিজ্ঞান’ চর্চা করেননি, আর কাজগুলো করেছেন ‘আধুনিক’ ভাষাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যথেষ্ট আগে।[১০] যেসব প্রত্যয়ের উপর আজকের ভাষাতত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে শব্দবিদ্যা আর আনুশাসনিক ব্যাকরণের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। দেবপ্রসাদ

বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৬: ১২৮-৩০) সোস্যুরের জীবনের দুই অংশের বিবরণ দিয়েছেন, যার এক অংশে তিনি ছিলেন 'শব্দবিদ', অন্য অংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন 'ভাষাবিজ্ঞানী' হিসাবে। সোস্যুর ভাষাকে কাঠামো আকারে ব্যাখ্যা করার তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন, যে কাঠামোর মধ্যে স্বেচ্ছাচারী (arbitrary) শাব্দ-উপাদান সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে।[১১] এদিক থেকে 'আকারধর্মী ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে কাঁচামাল-নির্ভর শব্দবিদ্যার পার্থক্য দুস্তর'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাবে সে পার্থক্য পুরোমাত্রায় রক্ষা করেছেন। শব্দনির্ভর ভাষাচর্চা যে শেষ পর্যন্ত ভাষা-বিশ্লেষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না, তাঁর এই উপলব্ধির স্মারক হয়ে আছে নিম্নোক্ত বিস্ময়কর মন্তব্য: ''আমাকে তোমার পড়াতে হবে' বাক্যটির প্রত্যেক শব্দই সংস্কৃতমূলক, অথচ ইহার প্রত্যেক শব্দটিতেই সংস্কৃত নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১০৮)[১২]

বাংলা ভাষা-চর্চাকারীদের মধ্যে ঐতিহাসিক কারণে শব্দকেন্দ্রিকতা আর শব্দের বাছবিচার খুব বড় ভূমিকা রাখে। এ বাস্তবতা জানতেন বলেই রবীন্দ্রনাথ ভাষা-বিবেচনায় বিচার্য শব্দভাণ্ডারের আওতা সম্পর্কে বারবার সতর্ক করেছেন। কোনো শব্দ লেখায় ব্যবহৃত হয়েছে কি না, বা ভদ্রসমাজে ব্যবহারের উপযোগী কি না, তা বিচার করা – তাঁর মতে – ব্যাকরণকারের কাজ নয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, 'অকিঞ্চিৎকর' কথা বাংলায় গ্রাহ্য করে তিনি ভাষা নষ্ট করছেন। উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তা শুধু তখনকার দায়িত্ব পালন করেনি, ভাষা-বিশ্লেষণের একটি গোড়ার সত্যও প্রতিষ্ঠিত করেছে: 'ওই কথাগুলো আমার এবং তাঁহার বহু-পূর্ব পিতামহ-পিতামহীরা প্রচলিত করিয়া গেছেন, আমি তাহাদের রাখিবারই বা কে, মারিবারই বা কে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১২০)। ভাষা সম্পর্কে এই প্রাথমিক কাণ্ডজ্ঞানের কথাই রবীন্দ্রনাথ বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। আর সমষ্টির মধ্যে প্রচলিত সেই উপাদানগুলোকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চেয়েছেন বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি। বিজ্ঞানের কার্যপ্রণালি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত:

> জগতে যে-কোনো জিনিসই আছে, তাহা ছোটো হউক আর বড়ো হউক, কুৎসিত হউক আর সুশ্রী হউক, প্রাদেশিক হউক আর নাগরিক হউক, তাহার তত্ত্বনির্ণয় বিজ্ঞানের কাজ। শরীরতত্ত্ব কেবল উত্তমাঙ্গেরই বিচার করে এমন নহে, পদাঙ্গুলিকেও অবজ্ঞা করে না। বিজ্ঞানের ঘৃণা নাই, পক্ষপাত নাই। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ১০৬)

ভাষাবিজ্ঞানীও এই বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিরই পরিচয় দেবেন – এই তাঁর প্রত্যাশা:

> বাংলা বলিয়া একটা ভাষা আছে, তাহার গুরুত্ব মাধুর্য ওজন করা ব্যাকরণকারের কাজ নহে। সেই ভাষার নিয়ম বাহির করিয়া লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার কাজ। সে-ভাষা যে ইচ্ছা ব্যবহার করুক বা না-করুক, তিনি উদাসীন। কাহারো প্রতি তাঁহার কোনো আদেশ নাই, অনুশাসন নাই। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ১১৫)

রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, এই নিরাসক্তি নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষা বিশ্লেষিত হবে। তাঁর সেই আশা – বলা যায় – অপূর্ণই থেকে গেছে। কিন্তু নিজে তিনি বাংলা ভাষার যে অংশ ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হয়েছেন, তাতে যথাসম্ভব এই তত্ত্ব, প্রণালি আর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন পাওয়া যায়।

৫.৪ বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার ধরন

দেবেশ রায় সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের অনুশীলন, প্রস্তুতি ও প্রকাশের একটি দিক এভাবে চিহ্নিত করেছেন:

> বাল্য থেকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রকাশ্য মাধ্যমে চর্চার মধ্য দিয়ে নিজের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সাহিত্যের ফর্মের যোগ-বিয়োগ ঘটিয়েছেন – সেই যোগবিয়োগ গোপনে কোনো একান্ততায় সেরে তিনি আমাদের জন্য নিয়ে আসেন না

> শুধুমাত্র সাহিত্যের পরিণতিটুকু। এমনকি, একটি রচনার একাধিক খশড়ার ভেতরে রচনাকারের ব্যক্তিত্বের গূঢ় প্রবণতা অনুমানের যে অবকাশ থাকে, রবীন্দ্রনাথে তাও যেন তুলনায় কত কম, অন্তত তাঁর রচনার সংখ্যার তুলনায়। একাধিক খশড়ার বদলে তিনি লিখে ফেলেন একাধিক রচনাই। (দেবেশ ১৯৭৮: ২)

রবীন্দ্রনাথের ভাষা-সম্পর্কিত রচনা পাঠের ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখা খুব জরুরি। ভাষাবিষয়ক রচনাবলিও তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তাপে-ভাঁপে রচিত, অব্যবহিত প্রয়োজনের ইশারায় ও অনুভূতির দীপ্তিতে আলোকিত – পৃথক গবেষণাকর্ম হিসাবে নয়। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থকে ব্যতিক্রম বলা যায়। তবে খুব কাছাকাছি সময়ের অন্য কিছু প্রবন্ধ বা তর্ক-বিতর্ক হাজির থাকায় ওই গ্রন্থের মত-মন্তব্যকে তাঁর চূড়ান্ত মত হিসাবে নেওয়া বিচার-সাপেক্ষ।[১৩]

৫.৪.১ ভাষা সম্পর্কে কিছু বুনিয়াদি ধারণা

রবীন্দ্রনাথের ভাষাচর্চা নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই এই চর্চার 'বৈজ্ঞানিকতা' ও 'আধুনিকতা' সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়েছেন (সুনীতি ১৯৭২, 2002; মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৪, ১৯৯৫; মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৯৪; কাজী দীন ১৯৬৫; পবিত্র ১৯৯৯; সুনীল ১৯৮৯; কৃষ্ণা ১৯৮৭; মনিরুজ্জামান ১৪১৯)। ভাষার তত্ত্ব আর চর্চার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সমকালের দেশি-বিদেশি তাত্ত্বিকদের তুলনায় অগ্রসর ছিলেন – এ সিদ্ধান্তেও তাঁদের মতৈক্য আছে; যদিও তাঁরা এও খেয়াল করেছেন যে, চর্চার পদ্ধতি-সম্মিতি আর শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সাফল্য দেখাননি।

রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে দেখেছেন 'মানবধর্মে'র আকর উপাদান হিসাবে। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের শুরুতেই লিখেছেন, 'মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষ একলা নয়। প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত, বহু মানুষের হাতে তৈরি' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৫৯৭)। মানুষের এই পারস্পরিকতা গড়ে ওঠা আর তা রক্ষিত হওয়া – দুইয়েরই মূলে আছে ভাষা: 'এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৫৯৮)। ভাষা মানুষের সচেতন নির্মাণ নয় বলেই এর উৎপত্তি ও গতির উপরও তার বিশেষ নিয়ন্ত্রণ নেই। বাগ্‌যন্ত্রের তফাতের কারণেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উচ্চারণে ফারাক হয়, স্বর-ব্যঞ্জনের পার্থক্য ঘটে। এই স্বর-ব্যঞ্জনের মিশ্রণ ঘটবার যে তফাত ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে দেখা যায় তাতেই ভাষা আলাদা হয়ে ওঠে। এ তো গেল ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কথা। এক ভাষাভাষীর ক্ষেত্রেও ভাষার গড়ে ওঠা কোনো নিয়ন্ত্রিত ব্যাপার নয়:

> ভাষা প্রথমে আরম্ভ হয় নানারকম দৈবাৎ শব্দসংঘাতে, তার পরে মানুষের দেহমনের স্বভাব অনুসরণ করে সেইসব সংকেতের ধারায় সে ভরে উঠতে থাকে। ... ভাষার আকস্মিক সংকেত ... অলক্ষ্যে টেনে নিয়ে চলেছে যে পথে সেটা আঁকাবাঁকা পথ। হিসেব করে তৈরি হয় নি, হয়েছে ইশারা থেকে ইশারায়। পুরোনো রাস্তা কিছু কিছু জীর্ণ হয়েছে, আবার তার উপরে নতুন সংস্কারেরও হাত পড়েছে। অনেক খুঁত আছে তার মধ্যে, নানা স্থানেই সে যুক্তিসংগত নয়। না হোক, তবু সে প্রাণের জিনিস, সমস্ত জাতের প্রাণমনের সঙ্গে সে গেছে এক হয়ে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬০০)

অন্যত্র ভাষার গতি ও প্রবৃদ্ধি বোঝাতে তিনি দুটি উপমা ব্যবহার করেছেন। একটি হল দ্বীপের উপমা: 'সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার প্রবাল আপন দেহের আবরণ মোচন করতে করতে কখন এক সময়ে দ্বীপ বানিয়ে ফেলে। তেমনি বহু

সংখ্যক মন আপনার অংশ দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাষাদ্বীপ’ (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬০৮)। অন্য উপমাটি মেঠোপথের:

> পথহীন মাঠের মধ্যে দিয়ে যখন একজন বা দু-চারজন মানুষ কোনো-এক সময়ে চলে গেছে, তখন তাদের পায়ের চাপে মাটি ও ঘাস চাপা পড়ে একটা আকস্মিক সংকেত তৈরি হয়েছে। পরবর্তী পথিকেরা পায়ের তলায় তারই আহ্বান পায়। এমনি করে পদক্ষেপের প্রবাহে এ পথ চিহ্নিত হতে থাকে। যদি পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে মানুষ এ পথ বানাতে বিশেষ চেষ্টা করত তা হলে রাস্তা হত সিধে; কিন্তু দেখতে পাই মেঠোপথ চলেছে বেঁকেচুরে। তাতে রাস্তা দীর্ঘ হয়েছে কি না সে কথা কেউ বিচার করে নি। ভাষার আকস্মিক সংকেত এমনি করে অলক্ষ্যে টেনে নিয়ে চলেছে যে পথে সেটা আঁকাবাঁকা পথ। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬০০)

ভাষার জন্ম, গতি ও প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে উপরে বর্ণিত রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই আসলে তাঁর বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণের ভিত্তি। যুক্তির সীমার মধ্যে ভাষা সবসময়ে আঁটে না। তাই ভাষার স্বভাব আর বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী যুক্তি তৈরি করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ সূত্র প্রায় সর্বত্রই অনুসরণ করেছেন। ‘সম্বন্ধে কার’ (১৩০৫) প্রবন্ধে লক্ষ করেছেন, একটি বা একাধিক সূত্রের অধীনে ভাষার কোনো এক বৈশিষ্ট্যকে আঁটিয়ে ফেলা যায় না। কারণ, ‘ভাষা ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট জীবের মতো কেন যে কী করে, তাহার সম্পূর্ণ কিনারা করা যায় না’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪০)। অন্যত্র, ‘বঙ্গভাষা’ (১৩০৫) প্রবন্ধেও তাঁর সিদ্ধান্ত একই: ‘ভাষা একটা প্রকাণ্ড সজীব পদার্থ। জীবনধর্মের নিগূঢ় নিয়মে তাহার বিচিত্র শাখাপ্রশাখা কত দিকে কত প্রকার অভাবনীয় আকার ধারণ করিয়া ব্যাপ্ত হইতে থাকে তাহার অনুসরণ করিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪৩)। এই উপলব্ধি একদিকে ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের স্বরাজ ঘোষণা করে; অন্যদিকে আরোপিত নিয়মের ছাঁচে ভাষা-বিশ্লেষণের বিপদ সম্পর্কে সজাগ করে।

কথাগুলো রবীন্দ্রনাথ মনে রেখেছেন কেবল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নয়; ভাষার কাছ থেকে সর্বোচ্চ কাজ আদায়ের ক্ষেত্রেও। আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ভাষার কেজো দিকের কথা বাদ রেখে ‘ভাষাতত্ত্ব’ করেননি। সেই কেজো দিকের মধ্যে সাহিত্যকে জনগ্রাহ্য করা থেকে শুরু করে শিক্ষা ও জাতিগঠনের মতো নানা প্রকল্প রয়েছে। তাতে ভাষাকে ‘শুদ্ধ’, ‘উন্নত’ বা ‘পূর্ণাঙ্গ’ করার দরকার হতেও পারে। কিন্তু সবকিছুই করতে হবে ভাষার নিজস্ব ছাঁচকে মান্য করে। *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থের ‘সভাপতির অভিভাষণ’ (১৩৩০) প্রবন্ধে তিনি ভাষাকে কাজে খাটানোর এই পরামর্শই দিয়েছেন: ‘ভাষা জিনিসের জীবনধর্ম আছে। তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাশে গড়া যায় না। তার নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধগামী হলে সে বন্ধ্যা হয়’। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১২: ৫২৩)[14]

৫.৪.২ ভাষার ‘শুদ্ধতা’ ও ‘দুর্বলতা’

হকেট তাঁর *A Course In Modern Linguistics* গ্রন্থের ভূমিকায় ভাষা-আলোচনার কয়েকটি সংকটের উল্লেখ করেছেন (Hocket1968: 4-10): এক. ‘ভাষা’ আর ‘লেখা’কে গুলিয়ে ফেলা। দুই. ভাষার নিয়ম-আবিষ্কারের তুলনায় ‘শুদ্ধতা’ সম্পর্কে অধিকতর মনোনিবেশ করা। তিন. ভাষা ও সাহিত্যকে একাকার করে ফেলা। চার. ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে বিবেচনায় না আনা। এই ধারণাগুলো বিকশিত হয়েছে ভাষাচর্চার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে। ‘আধুনিক’ ভাষাবিজ্ঞান সাধারণভাবে ভাষাচর্চার মূলনীতি হিসাবে কথাগুলো মনে রাখে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা-আলোচনা পর্যালোচনা

করলে দেখা যায়, উপরি-উক্ত সংকট থেকে তা বিস্ময়কর পরিমাণে মুক্ত। তবে ভাষার ‘শুদ্ধতা’র ব্যাপারে তাঁর মনোযোগ ছিল; আর ভাষা ও সাহিত্যকে একাকার করে না ফেললেও সাহিত্যিক ভাষায় তিনি অনেক বেশি নিবিষ্ট ছিলেন।

শুধু ভাষার ‘শুদ্ধতা’ নয়, অল্পবয়সে বাংলা ভাষার হীনতা-বিষয়ক ঔপনিবেশিক ধারণাও তিনি প্রচার করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে লেখা ‘বাংলা ভাষা ও বাঙালি চরিত্র’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন: ‘অনেক সময় দেখা যায় সংস্কৃত শব্দ বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে এক প্রকার বিকৃত ভাব প্রকাশ করে। কেমন এক প্রকার ইতর বর্বর আকার ধারণ করে’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৩১১)। এ ধারণাকে আরো বিস্তারিত ও জোরালো করে লিখেছেন: ‘সকল ভাষাতেই গ্রাম্য ইতর শব্দ আছে। কিন্তু দেখিয়াছি বাংলায় বিশেষ ভাবপ্রকাশক শব্দ মাত্রই গ্রাম্য। তাহাতে ভাব ছবির মতো ব্যক্ত করে বটে কিন্তু সেইসঙ্গে আরো একটা কী করে যাহা সংকোচজনক’। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৩১২)

এ মনোভাব অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অচিরেই কাটিয়ে উঠেছিলেন। মনোভাবের পরিবর্তনের কারণেই একদা যা বাংলার দুর্বলতা বলে মনে হয়েছিল, তা-ই পরে বিশ্লেষিত হয়েছে অতুলনীয় সামর্থ্য হিসাবে। ১৮৮৮ সালে বলেছেন, ‘বাংলা ভাষায় ছবি আঁকা শব্দ অতি অল্প’। বিশেষত ইংরেজি ভাষার তুলনায় বাংলায় ‘গমন’ ক্রিয়ার সূক্ষ্ম বিভিন্নতা ও ব্যঞ্জনা-প্রকাশক শব্দের অনুপস্থিতির কারণে তিনি রীতিমত বাঙালির চিত্রনির্মাণকলা নিয়েই তত্ত্ব ফেঁদে বসেছিলেন। কিন্তু ১৯০০ সালে লেখা ‘ধ্বন্যাত্মক শব্দ’ প্রবন্ধে পৌঁছেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে:

> ইংরেজিতে গমনক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ছবির জন্য বিচিত্র শব্দ আছে – creep crawl sweep totter waddle ইত্যাদি। বাংলায় আভিধানিক শব্দে চলার বিচিত্র ছবি পাওয়া যায় না; ছবি খুঁজিতে হইলে আমাদের অভিধানতিরস্কৃত শব্দগুলি ঘাঁটিয়া দেখিতে হয়। খটখট করিয়া, ঘটঘট করিয়া, খুটখুট করিয়া, খুরখুর করিয়া, খুটুস খুটুস করিয়া, গুটগুট করিয়া, ঘটর ঘটর করিয়া, ট্যাঙস ট্যাঙস করিয়া, থপ থপ করিয়া, থপাস থপাস করিয়া, ধদ্ধড় করিয়া, ধাঁ ধাঁ করিয়া, সন সন করিয়া, সুড় সুড় করিয়া, সুট সুট করিয়া, সুড়ুৎ করিয়া, হন হন করিয়া, হুড়মুড় করিয়া – চলার এত বিচিত্র অথচ সুস্পষ্ট ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৮৩-৮৪)

দেখা যাচ্ছে, ‘বাংলা ভাষা’র পরিধিটা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে যা ছিল ভাষার ‘দুর্বলতা’, তা-ই হাজির হয়েছে শক্তির নমুনা হয়ে। এ জন্য অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে আগে ‘প্রাকৃত বাংলা’ আবিষ্কার করতে হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃত বাংলার নানা ‘দুর্বলতা’ও নানা সময়ে তাঁর চোখে পড়েছে। এর একটি হল, নতুন শব্দ বানাবার অক্ষমতা: ‘নূতন শব্দ বানাইবার শক্তি প্রাকৃত বাংলার মধ্যে নাই’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৫)। বারবার বলেছেন বাংলা ক্রিয়াপদের অক্ষমতার কথা। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইয়ের ‘ভাষার খেয়াল’ (১৩৪২) প্রবন্ধে এ বাবদ তিনি বিস্তর বাক্যব্যয় করেছেন। যেমন প্রশ্ন তুলেছেন ‘জিজ্ঞাসা করা’ ক্রিয়াপদ নিয়ে। তাঁর মতে, ‘এ রকম বিশেষ্য-জোড়া ওজনে-ভারী ক্রিয়াপদে ভাষার অপটুত্ব জানায়। প্রশ্ন করা ব্যাপারটা আপামর সাধারণের নিত্যব্যবহার্য অথচ ওটা প্রকাশ করবার কোনো সহজ ধাতুপদ বাংলায় দুর্লভ এ কথা মানতে সংকোচ লাগে’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৪৪)। এই সংকোচ থেকেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল ‘বিশেষ্য-জোড়া ক্রিয়াপদের জোড় মিলিয়ে এক করা’। বাংলা গদ্য এর আনুকূল্য করে না বলে তাঁর মনে হয়েছে ‘ভাবপ্রকাশের কাজে শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে কাব্যের বোধশক্তি গদ্যের চেয়ে সূক্ষ্মতর’। এ কথা তত্ত্ব হিসাবে সত্য

হতেও পারে; কিন্তু বাংলা ক্রিয়াপদের দুর্বলতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যুক্তি হিসাবে যথেষ্ট নয়। দেবেশ রায়ের মতে:

> বাংলাবাক্যের 'দুর্বলতা' সম্পর্কে সংস্কারটি প্রচলিত হয়েছে প্রধানত ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে, কখনো কখনো সংস্কৃত বাক্যের সঙ্গেও, তুলনা থেকে। তাতে প্রথমেই ধরা পড়ে বাংলা ক্রিয়াপদের দুর্বলতা। সে দুর্বলতার একটা প্রমাণ হিসেবে ধরা হয় বাংলা ক্রিয়াপদের স্বল্পতা ও ফলে কয়েকটি ক্রিয়াপদ দিয়ে অনেক ক্রিয়া সম্পাদনের বাধ্যতা। ... বাংলা ক্রিয়াপদ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে অচেতনতা থেকেই এই ধরনের অভিযোগ তৈরি হয়। ... বাংলায় ক্রিয়াপদের সংখ্যার স্বল্পতা সম্পর্কে কুসংস্কারের একটি প্রধান কারণ বাংলা লেখকরা বাংলা ক্রিয়াপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না ও মুখের বাংলায় যে বিচিত্র ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হত ও এখনো হয় তা লেখার বাংলায় আসেনি। (দেবেশ ১৯৯০: ৫২৫-৫২৬)

তার মানেই হল, বাংলা ক্রিয়াপদের দুর্বলতা বা অপর্যাপ্ততা একটা ঔপনিবেশিক মিথ। দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ অন্তত বাংলা ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে এ মিথে অংশ নিয়েছিলেন।

কোনো ভাষার হীনতা বা অপূর্ণতা 'আধুনিক' ভাষাবিজ্ঞান স্বীকার করে না। এ প্রসঙ্গে সাপিরের সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে:

> The fundamental groundwork of language – the development of a clear-cut phonetic system, the specific association of speech elements with concepts, the delicate provision for the formal expression of all manner of relations – all this meets us rigidly perfected and systematized in every language known to us. (Sapir 2004: 17)

বলা যায়, কোনো ভাষা নিজে 'দুর্বল' হয় না, তবে অন্য ভাষার তুলনায় কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যে দুর্বল মনে হতেও পারে। ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি ঘটে নতুন ভাব বা বিষয় লেখার ভাষায় চর্চিত হওয়ার কালে। উপনিবেশ আমলে বাংলা এমন বহু বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছে, যা আগে কখনো এ ভাষায় চর্চিত হয়নি। এমতাবস্থায় বাংলা ভাষার শব্দ-সংকট অনেকের কাছেই গুরুতর হয়ে ওঠে। অন্য ভাষায় এ সংকটের সমাধান সাধারণত যেভাবে হয়, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে বাংলা পুরোপুরি তার অনুসরণ করতে পারেনি। কেবল সংস্কৃত-উৎসই ব্যবহার করতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এ আবহে প্রচলিত ধারাতেই কাজ করেছেন। প্রায় জীবনব্যাপী যে বিপুল পারিভাষিক শব্দ তিনি বানিয়েছেন বা সংগ্রহ করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৩৬৩-৪০৬), তার অধিকাংশই বাংলা ভাষায় গ্রাহ্য হয়নি প্রধানত উৎসের সীমাবদ্ধতার কারণেই। পবিত্র সরকার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তাঁর নিজের অধিকাংশ পরিভাষা সুশ্রাব্য হলেও অতিরিক্ত সংস্কৃত-নির্ভরতার জন্য প্রায় অব্যবহার্য। ... 'ড্রপ সীন'-এর বাংলা যখন 'চরম তিরস্করণী' করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তখন বুঝতে হবে সংস্কৃত প্রতিশব্দের দুর্বার সম্মোহন তাঁকে খানিকটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল' (পবিত্র ১৯৯৯: ৬৬)। দেবেশ রায় লক্ষ করেছেন, পারিভাষিক শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে তিনি 'ফারসি উৎস একেবারেই মনে আনেননি, যদিও জমিদারি কাজ থেকে তাঁর তো জানা ছিল – জমিজমা আইনকানুন কোর্ট কাছারিতে এই আরবি-পারসিক পরিভাষার ব্যবহার কতটাই' (দেবেশ ২০০৩: ১১)। তারচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, প্রচলিত ভাষা ও জীবনাভিজ্ঞতার মধ্যেও তিনি পরিভাষা তালাশ করেননি, যদিও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'নূতন কথা গড়া' প্রবন্ধের দারুণ প্রস্তাব তাঁর সামনে ছিল (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৫৫২-৫৮)।

এর অন্যতম কারণ তাঁর এবং তাঁর কালের চিন্তাধারার পশ্চিমা উৎস ও রূপ। শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধাবলিতে রবীন্দ্রনাথ বারবার এ কথাই বলেছেন যে, ইংরেজি-শিক্ষা মারফত যে জ্ঞানালোক কিছু মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়েছে, দেশের জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে না পারলে দেশের কল্যাণ অসম্ভব। জনমানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন সাধু বাংলায় তা হতে পারে না। তাই তাঁর কাছে প্রাকৃত বাংলা এতটা প্রয়োজনীয়। কিন্তু পশ্চিমা চিন্তাচেতনার দেশজ রূপ প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর কালের স্বভাব অনুযায়ী তিনিও হাত পেতেছেন পুরোনো সংস্কৃতের ভাণ্ডারে। ফরহাদ মজহার ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

> প্রাকৃতজনের ভাষার মধ্যে যে চিন্তা, ধারণা প্রতীক ও ব্যঞ্জনা রয়েছে, তাকে বের করে আনবার জন্য প্রয়াস দরকার। সেটা রবীন্দ্রনাথের গদ্যে একটা পর্যায়ে এসে থেমে গেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর ভাবুকতার বা দার্শনিকতার বিষয়গুলো আলোচনা করতে নামলেন, দেখা গেল তিনি নির্ভর করছেন উপনিষদ, বেদান্ত ও অন্যান্য সংস্কৃত ঐতিহ্যের উপর। তাঁর দার্শনিক আলোচনা ভারাক্রান্ত হয়েছে গুরুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দে; বা এমন সব প্রতীক ও ধারণা তাঁকে ভর করেছে যেগুলো তিনি প্রাচীন হিন্দু ধর্মের ভেতর থেকে সংগ্রহ করেছেন। সাধারণ হিন্দুর জীবনে তার যে অপভ্রংশ প্রাকৃত রূপ আরো হাজারো তদ্ভব ভাবুকতার মধ্যে জড়াজড়ি করে পড়ে রয়েছে, তিনি সেখান থেকে কুড়িয়ে আনবার আবেগ খুব একটা বোধ করলেন না। তিনি ফিরে গেলেন খুব উঁচুতে। অথচ তাঁর আগে রামপ্রসাদ গান গেয়ে গেছেন, লোকায়ত ভক্তি আন্দোলনের নানা শক্তিশালী ধারা বাংলাকে পাগল বানিয়ে ছেড়েছে। বাংলা গদ্যে যে প্রাকৃত ভাব আনতে চাইলেন সেটা ভারি হয়ে উঠল উপর থেকে ধার করা দর্শনে। (ফরহাদ ২০০৮: ২৯)

দর্শনের চর্চার দিক থেকে এর ফল ভালো হলেও হতে পারে। কিন্তু প্রাকৃত বাংলার চালু ভাবসম্পদের দিকে নজর না দেওয়ায় দরকারি পরিভাষার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস যে অব্যবহৃত থেকে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর মনোনীত উৎস থেকে নতুন শব্দ আর পরিভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থের 'সংজ্ঞাবিচার' (১২৯২) বা 'প্রতিশব্দ' (১৩২৬) শিরোনামের রচনাগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, নতুন শব্দের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভাষা-ব্যবহারকারীদের – অন্তত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের – গণতান্ত্রিক অধিকার তিনি যথাসম্ভব মান্য করেছেন।

এই গণতান্ত্রিকতা তাঁর ভাষাচিন্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ও শক্তি। অন্তত তত্ত্ব হিসাবে তিনি ভাষার আভিজাত্য ও ইতরতা, নাগরিকতা ও গ্রাম্যতা, নিজস্বতা ও অপরতা মানতেন না।[১৫] কিন্তু ব্যক্তিগত চর্চায় আর রুচির বরাতে একটা শক্ত ভাগাভাগি তাঁর ছিল – দেখা যায়। ভাষাপ্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ মোটেই শুচিবায়ুমুক্ত ছিলেন না। কলকাতার স্থানীয় ভাষার নিন্দা তিনি বারবার করেছেন। সুযোগ পেলেই কোনো বিশেষ শব্দ বা রীতি সম্পর্কে নিজের অনীহার কথা জানিয়েছেন। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ 'কৃষ্টি' শব্দটি। এ বাবদ তিনি এত বাক্যব্যয় করেছেন যে, বিস্মিত হতে হয়। 'সহানুভূতি' শব্দটি তাঁর সহানুভূতি পায়নি। 'বাধ্যতামূলক' সম্পর্কে বলেছেন, 'বাধ্যতামূলক' নামে যে একটা বর্বর শব্দ বাংলা ভাষাকে অধিকার করতে উদ্যত, তার সম্বন্ধে কি সাবধান হওয়া উচিত হয় না' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৪৪)? আরেক জায়গায় লিখেছেন, ''ভিতর' এবং 'ভেতর' 'উপর' এবং 'ওপর' 'ঘুমতে' এবং 'ঘুমুতে' এই দুই রকমেরই ব্যবহার কলকাতায় আছে কিন্তু শেষোক্তগুলিকে আমি অপভাষা বলি। 'দুয়োর' কথাটার জায়গায় 'দোর' কথা ব্যবহার করতে আমার কলমে ঠেকে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৩৬)। বস্তুত এ ধরনের শব্দের সংখ্যা প্রচুর।[১৬] এসব

শব্দের অধিকাংশই পরবর্তীকালের লেখ্য-বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয়, ভাষা আসলে ব্যক্তির যুক্তি মানে না, চলে সামষ্টিক যুক্তিতে। সে যুক্তি অযৌক্তিক হতেও পারে, কিন্তু সামষ্টিক।

এ ধরনের কিছু উদাহরণ বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে ভাষার 'অযৌক্তিক' সামষ্টিকতাকে পরম মূল্য দিয়েছেন – দিতে পেরেছেন।

৫.৪.৩ বাংলা ভাষা ও জাতীয়তাবাদ

ভাষার সঙ্গে জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক – রবীন্দ্রনাথের কাছে – নিত্য সম্পর্ক। তাঁর ধারণা ছিল, ভাষার মাধ্যমেই জনগোষ্ঠীর ঐক্য-প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতিসাধন সম্ভব। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে ভাষার জন্মকথা বলতে গিয়ে তিনি ভাষাকেই জনসমাজ গঠনের মূল কারণ ও উপাদান হিসাবে বর্ণনা করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৫৯৭-৯৮)। বাস্তবে কাজের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, নিজের লেখালেখিতে তিনি বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে সম্বোধন করেছেন, যাকে এক ধরনের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলা যায়।[১৭] উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় কলকাতায় এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য মোটেই অচেনা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রসহ সেকালের কৃতবিদ্য প্রায় সকল বাঙালির লেখায় প্রধানত সাহিত্যকে অবলম্বন করে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর মিলন আর উন্নয়নের যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের লেখায় তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।[১৮] আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষা-বিষয়ক চিন্তাভাবনায় জনগোষ্ঠীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এবং এই ভূমিকা খুবই কাজের। কিন্তু কোথাও কোথাও জাতীয়তাবাদী চিন্তা উৎকট হয়ে চিন্তার ঔদার্য ও গণতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ন করেছে। কলকাতার বাঙালির ক্ষেত্রে – এবং রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও – বাংলা ভাষার সঙ্গে ওড়িয়া ও অসমিয়ার সম্পর্ক এমনি এক উৎকট জাতীয়তাবাদী প্রসঙ্গ।

বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে সংকলিত 'ভাষাবিচ্ছেদ' (১৩০৫) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি বাংলার সঙ্গে অসমিয়ার ব্যাকরণিক মিলের উল্লেখ করেছেন, ওড়িয়ার সঙ্গে বাংলার মিল সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত: 'উড়িষ্যা এবং আসামে বাংলা শিক্ষা যেরূপ সবেগে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলার এই দুই উপরিভাগ ভাষার সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙিয়া দিয়া একদিন একগৃহবর্তী হইতে পারিত' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪৭)।[১৯] তাঁর মতে, 'শক্তিপরীক্ষা ও যোগ্যতমের জয়চেষ্টার' সুযোগ থাকলে বাংলাই জয়ী হবে। দৃষ্টান্তটা তিনি নিয়েছেন ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা থেকে:

> বৃটিশ দ্বীপে স্কট্ল্যান্ড, অয়র্ল্যাণ্ড ও ওয়েল্সের স্থানীয় ভাষা ইংরেজি সাধু ভাষা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে ইংরেজির উপভাষাও বলা যায় না। উক্ত ভাষাসকলের প্রাচীন সাহিত্যও স্বল্পবিস্তৃত নহে। কিন্তু ইংরেজের বল জয়ী হওয়ায় প্রবল বৃটিশ ভাষাই বৃটিশ দ্বীপের সাধুভাষা রূপে গণ্য হইয়াছে। এই ভাষার ঐক্যে বৃটিশ জাতি যে ঐক্য ও বললাভ করিয়াছে, ভাষা পৃথক থাকিলে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইত না।
>
> ভারতবর্ষেও যে যে সমশ্রেণীয় ভাষার একীভবন স্বাভাবিক অথবা স্বল্পচেষ্টাসাধ্য, সেগুলিকে এক হইতে দিলে আমাদের ব্যাপক ও স্থায়ী উন্নতির পথ প্রসর হইত। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪৭)

শিশিরকুমার দাশ রবীন্দ্রনাথকে লেখা 'একটি খোলা চিঠি' নামের পত্রপ্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত মতের তীব্র সমালোচনা করেছেন (শিশির ১৯৯৯)। তিনি লক্ষ করেছেন, এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা, ইংরেজি বা অসমিয়া-ওড়িয়া সম্পর্কে যতগুলো অনুমান করেছেন, তার কোনোটিই শতবর্ষ পরে ঠিক প্রমাণিত হয়নি। তা নাও হতে পারে। কিন্তু

বাংলার প্রান্তীয় উপভাষাগুলোর ব্যাপারে এতটা মনোযোগী রবীন্দ্রনাথ দুটি জনগোষ্ঠীর ভাষার দাবিকে ফ্যাসিবাদী কায়দায় নস্যাৎ করে দিয়েছেন – ভাবা যায় না। শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন:

> বাংলা সাহিত্যের পক্ষে যা শুভজনক ওড়িয়া ও অসমীয়ার পক্ষেও তা শুভজনক একথা অবশ্য ওড়িয়া ও অসমীয়াভাষীরা মানেননি । আপনি যাকে স্থানীয় ভাষা বলে ঈষৎ উপেক্ষা করেছেন তা বহু লক্ষ মানুষের মাতৃভাষা এবং সে ভাষায় কয়েক শতাব্দীব্যাপী সাহিত্যচর্চা হয়েছে। অতএব একদল শিক্ষিত যুবকের বাংলার আধিপত্যের প্রতিবাদকে শুধু ইংরেজসৃষ্ট কৃত্রিম উৎসাহ ও উত্তেজনা মনে করা তথ্যভিত্তিক হবে না। আপনি যখন 'চোখের বালি' রচনায় ব্যস্ত তখনই ফকিরমোহন সেনাপতি 'ছ মান আঠ গুণ্ঠ' উপন্যাস রচনা করছেন। আপনি যখন এই প্রবন্ধ রচনা করছেন তখনই কলকাতা শহরে বসে কয়েকজন যুবক অসমীয়া সাহিত্যের এক যুগের সূত্রপাত করেছেন। সেই যুবকদের একজন আপনার এক ভ্রাতুস্পুত্রীর স্বামী। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তাঁর মাতৃভাষাপ্রীতি আপনাদের কাছে সস্নেহে তিরস্কৃত হয়েছিল। (শিশির ১৯৯৯: ১৪৩-৪৪)

আরেকবার রবীন্দ্রনাথ ভাষার জাতীয়তাবাদী ব্যবহারের বরাতে তাঁর ভাষা-দৃষ্টির মূল সুর লঙ্ঘন করেছিলেন – 'সফলতার সদুপায়' (১৩১১) প্রবন্ধে। নেপাল মজুমদার এ প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে লিখেছেন:

> তখন গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা যে ভাষার মাধ্যমে প্রচলিত ছিল, তাহা ছিল অত্যন্ত দুরূহ সংস্কৃতায়িত। সেই কারণে উহার সংস্কারের প্রশ্ন উঠে। সরকার এই উদ্দেশ্যে একটি তদন্ত কমিটি বসাইলেন। ... এই তদন্ত-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে বাংলাদেশে তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল। কলিকাতায় জেনারেল এ্যাসেমব্লি হলে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে প্রতিবাদ-সভা হয় (১৩১১, ফাল্গুন ২৭) তাহাতে রবীন্দ্রনাথ 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। (নেপাল ১৯৮৩: ২০০)

এ প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, তারা নিশ্চয়ই কৃষক-বিরোধী নয়; অথচ সেখানে কৃষকের পাঠ্যপুস্তক কৃষকের ভাষায় লেখা হয় না। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার ভিন্নতার বরাতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন জাতিকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। পাঠ্যপুস্তকের ভাষার সঙ্গে গ্রামবাংলার মানুষের অপরিচয়ের অভিযোগও তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার চৈত্র ১৩১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে লিখেছেন: 'পুরাণপাঠ, কীর্তন, পৌরাণিক যাত্রা, কথকতা, তরজা, কবির লড়াই প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের সাধারণ লোকের উপদেশ ও আমোদের উপকরণ, সমস্তই স্বভাবতই সংস্কৃতকথাকে দেশের সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত দেশের সাধারণের এই জ্ঞানসম্বন্ধের ভাবসম্বন্ধের পথ চিরদিন অবারিত আছে' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/২: ৮৮৭)। নেপাল মজুমদার রবীন্দ্রনাথের এ অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সে-যুগে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ দেশের অন্যান্য নেতৃবর্গের মতো জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নটিই বড়ো করিয়া দেখিতেছিলেন' (নেপাল ১৯৮৩: ২০১)।

বস্তুত, বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাবের আগের বছর ইংরেজের বিভাজননীতির বিরোধিতা রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসাবে হয়ত ঠিকই ছিল। কিন্তু ভাষাপ্রশ্নে একে জাতীয়তাবাদী অবস্থানই বলতে হবে। 'ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি'র অভাব এই অবস্থানের কারণ নয়। তার প্রমাণ এই যে, 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি'র চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে, এমন বেশ কিছু রচনা

তিনি ১৯০৪ সালের আগেই লিখেছিলেন। লক্ষণীয়, ভাষা-জাতীয়তাবাদকে বৈধ করতে গিয়েই তাঁকে বলতে হয়েছে, সংস্কৃতায়িত বাংলার মধ্য দিয়ে জাতীয়ভাবের ঐক্য রক্ষিত হচ্ছে। অথচ, আগের বা পরের ভাষা-বিষয়ক রচনাবলিতে তাঁর মূল বক্তব্যই ছিল, এই কৃত্রিম বাংলা জনবিচ্ছিন্নতার দোষে দুষ্ট। 'ভাষাবিচ্ছেদ' (১৩০৫) প্রবন্ধেও তিনি প্রায় একই যুক্তিতে সংস্কৃতায়নের সমর্থন করেছেন। বলেছেন, সাধু বাংলা সংস্কৃতায়িত ওড়িয়া-অসমিয়ার প্রায় সমরূপ। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান দাবি ও যুক্তি ছিল সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে ভারতের প্রাকৃত ভাষাগুলোকে ক্রমশ সমরূপ করে তোলা। ভারত-রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে এ যুক্তি নানারূপে এখনো শোনা যায়। কিন্তু ওই দুই 'জাতীয়তাবাদী' মুহূর্ত বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ সবসময়েই সর্বভারতীয় বা অন্য কোনো দাবিতে বাংলার সংস্কৃতায়নের ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন।

ভারত-রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ যখন রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দির দাবি মেনে নিয়েছেন (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬১০-১১), তখনো তিনি বাংলাসহ ভারতের অন্য প্রাকৃত ভাষাগুলোর ব্যাপারে কোনো আপোস করেননি:

> ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেইদিন য়ুরোপের বড়ো দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়ো দিনের অপেক্ষা করব – সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬১১)

সাহিত্যের পথে গ্রন্থের 'সভাপতির অভিভাষণ' (১৩৩০) প্রবন্ধেও তিনি ভাষাপ্রশ্নে 'ভারতীয় ঐক্যে'র যুক্তি বাতিল করে দিয়েছেন (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১২: ৫২৩-২৪)।

৫.৪.৪ সাহিত্যের ভাষা

উপনিবেশ আমলে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন এক বলিষ্ঠ সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে প্রধানত কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে। পশ্চিমা সাহিত্য-সংস্কৃতি-মূল্যবোধের সংস্পর্শে কলকাতায় গড়ে ওঠা নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিই এই সাহিত্যধারার প্রধান ভিত্তি। ইংরেজি সাহিত্যকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের (২.৬.৫ দ্রষ্টব্য) কারণেই সম্ভবত সাহিত্য ও সাহিত্যকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড অনেক বেশি মূল্য পেয়েছে। ঔপনিবেশিক সমাজের গড়ন-অনুযায়ী এ অবস্থা অবশ্য অস্বাভাবিক নয় (৪.৪.৩.৩ দ্রষ্টব্য)। উপনিবেশিত সমাজে জ্ঞান, মূল্যবোধ, রুচি ইত্যাদির জোগান কেন্দ্র থেকেই আসে। বাস্তব সমাজে তার গভীর কোনো প্রতিফলন না থাকায় এক ধরনের আদর্শ সমাজের কল্পনা উপনিবেশিত সুবিধাভোগী শ্রেণির মধ্যে বিকশিত হয়। এ অবস্থার প্রতিফলনের জন্য সাহিত্যই সবচেয়ে ভালো মাধ্যম। অন্যভাবে বলা যায়, সাহিত্যেই কেবল সেই 'অনুপস্থিত' আদর্শ সমাজের বাস্তবায়ন সম্ভব।[২০]

সে ক্ষেত্রে উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের জনকল্যাণ বা দেশহিতৈষণার একটা ছক দাঁড়িয়েছিল এ রকম: ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষায় অর্জিত জ্ঞান আর মূল্যবোধ প্রতিফলিত হবে সাহিত্যে, আর সাহিত্যের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়বে জনসাধারণের মধ্যে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু কিংবা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে চিন্তার এ কাঠামো বারবার ঘোষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও তার প্রবল অনুবর্তন দেখা যায়।[২১]

রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক যুগকে নতুন বাঙালির নবযুগ বলেই মেনে নিয়েছেন। এর দোষ-ত্রুটি দূর করে ক্রমশ স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণের প্রধান অবলম্বন সাহিত্য। *সাহিত্য* গ্রন্থের 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' (১৩০২) প্রবন্ধে তিনি লোকহিতের উৎস এবং উপায় নির্দেশ করেছেন এভাবে:

> শিক্ষাদ্বারা আমাদের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা যে অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে বাংলা ভাষা ব্যতীত তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। শিখিয়া যদি কেবল সাহেবের চাকরি ও আপিসের কেরানিগিরি করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম তাহা হইলে কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু শিক্ষায় আমাদের মনে যে কর্তব্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছে তাহা লোকহিত। জনসাধারণের নিকট আপনাকে কর্মপাশে বদ্ধ করিতে হইবে, সকলকে শিক্ষা বিতরণ করিতে হইবে, সকলকে ভাবরসে সরস করিতে হইবে, সকলকে জাতীয় বন্ধনে যুক্ত করিতে হইবে।
>
> দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের অবলম্বনব্যতীত এ কার্য কখনো সিদ্ধ হইবার নহে। আমরা পরের হস্ত হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি দান করিবার সময় নিজের হস্ত দিয়া তাহা বন্টন করিতে হইবে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৪: ৭০৪)

লোকহিতের এই 'অবরোহী পন্থা' ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিরই বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথ সে বাস্তবতাকে জাতীয় ঐক্য আর দেশের উন্নতির কাজে যথাসম্ভব খাটাতে চেয়েছেন। *সাহিত্যের পথে* বইয়ের 'সাহিত্যসম্মিলন' (১৩৩৩) নিবন্ধে লিখেছেন, 'বাঙালি একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে, ইহা তাহার সাহিত্য। ... এইরূপ একটি সাধারণ প্রীতির সামগ্রী সমগ্র জাতিকে যেরূপ স্বাভাবিক ঐক্য দেয় এমন আর কিছুই না' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১২: ৫২৯)। একই প্রবন্ধে তিনি আবার লিখেছেন, 'বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের আদানে প্রদানে জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১২: ৫৩২)। এ কথাগুলো রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন হিন্দু-মুসলমান ভেদ এবং সেখান থেকে মুসলমানদের ভিন্নভাষার প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে। অন্য আরো নানা প্রসঙ্গে নানা জায়গায় তিনি একই যুক্তি ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই সাহিত্যের ভাষা এবং বিশেষত কাব্যের ভাষা নিয়ে বিস্তর লিখেছেন। বলেছেন, 'মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬০৩)। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি ভাষার এই দুই সূক্ষ্ম ব্যবহারের কিছু দিক বিশ্লেষণ করেছেন। একাদশ পরিচ্ছেদে পরিচয় দিয়েছেন ছন্দের। *ছন্দ* গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় বাংলা ছন্দের গভীর কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি আশ্চর্য মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এর মধ্যে বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক কথা এই যে, কাব্যের ভাষা আর গদ্যের ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ ফারাক আছে। 'ভাষাকে ছন্দে-ওজন-করা পদে বিভক্ত করতে গেলে তার মধ্যে স্বাভাবিক কথা বলার নিয়ম খাটে না, ক্রমে তার একটা বিশেষ রীতি বেঁধে যায়। ... কতকগুলি পুরোনো শব্দ ও রীতি থেকে যায়, ছন্দের আশ্রয় পেয়ে যারা কালের বদল মানে না' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৬১৫)। তাই কাব্যের ভাষায় প্রচলিত ভাষার ব্যতিক্রম সম্ভব। কিন্তু গদ্যে সম্ভব নয়। সত্য যে, 'স্বভাবতই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ এবং বিশিষ্ট হইয়া থাকে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১২)। তাতে কৃত্রিমতা দেখা দেয়। কিন্তু প্রাণরক্ষার তাগিদেই তাকে বারবার ফিরে আসতে হয় মুখের ভাষার আঙিনায়:

> সকল দেশেই বিশিষ্টতার বিলাসে ক্ষণে ক্ষণে সাহিত্য কৃত্রিমতার বন্ধ্যদশায় গিয়া উত্তীর্ণ হয়। তখন তাহাকে আবার কুলরক্ষার লোভ ছাড়িয়া প্রাণ রক্ষার দিকে ঝোঁক দিতে হয়। সেই প্রাণের খোরাক কোথায়? সাধারণের ভাষার মধ্যে,

> যেখানে বিশ্বের প্রাণ আপনাকে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রকাশ করিতেছে। ইংরেজি সাহিত্যিক ভাষা প্রথমে পণ্ডিতের ভাষা ল্যাটিন এবং রাজভাষা ফরাসির একটা কৌলিন্য খিচুড়ি ছিল, তারপরে কুল ছাড়িয়া যখন সে সাধারণের ঘরে আশ্রয় লইল তখনি সে ধ্রুব হইল। কিন্তু তারপরেও বারে বারে সে কৃত্রিমতার দিকে ঝুঁকিয়াছে। আবার তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাধারণের জাতে উঠিতে হইয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৩)

কিন্তু বাংলা সাহিত্যিক গদ্য এই স্বাভাবিক সূত্র মেনে তৈরি হয়নি। 'মুখের বুলির পথ' আর 'পুঁথির বুলির পথ' 'দুই বহরের পথ' হয়ে বাংলা ভাষায় চালু আছে। তাতে, রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্যিক ভাষাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে: 'বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুলপরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদ্ভাবিত বলিয়া ... বাংলাপদবিন্যাস প্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৯৩)। একই সঙ্গে প্রাকৃত বাংলাও যথেষ্ট প্রকাশক্ষম হয়ে উঠছে না: 'নিত্য ব্যবহারের ভাষা সাহিত্যে ব্যবহার করি না বলিয়া [তাহার] পরিচয় আমাদের কাছে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, যখনি শক্তিশালী সাহিত্যিকেরা এই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবেন তখনি ইহা পরিব্যক্ত হইয়া উঠিবে, সেটাতে কেবল ভাষার উন্নতি নয়, দেশের কল্যাণ' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১)। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেশের উন্নতি ও কল্যাণ চান, তার জন্য উপযুক্ত নয় বলেই তিনি উপনিবেশিত সাহিত্যিক বাংলার এত বিরোধী। তিনি চান লেখার বাংলার সঙ্গে মুখের বাংলার ব্যবধান যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে। এ ধরনের চর্চার বাস্তব উদাহরণ হিসাবে বারবার ইংরেজি সাহিত্যের উল্লেখ করেন:

> এ কথা সত্য ইংরেজিতেও মুখের ভাষায় এবং লেখার ভাষায় একেবারে ষোল-আনা মিল নেই। কিন্তু মিলটা এতই কাছাকাছি যে পরস্পরের জায়গা অদলবদল করতে হলে মস্ত একটা লাফ দিতে হয় না। কিন্তু বাংলায় চলতি ভাষা আর কেতাবী ভাষা একেবারে এপার ওপার – ইংরেজিতে সেটা ডান হাত বাঁ হাত মাত্র – একটাতে দক্ষতা বেশি আর-একটাতে কিছু কম – উভয়ে একত্রে মিলে কাজ করলে বেমানান হয় না। আমি কোনো কোনো বিখ্যাত ইংরেজ লেখকের ডিনার-টেবিলের আলাপ শুনেছি, লিখে নিলে ঠিক তাঁদের বইয়ের ভাষাটাকেই পাওয়া যেত, অতি সামান্যই বদল করতে হত। এই জাতিভেদের অভাবে ভাষার শক্তিবৃদ্ধি হয় আমার তো এই মত। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৯-৩০)

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে যেমন চরম মূল্য দিয়েছেন তেমনি ভাষানির্মাণ প্রশ্নে সাহিত্যিকদেরও দিয়েছেন উঁচু মর্যাদা। হকেট দেখিয়েছেন (1968: 563-64), বড় সাহিত্যিকেরা ভাষার ছাঁচ গড়ে দেয় এবং পরের প্রজন্মের কথার জোগান দেয় বলে একটা ধারণা চালু আছে। এ ধারণা অনেক পণ্ডিতেরও স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। কিন্তু এ এক বিভ্রান্তিকর ধারণাই বটে। তাঁর মতে, এ মত-পোষণকারী পণ্ডিতেরা ভাষার উপরিতলের ফেনায় অতিরিক্ত মন দিয়েছেন, গভীর কাঠামো বা স্তরকে অবজ্ঞা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে,

> The 'architects' of our language are not literary artists, but the masses of people who use the language for everyday purposes. The greatness of literary artists is not measured in terms of his stylistic novelty – if he does not operate within the body of shared conventions which constitute ordinary language, he can hope only for a short faddistic following – but by the extent to which he can develop freedom and variety of expression *within* the constraints imposed by the language. So far as language is concerned, the greatest of literary artists is infinitely more a recipient than a donor. (Hockett 1968: 564)

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সাধারণভাবে প্রচলিত মতেরই প্রতিফলন পাওয়া যায়। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে নতুন ভাব এবং নতুন ভাষার প্রবর্তনার ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে একক কৃতিত্ব দিয়েছেন (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬০৮)। অন্যত্র, *চারিত্রপূজা* গ্রন্থের 'বিদ্যাসাগরচরিত' (১৩০২) প্রবন্ধেও বিদ্যাসাগর-প্রশ্নে তাঁর অনুরূপ মতের প্রকাশ ঘটেছে (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/২: ৮২০)। অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের মন্তব্যে আসলে সাহিত্যিক ভাষার কথাই বলা হয়; আর সাহিত্যিক ভাষার ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্যের বিশেষ মূল্যও আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভাষার ক্ষেত্রে ব্যক্তির মূল্য আসলে অতি নগণ্য। ওই 'বিদ্যাসাগরচরিত' প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ এক চকিত মন্তব্যে ভাষার এই নিরাসক্ত প্রবহমানতার বৈশিষ্ট্যটি সূক্ষ্মভাবে শনাক্ত করেছেন:

> বিশেষ গ্রন্থ অথবা চিত্র অথবা মূর্তি চিরকাল আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আপন রচনাকর্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোট বড়ো অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবনলাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরূপে কাহারো নাম ঘোষণা করে না। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/২: ৮২০)

উপনিবেশিত জ্ঞানকাণ্ডের প্রচণ্ডতার মধ্যে এ ধরনের চিরন্তন উপলব্ধির জোরেই রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তাঁর কালের সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন।

৫.৫ বাংলা ভাষা সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত

আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষাচিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর কালের বাস্তবতা দ্বারা কেবল প্রভাবিতই হননি, অনেক ক্ষেত্রে চালিতও হয়েছেন। আরো দেখানো হয়েছে, প্রধানত ভাষার ব্যবহারকারী হিসাবে নিজের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা আর ভাষাকে বড়মাপের কাজে খাটানোর উপযোগী করে তোলার প্রেরণা থেকেই তিনি সমকালীন প্রভাবশালী নানা মত-পথ থেকে সরে এসেছেন বা আসতে পেরেছেন। অন্য কোনো ভাষার বা ভাষাতত্ত্বের কাঠামো তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিল না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার গতিপথ সরলরৈখিক নয়। লেখ্যভাষার ইতিহাসের একটা ধারাবাহিকতা থাকে। কলকাতায় মুদ্রণ-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা আর সাহিত্যিক গদ্যের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে সেই ধারাবাহিকতায় যথেষ্ট শক্তিও সঞ্চিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে এই শক্তির সঙ্গে অনবরত সমঝোতা করে এগোতে হয়েছে। সেই সমঝোতার দুটি দিক। একদিকে তাঁর নিজের সাহিত্যকর্ম, যেখানে যে কোনো সৃষ্টিশীল লেখকের মতো তিনিও উৎপাদক ও ভোক্তার বিদ্যমান সংস্কৃতির অধীন।[২২] অন্যদিকে আছে ভাষা-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত নানা ধারণা। দুই দিকেই তাঁর লড়াই চলেছে। তাঁর ভাষা-বিষয়ক রচনাবলির একটা বড় অংশ যে কলমযুদ্ধের রূপ পেয়েছে, তার কারণ বিরোধী মত-পথের শক্তিমত্তা। সমকালীন পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে অন্যদের ভিন্নমতে পরীক্ষিত হয়ে তাঁর সিদ্ধান্তগুলো পরিস্রুত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

৫.৫.১ বাংলা আসলে প্রাকৃত ভাষা

বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যথার্থ বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা নয়'। আগে বহুবার বলা কথাটা তিনি এখানে আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন মাত্র। বাংলা গদ্যের উপনিবেশায়নের ইতিহাস মনে না রাখলে এ কথার আসলে কোনো অর্থ হয় না। কারণ বাংলা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা নয়, তা তো জানা কথা। কিন্তু সমকালীন বাংলা ভাষাচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা বারবার উচ্চারণ করা রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনীয় ভেবেছেন।

শুধু উচ্চারণই নয়, 'প্রাকৃত বাংলা' কথাটার নানা তাৎপর্য এবং দরকারি কেজো দিকের বিশ্লেষণ করে তাঁর বাংলা ভাষাচিন্তায় কথাটাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠাও দিয়েছেন।

প্রাকৃত বাংলা বলতে রবীন্দ্রনাথ আদতে কী বোঝাতে চেয়েছেন, তার মূল পরিচয় আছে তাঁর ভাষা-বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। তবে 'প্রাকৃত ও সংস্কৃত' (১৩০৮) প্রবন্ধে তিনি তার সংজ্ঞাও ঠিক করে দিয়েছেন:

> পুরাকালে যখন গ্রন্থের ভাষা, পণ্ডিতদের ভাষা, সাধারণ-কথিত ভাষা হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল তখন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই পৃথক নামের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন যাহা সংস্কৃত ছিল এবং তখন যাহা প্রাকৃত ছিল তাহাই বিশেষ রূপে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে বাচ্য।
> এখনো বাংলায় লিখিত ভাষা কথিত ভাষা হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ আকার ধারণ করিতেছে। আমরা যদি ধাতুগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণ-কথিত বাংলাকে প্রাকৃত বলি তাহা হইলে লিখিত গ্রন্থের বাংলাকে সংস্কৃত বলিতে হয়। বস্তুত এখনকার কালের প্রাকৃত ও সংস্কৃত ইহাই।
> ... যদি প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ বাংলা শব্দের পূর্বে বিশেষণরূপে জুড়িয়া ব্যবহার করা হয়, যদি লিখিত বাংলাকে 'সংস্কৃত বাংলা' ও কথিত বাংলাকে 'প্রাকৃত বাংলা' বলা যায়, তাহা হইলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৩৯-৪০)

দেখা যাচ্ছে, উপনিবেশ আমলে ব্যাকরণ-অভিধান প্রণয়ন আর গদ্যের বিশেষ ধরনের চর্চার মধ্য দিয়ে যে সাধু বাংলা – রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সংস্কৃত-বাংলা – গড়ে উঠেছিল, তার সাপেক্ষে এবং তার বিপরীতেই 'প্রাকৃত বাংলা' কথাটা দাঁড়িয়েছে।[২৩] সে ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য বোঝার জন্য 'সাধু বাংলা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বুঝে নেওয়া জরুরি।

ছন্দ গ্রন্থে সংকলিত জে. ডি. অ্যান্ডার্সনকে লিখিত পত্রে সাধু বাংলা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'বাংলা হসন্তবর্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোটা গোলগাল; চর্বির স্তরে তাহার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেছে, এবং তাহার চিক্কণতা যতই থাক্, তাহার জোর অতি অল্পই' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১১: ৬৩৮)। এখানে সাধু বাংলাকে 'হসন্তবর্জিত' আখ্যা দেওয়ায় বোঝা যায়, সাধুরীতি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে ভাষার গভীরতর কিছু রদবদল হয়েছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবি রেখে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রধান আপত্তিটা সাধুরীতির সার্বিক দুর্বলতায়। অর্থাৎ, যে কাজে তিনি ভাষাকে খাটাতে চান, সাধুরীতি মোটেই সে কাজের উপযুক্ত নয়। এ ব্যাপারে তাঁর অন্য আপত্তি এই যে, সাধুরীতি তার কৃত্রিম পোশাক পরার কালে বাংলা ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 'অসাধুতা' করেছে। 'বানান-বিধি' (১৩৪৪) শিরোনামের লেখায় তিনি এই অসততার দিকগুলো তুলে ধরেছেন:

> সংস্কৃত বাংলা অর্থাৎ যাকে আমরা সাধুভাষা বলে থাকি তার মধ্যে তৎসম শব্দের চলন খুবই বেশি। তাছাড়া সেই-সব শব্দের সঙ্গে ভঙ্গির মিল করে অল্প কিছুকাল মাত্র পূর্বে গড়-উইলিয়মের গোরাদের উৎসাহে পণ্ডিতেরা যে কৃত্রিম গদ্য বানিয়ে তুলেছেন তাতে বাংলার ক্রিয়াপদগুলিকে আড়ষ্ট করে দিয়ে তাকে যেন একটা ক্লাসিকাল মুখোশ পরিয়ে সান্ত্বনা পেয়েছেন; বলতে পেরেছেন, এটা সংস্কৃত নয় বটে, কিন্তু তেমনি প্রাকৃতও নয়। যা হোক, ওই ভাষা নিতান্ত অল্পবয়স্ক হলেও হঠাৎ সাধু উপাধি নিয়ে প্রবীণের গদিতে অচল হয়ে বসেছেন। অন্ধভক্তির দেশে উপাধির মূল্য আছে। ... আমাদের দেশে পূর্বতন আদর্শ খুব বিশুদ্ধ। বানানের এমন খাঁটি নিয়ম পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় আছে বলে জানি নে। সংস্কৃত ভাষা খুব সূক্ষ্ম বিচার করে উচ্চারণের প্রতি বানানের সদ্ব্যবহার রক্ষা করেছেন। একেই বলা

> যায় honesty, যথার্থ সাধুতা। বাংলা সাধুভাষাকে honest ভাষা বলা চলে না, মাতৃভাষাকে সে প্রবঞ্চনা করেছে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬৯)

তাহলে সাধু বাংলা বা সংস্কৃত-বাংলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অতি স্পষ্ট। বাংলা ভাষার মূল-স্বভাবকে তা অগ্রাহ্য করেছে; আর অগ্রাহ্য করেও বা করার ফলেই এর শক্তি-সামর্থ্যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিপরীতে প্রাকৃত বাংলার শক্তি তার নিত্য পরিবর্তনশীলতা আর লোকব্যবহারের নিত্যতা। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছু সূক্ষ্ম ব্যাপারে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেগুলো দৈনন্দিন ভাববিনিময়ের দরকারে ভাষাভাষীরা স্বাভাবিকভাবে তৈরি ও ব্যবহার করে থাকে। কথা বলার সময়ে মানুষ কেবল শব্দে ভাব প্রকাশ করে না। 'কথার সঙ্গে সঙ্গে সুর থাকে, হাতমুখের ভঙ্গী থাকে'। একদিকে কথার অর্থ আরেকদিকে ইঙ্গিত – এ দুই মিলে ভাবটি সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত হয়। 'আমাদের ভাষারও মধ্যে সুর এবং ইশারা স্থানলাভ করিয়াছে। অর্থবিশিষ্ট শব্দের সাহায্যে যে-সকল কথা বুঝিতে দেরি হয় বা বুঝা যায় না, তাহাদের জন্য ভাষা বহুতর ইঙ্গিত-বাক্যের আশ্রয় লইয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১২৩)। সাধু বাংলা মুখের ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে না বলে ভাষার এই সূক্ষ্ম সম্পদ থেকে চিরবঞ্চিত। তার অভিধান-ব্যাকরণে, রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, এই ইঙ্গিত-বাক্যগুলি স্থান পায় না। অথচ বাংলা ভাষা – রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রাকৃত বাংলা' – এ ক্ষেত্রে খুবই ধনী।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বাংলা ভাষায় এই ইঙ্গিত-বাক্যের ব্যবহার যত বেশি, এমন আর কোনো ভাষায় আছে বলিয়া আমরা জানি না' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১২৩-২৪)। শুধু পরিমাণে নয়, তাৎপর্যের দিক থেকেও বাংলার ইঙ্গিতমূলক শব্দের বিশিষ্টতা ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। অনুকরণমূলক শব্দ অন্য ভাষাতেও আছে। কিন্তু বাংলায় এ ধরনের অনেক শব্দ 'বাস্তব ধ্বনির অনুকরণ নহে, অনেক সময়ে ধ্বনির কল্পনা মাত্র'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দাবি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেছেন:

> মাথা দব্‌দব্‌ করিতেছে, টন্‌টন্‌ করিতেছে, কন্‌কন্‌ করিতেছে প্রভৃতি শব্দে বেদনাবোধকে কাল্পনিক ধ্বনির ভাষায় তর্জমা করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, শূন্য ঘর গম্‌গম্‌ করিতেছে, ভয়ে গা ছমছম করিতেছে, এগুলিকে অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বিস্তারিত করিয়া বলিতে হয় এবং বিস্তারিত করিয়া বলিলেও ইহার অনির্বচনীয়তাটুকু হৃদয়ের মধ্যে তেমন অনুভবগম্য হয় না; এরূপ স্থলে এই প্রকার অব্যক্ত অস্ফুট ভাষাই ভাবব্যক্ত করিবার পক্ষে বেশি উপযোগী। একটা জিনিসকে লাল বলিলে তাহার বস্তুগুণ সম্বন্ধে কেবলমাত্র একটা খবর দেওয়া হয়, কিন্তু লাল টুক্‌টুক্‌ করিতেছে বলিলে সেই লাল রঙ আমাদের অনুভূতির মধ্যে কেমন করিয়া উঠিয়াছে, তাহাই একটা অর্থহীন কাল্পনিক ধ্বনির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করা যায়। ইহা ইঙ্গিত, ইহা বোবার ভাষা। বাংলা ভাষায় এইরূপ অনির্বচনীয়তাকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টায় এই প্রকারের অব্যক্ত ধ্বনিমূলক শব্দ প্রচুররূপে ব্যবহার করা হয়। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১২৪)

কিন্তু সাধু বাংলা কথ্য-বাংলার এই অভাবনীয় সূক্ষ্মতার ভাগ পায়নি। চায়নি বলেই পায়নি। ফলে তার প্রকাশের বৈচিত্র্য আর সূক্ষ্মতা অর্জিত হয়নি। এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল, সাধু বাংলা কথ্য-বাংলার সম্পদ ব্যবহারে অপারগ। অন্যত্র বাংলা ছন্দের আলোচনায় তিনি প্রাকৃত বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিগুণ, প্রাণচঞ্চল সুর আর নিপুণ গতিধর্মের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, সাধুরীতির ধার করা কৃত্রিমতা প্রাকৃত বাংলার এসব সম্পদকে অবহেলা করে ক্ষতির শিকার হয়েছে:

> বাংলাভাষারও নিজের একটা বিশেষ ধ্বনিস্বরূপ আছে। তার ধ্বনির এই চেহারা হসন্তবর্ণের যোগে। যে বাংলা আমাদের মায়ের কণ্ঠগত, জ্যেষ্ঠতাতের লেখনীগত নয়, ইংরেজির মতো তারও সুর ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাতে। আজ সাধুভাষার ছন্দে জোর দেবার অভিপ্রায়ে অভিধান ঘেঁটে যুক্তবর্ণের আয়োজনে লেগেছি, অথচ প্রাকৃতবাংলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১১: ৬০৮)

সাধু বাংলার রূপ-রীতি, ব্যবহার ও সামর্থ্যের চেয়েও গভীর এক অভাবের কথা বলা হল এখানে, যা প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতিগত ঐশ্বর্য। ভদ্রসাহিত্যে এ ঐশ্বর্য অব্যবহৃত থাকা বা এমনকি বিকৃত হওয়া যে একে ধ্বংস করতে পারেনি, তার কারণ – রবীন্দ্রনাথের মতে – 'আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায়' এ ছন্দ-ধ্বনি-সুর চিরকাল ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[২৪]

প্রাকৃত বাংলার শব্দভাণ্ডারও তার সমৃদ্ধির উৎস। সে শব্দের জাতকুল বিচার করে না; প্রাণের তাগিদে ব্যবহারিক প্রয়োজনে শব্দ সংগ্রহ করে। 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি' (১৩৪১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা' হিসাবে এর এই গ্রহিষ্ণু প্রাণবানতাই তার শব্দ-সমৃদ্ধির কারণ: 'এইজন্যে সংস্কৃত বলো, ফার্সি বলো, ইংরেজি বলো, সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে। ... প্রাকৃত-বাংলাকে গুরুচণ্ডালি দোষ স্পর্শই করে না। সাধু ছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশোল সয় না' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১১: ৬১০-১১)।[২৫] অন্যদিকে আছে ধ্বন্যাত্মক শব্দের মতো নানা ধরনের 'অভিধান-তিরস্কৃত' শব্দ, যেগুলো প্রাকৃত বাংলার অতুলনীয় বর্ণনাশক্তির উৎস।

এতসব ঐশ্বর্য সত্ত্বেও প্রাকৃত বাংলা সব ধরনের ভাব প্রকাশে যথেষ্ট সামর্থ্যের প্রমাণ রাখতে পারেনি। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের মতে, এ বাংলা ভদ্রসমাজে এখনো ঠিকমত ব্যবহৃতই হয়নি। পুরোনো কালে এদেশে 'যাঁরা চিন্তা করিয়াছেন তাঁরা বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ। তাঁরা প্রধানত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল। তাঁদের শিক্ষা এবং ব্যবসা, দুইয়েরই অবলম্বন ছিল সংস্কৃত পুঁথি। এইজন্য ঠিক বাংলা ভাষায় মনন করা বা মত প্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। তাই সেকালের গদ্য উচ্চচিন্তার ভাষা হইয়া উঠিতে পারে নাই' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪)। অন্যদিকে উপনিবেশ আমলেও অন্যভাবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। 'পুঁথির ভাষার' সঙ্গে 'কথার ভাষার' মিলন ঘটল না: 'এরা সহোদর অথচ এদের মধ্যে ঘটেছে শ্রেণীভেদ; একটি হলেন সাধু, আর-একটি হলেন অসাধু। এই শ্রেণীভেদের কারণ ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৮)। ভাষা তৈরি হয়, তাঁর মতে, চিন্তার মাপে। চিন্তামূলক রচনায় প্রাকৃত বাংলা ব্যবহারের ধারাই গড়ে ওঠেনি। তাই প্রাকৃত বাংলার এই 'অসামর্থ্যে'র জন্য এ ভাষার কোনো আভ্যন্তর-বৈশিষ্ট্য দায়ী নয়, অ-ব্যবহারের ইতিহাসই দায়ী। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সে কথাই বলেন: 'পাশ্চাত্য জাতিদের ভাষায় এই সদর-অন্দরের বিচার নেই। তাই সেখানে সাহিত্য পেয়েছে চলনশীল প্রাণ, আর চলতি ভাষা পেয়েছে মননশীল ঐশ্বর্য। আমাদের ঘোমটা টানার দেশে সেটা তেমন করে প্রচলিত হয় নি; কিন্তু হবার বাধা বাইরের শাসন, স্বভাবের মধ্যে নয়' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৯: ৬১২)।

বাংলা ভাষা বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে 'প্রাকৃত বাংলা' কথাটি ব্যবহার করেছেন, তার অন্তত তিন ধরনের তাৎপর্য চিহ্নিত করা সম্ভব।

এক. উপনিবেশিত বাংলা গদ্যের অতি-নিরূপিত কৃত্রিম গদ্যের 'অপর' হয়ে যে বাংলা লোক-ব্যবহারে বা নানা ধরনের প্রান্তীয় রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে, তা-ই প্রাকৃত বাংলা। ঐতিহাসিক বিচারে একে উপনিবেশিত বাংলা গদ্যের বিপরীতে বি-উপনিবেশিত বাংলা গদ্যের প্রস্তাব বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে 'সাহেব', 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' আর 'গড় উইলিয়ম'কে

সাধু বা সংস্কৃত-বাংলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন, তাতে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না।

দুই. প্রাকৃত বাংলাই আসলে বাংলা ভাষা। ভাষা হিসাবে বাংলার স্বাতন্ত্র্য, নিজস্ব গড়ন ও ধরন, প্রাণশক্তি আর চলিষ্ণু সজীবতাকেই তিনি নাম দিয়েছেন প্রাকৃত বাংলা। তাই এ বাংলা অ-নিরূপিত হবে, খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল হবে; কিন্তু সুশৃঙ্খল কৃত্রিম কোনো 'ভাষারূপ' এর বিকল্প হতে পারে না। উপমাটি তিনি দিয়েছেন সোনার সীতা আর সজীব সীতার সঙ্গে। বিমলনারায়ণ চৌধুরীর পত্রের উত্তরে লেখা 'বাংলার বানান-সমস্যা' (১৩৩৯) নামের নিবন্ধে লিখেছেন:

> কেউ কেউ বলেন প্রাকৃত বাংলা ব্যবহারে যখন এত উচ্ছৃঙ্খলতা তখন ওটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পণ্ডিতি বাংলার শরণ নেওয়াই নিরাপদ। তার অর্থ এই যে, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করার চেয়ে কাঠের পুতুলের সঙ্গে ব্যবহারে আপদ কম। ... সোনার সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রের সংসার চলে নি। নিকষ এবং তৌলদণ্ডের যোগে সেই সীতার মূল্য পাকা করে বেঁধে দেওয়া সহজ, কিন্তু সজীব সীতার মূল্য সজীব রামচন্দ্রই বুঝতেন, তাঁর রাজসভার প্রধান স্বর্ণকার বুঝতেন না, কোষাধ্যক্ষও নয়। আমাদের প্রাকৃত বাংলার যে মূল্য, সে সজীব প্রাণের মূল্য ...। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬১)

রবীন্দ্রনাথ এখানে 'পণ্ডিতি বাংলা'য় সন্তুষ্ট ব্যবহারকারীদের যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন; কারণ একটি নিরূপিত ছকের মধ্যে ভাষা ব্যবহার করলে নিরাপত্তা ও আরামের যে অনায়াস জোগান পাওয়া যায়, তা তাঁরা হারাতে চান না। বোঝা যায়, তাঁর কাছে প্রাকৃত বাংলার ব্যাপারটা নিছক তত্ত্বীয় উপলব্ধি নয়, 'ভাষাপ্রেম' নয় – ভাষার সজীব প্রাণশক্তির সুযোগ নিয়ে অধিকতর মুনাফা হাসিলের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

তিন. প্রাকৃত বাংলা কথাটার নানামাত্রিক ব্যবহার ও বিশ্লেষণে এমন একটা তত্ত্ব দাঁড়িয়ে যায়, যা শেষ পর্যন্ত শুধু বাংলা ভাষার মধ্যেই সীমিত থাকে না – যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে ওঠে। কোনো ভাষার সাহিত্যিক বা মননশীল ব্যবহার প্রাত্যহিক ভাষার ছোঁয়া এড়িয়ে বিশিষ্ট মানরূপ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু সেই রূপকেই 'ভাষা' বলে চিহ্নিত করা যায় না। 'ভাষা' থাকে তার প্রাকৃত রূপে – প্রাত্যহিক ব্যবহারে।

৫.৫.২ সাধু ও চলিত বাংলা

সাধু বাংলা বনাম প্রাকৃত বাংলার বিরোধ রবীন্দ্রনাথের লেখায় এক পর্যায়ে সাধু-চলিত বিরোধে রূপ নেয়। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে তিনি চলিত ভাষাই ব্যাখ্যা করেছেন। ভূমিকায় চলিত ভাষাকে তিনি প্রাকৃত বাংলা বলেছেন: 'এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা'। কিন্তু এর পরেই আলোচ্য চলিত ভাষার যে সংজ্ঞায়ন করেছেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, আগের প্রাকৃত বাংলা আর এই চলিত বাংলা মোটেই এক বস্তু নয়: 'সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে। এই প্রাকৃতেরই স্বভাব বিচার করেছি এই বইয়ে'। তাহলে এ বাংলা প্রাকৃত বাংলার এক বিশেষ রূপ, যা ব্যবহৃত হয় সাহিত্যিক বাংলা হিসাবে।

অবশ্য সাধুরীতির বিপরীতে চলিতের প্রতি তাঁর পক্ষপাত প্রাকৃত বাংলার মতোই। চলিতরীতির যে পরিচয় তিনি নানা জায়গায় দিয়েছেন, তার সঙ্গেও প্রাকৃত বাংলার বিস্তর মিল। যেমন, 'বাংলায় চলতি ভাষা বহুকাল ধরে জায়গা

পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকানো আঙিনার পাশে যেখানে সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসীতলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬১১)। আরো বলেছেন, 'চলিত ভাষার চলার বিশ্রাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না। ... আমাদের মুখরিত দিনরাত্রির সব কথা ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬১১-১২)। এ বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর বর্ণিত প্রাকৃত বাংলারই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাৎপর্য বিচারে এ দুইয়ের ফারাকও গভীর।

সাধুর সঙ্গে চলিতের যে পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ স্থির করেছেন, তাতেই প্রাকৃত বাংলার সঙ্গে চলতির পার্থক্যটা বোঝা যায়। যেখানে সাধু বা সংস্কৃত-বাংলার সঙ্গে প্রাকৃত বাংলার জল-অচল ভেদ, সেখানে সাধুর সঙ্গে চলিতের পার্থক্য কেবল সর্বনাম ও ক্রিয়ার রূপে – শব্দ-নির্বাচনের ব্যাপারে চলিতের বিশেষ বাছবিচার নেই:

> সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাত নিয়ে। 'হচ্ছে' 'করছে'কে যদি জলচল করে নেওয়া যায় তাহলে জাতঠেলাঠেলি অনেকটা পরিমাণে ঘোচে। উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিঘ্ন ঘটিয়েছিল, এইটে থেকেই সর্ববংশধ্বংসের উৎপত্তি। এর ক্রিয়া কটাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধু ভাষার ভঙ্গী দিলেই কালীসিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। ... আজ সমাজের উপর তলায় নীচের তলায় ভাষাব্যবহারে আর্য-অনার্যের মিশোল চলেছে। ... এটা হতে পেরেছে তার কারণ, সীমাসরহদ্দ নিয়ে মামলা করে না চলতি ভাষা। স্বদেশী বিদেশী হালকা ভারী সব শব্দই ঘেঁষাঘেষি করতে পারে তার আঙিনায়। সাধু ভাষায় তাদের পাসপোর্ট মেলা শক্ত। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬১২-১৩)[২৬]

তার মানেই হল, এই চলিত ভাষা হচ্ছে লেখ্য-বাংলার এক বিশেষ ধরন যেখানে কথ্য-লেখ্যের মিলমিশ ঘটেছে। যে 'সাধুভাষা সর্বসাধারণের ভাষার সঙ্গে জল-চল বন্ধ করে কোণ-ঘেঁষা হয়ে বসেছিল', তা কথ্য উপাদানগুলোকে অল্প অল্প করে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। আবার লেখ্য-বাংলার প্রভাবে কথ্য-বাংলারও পরিবর্তন ঘটেছে। 'এক ভাষার দুই অঙ্গের মধ্যে অতি বেশি প্রভেদ থাকলে সেই অস্বাভাবিক পার্থক্য মিটিয়ে দেবার জন্যে পরস্পরের মধ্যে কেবলি রফা চলতে থাকে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৯)। এভাবে 'এখন আমরা মুখের কথাতেও নূতন পুরাতন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি আবার পুঁথির ভাষাতেও এমন শব্দ চলিতেছে পূর্বে সাধু ভাষায় যাদের জল-চল ছিল না' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৬-৭)। এই বর্ণনা থেকে রবীন্দ্রনাথের চলিতরীতি-সম্পর্কিত চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। তাঁর চলিতরীতি অবরোহী পন্থায় পাওয়া এক ভাষারূপ, যা সংস্কৃতায়িত লেখ্যরূপ থেকে ক্রমে ক্রমে নিচের দিকে নেমে এসে ভদ্রলোকশ্রেণির কথ্যভাষার সঙ্গে এক ধরনের আপোস করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে। ভাষাচিন্তার ক্ষেত্রে বহুক্ষেত্রে, বলা যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, আরোহী পদ্ধতির প্রস্তাব রাখলেও এবং নিজে ব্যাকরণের কাজ করার সময়ে সেভাবে করলেও এই প্রস্তাবে তার উলটা কথা আছে। সম্ভবত সমকালীন লেখ্যভাষা-পরিস্থিতির সঙ্গে এ তাঁর এক কার্যকর ও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন আপোসরফা।

৫.৫.৩ বাংলা ও সংস্কৃত

উপনিবেশ আমলের গোড়ায় বাংলা ভাষার গড়াপেটায় ইংরেজি ও সংস্কৃত – দুইই ব্যবহৃত হয়েছিল (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। পরে বাংলাচর্চার কর্তৃত্ব স্থানীয়দের হাতে আসার পর ইংরেজি অন্তত প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থেকে বাদ পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতের আধিপত্যই নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে বাংলা ভাষার একটা লেখ্যরূপ দাঁড়িয়ে যায়, ব্যাকরণ-অভিধানের চর্চাও সে মোতাবেক চলতে থাকে। উনিশ শতকের শেষ দিকে অনেকেরই মনে হতে থাকে, সংস্কৃতের আধিপত্যে আর ছাঁচে বাংলা ভাষার সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (1990) সমস্যাটির বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেন। পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীসহ আরো কেউ কেউ প্রায় একই ধারায় নিজেদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেন। এঁদের সবারই মূল দাবি ছিল বাংলা ভাষার 'স্বাধীনতা' ও 'স্বায়ত্তশাসন' রক্ষা করা। বিপরীতে সংস্কৃতপন্থীদের বিরাট দল সংস্কৃতজ ভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে কলম চালিয়েছিলেন। তাঁদের প্রচারণার ভিত্তি ছিল মূলত দুটি। এক. সংস্কৃতের সন্তান হিসাবে বাংলা সংস্কৃতের সমৃদ্ধ ব্যাকরণ-অভিধানের উত্তরাধিকারী। তাই সংস্কৃতের নিয়ম বাংলায় চালালে বাংলারও সমৃদ্ধি ঘটবে। দুই. আগের একশ বছরের চর্চায় সাধু গদ্যের যে রূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তা-ই বাংলা গদ্যের তথা লেখ্যরূপের মূল আদর্শ। এই দুই পক্ষের – প্রায়শই 'বাংলাপন্থী' ও 'সংস্কৃতপন্থী' নামে চিহ্নিত – মত-মতান্তর দীর্ঘসময় জুড়ে বাংলা ভাষাচর্চার মূল বিষয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষাচর্চা এই বিতর্কের সমকালীন শুধু নয়, তাঁর বাংলা ভাষা-বিষয়ক রচনাবলির মূলছকও এ বিতর্ককে কেন্দ্রে রেখে নির্মিত হয়েছে। তাতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সংস্কৃতপন্থীদের সবচেয়ে প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থের 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন:

> সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তার তদ্ধিত প্রত্যয় পর্যন্ত লইতে গেলে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও অনেকটা অংশ আপনি আসিয়া পড়ে। সুতরাং দুই নৌকায় পা দিবামাত্রই যে টানাটানি বাধিয়া যায় তাহা ভালো করিয়া সামলাইতে গেলে সাহিত্য-সার্কাসের মল্লগিরি করিতে হয়। তার পর হইতে এ তর্কের আর কিনারা পাওয়া যায় না যে, নিজের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বাধীন অধিকার কতদূর এবং তাহাতে সংস্কৃত শাসনের সীমা কোথায়। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৫)

এখানে 'বাংলা ভাষার স্বাধীন অধিকার' আর 'সংস্কৃত শাসনের সীমা' নির্ধারণের সমস্যার কথা বলা হয়েছে। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের সংশ্লিষ্ট-রচনার একটা বড় অংশ এই সমস্যার সমাধানে ব্যয়িত হয়েছে।

এর অংশ হিসাবে বাংলা ও সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্যগত ফারাকের কথা তাঁকে বারবার লিখতে হয়েছে। বাংলা কারক-বিভক্তি যে সংস্কৃতের মতো নয়, অন্য অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথও সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে: 'সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদানকারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১০৬-০৭)। একই প্রবন্ধে অনেকগুলো বাংলা বাক্য আর সেগুলোর সংস্কৃত অনুবাদ বিশ্লেষণ করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: 'সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে এ-সকল বাক্য সাধা অসাধ্য, বাংলা ভাষার নিয়মে এগুলিকে পরিত্যাগ করা ততোধিক অসাধ্য' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১০৮)। অর্থাৎ, বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের আভ্যন্তর-বৈশিষ্ট্যে অমিল এত প্রকট যে সংস্কৃতের ছাঁচে বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণ সুষ্ঠুভাবে হতে পারে না। অন্যত্র *ছন্দ* গ্রন্থের 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃত ও বাংলার – তাঁর ভাষায়, 'প্রাকৃত বাংলা'র – ধ্বনিগত পার্থক্য নির্দেশ করেছেন:

> বাংলা চলতি ভাষার মূল সংস্কৃত শব্দের অনেকগুলি স্বরবর্ণই কোনোটা আধখানা কোনোটা পুরোপুরি ক্ষয়ে যাওয়াতে ব্যঞ্জনগুলো তাল পাকিয়ে অত্যন্ত পরস্পরের গায়ে-পড়া হয়ে গেছে। স্বরের ধ্বনিই ব্যঞ্জনের ধ্বনিকে অবকাশ দেয়, তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে; সেগুলো সরে গেলেই ব্যঞ্জনধ্বনি পিণ্ডীভূত হয়ে পড়ে। চলিত এবং চল্‌তি, ঘৃণা এবং ঘেন্না,

> বসতি এবং বস্‌তি, শব্দগুলো তুলনা করে দেখলেই বোঝা যাবে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির দাক্ষিণ্য, আর প্রাকৃত-বাংলায় তার কার্পণ্য, এইটেই হল দুটো ভাষার ধ্বনিগত মূল পার্থক্য। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১১: ৫৮৭)

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উপাদানের ব্যাপক উপস্থিতি ও ব্যবহার সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। কিন্তু উপাদান ভাষার মূলকাঠামোর ওপর আধিপত্য করবে – এ দাবিকে যুক্তিসম্মত মনে করেননি। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষার বাংলা অংশকে 'অঙ্গ' আর সংস্কৃত অংশকে 'বস্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন। এ 'বস্ত্র' যে অতি মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ, 'মানুষ বরঞ্চ দেহত্যাগ করিতে রাজি হইবে তবু বস্ত্র ত্যাগ করিতে রাজি হইবে না'; কিন্তু 'তবু বস্ত্র তাহার অঙ্গ নহে এবং তাহার বস্ত্রতত্ত্ব ও অঙ্গতত্ত্ব একই তত্ত্বের অন্তর্গত নহে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১২২)। ঐতিহাসিক বাস্তবতার কারণে বাংলা ভাষার 'বস্ত্রতত্ত্ব' বড় হয়ে উঠেছিল 'অঙ্গতত্ত্বে'র চেয়ে। এমনকি কখনো কখনো 'বস্ত্রতত্ত্ব'ই ঘোষিত হচ্ছিল 'অঙ্গতত্ত্ব'-রূপে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি। তিনি সবসময়ে চেয়েছেন বাংলাকে পৃথক ভাষা হিসাবে গণ্য করার স্বীকৃতি।[২৭] খুবই সরল-স্বাভাবিক চাওয়া, যদিও উপনিবেশিত বাংলা ভাষার সেই পরিস্থিতিতে এই সামান্য কথাটা প্রকাশ করতে, তাঁর ভাষায়, 'প্রচুর পরিমাণে বীররসের প্রয়োজন' হত (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১২২)।

কেবল তত্ত্ব হিসাবে বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য-স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল না। সংস্কৃতপন্থীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের মূল কারণ সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের আধিপত্য বাংলা ভাষাচর্চায় নানা বাস্তব সংকট তৈরি করছে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধ থেকে একটা অংশ পড়া যেতে পারে:

> ইংরেজি ভাষা *laugh, smile, grin, simper, chukle* করিয়া নানাবিধ আনন্দ কৌতুক ও বিদ্রুপ প্রকাশ করে; বাংলা ভাষা খলখল করিয়া, খিলখিল করিয়া, হোহো করিয়া, হিহি করিয়া, ফিক্ ফিক্ করিয়া, ফিক্ করিয়া এবং মুচকিয়া হাসে। মুচকে হাসির জন্য বাংলা অমরকোষের কাছে ঋণী নহে। মচ্‌কান শব্দের অর্থ বাঁকানো, বাঁকাইতে গেলে যে মচ্ করিয়া ধ্বনি হয় সেই ধ্বনি হইতে এই কথার উৎপত্তি। উহাতে হাসিকে ওষ্ঠাধরের মধ্যে চাপিয়া মচকাইয়া রাখিলে তাহা মুচকে হাসি রূপে একটু বাঁকাভাবে বিরাজ করে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১২৫)

এখানে দেখা যাচ্ছে, হাসির নানা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা প্রকাশের সামর্থ্য বাংলা ভাষার আছে। এখন *অমরকোষে* না থাকার দোহাই দিয়ে যদি এ শব্দগুলোকে পরিহার করা হয় – যেমন করা হয়েছে উনিশ শতক ও বিশ শতকের গোড়ার প্রায় সব ব্যাকরণ-অভিধানে – তাহলে ভাবপ্রকাশের দিক থেকে বাংলা দুর্বল হবে। আবার যদি, এর মধ্যে এক বা একাধিক শব্দ 'শুদ্ধ' রূপে গৃহীত হয়, তাহলে শব্দগুলোর ব্যাখ্যা তালাশ করা হবে সংস্কৃত উৎসে এবং কোনো-না-কোনোভাবে সংস্কৃতের সঙ্গে তাকে সম্পর্কিত করা হবে। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কাণ্ডজ্ঞান থেকেই বহু শব্দের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব। সাহিত্যিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভাষার এ সংকট উপলব্ধি করেছেন – নিজস্ব উপাদান বাদ দেওয়া আর আরোপিত শুদ্ধতার জাল তৈরির সংকট:

> ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে। সংস্কৃতভাষার জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড়-হাত দুই-হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা আছে তাহা আমরা ভুলিয়া

> গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি তাহাতে সাধু লোকেরা ছি ছি করিয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১১: ৬৩৮)

কিন্তু সমস্যাটা কেবল সাহিত্যিক ভাষার নয়। সাধারণ ব্যবহারকারীদের লেখ্য-বাংলায়ও সংস্কৃত আপন অধিকারের সীমা প্রসারিত করে রাখে। ফলে বাংলা ভাষার ব্যবহার-ক্ষেত্র সীমিত হয়ে আসে। সংস্কৃতের এই আধিপত্যের কারণে বাংলা ভাষার সর্বজনীন ব্যবহার যে অসম্ভব হয়ে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ তাও লক্ষ করেছেন:

> বাংলা ভাষার মুশকিল হইয়াছে এই যে ইহাকে একভাষা বলিয়া গণ্য করিলে চলে না। বাংলা শিখিতে হইলে সংস্কৃতও শিখিতে হইবে। সেও সকলে পারিয়া উঠে না – মাতৃভাষা বলিয়া নির্ভয়ে আবদার করিতে যায়, শেষকালে মাতামহীর কোপে পড়িয়া বিপন্ন হয়। মাতা ও মাতামহীর চাল স্বতন্ত্র, এক ব্যাকরণে তাঁহাদের কুলায় না। এ অবস্থায় হতভাগ্য বাঙালির চলে কি করিয়া, পরম পণ্ডিত না হইলে সে কি নিজের ভাষাও ব্যবহার করিতে পারিবে না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৫১)

এ ধরনের বাস্তব ও গভীর সংকটের কারণেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃতের আধিপত্যের বিরোধিতা করেছেন। সংস্কৃত ভাষার ব্যাপারে তাঁর বিরাগ কোথাও প্রকাশিত হয়নি;[২৮] সংস্কৃতপন্থী বাংলা চর্চাকারীরাই তাঁর আক্রমণের শিকার হয়েছেন। প্রথমদিকে সাধু বা সংস্কৃত-বাংলার প্রবল প্রতাপের যুগে সংস্কৃতপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বহরও চওড়া ছিল, আক্রমণের সুরও তীব্র ছিল। চলিতরীতি চালু হওয়ার পর, ক্রমশ লেখ্য-বাংলায় কথ্য-বাংলার প্রবেশ ঘটতে থাকলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত-বাংলা আর প্রাকৃত বাংলায় এক ধরনের সমঝোতার প্রস্তাবই তাঁর লেখায় প্রধান হয়ে ওঠে। আক্ষরিক এবং প্রতীকী – দুই অর্থেই তাঁর এই অবস্থানের পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে 'ভাষার কথা' প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অংশে:

> সংস্কৃত ভাষা যে অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। বাংলাকে সংস্কৃতের সন্তান বলিয়াই যদি মানিতে হয় তবে সেই সঙ্গে এ কথাও মানা চাই যে তার ষোল বছর পার হইয়াছে, এখন আর শাসন চলিবে না, এখন মিত্রতার দিন। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৭)

টীকা

১. ভারতীয়দের পক্ষ থেকে কলকাতার ভদ্রসমাজ বারবার ইংরেজ-শাসনের প্রতি নিজেদের জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেছে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই সমর্থনেরই নিশ্চয়তা দিয়েছেন: 'এ-পর্যন্ত ভারত-অধিকার-কার্যে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়দের নিকট হইতে ইংরাজের আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। দেড়শত বৎসর পূর্বেই যখন কারণ ছিল না বলিলেই হয়, তখন এখনকার তো আর কথাই নাই' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৫: ৬৮১)। এ ধরনের সমর্থনের পেছনে রানির প্রজা হিসাবে খোদ ইংল্যান্ডের প্রজাদের মতো সুশাসন পাওয়ার ইচ্ছাই মূলত কাজ করেছে।

২. বর্ণবাদই রবীন্দ্রনাথের কাছে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রধান সমস্যা। একে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তর্নিহিত কোনো বৈশিষ্ট্য মনে করেন না। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের কুফলগুলোর পেছনে বর্ণবাদী মনোভাবকে প্রধান কারণ বলে শনাক্ত করেন। *রাজা প্রজা* বইয়ের 'রাজনীতির দ্বিধা' (১৩০০) প্রবন্ধে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক উপনিবেশের 'সাধারণ' অভিজ্ঞতা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে:

> য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য, যত সদয়, যত ন্যায়পর, বাহিরে ততটা নহে, এ-পর্যন্ত ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাহারা খৃস্টানদের নিকট খৃস্টান, অর্থাৎ গালে চড় খাইলে সময়বিশেষে অন্য গালটিও ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়, তাহারাই স্থানান্তরে গায়ে পড়িয়া অখৃস্টানের এক গালে চড় মারিয়া তাহাকে অন্য গাল ফিরাইতে বলে ... সভ্য খৃস্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অস্ট্রেলিয়ায় কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি-যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, অখৃস্টানের গালে খৃস্টানি চড় কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৫: ৬৯৩)

৩. 'দেশের কথা' (১৩১১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, 'ইংরাজের আদর্শ আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল। স্বদেশের সকল দিক হইতে আমাদের হৃদয় বিমুখ হইতেছিল। মুখে আস্ফালন করিয়া যাহাই বলি আমাদের অন্তঃকরণ বলিতেছিল, বিলাতি সভ্যতার মত সভ্যতা আর নাই।' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৫: ৮৪৮) – তখন তিনি এক ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নকেই শনাক্ত করেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে এ ক্ষেত্রে বি-উপনিবেশায়নের একটা প্রক্রিয়া চলছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজে তার অন্যতম সক্রিয় কর্মী ও ভাবুক।

৪. বিমলনারায়ণ চৌধুরীর পত্রের উত্তরে লেখা পত্র-নিবন্ধে (১৩৩৯) রবীন্দ্রনাথ আবার বাংলা ভাষার উপনিবেশায়নের প্রসঙ্গটি সামনে এনেছেন। এখানে শুধু শুরুর কথাই বলেননি, এ প্রক্রিয়ার ফল আর অব্যাহত অনুসৃতিরও উল্লেখ করেছেন:

> বিদেশী রাজার হুকুমে পণ্ডিতেরা মিলে পুঁথিতে আধুনিক গদ্য-বাংলা পাকা করে গড়েছে। অথচ গদ্যভাষা যে-সর্বসাধারণের ভাষা, তার মধ্যে অপণ্ডিতের ভাগই বেশি। পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালাই করলেন সেটা হল অত্যন্ত আড়ষ্ট। বিশুদ্ধভাবে সমস্ত তার বাঁধাবাঁধি – সেই বাঁধন তার নিজের নিয়মসংগত নয় – তার ষত্ব ণত্ব সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ফরমাসে। সে হঠাৎ বাবুর মতো প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজেকে বনেদী বংশের বলে প্রমাণ করতে। যারা এই কাজ করে তারা অনেক সময়েই প্রহসন অভিনয় করতে বাধ্য হয়। কর্নেলে গবর্নরে পণ্ডিতি করে মূর্ধন্য ণ লাগায়, সোনা পান চুনে তো কথাই নেই। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬০)

৫. 'রবীন্দ্রনাথের – যাঁর প্রবর্তনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ ব্যাপারে সংস্কারের ভার দেওয়া হয় – ছিলো পাণ্ডিত্য ও দীর্ঘ ঈ-কার এই দুই ব্যাপারে স্পষ্ট অ্যালার্জি। এই দ্বিবিধ অ্যালার্জির কারণে তাঁর দেওয়া মতামতে সর্বত্র সুবিবেচনা দৃষ্টিগোচর হয় না।' (কেতকী ২০০৫: ৩১১)

৬. পারিবারিক পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের লেখার ভাষায়ও যে বিশিষ্টতা এনেছিল, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর এক মন্তব্যে। রচনাবলীর 'অবতরণিকা'য় (১৯৩১) তিনি লিখেছেন, 'আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গি ছিল কলকাতার লোকে যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১: ১১)। প্রবোধচন্দ্র ঘোষের মতে, 'রবীন্দ্রনাথের ভাষা শুধু তাঁর নিজ ভাষা নয়, ঠাকুরবাড়ির ভাষাও বটে' (প্রবোধ ১৯৬৮: ১৫০)।

৭. নগুগি ওয়া থিওঙ্গো উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষায় উপনিবেশক-ভাষা ব্যবহারের গভীর সংকট ব্যাখ্যা করেছেন (Thiong'o 2007: 12-17)। তাঁর মতে, ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, সংস্কৃতিরও বাহন। ফলে কোনো ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে তার ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং জগত ও জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক – সবই ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত। ভিন ভাষায় শিক্ষা শুরু হলে শিশুর নিত্যজীবন আর অন্তর্জগতের সঙ্গে পঠিত বিষয়ের বিরোধ তৈরি হয়। ফলে শিক্ষার স্বাভাবিকত্ব ক্ষুণ্ন হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে যেসব যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেছেন, তার সঙ্গে থিওঙ্গোর বিবৃতির প্রায় আক্ষরিক সাদৃশ্য আছে।

৮. জাপানের শিক্ষাব্যবস্থাও একই কারণে তাঁর সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৯৩২) প্রবন্ধে এ সম্পর্কে লিখেছেন: 'জাপানে বিদ্যাকে সত্য করে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করলে না। সর্বজনের ভাষার ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বজনের ক'রে তুললে; শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে চিত্তপ্রসারের পথ অবাধ প্রশস্ত হয়ে উঠল। তাই আজ সেখানে সমস্ত দেশে বুদ্ধির জ্যোতি অবারিতভাবে দীপ্যমান'। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৬: ৩১৫)

৯. লিখিত উপাত্তের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল এই উৎসগুলো থেকে উপাত্ত সংগ্রহের প্রশ্ন আসে। রবীন্দ্রনাথ মূলত কাজ করেছেন এ সবের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁর বিচারে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ আর অভিধানই তৈরি হয়নি। ব্যাকরণ সম্পর্কে বলেছেন, 'প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২০)। ১৩০৮ সালে অভিধান প্রসঙ্গেও বলেছেন একই কথা: 'আজ পর্যন্ত বাংলা অভিধান বাহির হয় নাই' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৮৯)। অন্যদিকে অভিধান প্রসঙ্গে দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা এক পত্রে (১৩৪৪) কথাটা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন: 'প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয় নি, কেননা, আজও তার প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারে নি'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৯)

১০. বাংলা ভাষাবিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবেই বর্ণিত হন। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের (১৯৯৪: ৪৩৭) মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে: 'বিস্ময়ের বিষয় এই যে যাঁকে আমরা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং বাংলা ভাষার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি বলে জানি, সেই কবি রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার বর্ণনাভিত্তিক আলোচনার জনক এবং পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন'। হুমায়ুন আজাদ তাঁকে চিহ্নিত করেছেন বাংলা ভাষার 'বিশ শতকের প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী' হিসাবে (হুমায়ুন ২০০২: ৭৪২)।

১১. সোস্যুর ভাষার কাঠামো আর উপাদানগুলোর কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করেছেন দাবা খেলার উপমায়। দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই উপমার নিজস্ব ভাষ্য তৈরি করে লিখেছেন:

> আপনারা যাঁরা *শতরঞ্জ কি খিলাড়ি* দেখেছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে মির্জা সাজ্জাদ আলি আর মির রোশন আলির দাবা খেলার কথা। কিন্তু মির্জার বিবি খুরশীদের আবার দাবা খেলায় খুবই বিরাগ। তিনি দাবার ঘুঁটি সরিয়ে রাখেন। গজদাঁতের বা কাঠের ঘুঁটি যখন অলভ্য হয়ে উঠল তখন সুপুরি আঙুর আপেলই হয়ে উঠল ঘুঁটি। কতরকম কাঁচামাল দিয়েই তো তৈরি হতে পারে দাবার ঘুঁটি – হাতির দাঁত, প্লাস্টিক, মাটি মায় আবহাওয়া পারমিট করলে বরফের ঘুটি দিয়েও তো খেলা চালানো যায়। কিন্তু এত শত কাঁচামাল বদলে গেলেও খেলা চলে কিসের জোরে? খেলা চলে আকারগত নিয়মকানুনের জোরে। একেই বলব আকার বা গড়ন: এটাই ভাষার প্রাণভোমরা – আসলি মাল! আর কাঁচামাল/উপাদান যাচ্ছেতাই অবাধ চিহ্নমাত্র – তার বেশি কিছু নয়। (দেবপ্রসাদ ২০০৬: ১২৯)

১২. বাংলা ও সংস্কৃতের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য নিরূপণে এবং সেই পার্থক্য ও সম্পর্ক ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রমথ চৌধুরীর কথায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিফলন দেখা যায়। 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' প্রবন্ধে প্রমথ লিখেছেন:

> ভাষার দেহের পরিচয় অভিধানে, এবং তার গঠনের পরিচয় ব্যাকরণে। সুতরাং বাংলা এবং সংস্কৃতে আকৃতিগত মিল থাকলেও জাতিগত কোনোরূপ মিল নাই। প্রথমটি হচ্ছে analytic, দ্বিতীয়টি inflectional ভাষা। সুতরাং বাংলাকে সংস্কৃতের অনুরূপ করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে আমরা যে বঙ্গভাষার জাতি নষ্ট করি, শুধু তাই নয়, তার প্রাণবধ করবার উপক্রম করি। ... ভাষামাত্রেরই তার আকৃতি ও গঠনের মতো একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, এবং প্রকৃতিস্থ থাকার উপরই তার শক্তি এবং সৌন্দর্য নির্ভর করে। বঙ্গভাষার সেই প্রকৃতির বিশেষ জ্ঞানের অভাববশতই আমরা সে ভাষাকে সংস্কৃত করতে গিয়ে বিকৃত করে ফেলি। (প্রমথ ২০০৯: ২৬৩)

রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণের ধরন ও আলোচনার গতি দেখে কখনো কখনো মনে হয়, উপনিবেশিত বাংলা গদ্যের বিরুদ্ধে যুক্তি তৈরি করতে গিয়েই তিনি বাংলা ভাষার নিজস্ব ও বিশিষ্ট প্রকৃতিটি আবিষ্কার করেছিলেন।

১৩. রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিষয়ক রচনাবলিতে শৃঙ্খলার অভাব আছে; কিন্তু তাঁর মত ও বিশ্লেষণ যে বিশৃঙ্খল তা নয়। রচনার বিশিষ্টতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিক পাঠে বিভ্রান্তির বিপদ আছে। কেউ চাইলে এ পাঠজনিত বিভ্রান্তিকে তাঁর মতের দুর্বলতা হিসাবেও পড়তে পারেন। যেমন, দেবপ্রসাদ ঘোষ 'প্রাকৃত বাংলা' অভিধায় আপত্তি তুলেছেন:

> ঠিক্ কি অর্থে যে আপনি 'প্রাকৃত' বাঙ্গালা কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন আপনার প্রবন্ধে এবং পত্রে, তাহা আমি সব সময়ে বুঝিতে পারি নাই। একটু যেন loosely কথাটা ব্যবহৃত হইয়াছে মনে হইল। কোন সময়ে মনে হয় যে, বাঙ্গালা ভাষাকেই আপনি 'প্রাকৃত' বাঙ্গালা বলিয়াছেন; কোন সময়ে মনে হয় যে, বাঙ্গালা ভাষার অ-সংস্কৃত অংশকে আপনি প্রাকৃত বাঙ্গালা বলিয়াছেন; আবার কোন সময়ে মনে হয় যে, ভাষার যে মৌখিক (colloquial) রূপ আজকাল বহুল পরিমাণে সাহিত্যে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকেই আপনি 'প্রাকৃত' বাঙ্গালা বলিয়াছেন। (দেবপ্রসাদ ১৯৯৭: ১৭১)

মনীন্দ্রকুমার ঘোষও রবীন্দ্রনাথের 'প্রাকৃত বাংলা' পরিভাষা ব্যবহারের গোলমাল শনাক্ত করেছেন (মনীন্দ্র ১৪০৯: ২৭)। এঁদের এই অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। অথচ 'প্রাকৃত বাংলা'র ধারণা রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার মূল আশ্রয়। অতএব, এ ব্যাপারে কার্যকর পাঠের জন্য এক ধরনের সমন্বিত পাঠের বিকল্প নেই।

১৪. ভাষার এই প্রাণধর্ম বা জীবধর্মকে অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ 'মর্ম' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই মর্ম, তাঁর মতে, ভাষাভাষীরা ধরতে পারে বিনা আয়াসেই। কিন্তু বিভাষীরা ব্যাকরণের শিক্ষায় অনেকসময়েই তা ধরতে ব্যর্থ হন। 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ'

(১৩০৫) প্রবন্ধে তিনি বীম্‌সের বিরুদ্ধে এই ব্যর্থতারই অভিযোগ এনেছেন। ভাষার ব্যাকরণগত ভুল আর মর্মগত ভুল সম্পর্কে লিখেছেন:

> আমাদের ইস্কুলে-শেখা ইংরেজিতে ভুল হইবার প্রধান কারণ এই যে, সে-বিদ্যা পুঁথিগত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজি ভাষার ঠিক মর্মগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এইজন্য অনেক খাঁটি ইংরেজের ন্যায় তাঁহারা হয়তো ব্যাকরণে ভুল করিতেও পারেন, কিন্তু ভাষার প্রাণগত মর্মগত ভুল করা তাঁহাদের পক্ষে বিরল। এদেশে থাকিয়া যাঁহারা ইংরেজি শেখেন, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যাকরণকে বাঁচাইয়াও ভাষাকে বধ করিতে ছাড়েন না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৫২)

১৫. 'এমন না-মানার একটি প্রমাণ – তিনি বাংলা ক্রিয়াপদের যে বিরাট লিস্টি তৈরি করেছিলেন তাতে এমন শব্দ প্রচুর যা এখনো আমাদের কলমে আসেনি, অপর থেকে গেছে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেগুলো ব্যবহার করেননি কিন্তু ব্যবহারযোগ্য ভেবেছিলেন।' (দেবেশ ২০০৩: ১১)

১৬. রবীন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্যিক ভাষা পরীক্ষা করলে তাঁর এ ধরনের 'রুচি'র কার্যকারণ বোঝা যায়। প্রবোধচন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্রনাথের ভাষার এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে গুণ সহজেই নজরে পড়ে তা হচ্ছে প্রসাদগুণ ও প্রসন্নতা। ... এরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত রয়েছে তাঁর ভাষার শুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা। গ্রাম্যতা, অশ্লীলতা বা অশালীনতা এ ভাষায় একেবারেই নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষা হচ্ছে পরিস্রুত রুচি বা সংস্কৃতির একটি সামগ্রিক প্রকাশ।
>
> কিন্তু এর ফলে রসপ্রকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রয়োগ অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে যে কয়েকটি রসের উল্লেখ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ও সাহিত্যে তার সব কয়টি মেলে না, কয়েকটির শুধু আংশিক অবতারণা দেখা যায়। আদিরস ও করুণরসই তাঁর ভাষার মূল জীবিকা; রুদ্ররস বিরল, বীভৎস রস তো একেবারেই নেই। বাংলা সাহিত্যেও এসব রস বড় দুষ্প্রাপ্য। (প্রবোধ ১৯৬৮: ১৫৫)

তিনি এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের পরিশুদ্ধ নাগরিক ভাষা যে কতক পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের নবরুচির ফল তাতে সন্দেহ নেই' (প্রবোধ ১৯৬৮: ১৫৩)। ঠাকুরবাড়ির ভাষার বিশিষ্টতা – যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শনাক্ত করেছেন – এই বিশিষ্ট রুচিবোধের অপর উৎস।

১৭. সাপির ভাষার সঙ্গে জাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির সম্পর্ক প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'Historians and anthropologists find that races, languages, and cultures are not distributed in parallel fashion, that their areas of distribution intercross in the most bewildering fashion, and that the history of each is apt to follow a distinctive course.' (Sapir 2004:171) স্পষ্টতই রাজনৈতিক অর্থে তো নয়ই, এমনকি সাংস্কৃতিক অর্থেও ভাষা ও জাতি সমার্থক নয়। উনিশ শতকের লেখালেখিতে 'বাঙালি' কথাটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে, দেবেশ রায়ের মতে, বাংলাভাষী বিপুল জনগোষ্ঠীর বদলে ইংরেজিশিক্ষিত শ্রেণির বিশেষ গোষ্ঠীচিন্তাই প্রাধান্য পেয়েছে (দেবেশ ১৯৯০: ২৯০)। তা সত্ত্বেও বাংলাভাষীদের সামষ্টিকভাবে সম্বোধনের রেওয়াজটি ছিল, এবং এর একটা কার্যকরতাও ছিল।

১৮. এই জনগোষ্ঠী নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়ে বিশেষভাবে শনাক্তযোগ্য সত্তা হিসাবে সম্বোধিত হয়নি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> India, and the people of India, are defined as the 'Other' of European. Sometimes it is the Bengali, sometimes the Hindu; sometimes Bankim is talking of the *bharatvarsiya*, the inhabitants of India. There is no attempt here to define the boundaries of Indian nation *from within*. The definition of the Bengali, the Hindu or the Indian of the 'Other', the 'subject', is then extrapolated backwards into the historical past. (Chatterjee 1993: 55)

এই বিশ্লেষণ মোটের ওপর অন্য লেখকদের ক্ষেত্রেও যথার্থ।

১৯. বাংলার সঙ্গে অসমিয়া বা ওড়িয়ার গভীর সাদৃশ্যহেতু এ দুই অঞ্চলে বাংলা ভাষা চালুর আবদার মোটেই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মত নয়। সেকালে কলকাতায় এ মত অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। দীনেশচন্দ্র সেন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর উড়িয়া-সাহিত্যের ভাষার সহিত বর্তমান বাঙ্গলা ভাষার যে সান্নিধ্য, তাহা ত্রিপুরা, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশের কথিত ভাষার সহিত আধুনিক কালের লিখিত বাঙ্গলার অপেক্ষা ন্যূন নহে। গঙ্গা-বংশের রাজত্বকালে বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। সম্প্রতি – একশ বৎসরও হয় নাই, আসামী ভাষাকে বাঙ্গলা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে, তৎপূর্বে বাঙ্গলাই আসামের রাজদরবার ও বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত ছিল। (দীনেশ ২০০৬: ১৭-১৮)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা-অসমিয়া-ওড়িয়া আদতে একই ভাষা: 'Bengali and Assamese are practically one language, when a comparison is instituted among the Magadhan speeches; and Oriya is most closely related to Bengali-Assamese.' (Chatterji 2002: 91)

২০. রবীন্দ্রনাথসহ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যে রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শের প্রবল প্রতাপ, অতীতপ্রীতি এবং জীবনের আদর্শায়িত উপস্থাপনার ঝোঁক দেখা যায়, তার সঙ্গে এই ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ (৪.৪.৩.৩ দ্রষ্টব্য)। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর *বাঙালী জীবনে রমণী* বইতে এ বাস্তবতার সুন্দর পরিচয় আছে।

২১. চিন্তা ও তৎপরতার সাহিত্যকেন্দ্রিকতা একদিকে বাংলাভাষীদের জীবনদৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে, অন্যদিকে লেখ্য-বাংলার গড়ন আর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে সীমাবদ্ধ করেছে। প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ইংরেজির সঙ্গে তুলনা করে লেখ্য-বাংলার এই ঊনতা ব্যাখ্যা করেছেন:

> ইংরেজি ভাষা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এ ভাষা গড়ে তুলেছেন বহু শ্রেণীর লেখক। তাঁদের অনেকেই সাহিত্যিক নন; কেউ বিজ্ঞানী, কেউ ইতিহাস-রচয়িতা, সাংবাদিক, দার্শনিক, সমাজে বা রাজনীতির ক্ষেত্রে কর্মী বা চিন্তানায়ক। কিন্তু বাংলা ভাষার বেশিটাই সৃষ্টি করেছেন সাহিত্যিক। এখানেই বাংলা ভাষার দৌর্বল্য পরিস্ফুট হয়ে আছে। এই দৌর্বল্যের অংশীদার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁর ভাষা মূলত সাহিত্যের ভাষা, এমনকি বিষয়বস্তু যখন মোটেই সাহিত্যধর্মী নয়। সেইজন্যই তাঁর তথ্যবাহী রচনার ভাষাতেও এমন একটি ভঙ্গি দেখা যায় যা রচনাকে সুখপাঠ্য করলেও জ্ঞানের ঋজুতা, চিন্তার দৃঢ়তা ও স্পষ্টতাকে সময়ে সময়ে ক্ষুণ্ন করে। (প্রবোধ ১৯৬৮: ১৫৪)

২২. এই অধীনতার জোর বোঝা যায়, যখন তাঁর প্রস্তাবিত ভাষাদর্শের সঙ্গে তাঁর নিজের গদ্য পুরোপুরি খাপ খায় না। মোহিতলাল মজুমদার বা সুশীলকুমার দে অভিযোগ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের নতুন ভাষাদর্শ মোতাবেক তাঁর নিজের রচনার একটা বড় অংশই – এবং সে অংশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ বটে – বাতিল হয়ে যায় (মোহিতলাল ২০০৫: ১২১-২৫; সুশীল ১৯৫৪: ৩৫-৪২)। *আলালের ঘরের দুলাল* প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন, 'তখন সময় আসে নাই' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৬)। অর্থাৎ, চলিতরীতি প্রবর্তনের জন্য ভাষা এবং ভোক্তা তখনো প্রস্তুত হয়নি। এ কথা হয়ত রবীন্দ্রনাথের ভাষা-প্রস্তাব আর নিজের

সাহিত্যিক ভাষা সম্পর্কেও বলা যায়। মোটেই বিস্ময়কর নয় যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংরেজি-প্রভাবিত বাংলা বাক্যের উদাহরণ সংগ্রহ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের *গোরা* থেকে (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৩৬৯)।

২৩. রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'প্রাকৃত বাংলা' কথাটা বাংলা ভাষার গভীরতর প্রকৃতি বুঝতে এবং বোঝাতেও ব্যবহার করতেন। সে কারণেই পুরোনো সাহিত্যে শব্দটির ব্যবহার দেখে উল্লসিত হয়েছেন: 'আমি প্রাকৃত বাংলা শব্দটি ব্যবহার করে আসছি। সেদিন এর একটা পুরাতন নজির পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি বুলবুল নামক পত্রে। যথা – 'দেসি ভাসে পদবন্ধে গাহি পরকৃতে'।' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৪)

২৪. প্রাকৃত বাংলার সাহিত্যিক ব্যবহারের তিনটি ধারার উল্লেখ পাওয়া যায় *বাংলা শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থের 'বানান-বিধি' (১৩৪৪) শিরোনামের রচনায়:

> এ পর্যন্ত অলিখিত প্রাকৃত বাংলা ভাষায় রস জুগিয়ে এসেছে মেয়েরাই, ছেলেবেলায় যখন রূপকথা শুনেছি তখন তার প্রমাণ পেয়েছি প্রতি সন্ধ্যাবেলায়। ব্রতকথার বাংলা ভাষার প্রতি লক্ষ করলেও আমার কথা স্পষ্ট হবে। এটা জানা যাবে প্রাকৃত বাংলা যেটুকু সাহিত্যরূপ নিয়েছে সে অনেকটাই মেয়েদের মুখে। অবশেষে সত্যের অনুরোধে ময়মনসিংহগীতিকা উপলক্ষে পুরুষের জয় ঘোষণা করতে হবে। এমন অকৃত্রিম ভাবরসে ভরা কাব্য বাংলা ভাষায় বিরল। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭০)

২৫. *ছন্দ* গ্রন্থের 'ছন্দের অর্থ' (১৩২৪) প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত বাংলার শব্দ-সংগ্রহ-পদ্ধতি এবং শব্দ-স্বভাবের প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন:

> প্রাকৃত-বাংলার লক্ষ্মীর পেট্‌রায় সংস্কৃত, পারসি, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষা থেকেই শব্দ সঞ্চয় হচ্ছে, সেইজন্যে শব্দের দৈন্য প্রাকৃত-বাংলার স্বভাবগত বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃত-ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজনবশত সংস্কৃত শব্দই সংগত সেখানে প্রাকৃত-বাংলায় তার বাধা নেই। আবার ফার্সি কথাও তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। সাধুভাষায় তার বিঘ্ন আছে, কেননা সেখানে জাতি রক্ষা করাকেই সাধুতা রক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য গদ্যে-পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ, এই কথা মনে রাখতে হবে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১১: ৫৭৪)

২৬. সাধু ও চলিতরীতির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের এসব মন্তব্য পরবর্তীকালে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। মূলত ব্যাপারটিকে হালকা করে কেবল সর্বনাম ও ক্রিয়ার রূপে নিয়ে আসা যে গেছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের দায় বিরাট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তাঁর কথাগুলো কোন অর্থে পড়তে হবে তার নিশানা দাগিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীরা কেবল মোটা মন্তব্যগুলোই নিয়েছেন। আসলে বলা উচিত, ব্যবহার করেছেন। তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, রবীন্দ্রনাথের এসব মন্তব্যে তার সমর্থন যথেষ্ট মেলে।

রবীন্দ্রনাথ তখন নিয়ত লড়াই করছেন সাধুপন্থীদের সঙ্গে। প্রমথ চৌধুরী-পরিচালিত চলিত ভাষার আন্দোলনকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছেন সেই লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসাবে। বোঝাতে চেয়েছেন, চলিতরীতিতে পুরোনো রীতির সঙ্গে আপোসরফা করে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে। রবীন্দ্রনাথের চলিতরীতি গ্রহণ কেমন ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল, তা বোঝা যাবে মোহিতলাল মজুমদারের লেখা পড়লে (মোহিতলাল ২০০৫: ১২১-১২৫)। এঁদের অনেকেই তাঁর অত্যন্ত কাছের জন। ফলে লড়াইটা করতে হয়েছে আরো কৌশলে। লেখকের অভীপ্সা খুঁজে পাঠ করলে অবশ্য সাধু-চলতির এই আলোচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। দেখা যাবে, তিনি আসলে লেখ্য-বাংলাকে এক করে

Dhaka University Institutional Repository

তুলতে চাইছেন, যার অভিমুখ শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতের দিকে। এক জায়গায় লিখেছেন, 'ভাষার অবিমিশ্র কৌলীন্য নিয়ে খুঁতখুঁত করেন এমন গোঁড়া লোক আজও আছেন। কিন্তু ভাষাকে দুইমুখো করে তার দুই বাণী বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাকে অসাধু বলাই উচিত। ভাষায় এরকম কৃত্রিম বিচ্ছেদ জাগিয়ে রেখে আচারে শুচিতা বানিয়ে তোলা পুণ্যকর্ম নয়, এখন আর এটা সম্ভবও নয়'। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬১৪)

এসব মন্তব্যের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বিপুল লেখালেখির প্রসঙ্গও ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। মোহিতলাল তাঁর বিরুদ্ধে প্রধানত এই অভিযোগই করেছিলেন। বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষা-সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত মেনে নিলে তাঁর নিজের গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখিই তাতে বাদ পড়ে যায়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ চলিতের এই কাজ-চলতি সংজ্ঞা প্রণয়ন করেছেন প্রাকৃত ভাষার আওতা বাড়িয়ে হলেও যেন বাংলাচর্চার অভিমুখ প্রাকৃতের দিকে নেওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে। চলিত ভাষা সম্পর্কে তাঁর সরল মন্তব্যগুলো এই বৃহত্তর ভাষা-পরিকল্পনার আওতায় নিয়েই পাঠ করতে হবে। তাঁর বিপুল রচনায় সেই সুযোগ আছে। মনে রাখা দরকার, এই বইতে এবং আরো বিপুল রচনায় তিনি যে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছেন, তাতে এই প্রাকৃত বাংলাকে লায়েক ও সর্বকাজের উপযোগীরূপে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছাই মূলত ক্রিয়াশীল ছিল।

২৭. দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা দ্বিতীয় পত্রে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজির উদাহরণ দিয়ে বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যের দাবিই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইয়ে 'বানান-বিধি ২' নামে সংকলিত এ পত্রে তিনি লিখেছেন:

> প্রচলিত উচ্চারণে আমরা বলি কোলকাতা, কলিকাতাও যদি কেউ বলতে ইচ্ছা করেন বলতে পারেন, যদিও তাতে কিঞ্চিৎ হাসির উদ্রেক করবে। কিন্তু ইংরেজ এই শহরটাকে উচ্চারণ করে ক্যালকাটা এবং লেখেও সেই অনুসারে। আপনিও বোধ হয় ইংরেজিতে এই শহরের ঠিকানা লেখবার সময় ক্যালকাটাই লেখেন, অথবা ক্যালকাটা লিখে কলিকাতা উচ্চারণ করেন না – অর্থাৎ যে জোরে প্রাকৃত বাংলায় আপনারা ষত্ব ণত্ব মেশিনগান চালাতে চেষ্টা করেন, সে জোর এখানে প্রয়োগ করেন না। ... চোখে অঞ্জন দিলে কেউ নিন্দা করবে না, মুখে দিলে করবে। প্রাকৃত বাংলায় যা শুচি, সংস্কৃত ভাষায় তাই অশুচি। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৮২)

অর্থাৎ বাঙালি ইংরেজি শব্দের উচ্চারণে ও বানানে যেমন ইংরেজির রীতি রক্ষা করে, প্রাকৃত বাংলার ক্ষেত্রেও তেমনি বাংলার রীতি মেনে চলবে – এই হল রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব।

২৮. সংস্কৃত ভাষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অশ্রদ্ধা ছিল এমন কোনো প্রমাণ বাস্তবে পাওয়া যায় না, আর তত্ত্বীয়ভাবে তা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের মুগ্ধ পাঠক-আলোচক নন, তাঁর সাহিত্যকর্মের অনিঃশেষ উৎসও সংস্কৃত সাহিত্য। তাই সংস্কৃতপন্থী বাংলা ভাষা-ব্যাখ্যাকারীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিদ্রূপ বা অনীহাকে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কোনো অবকাশ নেই।

বরং লেখ্য-বাংলায় চলিতরীতির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত উৎস থেকে দরকারি নতুন শব্দ গ্রহণের কথাই তিনি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে ভারতীয় চিত্তশক্তির বিকাশ ও তার প্রবহমানতার জন্য সংস্কৃতের ঋণ স্বীকার করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬০৯)। তারও আগে সংস্কৃত কলেজে দেওয়া 'অভিভাষণে' (১৩৩৮) বলেছিলেন, 'বাংলাকে বাংলা বলে স্বীকার করেও এ কথা মানতে হবে যে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় চিত্তের যে আভিজাত্য, যে তপস্যা আছে, বাংলা ভাষায় তাকে যদি গ্রহণ না করি তবে আমাদের সাহিত্য ক্ষীণপ্রাণ ও ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হবে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৪২)। আরো বলেছেন, 'বাংলাকে সংস্কৃত ভাষার দানসত্র ও অন্নসত্র থেকে দূরে নিয়ে এলে তাতে গুরুতর ক্ষতি ঘটবে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৪২)।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা: বাংলা ভাষা-বর্ণনার কিছু সূত্র ও প্রণালি-পদ্ধতি

৬.১ কাজের পরিধি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সার্থকভাবে প্রথম শিক্ষা দিয়েছিলেন' (বিজন ১৯৭৭: ৫)। অন্যত্র একজন ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে তিনি নিজে কিভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনায় গভীরভাবে উপকৃত হয়েছেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন (সুনীতি ১৯৭২: ৫৪-৫৫)। একদিকে বাংলা ভাষাভাষীকে তাদের 'মাতৃভাষা' সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন করা, অন্যদিকে ভাষাতাত্ত্বিকের জন্য পথনির্দেশ – এই দুই বড় দায়িত্ব পালনের উপযোগিতা রবীন্দ্রনাথের ভাষা-আলোচনায় আছে। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'ভাষার ক্ষেত্রে চলতে চলতে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে, আশ্চর্য করেছে, তারই কৌতুকের ভাগ সকলকে দেব বলেই লেখবার ইচ্ছে হল'। এ ধরনের কথা – যেখানে নিজেকে ভাষা-আলোচনায় 'অ্যামেচার' হিসাবে বর্ণনা করেছেন – তিনি অনেকবার বলেছেন। কিন্তু সত্য এই যে, কাজের জন্য তিনি যে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন, তা পরিমাণে রীতিমত বিস্ময়কর। 'পুরাতন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় যে সমস্ত শব্দ-সংগ্রাহকের নাম পাওয়া গেছে তাঁদের শীর্ষ স্থানে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ' (অসিত ১৯৯১: ১২)। ভাষাবোধ ও তত্ত্ব প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর সহজাত প্রতিভা আর সাফল্যের কথা আগেই বলা হয়েছে (৫.৩ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ 'ভাষাবিজ্ঞানের উঁচুদরের গবেষণায় যা যা দরকার – সংগ্রহ ও সংকলন, বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ – এই তিনটি ক্ষেত্রেই তাঁর বিচরণ ঘটেছে' (পবিত্র ১৯৯৯: ৫৩)। তাতে 'আধুনিক' ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত ঐক্য পাওয়া যায় না – সম্ভবত তা তাঁর লক্ষ্যও ছিল না। তাছাড়া, ভাষাবোধ ও তত্ত্বপ্রণয়নে তিনি যেমন সামগ্রিক, ভাষা-বিশ্লেষণে তেমন নন। বাংলা ভাষার ইতিপূর্বে অব্যাখ্যাত কিছু দিক নিয়েই তিনি বিস্তারিত কাজ করেছেন। এসব রচনার একটা বড় অংশে সম্ভাব্য ভাষা-বিশ্লেষকদের কাজের এলাকা ও ধরন চিনিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু যতটা করেছেন তাতে তত্ত্ব ও প্রণালি-পদ্ধতির ওই বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষিত হয়েছে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে যেগুলোর আবির্ভাব হয়েছে অনেক পরে। গত পাঁচ-ছয় দশক ধরে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের যে দুটি প্রধান বিষয় বিশ্বজুড়ে প্রায় সমস্ত ভাষাবিজ্ঞানীকে নানাভাবে আকৃষ্ট করে রেখেছে সেগুলি হল (নীলাদ্রি ২০১০: ১৩৫): ক) ভাষাকে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার ও বিশ্লেষণ করে সেই সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য মতামত প্রদান করা। এবং খ) সম্পূর্ণ আরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করে অসংখ্য বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে সামান্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য ব্যবহৃত নমুনার সাহায্য গ্রহণ করা। রবীন্দ্রনাথের ভাষা-আলোচনা মোটের উপর এ দুই নীতি মেনে চলেছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় ভাষা-আলোচনার চারটি মুখ্য বিভাগের – ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব আর শব্দসাধন, বাক্যরীতি আর অর্থ-বিচার – 'সবগুলির সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু নূতন কথা আছে' (সুনীতি ১৯৭২: ৫৭)। এছাড়া ভাষাবিজ্ঞানের নানা শাখায় আলোচিত হয় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ, যেমন, 'প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানে'র নানা দিক, 'সমাজভাষাবিজ্ঞানে'র কয়েকটি প্রসঙ্গ এবং ছন্দতত্ত্ব সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ কাজ

করেছেন (পবিত্র ১৯৯৯: ৫৪)। বর্তমান অধ্যায়ে মূলত প্রথমোক্ত চারটি বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো আলোচিত হবে।

৬.২ ধ্বনি

বাংলা উচ্চারণের রহস্য ভেদ করতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ ভাষাচর্চায় নেমেছিলেন।[১] ১২৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'বাংলা উচ্চারণে' তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। এরপর আরো নানা প্রবন্ধে এবং *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে বাংলা ধ্বনি সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ-মত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রধান পর্যবেক্ষণ, মন্তব্য ও সূত্রগুলো নিচে সূত্রাকারে উল্লেখ করা হল।

এক. 'অ'-এর উচ্চারণ: 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'অ' উচ্চারণের – মূলত কোন কোন প্রতিবেশে 'অ' 'ও' হয় – আটটি সূত্র তৈরি করেছেন। সংক্ষেপে সূত্রগুলো নিম্নরূপ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৮-১৯):

১ম। ই (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অথবা উ (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) কিংবা ইকারান্ত উকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে তার পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ 'ও' হবে; যথা, অগ্নি, তরু ইত্যাদি।
২য়। য-ফলা বিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'অ' 'ও' হয়ে যাবে। এক অর্থে এ নিয়ম প্রথম নিয়মের অন্তর্গত, কারণ যফলা ই এবং অ-এর যোগ মাত্র। উদাহরণ, গণ্য, দন্ত্য ইত্যাদি।
৩য়। ক্ষ পরে থাকলে তৎপূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হয়ে যায়; যথা, অক্ষর, কক্ষ ইত্যাদি।
৪র্থ। ক্রিয়াপদে স্থলবিশেষে অকারের উচ্চারণ 'ও' হয়ে যায়; যেমন, হ'লে, ক'রলে ইত্যাদি।
৫ম। ঋ-ফলা বিশিষ্ট বর্ণ পরে এলে তার আগের অকার 'ও' হয়; যথা, কর্তৃক, মসৃণ ইত্যাদি।
৬ষ্ঠ। দ্ব্যক্ষর-বিশিষ্ট শব্দে দন্ত্য ন অথবা মূর্ধন্য ণ পরে থাকলে পূর্ববর্তী অকার 'ও' হয়ে যায়; যথা, বন, ধন ইত্যাদি।
৭ম। ৪র্থ নিয়মে যেমন অপভ্রংশে ইকার লোপ হলে পূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হয়, তেমনি অপভ্রংশে উকারের লোপ হলেও পূর্ববর্তী অ উচ্চারণস্থলে 'ও' হবে; যথা, হ'ন, ক'ন ইত্যাদি।
৮ম। রফলা-বিশিষ্ট বর্ণের সঙ্গে অ লিপ্ত থাকলে তা 'ও' হয়ে যায়; যথা, শ্রবণ, ভ্রম ইত্যাদি।

এ প্রবন্ধে অন্তত দুটি ব্যতিক্রমেরও উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ (১৪০২: ২০):
১ম। ই উ যফলা ঋফলা ক্ষ পরে থাকলেও অভাবার্থসূচক অ-এর বিকার হয় না; যথা, অকিঞ্চন, অকুতোভয় ইত্যাদি।
২য়। নিম্নলিখিত শব্দগুলো কোনো নিয়ম মানে না, অর্থাৎ ই উ যফলা ঋফলা ইত্যাদি পরে না থাকা সত্ত্বেও এদের আদ্যক্ষরবর্তী 'অ' 'ও' হয়ে যায়; যথা, মন্দ, মন্ত্র, নখ ইত্যাদি।

পবিত্র সরকার লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রায় ছ'টি নিয়মকে মূলত একটি ব্যাপক ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত নিয়ম হিসেবে দেখানো যেতে পারে' (পবিত্র ১৯৯৯: ৫৬)। আসলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা করেছেন। নিয়মগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> দুয়েকটি ছাড়া যতগুলি নিয়ম উপরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝাইতেছে ই কিংবা উ-এর পূর্বে অ-এর উচ্চারণ 'ও' হইয়া যায়। এমন-কি ইকার উকার অপভ্রংশে লোপ হইলেও এ-নিয়ম খাটে। এমন-কি যফলা ও ঋফলায় ইকারের সংস্রব আছে বলিয়া তাহার পূর্বেও অ-এর বিকার হয়। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২০)

'স্বরবর্ণ অ' প্রবন্ধে এ কথা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন: 'বাংলায় প্রধানত ই এবং উ এই দুই স্বরবর্ণের প্রভাবেই অন্য স্বরবর্ণের উচ্চারণ-বিকার ঘটিয়া থাকে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২১)।

'স্বরবর্ণ অ' প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল *সাধনা*র আষাঢ় ১২৯৯ সংখ্যায়। সাত বছর আগের 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে এর বিশেষ অমিল নেই। তবে মন্তব্য আকারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আছে, যা বাংলা স্বরধ্বনির পাঠে তাৎপর্যপূর্ণ (৬.২.১ দ্রষ্টব্য)।

দুই. 'এ'-র উচ্চারণ: বাংলায় 'এ' স্বরবর্ণ আদ্যক্ষররূপে ব্যবহৃত হলে তার দুই প্রকার উচ্চারণ দেখা যায়। একটি বিশুদ্ধ এ, আরেকটি অ্যা। 'স্বরবর্ণ এ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কিত নিয়ম ও ব্যতিক্রমগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৩-২৫)। সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে নিচে এগুলো উল্লেখ করা হল:

১ম। পরে ইকার অথবা উকার থাকলে তার আগের একারের কখনোই বিকৃতি হয় না। জেঠা এবং জেঠী, বেটা এবং বেটী, একা এবং একটু – তুলনা করে দেখলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

২য়। পরে অকারান্ত অথবা বিসর্গ শব্দ থাকলে পূর্ববর্তী একারের অধিকাংশ স্থলেই কোনো পরিবর্তন হয় না; যথা, কেশ, তেজ ইত্যাদি। কিন্তু ন-এর আগে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়; যথা, ফেন, কেন ইত্যাদি। পরবর্তী চ অক্ষরও বিকারজনক। যথা, ব্যাচা, স্যাঁচা, চ্যাঁচানো ইত্যাদি।

৩য়। শব্দানুকারমূলক বর্ণনাসূচক ক্রিয়ার বিশেষণের ক্ষেত্রে আদ্যক্ষরে একার সংযোগ দেখা যায় না। গাঁগাঁ, গোঁগোঁ, চীঁচীঁ পাওয়া যায়, কিন্তু গেঁগেঁ, চেঁচেঁ কোথাও নেই। কেবল নিতান্ত যেখানে শব্দের অবিকল অনুকরণ সেখানেই কদাচ একারের সংশ্রব পাওয়া যায়, যথা, ঘেউঘেউ। এরূপ স্থলে অ্যাকারই বেশি পাওয়া যায়; যথা, ফ্যাঁসফ্যাঁস, খ্যাঁকখ্যাঁক ইত্যাদি।

এ শব্দগুলোকে বিশেষণে পরিণত করলে দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম অ্যাকারের পরিবর্তে একার সংযুক্ত হয়; যথা, স্যাঁৎসেঁতে ম্যাড়মেড়ে। কারণ, স্যাৎসেঁতিয়া থেকে স্যাঁৎসেঁতে হয়েছে। ইকারের আগে 'এ' উচ্চারণ বলবান থাকে।

৪র্থ। যেসব অসমাপিকা ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে ই যুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপ ধারণকালে তাদের সেই ইকার একারে পরিণত হয় এবং অসমাপিকারূপে যে সকল ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে 'এ' সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপে তাদের সেই একার অ্যাকারে পরিণত হয়। যথা, কিনিয়া> কেনা, বেচিয়া> ব্যাচা, মিলিয়া> মেলা, ঠেলিয়া> ঠ্যালা ইত্যাদি। এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম পাওয়া যায় না।

৫ম। যেসব ক্রিয়ার আরম্ভে ইকার আছে, যথা, গিল, মিল ইত্যাদি, সেগুলো ইকারের পরিবর্তে একার গ্রহণ করলে একারের উচ্চারণ রক্ষিত হয়; যথা, গিলন থেকে গেলা, মিলন থেকে মেলা (মেলন শব্দ থেকে যে মেলার উৎপত্তি তার উচ্চারণ ম্যালা), লিখন থেকে লেখা, শিক্ষণ থেকে শেখা ইত্যাদি। অন্য সর্বত্রই একারের উচ্চারণ অ্যা হয়ে যায়; যথা, খেলন – খেলা, ঠেলন – ঠেলা, দেখন – দেখা ইত্যাদি। অর্থাৎ, গোড়ায় ই থাকলে হয় এ, আর এ থাকলে হয় অ্যা। গোড়ায় কোথায় এ আছে এবং কোথায় ই আছে, তা ইতে প্রত্যয় যোগ করলে ধরা পড়ে; যথা, গিলিতে মিলিতে লিখিতে শিখিতে মিটিতে পিটিতে; অন্যত্র, খেলিতে ঠেলিতে দেখিতে ঠেকিতে বেঁকিতে মেলিতে হেলিতে ইত্যাদি।[২]

তিন. স্বর-পরিবর্তনের সূত্র: রবীন্দ্রনাথ কাজ করেছেন মূলত কথ্য-বাংলা নিয়ে।[৩] বিশেষত সাধুরীতির শব্দ কথ্য উচ্চারণে কী রূপ গ্রহণ করে তা খতিয়ে দেখেছেন ব্যাপকভাবে। প্রধানত 'টা টো টে' প্রবন্ধ আর *বাংলাভাষা-পরিচয়ের* দ্বাদশ পরিচ্ছেদে এই 'উচ্চারণ-বিকার' প্রসঙ্গ বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে নিচে এগুলো বর্ণিত হল:

১ম। আ> এ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬-২৭):
ক) ইকারের পরবর্তী আকার মাত্রই এ-তে রূপান্তরিত হয়: হইয়া> হয়ে, হিসাব> হিসেব, লইয়া> লয়ে ইত্যাদি।
খ) এমনকি যেখানে অপভ্রংশে মূল শব্দের ইকার লুপ্ত হয়ে যায়, সেখানেও এ-নিয়ম খাটে। যেমন: মরিচা> মর্চে, সরিষা> সর্ষে।
গ) অ এবং ই মিলিত হয়ে যুক্তাক্ষর 'ঐ' হয়। এজন্য 'ঐ' স্বরের পরেও আ স্বরবর্ণ এ হয়ে যায়; যেমন: কৈলাস> কৈলেস, তৈয়ার> তোয়ের।
ঘ) যফলার সঙ্গে সংযুক্ত আকারও একারে পরিণত হয়। কারণ, যফলা ই এবং অ-এর যুক্তস্বর; যথা: অভ্যাস> অভ্যেস, কন্যা> কন্যে।
ঙ) যে কারণবশত ক্ষ-র পূর্ববর্তী অ ওকারে পরিণত হয়, সেই কারণেই ক্ষ-সংযুক্ত আকার এ হয়ে যায়; যথা, রক্ষা> রক্ষে। অবশ্য আদ্যক্ষরে এ কথা খাটে না; যেমন, ত্যাগ, ন্যায়, ক্ষার, ক্ষালন ইত্যাদি।
এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের একটি সামগ্রিক সিদ্ধান্ত: পূর্ববর্তী ইকারের প্রভাবেই 'বাংলার অনেকগুলি আকারান্ত ক্রিয়াপদ কালক্রমে একারান্ত হইয়া আসিয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭)।[৪]
২য়। আ> ও (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭-২৮):
ক) পূর্বে ই থাকলে যেমন পরবর্তী আ 'এ' হয়ে যায়, তেমনি পূর্বে উ থাকলে পরবর্তী আ 'ও' হয়ে যায়; যথা, ফুটা> ফুটো, মুঠা> মুঠো।
খ) ঔকারের পরেও এ নিয়ম খাটে। কারণ ঔ অ এবং উ-মিশ্রিত যুক্তস্বর; যথা, নৌকা> নৌকো, কৌটা> কৌটো।

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে খুব সংক্ষেপে স্বরবিকারের আরো কিছু নিয়ম ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬২৫-২৮)। যেমন,
৩য়। ই> এ: পরে আকার থাকলে ই এ-তে পরিণত হয়; যেমন, বিড়াল> বেড়াল, কিতাব> কেতাব, খিতাব> খেতাব।
৪র্থ। উ> ও: ইকার টেনে আনে এ স্বরকে, আর ও স্বরকে টানে উকার; যেমন, পট> পটুয়া> পোটো, মাঠ> মাঠুয়া> মেঠো, ডুবানো> ডোবানো।
৫ম। আ> ও: উ-এর প্রভাবে আ উ-তে পরিণত হয়; যেমন, জুতা> জুতো, ছুতার> ছুতোর।
৬ষ্ঠ। উ-এর আবির্ভাব: ইয়া প্রত্যয়ে ই-এর স্থলে উ হয়; যথা, জঙ্গলিয়া> জঙ্গুলে, বাদলিয়া> বাদুলে। অ বা আ-এর স্থলেও উ আবির্ভূত হয়; যথা, চালনি> চালুনি, পিটানি> পিটুনি।
৭ম। অ> এ: সমাজের বিশেষ স্তরে এ রূপান্তর বেশি দেখা যায়; যেমন, প্রণাম> পেরনাম, সরস> সরেস।

চার. স্বরধ্বনি সম্পর্কে আরো কিছু সিদ্ধান্ত: *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বাংলা স্বরধ্বনির বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম পরিচয় আছে (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬২৩-৩০)। এ পরিচয় একদিকে ধ্বনিগত, অন্যদিকে ব্যবহারগত। অর্থাৎ, শব্দের ব্যবহারিক চরিত্র অনুযায়ী স্বরধ্বনি বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রসঙ্গত সংস্কৃত স্বরধ্বনির সঙ্গে বাংলা স্বরের তুলনামূলক আলোচনা-সূত্রে বাংলা স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনির পার্থক্য বিবেচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য এভাবে সূত্রবদ্ধ করা যায়:

ক) অ ধ্বনি প্রসঙ্গে: অ লুপ্ত হয়ে হসন্তধ্বনিতে পরিণত হওয়া চলতি বাংলার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'আমাদের ভাষাটা হসন্তবর্ণের শক্ত মুঠোয় আঁটবাঁধা। 'করিতেছি' এলানো শব্দ, পিণ্ড পাকিয়ে হয়েছে 'করছি''। যেমন, ছিট্‌কে পড়া, আধ্‌লা, আল্‌গা ইত্যাদি। 'এই হসন্তবর্ণের প্রভাবে আমাদের চলতি ভাষায় যুক্তবর্ণের ধ্বনিরই প্রাধান্য ঘটেছে'।[৫]
বাংলা অ বিশেষভাবে বাংলা ভাষারই সম্পত্তি। কারণ, এই 'অ সংস্কৃত বর্ণমালার কোঠায় নেই'।
অ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পত্তি হলেও এ ভাষায় তার অধিকার খুবই সংকীর্ণ। শব্দের মধ্যে বা অন্তে অ প্রায়শই লুপ্ত হয়, আদিতে বা মধ্যে ও-তে পরিণত হয়।[৬]
খ) আ ধ্বনি: সংস্কৃত আ দীর্ঘস্বর, কিন্তু বাংলা আ হ্রস্ব। এর উচ্চারণ একমাত্রার চেয়ে প্রশস্ত নয়। সংস্কৃত আকারযুক্ত শব্দও বাংলায় হ্রস্বমাত্রাতেই উচ্চারিত হয়। যেমন, কামনা।
গ) ধ্বনিগুলোর ব্যবহারিক তৎপরতা: বাংলা বর্ণমালায় 'ই আর উ সবচেয়ে উদ্যমশীল স্বরবর্ণ'। নিজেদের এবং অন্যদের পরিবর্তন ঘটানোর পৌনঃপুনিকতায় এই উদ্যমের পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপরতার দিক থেকে বাংলা স্বরগুলোর বিন্যাস এ রকম: 'ইকার এবং উকার খুব কর্মিষ্ঠ, একার এবং ওকার ওদের শরণাগত, বাংলা অকার এবং আকার উৎপাত সইতেই আছে'।
ঘ) অ্যা প্রসঙ্গে: এই স্বর সংস্কৃতে নেই, বাংলায় আছে। 'ইংরেজি bad শব্দের a তার সমজাতীয়'। বাংলায় একে য ফলায় আকার দিয়ে লেখা হয়।
ঙ) দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বর: সাধারণভাবে বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে – যেমন হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরে – দীর্ঘতা পাওয়া যায়। 'জলা' শব্দের সঙ্গে তুলনা করে উচ্চারণ করলে বোঝা যায় 'জল' শব্দের অ দীর্ঘ।[৭] সংস্কৃতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা সর্বত্রই রক্ষিত হয়। যুক্তবর্ণের পূর্বেও সংস্কৃতে স্বর দীর্ঘ হয়, বাংলায় হয় না।
চ) ঋ-এর বৈশিষ্ট্য: ঋ স্বরবর্ণের কোঠায় থাকলেও এর উচ্চারণ ব্যঞ্জনবর্ণের – রি।

পাঁচ. ব্যঞ্জন সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬২৮-৩১):
ক) ঙ এবং ঞ প্রসঙ্গে: উচ্চারণে থাকলেও ঙ বানানে উপেক্ষিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তিনিই সম্ভবত 'ভাঙ্গা' প্রভৃতি স্থলে 'ভাঙা' লেখা চালু করেন। কাজটা তিনি করেছিলেন ছন্দের খাতিরে। তাতে বানানে ঙ-এর স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয়েছে।
বর্তমান বাংলায় ঞ-এর কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে বর্ণটি ব্যবহৃত হয়। মধ্যযুগে নাঞি, মুঞি প্রভৃতি শব্দে ঞ ব্যবহৃত হত।
খ) ন ও ণ: 'মূর্ধণ্য এবং দন্ত্য ন'এ ভেদাভেদ-তত্ত্ব' রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলা বর্ণমালার 'আর-একটা বিভীষিকা'। বানানে ওদের ভেদ আছে, ব্যবহারে নেই। তাঁর মতে, বাঙালি ণ-এর আসল উচ্চারণ জানে না।

গ) শ, স, ষ প্রসঙ্গেঃ সংস্কৃত বর্ণমালার এই তিন বর্ণ বাংলা বর্ণমালায় আছে, কিন্তু উচ্চারণে নেই। উচ্চারণে আছে শ। তবে স্নান, হস্ত, শ্রী, মিশ্র প্রভৃতি শব্দে স-এর উচ্চারণ পাওয়া যায়। 'সংস্কৃতে যেখানে র ফলার সংস্রবে এসেছে তালব্য শ' বাংলায় সেখানে এল দন্ত্য স'।

ঘ) বর্গীয় ও অন্ত্যস্থ ব প্রসঙ্গেঃ সাধারণভাবে বাংলায় অন্ত্যস্থ ব পাওয়া যায় না। এমনকি তৎসম শব্দেও কেবল বর্গীয় ব ব্যবহৃত হয়। তবে 'হাওয়া খাওয়া প্রভৃতি ওয়া-ওয়ালা শব্দে অন্ত্যস্থ ব'এর আভাস পাওয়া যায়'। তাছাড়া হ এবং অন্ত্যস্থ ব'এর সংযুক্ত বর্ণেও – যেমন আহ্বান, জিহ্বা ইত্যাদি – অন্ত্যস্থ ব-এর ইঙ্গিত আছে।

ঙ) ল-এর স্থানচ্যুতিঃ ব্যঞ্জনবিকার হিসাবে ল-এর জায়গায় ন উচ্চারণ বাংলায় প্রচুর পাওয়া যায়। যেমন, লালা> নাল, লোষ্ট্র> নোড়া, লবণ> নুন ইত্যাদি।

চ) ক্ষ-এর উচ্চারণ: বর্ণনা করবার সময়ে একে 'ক'এ মূর্ধন্য ষ 'ক্ষিয়ো" বলা হলেও এতে ক বা ষ কোনোটাই নেই। শব্দের আরম্ভে এর উচ্চারণ খ, আর অন্তে-মধ্যে 'দুটো খ'এ জোড়া ধ্বনি'।

ছ) য-এর উচ্চারণঃ বাংলায় যাকে য বলা হয়, বর্গীয় জ-এর সঙ্গে তার কোনো উচ্চারণভেদ নেই। য-এর নিচে ফোঁটা দেওয়া যে অক্ষরকে 'ইয়' বলা হয়, তাই সংস্কৃত অন্ত্যস্থ য। সংস্কৃত উচ্চারণ-মতে 'যম' শব্দ 'য়ম'। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের মতে, 'ওটাতে 'জম' উচ্চারণের অজুহাতে য়'র ফোঁটা' সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জ) যফলা প্রসঙ্গেঃ যফলায় আকার না থাকলেও বাংলায় তার উচ্চারণ অ্যাকার। যেমন, ব্যয়। অন্যত্র যফলা ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঘটায়।[৮]

ঝ) ধ্বনির অব্যাহত পরিবর্তন প্রসঙ্গেঃ কেবল মধ্যযুগের অনেক ধ্বনিই যে আধুনিক বাংলায় বদলে গেছে তা নয়। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, 'হয়তো এই মুহূর্তেই আমাদের উচ্চারণ তার কক্ষপথ থেকে অতি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ফ হচ্ছে f, ভ হচ্ছে ব, চ হচ্ছে স, এখনো কানে স্পষ্ট ধরা পড়ছে না'।

৬.২.১ রবীন্দ্রনাথের ধ্বনি-আলোচনার পর্যালোচনাঃ বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব

রবীন্দ্রনাথের আগে রামমোহন রায় এবং শ্যামাচরণ সরকার বাংলা ধ্বনির কিছু বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেছিলেন (কৃষ্ণা ১৯৮৭: ৪৬-৪৭)। যেমন, তিন 'শ', দুই 'ন' এবং দুই 'জ'-এর উচ্চারণ-সাম্য তাঁরা লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যক্তি ... যিনি প্রথাগত পদ্ধতি পরিহার করে বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনার সূত্রপাত করেন যাতে প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষার উচ্চারণ বিষয়ক প্রকৃত চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়' (মহাম্মদ দানীউল: ১৯৯৪: ১১০)। সূচনাকারী হিসাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্র প্রথম ও চূড়ান্তভাবে নির্ধারণকারী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব পরবর্তী সব আলোচকই স্বীকার করেছেন।[৯] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> বাঙলার উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি অতি সাধারণ কথা – এত সাধারণ কথা যে সেগুলি আমরা আগে লক্ষ্যই করি নি – রবীন্দ্রনাথ প্রথম আমাদের চোখের সামনে ধরে দেন। বাঙলার ধ্বনিসমষ্টির ইতিহাসের সব-চেয়ে বিশিষ্ট কতকগুলি সূত্র বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন (তাঁর 'বাংলা উচ্চারণ', 'টা টো টে', 'স্বরবর্ণ অ', 'স্বরবর্ণ এ' – ১২৯২ আর ১২৯৯ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ-চতুষ্টয়ে)। (সুনীতি ১৯৭২: ৪৬)

মনসুর মুসা লক্ষ করেছেন, বাংলা উচ্চারণের যে আট সূত্র রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে 'শত বছর আগে' শনাক্ত করেছিলেন, তাকে 'এখনও পর্যন্ত নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়'। সে কারণে তিনি 'বাংলা উচ্চারণ' শীর্ষক প্রবন্ধটিকে বাংলা উচ্চারণের 'অষ্টাধ্যায়ী' হিসাবে চিহ্নিত করতে চান (মনসুর ২০১১: ৩১৪)। পবিত্র সরকার মনে করেন (পবিত্র ১৯৯৯: ৫৯), উত্তরসূরিরা যে রবীন্দ্রনাথকে 'পথিকৃৎ' বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তা অতিশয়োক্তি তো নয়ই, বরং ঊনকথন।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম 'বাঙ্গালার স্বরসঙ্গতির সূত্রগুলি' আবিষ্কার করেছিলেন (সুনীতি ১৯৭২: ৫১)। তিনি অবশ্য প্রক্রিয়াগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজাননি। অর্থাৎ, পরবর্তীকালে 'স্বরসঙ্গতি', 'সমীভবন' প্রভৃতি নামে বা প্রগত, পরাগত, পারস্পরিক প্রভৃতি ভাগে এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়াকে সাজিয়ে পড়ার যে শৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে, রবীন্দ্রনাথে তা নেই। কিন্তু প্রক্রিয়াগুলো তিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছিলেন। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত *Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিক দিক থেকে এ পরিবর্তন-প্রক্রিয়াগুলো সূত্রবদ্ধ করেন। সুনীতিকুমারের সূত্রগুলো বিশ্লেষণ করে কৃষ্ণা দাশ জানিয়েছেন, 'রবীন্দ্রনাথ *শব্দতত্ত্ব* ও *বাংলাভাষা-পরিচয়ে* বাংলা স্বরবিকারের নিয়ম সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন *ওডিবিএল*-এ সুনীতিকুমার সেই তত্ত্বকেই সুবিন্যস্ত করেছেন মাত্র' (কৃষ্ণা ১৯৮৭: ৬৬)। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কাজের গুরুত্ব এ তথ্য থেকেই অনুমান করা যায়।

তথ্য-উপাত্ত এবং সূত্রের বাইরে রবীন্দ্রনাথের ধ্বনি-আলোচনায় আরো কয়েকটি দিক আছে, যা অতুলনীয়। রসাল বর্ণনাভঙ্গি এর একটি মাত্র। সর্বত্র তিনি স্মরণ রেখেছেন বাংলার উপভাষা-বৈচিত্র্যের কথা। সুযোগ পেলেই তুলনা টেনেছেন একাধিক উপভাষা এবং এমনকি একাধিক ভাষার। আর বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারের প্রকল্প তিনি কোথাও বিস্মৃত হননি। তাই তুলনা টেনেছেন লেখ্য-বাংলার এবং সংস্কৃতের। কথ্য-বাংলায় সংস্কৃত উচ্চারণকে বদলে যেতে দেখে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। যেমন, 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে লিখেছেন: 'যে-সকল সংস্কৃত শব্দ ভাষায় নূতন প্রবেশ করিয়াছে এবং জনসাধারণের দ্বারা সর্বদা ব্যবহৃত হয় না, তাহাতে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম এখনো রক্ষিত হয়। কিন্তু 'পাঠ্‌শালা' প্রভৃতি সংস্কৃত কথা যাহা চাষাভুষারাও নিয়ত ব্যবহার করে, তাহাতে বাংলা ভাষার নিয়ম সংস্কৃত নিয়মকে পরাস্ত করিয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৫৫)। তাছাড়া পর্যাপ্ত মনোযোগ দিয়েছেন অর্থ-উৎপাদনে ধ্বনির ভূমিকার প্রতি। দৃষ্টির সমগ্রতা রবীন্দ্রনাথের ধ্বনি-আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি নিয়ে খুব আংশিক আলোচনা করেছেন; যদিও এর মধ্যেই তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আছে। কিন্তু তাঁর স্বরধ্বনির আলোচনা বিস্তৃত এবং স্তরবহুল।[১০] তাতে 'মান' বাংলার সাতটি মূলস্বর খুব পরিচ্ছন্নভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই সাতটি স্বর শনাক্তকরণে এবং বাংলা দীর্ঘ ও হ্রস্বস্বরের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণে তাঁর সাফল্য প্রশ্নাতীত। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর ব্যবহারিক সচলতা, পৌনঃপুনিকতা এবং বিশেষ প্রতিবেশে রূপান্তরিত হওয়ার সূত্র আবিষ্কার। তিনি শুধু সূত্রপ্রণয়ন করেননি, কারণও বিশ্লেষণ করেছেন, যা পরবর্তী ভাষা-আলোচনায় খুব সুলভ নয়।[১১]

'স্বরবর্ণ অ' প্রবন্ধে নিজের প্রস্তাবিত উচ্চারণসূত্রগুলোর পর্যালোচনা করে লিখেছেন:

> কতকগুলি স্বরবর্ণ আছে যাহাকে সন্ধিস্বর বলা যাইতে পারে; যেমন, অ এবং উ-এর মধ্যপথে – ও, অ এবং ই-র সেতুস্বরূপ – এ; যখন একপক্ষে ই অথবা এ এবং অপর পক্ষে আ, তখন অ্যা তাহাদের মধ্যে বিরোধভঞ্জন করে। বোধ হয় ভালো করিয়া সন্ধান করিলে দেখা যাইবে, বাঙালিরা উচ্চারণকালে এই সহজ সন্ধিস্বরগুলির প্রতিই বিশেষ মমত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২)

এখানে 'সহজ সন্ধিস্বর' বলে যা বোঝানো হয়েছে, 'স্বরবর্ণ এ' প্রবন্ধে তাই আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে:

> মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, এ হইতে একেবারে আ উচ্চারণে যাওয়া রসনার পক্ষে কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য, আ হইতে এ উচ্চারণে গড়াইয়া পড়া সহজ। এইজন্য আমাদের অঞ্চলে আ-কারের পূর্ববর্তী একার প্রায়ই অ্যা নামক সন্ধিস্বরকে আপন আসন ছাড়িয়া দিয়া রসনার শ্রম লাঘব করে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৫)

রবীন্দ্রনাথ এখানে বিশেষ উচ্চারণের যে কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, তাকে বলা যায় মানুষের ধ্বনি-উচ্চারণের – এবং সেদিক থেকে ভাষার পরিবর্তনের – একটা গোড়ার কারণ। ইংরেজিতে একে বলা যায় 'the principle of least effort' (পবিত্র ১৯৯৯: ৫৭)। এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বা ডায়াক্রনিক দিকও মাঝে-মধ্যে তাঁর বিবেচনায় এসেছে। কিন্তু মূলত তিনি কাজ করেছেন ভাষার সমকালিক বা সিনক্রোনিক স্তর নিয়ে। ভাষাতত্ত্বে চালু ভাষা নিয়ে কাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করে পবিত্র সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি, যিনি ভাষার চালু নিয়ম কারণসুদ্ধ বিশদ করে বলেছেন' (পবিত্র ১৯৯৯: ৫৮)।[১২] সঙ্গত কারণেই পবিত্র সরকার মনে করেন, 'রবীন্দ্রনাথের অগ্রণী স্থান শুধু বাংলা ভাষাতত্ত্বের নয়, পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও'। (পবিত্র ১৯৯৯: ৫৯)

৬.৩ শব্দ ও রূপ

শব্দস্তরে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান কাজ মুখের ভাষায় প্রচলিত শব্দভাণ্ডারকে বাংলা শব্দভাণ্ডার হিসাবে গ্রাহ্য করানো। মুখের ভাষা আর লেখার ভাষায় পার্থক্য ঘটবেই – এ মত তিনি অনেক জায়গায় ব্যক্ত করেছেন। 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'মুখের ব্যবহারে ভাষার যে ভাঙচুর অপরিচ্ছন্নতা ঘটা অনিবার্য সেটাও যে লেখার ভাষায় গ্রহণ করতে হবে' তিনি তা মানেন না। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'ঘরে যে ধুতি পরি সে ধুতিই সভায় পরা চলে কিন্তু কুঁচিয়ে নিতে একটু যত্নের প্রয়োজন হয়, আর সেটা ময়লা হলে সৌজন্য রক্ষা হয় না। ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৩০)। এ কথা সম্ভবত সব দেশের সব কালের ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের গোড়ায় – বাংলা ভাষার উপনিবেশিত ধ্যান-ধারণার প্রতাপের কালে – লেখ্য-বাংলার শব্দসম্ভার সম্পর্কে এ ধারণা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ', 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত', 'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা' প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশের পর তাঁর বিরুদ্ধে 'slang আমদানি'র অভিযোগ ওঠে (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪২২)। বলা হয়, তিনি 'চলিত কথাগুলা ও তাহার প্রত্যয় সংগ্রহে সহায়তা করিয়া বাংলা ভাষাটাকেই মাটি করিবার' চেষ্টা করছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১০৬)।

এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান সরল আর স্পষ্ট। তিনি জোর দিয়েছেন সহজ কাণ্ডজ্ঞানের ওপর। 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন: 'মাকে মা বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রপিতামহীকেই মা

বলিতে যাওয়া দোষের হয়। সেইরূপ বাংলাকে বাংলা না বলিয়া কেবলমাত্র সংস্কৃতকেই যদি বাংলা বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাতে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় থাকে না' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১২)। বাংলা শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত আসলে ভাষার স্বভাব আর বৈশিষ্ট্যের আরো গভীর বোঝাপড়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তির রুচি বা পছন্দের ছাঁচে ভাষার শব্দভাণ্ডার নির্ণীত হয় না। তা জনগোষ্ঠীর ব্যবহারিক বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল। ওই একই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যের উপরই জোর দিয়েছেন: 'যে-কথাগুলা লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে বাংলায় রাখা বা বাংলা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া আমার বা আর-কাহারো সাধ্যই নহে। তাহারা আছে, এবং কাহারো কথায় তাহারা নিজের স্থান ছাড়িবে না' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১০৬)। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ আর *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে শব্দ আর রূপের আলোচনায় তিনি এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সর্বত্রই গুরুত্ব পেয়েছে বাংলা ভাষার চালু সম্পদ, আর চালু ব্যবহারবিধি। তাতে সামগ্রিক আলোচনার কোনো দাবি নেই, কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে উপাদানগুলোর ব্যবহারগত বিশিষ্টতা শনাক্ত করার চেষ্টা ও সাফল্যের প্রমাণ আছে। এখানে এই বিশিষ্টতাগুলো সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে উপস্থাপন করা হল।

এক. বাংলা শব্দদ্বৈত: এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধে। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধেও সমধর্মী উল্লেখ আছে, যদিও তা মূলত ধ্বনির দ্বৈত, শব্দের নয়। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধের মূল অবলম্বন নানা ধরনের দ্বৈতশব্দ। কিন্তু এ প্রবন্ধে গুরুত্ব পেয়েছে অর্থের দিকগুলো। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের আঠার ও একুশ-সংখ্যক পরিচ্ছেদে শব্দদ্বৈতের প্রসঙ্গ এসেছে মূলত বাংলা ভাষার শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করতে গিয়ে। তাতে নতুন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়নি। নিচের সূত্রগুলো 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধ অবলম্বনে তৈরি (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৭৫-৭৮)।

ক) বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশি, অন্য আর্যভাষায় তত নয়। বাংলা শব্দদ্বৈতের বিধিও বিচিত্র; অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃত ভাষায় তার তুলনা পাওয়া যায় না।

খ) কাজের ধরন অনুযায়ী শব্দদ্বৈতকে এভাবে ভাগ করা যায়:

মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, পরে পরে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় – এগুলো পুনরাবৃত্তিবাচক।

বুকে বুকে, মুখে মুখে, চোখে চোখে, মানুষে মানুষে – এগুলো পরস্পর সংযোগবাচক।

সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, মনে মনে, তলে তলে, বাইরে বাইরে – এগুলো নিয়তবর্তিতাবাচক, অর্থাৎ এগুলোতে সর্বদা লেগে থাকার ভাব ব্যক্ত হয়।

চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, চলিয়া চলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া – এগুলো দীর্ঘকালীনতাবাচক।

অন্য অন্য, অনেক অনেক, নূতন নূতন, ঘন ঘন – এগুলো বিভক্ত বহুলতাবাচক। নূতন নূতন কাপড় বললে প্রত্যেক নূতন কাপড়কে পৃথক করে দেখা হয়। অনেক অনেক লোক বললে লোকগুলোকে অংশে অংশে ভাগ করা হয়, কিন্তু শুদ্ধ 'অনেক লোক' বললে নিরবচ্ছিন্ন বহু লোক বোঝায়।

টাটকা টাটকা, গরম গরম, ঠিক ঠিক – এগুলো প্রকর্ষবাচক। টাটকা টাটকা বললে টাটকা শব্দকে বিশেষভাবে নিশ্চয় করে বলা যায়।

গ) বাংলায় অনেকগুলো শব্দদ্বৈতে দ্বিধা, ঈষদূনতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতার ভাব ব্যক্ত করে; যথা, যাব যাব, উঠি উঠি, মেঘ মেঘ, জ্বর জ্বর, শীত শীত, হাসি হাসি। ঘোড়া ঘোড়া (খেলা), চোর চোর (খেলা) এই জাতীয় – অর্থাৎ সত্যকার

ঘোড়া নয়, তার নকল করে খেলা। এই ঈষদূনত্বসূচক অসম্পূর্ণতাবাচক শব্দদ্বৈত বোধ করি অন্য আর্যভাষায় দেখা যায় না। ফরাসি ভাষায় একপ্রকার শব্দব্যবহার আছে, যার সঙ্গে এর কিছুটা তুলনা হতে পারে।

ঘ) আর একপ্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত বাংলায় এবং বোধকরি ভারতীয় অন্য অনেক আর্যভাষায় চলিত আছে; একে বলা যায় অনির্দিষ্ট-প্রভৃতি-বাচক; যেমন, জল-টল, পয়সা-টয়সা। জল-টল বললে জলের সঙ্গে সঙ্গে আরো যে-কটা আনুষঙ্গিক জিনিস শ্রোতার মনে উদয় হতে পারে তা সংক্ষেপে বলা হয়। বোঁচকা-বুঁচকি দড়া-দড়ি গোলা-গুলি কাপড়-চোপড় – এগুলোও প্রভৃতিবাচক বটে, কিন্তু পূর্বোক্তশ্রেণির অপেক্ষা নির্দিষ্টতর। বোঁচকা-বুঁচকি বললে ছোটো বড়ো মাঝারি একজাতীয় নানা প্রকার বোঁচকা বোঝায়, অন্য-জাতীয় কিছু বোঝায় না।

দুই. ধ্বন্যাত্মক শব্দ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৭৯-৮৮):

ক) ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনির বর্ণনা ইংরেজি ভাষায়ও আছে; যথা, bang thud ding-dong hiss ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা ভাষার তুলনায় তা যৎসামান্য। বাংলা ভাষার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব এই: যে সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নয়, তাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করা যায়। ভিন্নজাতীয় অনুভূতি সম্বন্ধে ভাষাবিপর্যয়ের উদাহরণ কেবল বাংলায় নয়, সর্বত্রই পাওয়া যায়। 'মিষ্ট' বিশেষণ শব্দ গোড়ায় স্বাদ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়ে ক্রমে মিষ্ট মুখ, মিষ্ট কথা, মিষ্ট গন্ধ প্রভৃতি নানা স্বতন্ত্র জাতীয় ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো এ জাতীয় নয়। এগুলোকে অর্থবদ্ধ শব্দ বলা অপেক্ষা ধ্বনি বলাই উচিত।

খ) ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো অভিধানকারকের নিকট যথার্থ সম্মান পায়নি। অথচ বর্ণনায় যে অংশ অপেক্ষাকৃত অনির্বচনীয়, সেগুলো ব্যক্ত করার জন্য বাংলা ভাষায় এসব অভিধানের আশ্রয়চ্যুত অব্যক্ত ধ্বনি কাজ করে। যা চঞ্চল, যার বিশেষত্ব অতি সূক্ষ্ম, যার অনুভূতি সহজে সুস্পষ্ট হওয়ার নয়, তাদের জন্য এ ধ্বনিগুলো সংকেতের কাজ করছে।

গ) ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বিকল্পহীন হয়ে ওঠে। কোনো বর্ণ যখন উজ্জ্বলতা হারায়, তখন বলা হয় ম্যাড়ম্যাড় করছে। কেন বলা হয় তার কৈফিয়ত দেওয়া সহজ নয়, কিন্তু যেখানে ম্যাড়ম্যাড়ে বলা আবশ্যক – সেখানে মলিন ম্লান প্রভৃতি আর-কিছু বললে চলে না।

ঘ) গতির দ্রুততা প্রধানত চোখে দেখার বিষয়। 'তীরবেগে চলে গেল' বললে প্রথমে অর্থবোধ ও পরে কল্পনার উদ্রেগ হতে সময় লাগে। কিন্তু যখন বলা হয় ধাঁ করে বা সাঁ করে চলে গেল – তখন ধাঁ বা সাঁ শব্দের অর্থের বালাই না থাকায় তা কল্পনাকে অব্যবহিতভাবে ঠেলা দিয়ে চেতিয়ে তোলে।

ঙ) ধ্বনিবৈচিত্র্য এত সহজে এত বর্ণনাবৈচিত্র্যের অবতারণা করতে পারে যে, তা অর্থবদ্ধ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। সাঁ করে গেল, এবং গটগট করে গেল – উভয়েই দ্রুতগতি প্রকাশ করছে; অথচ দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা অন্য উপায়ে প্রকাশ করতে গেলে হতাশ হতে হয়।

চ) চলা কাটা প্রভৃতি ক্রিয়ার সঙ্গে ধ্বনির সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়; কারণ গতি থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব ছবি ধ্বনির সঙ্গে দূরসম্পর্ক বিশিষ্ট, তাও বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দে ব্যক্ত হয়; যেমন পাতলা জিনিসকে ফিনফিন ফুরফুর ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ছিপছিপে কথাটাও ওইরূপ; সরু বেতই বাতাসে আহত হয়ে ছিপছিপ শব্দ করে, মোটা লাঠি করে না, এজন্য ছিপছিপে লোক বস্তুত কোনো শব্দ না করলেও ছিপছিপে শব্দে তার দেহের বিরলতা সহজেই মনে আসে।

ছ) ধ্বনির সঙ্গে যেসব ভাবের দূর সম্পর্কও নেই, তাও বাংলায় ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়। যেমন কনকনে শীত; কনকন ধ্বনির সঙ্গে শীতের কোনো সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। সর্বপ্রকার শূন্যতা, স্তব্ধতা, এমন-কি নিঃশব্দতাকেও বাংলা ভাষায় ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। এ ভাষায় শূন্যঘর খাঁ খাঁ করে, মধ্যাহ্ন রৌদ্রের স্তব্ধতা ঝাঁ ঝাঁ করে, শূন্য মাঠ ধূ ধূ করে, বৃহৎ জলাশয় থৈ থৈ করে। এসব নিঃশব্দতার ধ্বনি অন্যভাষীদের নিকট কিরূপ বলা মুশকিল, কিন্তু বাংলাভাষীদের কাছে নিরতিশয় স্পষ্ট ভাববহ।

জ) বর্ণকে ধ্বনিরূপে বর্ণনা করা, সেও বাংলা ভাষার আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। যেমন, টকটকে বা টুকটুকে লাল। টকটক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ। ঘোর লাল ইন্দ্রিয়দ্বারে যে-আঘাত করে, তার যদি কোনো শব্দ থাকত, তবে তা বাংলাভাষীদের মতে টকটক শব্দ। আবার সেই রক্তবর্ণ যখন মৃদুতর হয়ে আঘাত করে, তখন তার টকটক শব্দ টুকটুক শব্দে পরিণত হয়।

ঝ) অর্থবহ শব্দও অনেক সময়ে ধ্বন্যাত্মক শব্দে পরিণত হয়। ধবধব শব্দ সম্ভবত গোড়ায় ধবল থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং সংসর্গবশত নিজের অর্থসম্পত্তি হারিয়ে ধ্বনির দলে ভিড়ে গেছে। জ্বলজ্বল শব্দ এর অন্যতর উদাহরণ। চিকচিক গোড়ায় চিক্কণ শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে। চকচক চিকচিক ঝিকঝিক এখন বিশুদ্ধ ধ্বনিমাত্র। আবার সেই চিক্কণতা যদি তৈলাভিষিক্ত হয় তবে তা নীরবে চুকচুক শব্দ করে, যেমন, তেল-চুকচুকে।

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থের আঠার আর একুশ নম্বর পরিচ্ছেদেও রবীন্দ্রনাথ ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রসঙ্গ তুলেছেন। আগের 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধের কয়েকটি সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে এখানে। তাতে দেখা যায়, বাংলা ভাষার অতুলনীয় বর্ণনাশক্তির উৎস হিসাবে আর বাংলার স্বাতন্ত্র্যের নিশানা হিসাবে ধ্বন্যাত্মক শব্দকে ব্যাখ্যার রাবীন্দ্রিক পদ্ধতি তাঁর শেষবয়সেও অক্ষুণ্ন ছিল। ইংরেজির তুলনায় বাংলা ভাষার বর্ণনাশক্তির সূক্ষ্মতা ও পারঙ্গমতা বিষয়ে এখানে তিনি লিখেছেন:

> 'খিট্‌খিটে' শব্দের প্রতিশব্দ ইংরেজিতে আছে irritable, peevish, pettish; কিন্তু 'খিট্‌খিটে' শব্দের মতো এমন তার জোর নেই। নেশায় চুর্‌চুর্ হওয়া, কট্‌মট্ ক'রে তাকানো, ধপাস্ ক'রে পড়া, পা টন্ টন্ করা, গা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করা: ঠিক এ-সব শব্দের ভাব বোঝানো ধাতুপ্রত্যয়ওয়ালা ভাষার কর্ম নয়। ইংরেজিতে বলে creeping sensation, বাংলায় বলে 'গা ছম্‌ছম্ করা'; আমার তো মনে হয় বাংলারই জিত। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৫৩)

তিন. বাংলা বহুবচন: 'বাংলা বহুবচন' নামে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধ আছে। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালে *ভারতী* পত্রিকায়, পরেরটি ১৩১৮ সালে *প্রবাসী* পত্রিকায়। প্রথম প্রবন্ধটি তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির আলোচনা। লেখকের নিজের ভাষ্য-অনুসারে 'দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হ্যর্নলে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ সাহেবের হিন্দিব্যাকরণ, গ্রিয়র্সন সাহেবের মৈথিলী ব্যাকরণ, এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ অবলম্বনে' এই প্রবন্ধ রচিত (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৩৯)। মাঝে-মধ্যে সমকালীন বাংলা ভাষার প্রসঙ্গ এলেও এ প্রবন্ধে মূলত সর্বভারতীয় আর্যভাষাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কই গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক আলোচনা আছে দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে। এ আলোচনা নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হল।

ক) 'গুলা' শব্দযোগে বহুবচনরূপ নিষ্পন্ন করাই বাংলার সাধারণ নিয়ম। বিশেষ স্থলে বিকল্পে শব্দের সঙ্গে 'রা' ও 'এরা' যোগ হয়।

খ) 'রা' ও 'এরা' জীববাচক বিশেষ্যপদ ছাড়া অন্যত্র ব্যবহৃত হয় না। হলন্ত শব্দের সঙ্গে 'এরা' এবং স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে 'রা' যুক্ত হয়। যদিও কথ্যভাষায় এই 'এরা' চিহ্নের 'এ' প্রায়ই লুপ্ত হয়ে থাকে।

গ) ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যপদেরও বহুবচনরূপ হয়ে থাকে। যথা, রামেরা – অর্থাৎ রাম ও আনুষঙ্গিক অন্য সকলে। এরূপ স্থলে গুলা-গুলির প্রয়োগ হয় না। রামগুলি বললে বোঝাবে অনেকগুলি রাম। এ থেকে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'এরা' সম্বন্ধকারকরূপ থেকে উৎপন্ন। অর্থাৎ রামের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যারা তারাই 'রামেরা'। এখানে উল্লেখ করা দরকার, 'বাংলা বহুবচন' নামের প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে এ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

ঘ) 'সব', 'সকল' ও 'সমুদয়' বিশেষ্যের আগে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়ে বহুত্ব প্রকাশ করে। 'সব লোক' এবং 'লোকগুলি'র মধ্যে অর্থভেদ আছে। 'সব লোক' ইংরেজিতে all men এবং 'লোকগুলি' the men।

ঙ) লেখ্য-বাংলায় 'সকল' ও 'সমুদয়' বিশেষ্যপদের পরে বসে। কিন্তু কথিত বাংলায় এ রকম হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এইরূপ প্রয়োগ সম্ভবত আধুনিককালে গদ্যরচনা সৃষ্টির সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছে'।

চ) প্রাচীন বাংলায় 'সব' বিশেষ্যের পরে বসত। এখন কেবল কাব্যে এরূপ ব্যবহার আছে। সব বসাতে হলে আগে বিশেষ্যপদের বহুবচন করে নিতে হয়। যেমন, পাখিরা সব, ছেলেরা সব, দোয়াতগুলো সব ইত্যাদি।

ছ) 'অনেক', 'বিস্তর' এবং কথ্য-বাংলার 'ঢের' প্রভৃতি শব্দের আগে বসে।

জ) প্রাকৃত বাংলার আরেক বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ 'গুচ্ছার'। 'ইহা প্রায়ই বিরক্তি-প্রকাশক'।

ঝ) গণ, দল, সমূহ, বৃন্দ, বর্গ, কুল, চয়, মালা, শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি প্রভৃতি শব্দযোগে বিশেষ্যপদ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু 'ইহা সংস্কৃত রীতি'। এ জন্য অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্যত্র এগুলোর ব্যবহার নেই। এর মধ্যে 'গণ' প্রাকৃত বাংলার অন্তর্গত হয়েছে। বস্তুত এ তালিকার অনেকগুলো আদতে বহুবচন চিহ্ন নয়। এরা সমষ্টিবোধক। এ কারণেই এগুলোর পরেও বহুবচনচিহ্ন বসে। যেমন, সৈন্যগণেরা, পদাতিক দলেরা ইত্যাদি।

ঞ) প্রাকৃত বাংলার এরূপ সমষ্টিবোধক শব্দ ঝাঁক, গোচ্ছা, আঁটি, গ্রাস। এগুলো সমাসরূপে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় না। যেমন, পাখির ঝাঁক, চাবির গোচ্ছা, ধানের আঁটি ইত্যাদি।

ট) 'পত্র' শব্দযোগে বাংলার অনেক শব্দ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। যেমন, গহনাপত্র, আসবাবপত্র, ঔষধপত্র ইত্যাদি। বাংলা বহুবচনে নানারকম দ্বিত্বের ব্যবহার একদিকে বাংলা ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। অন্যত্র 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৭৫-৭৮)।

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ আবার বহুবচন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং পূর্বোক্ত প্রবন্ধের মতকেই অনুসরণ করেছে। তবে এখানেও তিনি বাংলা বহুবচনের বৈচিত্র্য, নিজস্বতা, সমৃদ্ধি আর অর্থগত তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় বাংলা বহুবচনের রূপরীতি নতুনভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে। পরবর্তী আলোচকদের – যেমন সুনীতিকুমার বা সুকুমার সেন – অন্তত ভাষার সমকালিক বা সিনক্রোনিক আলোচনায় এর বাইরে যেতে হয়নি।

চার. বাংলা নির্দেশক: টি, টা, খানা, খানি, টুকু, টুকুন, গাছা, গাছি ইত্যাদি বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ 'নির্দেশক' পারিভাষিক ব্যবহার করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন 'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য' এবং 'বাংলা নির্দেশক'

প্রবন্ধে। পরে *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের পনেরতম পরিচ্ছেদেও খুব সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন। 'বিশেষ বিশেষ্য' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে 'সামান্য বিশেষ্যে'র বিপরীতে। এ সম্পর্কে তাঁর কথাগুলো নিম্নোক্তভাবে সাজানো যেতে পারে (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৪৩-৫১; রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৪৩):

ক) বাংলায় টি ও টা সংকেতের দ্বারা একটিমাত্র পদার্থকে বিশিষ্ট করা হয়। যখন বলা হয় 'রাস্তা কোন্ দিকে' তখন সাধারণভাবে পথ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, বিশেষ কোনো রাস্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থাকলে বলা হয় 'রাস্তাটা কোন দিকে'।

খ) এদিক থেকে ইংরেজি the শব্দের তুলনায় বাংলা 'টি'-র প্রয়োগ অনেক সীমিত। 'মধু বাহিরে নাই' বা 'মধু ঘরে আছে' – এ ধরনের বাক্যে 'টি' বসে না। বিশেষভাবে কোনো কক্ষের কথা বলতে গেলে বলতে হয় – 'ঘরটাতে মধু আছে'। বক্তা যে কথাটার ওপর জোর দিতে চান, তার সঙ্গেই 'টি' বা 'টা' যোগ করেন। যেমন, গরুটা মাঠে চরছে, আর মাঠটাতে গরু চরছে – এই দুই বাক্যের প্রথমটাতে 'গরু' আর দ্বিতীয়টাতে 'মাঠ' কথাটার ওপর জোর পড়েছে।

গ) 'টি' অনেকসময়ে ছোটো আয়তনের জিনিস ও আদরের জিনিস সম্বন্ধে এবং 'টা' বড় জিনিস ও অবজ্ঞা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত নামসংজ্ঞার সঙ্গে বা গুণবাচক বিশেষ্যে 'টা' 'টি' বসে না। কিন্তু বিশেষ অর্থে বসতে পারে। যেমন, হরিটা বাড়ি গেছে। গিরিডির কয়লাটা ভালো। উমার লজ্জাটা বেশি।

ঘ) কর্তৃবাচক বিশেষ্যকে সাধারণভাবে উল্লেখ করে পরিচয়জ্ঞাপক বিশেষ্যকে বিশেষভাবে নির্দেশ করা হলে শেষোক্ত বিশেষ্যের সঙ্গে নির্দেশক বসে। যেমন, হরি মানুষটা ভালো।

ঙ) সর্বনাম বিশেষণপদ বিশেষ্যের আগে থাকলে বিশেষ্যের সঙ্গে নির্দেশক বসে। যেমন, এই বইটা; আমার কলমটা।

চ) বিশেষণ পদের সঙ্গে নির্দেশক যোগ করলে তা বিশেষ্য হয়ে যায়। যেমন, অর্ধেকটা রাখো; আমারটা লও। সংখ্যাবাচক শব্দের ক্ষেত্রে নির্দেশক যুক্ত হলেও শব্দটি বিশেষণ থাকে। যথা, একটা গাছ; দুইটি মেয়ে।

ছ) নির্দেশক-চিহ্ন-যুক্ত বিশেষ্যপদে কারকের চিহ্ন নির্দেশকের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন, লোকটাকে; বাড়িটাকে। এ ক্ষেত্রে অচেতন পদার্থবাচক বিশেষ্যপদেও কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি বসতে পারে। যথা, টেবিলটাকে; লোহাটাকে।

জ) 'টাক্' প্রত্যয়টি টা ও এক শব্দের সন্ধিজাত। ক্রোশটাক্ পথ, সেরটাক্ দুধ ইত্যাদিতে 'টাক্'যুক্ত শব্দগুলো বিশেষণ হিসাবে কাজ করে। তবে বিশেষ্য হিসাবেও কাজ করতে পারে। যেমন, পোয়াটাক্ হলেই চলবে।

ঝ) খানা/খানি ব্যবহারে সকলের অভ্যাস সমান নয়। সাধারণভাবে জীব সম্বন্ধে এর ব্যবহার নেই। তবে দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, দেহখানি, হাতখানা। অরূপ পদার্থে ব্যবহৃত হয় না। তবে ব্যতিক্রম আছে। যেমন, ভাবখানা, চলনখানি। যে বস্তু অবয়ব গ্রহণ না করে তরল বা বিচ্ছিন্ন থাকে, তাদের সম্বন্ধে খানা/খানি বসে না। তবে 'অনেক' বিশেষণের সঙ্গে 'খানি' যোগ করে ব্যবহৃত হয়। যেমন, অনেকখানি দুধ। খানা/খানির বদলে টি/টা বসতে পারে; কিন্তু বিপরীতটি সর্বত্র ঘটে না।

ঞ) গাছা/গাছিও জীব সম্বন্ধে বসে না। সরু লম্বা জিনিসের সঙ্গে বসে। যেমন, দড়িগাছা, চুলগাছি।

ট) টু, টুক, টুকু স্বল্পতাসূচক। সজীব পদার্থে এর ব্যবহার নেই। তবে পরিহাস করে 'মানুষটুকু' বলা যেতে পারে। গড়নওয়ালা জিনিসে এগুলো বসে না। 'চুনটুকু' বলা যায়, কিন্তু 'আংটিটুকু' নয়। তবে টুকরা বা খণ্ড করা যায়, এমন পদার্থের ক্ষেত্রে টুকু যুক্ত করা যায়। যেমন, কাপড়টুকু। একটুকু বা একটু হয়, কিন্তু দুটুকু বা তিনটুকু হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. বাংলা প্রত্যয়ঃ বাংলা প্রত্যয় সম্পর্কে *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইয়ের 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো প্রত্যয়ের ব্যবহারবিধি প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত বাংলা প্রত্যয়গুলো হলঃ অ, আ, আন্, আন্+অ, অন্, অন্+আ, ই, আ+ই, ই+আ, উ, উ+আ, আ+ও, ও+আ, অন্+ই, না, আনা, ল্, র্, আল্, ল্+আ, ল্+ই+আ, আড়ু, আড়ু+ই+আ, রা ও ড়া, আরি, আরু, ক্, আক্, উক্, ইক্, ক্+আ, ক্+ই+আ, গির্+ই, দার্, দান্, সই, পনা, ওলা বা ওয়ালা, তর, অৎ, অৎ+আ, তা, অৎ+ই, অৎ+আ+ই, অন্ত, মন্ত, ট্, ট্+ই, উ, আ+ট্, টা, আট্+ই+আ, অং/আং/ইং, অঙ্গ/আঙ্গ/আঙ্গিয়া, চ/চা/চি, অস্, সা, সা+ইয়া, আম, আম+ই, স্ত্রীলিঙ্গে ই, স্ত্রীলিঙ্গে নি ইত্যাদি (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৯১-১০৩)। বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে এই তালিকা সম্পূর্ণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন সেখানে। তিনি লক্ষ করেছেন, এবং নিজে যে তালিকা করেছিলেন তাতেও দেখা গেছে, বাংলা প্রত্যয় অন্তত সংস্কৃত প্রত্যয়ের মতো নিয়ম মানে না। কেন কোনো একটি প্রত্যয় কিছু শব্দ বেছে নেয় আর কিছু শব্দে বসে না, তার কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাঁর ধারণা ছিল, তালিকা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ হলে সে কারণও খুঁজে পাওয়া যাবে। সে কাজ আর তিনিও করেননি, অন্য কেউও এগিয়ে আসেনি।[১৩] *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে দেখা যায় (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৩২-৩৩), তিনি এ প্রকল্প মোটামুটি পরিহার করেছেন।[১৪] কিন্তু এখানেও তিনি আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, খাঁটি বাংলায় কিছু প্রত্যয় (মো, পনা, আনা, গিরি, অনি বা আনি, ইআ> এ, উআ> ও) 'অর্থগত ব্যবহার অতিক্রম করে ... ইঙ্গিতের দিকে পৌঁচেছে' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৩৪)। এই দিকটা শুধু সংস্কৃত কেন, তাঁর ধারণা, অন্য কোনো ভাষাতেই নেই।

বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থের 'স্ত্রীলিঙ্গ' প্রবন্ধে বাংলা স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহারবিধি আলোচিত হয়েছে (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৫৬-৫৮)। এ আলোচনা নিচে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হল।

ক) ভারতবর্ষের অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষায় শব্দগুলো অনেকস্থলে বিনা কারণেই স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছে। বাংলা শব্দে এরূপ অকারণ, কাল্পনিক, বা উচ্চারণমূলক স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই।[১৫]

খ) সাধারণত ই এবং ঈ প্রত্যয় ও নি এবং নী প্রত্যয়যোগে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয়। তাঁর মতে, এগুলো প্রচলিত আছে, কিন্তু এগুলোকে কোনো স্থির নিয়মভুক্ত করা যায় না।

গ) সংস্কৃত ভাষার মতো বাংলা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গশব্দের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। বাংলায় লিখিত বা কথিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারকালে স্ত্রীলিঙ্গশব্দের বিশেষণে কখনো কখনো স্ত্রীলিঙ্গরূপ ব্যবহার হয় – 'কিন্তু ক্রমশ ভাষা যতই সহজ হইতেছে ততই ইহা কমিয়া আসিতেছে'।

ঘ) বিশেষণ শব্দ বাংলায় স্ত্রীপ্রত্যয় প্রাপ্ত হয় না কিন্তু বিশেষণপদ বিশেষ্য অর্থ গ্রহণ করলে এ নিয়ম সর্বত্র খাটে না। খেঁদী, নেকী তার উদাহরণ।

ঙ) বাংলায় বৃহত্ত্ব অর্থে আ ও ক্ষুদ্রত্ব অর্থে ই প্রত্যয় প্রয়োগ হয়ে থাকে, অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার দৃষ্টান্ত অনুসারে এদেরকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ গণ্য করা যেতে পারে।

চ) টা ও টি, গুলা ও গুলি, স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয় প্রকার শব্দেই ব্যবহৃত হয়। যেমন, মেয়েগুলো ছেলেগুলি, বউটা জামাইটি ইত্যাদি।

ছয়. তির্যকরূপ: মারাঠি, হিন্দি প্রভৃতি অধিকাংশ গৌড়ীয় ভাষায় শব্দকে আড় করে বলার প্রথা আছে। যেমন, হিন্দিতে 'কুত্তা' সহজরূপ, 'কুত্তে' বিকৃতরূপ। 'ঘোড়া' সহজরূপ, 'ঘোড়ে' বিকৃতরূপ। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে শুরু করে চলতি ব্যবহারে এ রকম দৃষ্টান্ত বিস্তর পাওয়া যায়।[১৬] ইংরেজি oblique form থেকে রবীন্দ্রনাথ একে তির্যকরূপ নাম দিয়েছেন। 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে এবং *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের ষোল-সংখ্যক পরিচ্ছেদে কর্তৃকারক প্রসঙ্গে তির্যকরূপের কথা এসেছে। আগে 'বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ' প্রবন্ধে তিনি একই আলোচনা আরো বিস্তৃতভাবে করেছিলেন। এখানে সূত্রাকারে তা উল্লেখিত হল (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৩৭-৪২)।

ক) তির্যকরূপে সহজরূপ থেকে অর্থের ভিন্নতা ঘটে কখনো কখনো। যেমন, হাত থেকে হাতা; জামার হাতা বা পাকশালার উপকরণ হাতা। পা থেকে 'চৌকির পায়া'।

খ) বাংলা বিশেষণ পদ যে সাধারণত স্বরান্ত হয়, রবীন্দ্রনাথের মতে তার এক কারণ এই তির্যকরূপ। সংস্কৃত খঞ্জ থেকে বাংলায় হয়েছে খোঁড়া, অর্ধ থেকে আধা।

গ) সামান্য বিশেষ্যপদ যখন জীববাচক হয় তখনই তা তির্যকরূপ গ্রহণ করে। 'গাছে নড়ে' বলা হয় না, কিন্তু 'বানরে লাফায়' বলা হয়। বলা যায়, সকর্মক ক্রিয়ার সহযোগেই জীববাচক সামান্য বিশেষ্যপদ কর্তৃকারকে তির্যকরূপ ধারণ করে। কিন্তু 'সকর্মক' ও 'অকর্মক' সব জায়গায় খাটে না। রবীন্দ্রনাথ তাই দুটি নতুন পারিভাষিক প্রস্তাব করেছেন – 'সচেষ্টক' ও 'অচেষ্টক'। কর্ম সব ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে, কিন্তু কর্তার সক্রিয়তা থাকবে।

ঘ) 'সব' এবং 'সকল' শব্দ দুটি বিশেষণ, কিন্তু তির্যকরূপ ধারণ করে বিশেষ্যপদ হয়। কথ্য-বাংলায় 'সব' শব্দটি বিশেষ্যরূপ গ্রহণকালে দ্বিগুণভাবে তির্যকরূপ প্রাপ্ত হয় – প্রথমে 'সব' থেকে 'সবা'; পরে 'এ' যুক্ত হয়ে 'সবাএ'। এর উচ্চারণ হয় সবাই।

ঙ) নামসংজ্ঞায় তির্যকরূপ ব্যবহৃত হয় না। 'রামে মারলেও মরব রাবণে মারলেও মরব' – এখানে রাম ও রাবণ 'এ' যোগে ভিন্ন-অর্থ প্রাপ্ত হয়ে দুই প্রতিপক্ষকে বোঝাচ্ছে। যখন বলা হয় 'লোকে বলে' তখন সমষ্টি বোঝায়।

সাত. কারক-বিভক্তি: কারক-বিভক্তির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষাগুলো ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সংস্কৃত কারক-বিভক্তির ছক মান্য করেননি। বাংলায় সম্প্রদান কারকের কোনো চিহ্ন না থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারকের উপস্থিতি তাঁর তীব্রতম তিরস্কারের শিকার হয়েছে 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে:

> সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদানকারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদানকারক জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়, তবে এ কথাই বা কেন না বলা যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে। ... 'তাহাকে দিলাম' যদি সম্প্রদানকারকের কোঠায় পড়ে, তবে 'তাহাকে মারিলাম' সন্তাড়ন-কারক; 'ছেলেকে কোলে লইলাম' সংলালন-কারক; ... এবং এক বাংলা কর্ম-কারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১০৬-০৭)

এ ধরনের আলোচনা সেকালের বৈয়াকরণদের আরো অনেকে করেছেন। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদানকারক ঘুরেফিরে রয়েই গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় কোথাও সম্প্রদানের উল্লেখ করেননি। সংস্কৃতের কারক-সংখ্যা আর বিভক্তির সঙ্গে না মিলিয়ে তিনি চলতি বাংলার উদাহরণ থেকে কারক-বিভক্তি ব্যাখ্যার সম্ভাব্য পদ্ধতি উদ্ভাবন

করতে চেয়েছেন। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইয়ের 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৫-২৭) এবং *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের চোদ্দ, ষোল ও সতের-সংখ্যক পরিচ্ছেদে কারক-বিভক্তির আলোচনা স্থান পেয়েছে (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৪২-৪৬)। তাছাড়া সম্বন্ধের বিশেষ বিভক্তি 'কার' প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'সম্বন্ধে কার' প্রবন্ধে (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪০-৪২)। এসব আলোচনার সারসংক্ষেপ নিচে উপস্থাপন করা হল।

কর্তৃকারক: কর্তৃকারকে একবচনে যে বিভক্তি পাওয়া যায়, (বাঘে মানুষ খায়, ঘোড়ায় লাথি মারে ইত্যাদি বাক্যে), রবীন্দ্রনাথ তাকে তির্যকরূপ নামে ব্যাখ্যা করতে চান। আরেকটি মন্তব্য তিনি করেছেন – এখানে 'বাঘে' 'ঘোড়ায়' শব্দগুলি কর্তৃকারক ও করণকারকের খিচুড়ি। পরে বিজয়চন্দ্র মজুমদার এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রাকৃত ও বাংলা থেকে দৃষ্টান্ত দেখালে তিনি এ সিদ্ধান্ত পরিহার করে নেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৩০)। *বাংলাভাষা-পরিচয়ে* লিখেছেন, বাংলা বিশেষ্যপদে সংস্কৃত বিশেষ্যশব্দের অনুস্বার বিসর্গ না থাকাতে কর্তৃকারকে চিহ্নের উৎপাত নেই। মাঝে মাঝে একারের সংকেত দেখা যায়, যেমন: পাগলে কী না বলে। এ প্রসঙ্গে আবার তির্যকরূপের প্রসঙ্গ এসেছে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একটা অনুমান আবার বলা হয়েছে: 'এই তির্যক্‌রূপের ভিতর দিয়েই কারকের বিভক্তিগুলো তৈরি হয়েছে, আর হয়েছে বহুবচনের রূপ' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৪৪)।
কর্তৃকারকের বিভক্তি: এ, য়, তে।
কর্মকারক: কর্মকারকে সাধারণত প্রাণীপদার্থ সম্পর্কেই 'কে' বিভক্তি প্রয়োগ হয়। তবে অপ্রাণীবাচক শব্দের উত্তরে 'টা' বা 'টি' যোগ করলে কর্মকারকে তদুত্তরে 'কে' বিভক্তি হয়। যেমন, চৌকিটাকে সরিয়ে দাও; গাছটাকে কাট। এ থেকে বোঝা যায়, 'টি' বা 'টা' যোগ করলে শব্দবিশেষের অর্থ এমন একটা সুনির্দিষ্টতার জোর পায় যে তা যেন কতকটা প্রাণের গৌরব লাভ করে। 'লোহাকে সোনা করা যায়' বাক্যে 'লোহা' সেরূপ যেন ব্যক্তিবিশেষের ভাব ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, পুরোনো কাব্যসাহিত্যে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি বেশি ব্যবহৃত হয়নি। আধুনিক কথ্য-বাংলায় ব্যক্তিবাচক বা জীববাচক বিশেষ্যে কর্মকারকের কে বিভক্তি বসে। 'যে বিশেষ্যপদ সাধারণবাচক তার বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন কাজে লাগে না'। যেমন, রাখাল গোরু চরায়। 'গোরুকে' চরায় না। কিন্তু বিশেষ ব্যাপারে 'কে' বিভক্তি বসতে পারে। যেমন, ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো।
কর্মকারকের বিভক্তি: কে।
করণকারক: 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে করণকারকের তিনটি বিভক্তি দেখানো হয়েছে – দিয়ে (ছড়ি দিয়ে মারে), এ (ঘোলে দুধের সাধ মেটে না), য় (কথায় চিঁড়ে ভেজে না)।
বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থে বলা হয়েছে, দ্বারা, দিয়ে, ক'রে: এই তিনটি করণকারকের প্রধান উপকরণ। বাংলা সর্বনাম করণকারকে একটা বিভক্তির উপরে আর-একটি চিহ্ন জোড়া হয়। বিভক্তি সম্বন্ধপদের, যেমন 'আমার', ওতে জোড়া হয় 'দ্বারা' শব্দ: আমার দ্বারা। আর-একটা শব্দচিহ্ন 'দিয়ে'। তার বেলায় মূলশব্দে লাগে কর্মকারকের বিভক্তি: আমাকে দিয়ে। সর্বনামে যেখানে কে বিভক্তি যুক্ত হয়, বিশেষ্যে সেখানে হয় এ। যথা, হাতে মারা ভালো। তবে অন্য বিভক্তি ছাড়াও করণ হতে পারে। যেমন, মন দিয়ে কাজ করো।
অপাদানকারক: বাংলা অপাদানের সম্বল 'হতে' আর 'থেকে'। হতে এবং থেকে সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের একটা সিদ্ধান্ত এ রকম: 'মানুষ থেকে গন্ধ বেরচ্ছে' বলা হয় না, বলা হয় 'মানুষের গা থেকে' কিংবা 'কাপড় থেকে'। এর কারণ,

Dhaka University Institutional Repository

অচেতন পদার্থের নামের সঙ্গেই ‘থেকে’ শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তাই ‘মেঘ থেকে’ বৃষ্টি নামে, ‘পাখি থেকে’ গান ওঠে না, ‘পাখির কণ্ঠ থেকে’ গান ওঠে। ‘হতে’ সম্পর্কেও এ কথা খাটে। ‘অযোধ্যা হতে’ রাম নির্বাসিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন ‘রাবণের কাছ হতে’।

‘বাংলা কথ্যভাষা’ প্রবন্ধে অপাদানের চিহ্ন দেখানো হয়েছে তিনটি – চেয়ে/চাইতে (রামের চেয়ে শ্যাম বড়ো), থেকে (ঘর থেকে বেরোও) এবং হোতে (তোমা হোতেই এটা ঘট্‌ল)।

অধিকরণকারক: অধিকরণের বিভক্তি তিনটি – এ (পকেটে টাকা), য় (লতায় ফুল), তে (নদীতে জল)।

সম্বন্ধ: সম্বন্ধে র (গাছের পাতা), কের (আজকের কথা) এবং কার (সেদিনকার ছেলে) বিভক্তি হয়।

উচ্চারণের বিশেষ নিয়মঘটিত কারণে অনেকসময়ে বিভক্তির পরিবর্তন হয়ে থাকে; যেমন অধিকরণে মাটির বেলায় মাটিতে, ঘোড়ার বেলায় ঘোড়ায়। কিন্তু ‘কারে’র স্থলে সে কথা খাটে না। লিখন শব্দের বেলায় বলা হয় লিখনের, কিন্তু এখন শব্দের বেলায় বলা হয় – এখনকার। অথচ লিখন এবং এখন শব্দে উচ্চারণনিয়মের কোনো প্রভেদ হওয়ার কথা নয়। বাংলায় কোন্ কোন্ স্থলে সম্বন্ধে ‘কার’ শব্দের প্রয়োগ হয় তার একটি তালিকা এরূপ: এখনকার, তখনকার, এখানকার, সেখানকার, এ-বেলাকার, এ-সময়কার, সে-বছরকার, যে-দিনকার, এ-দিককার, আজকেকার, এপারকার, এ-ধারকার, এ-হপ্তাকার, আগেকার, একালকার, প্রথমকার, ভিতরকার, আগেকার, সকালকার ইত্যাদি। এই তালিকা হতে দেখা যায় সময় এবং অবস্থানসূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে কার বিভক্তির যোগ।

কিন্তু তারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। দিনের বেলা বলা হয়, দিনকার বেলা নয়। অথচ সেদিনকার শব্দ প্রচলিত আছে। সময় শব্দের সম্বন্ধে সময়ের চলে, অথচ তৎপূর্বে এ সে প্রভৃতি সর্বনাম যোগ করলে সম্বন্ধে কার বিভক্তি বিকল্পে প্রয়োগ হয়ে থাকে।

এতে প্রমাণ হয়, সময় ও দেশ সম্বন্ধে যেখানে বিশেষ সীমা নির্দিষ্ট হয়, সেখানেই কার শব্দ প্রয়োগ হতে পারে। সেদিনের কথা এবং সেদিনকার কথা – এ দুটো শব্দের একটা সূক্ষ্ম অর্থভেদ আছে। সেদিনের অর্থ অপেক্ষাকৃত অনির্দিষ্ট, সেদিনের কথা বললে অতীতকালের অনেক দিনের কথা বোঝাতে পারে, কিন্তু সেদিনকার কথা বলতে বিশেষ একটি দিনের কথা বোঝায়। যেখানে সেই বিশেষত্বের উপর বেশি জোর দেবার প্রয়োজন, কোনোমতে দেশ বা কালের একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করবার জো নেই, সেখানে এর বিভক্তির বদলে কার বিভক্তি হয়। অতএব বিশেষার্থবোধক, সময় এবং অবস্থানসূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের উত্তরে সম্বন্ধে কার প্রত্যয় হয়।

কিছু ব্যতিক্রম আছে। একজনকার, দুইজনকার ইত্যাদি মনুষ্যসংখ্যাবাচক, দেশকালবাচক নহে। সময়বাচক বিশেষ্য শব্দ সম্বন্ধে অনেকগুলো ব্যতিক্রম দেখা যায়। মাস, মুহূর্ত, দণ্ড, ঘণ্টা প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে কার শব্দের যোগ হয় না। এর কারণ নির্ধারণ সুকঠিন। তবে দেশ সম্বন্ধে একটা মোটা নিয়ম পাওয়া যায়। দেশবাচক যে সকল শব্দে সংস্কৃতে বর্তী শব্দ হতে পারে, বাংলায় সে সকল স্থানে কার ব্যবহৃত হয়। উর্ধ্ববর্তী নিম্নবর্তী সম্মুখবর্তী পশ্চাদ্বর্তী অগ্রবর্তী প্রভৃতি শব্দের স্থলে বাংলায় উপরকার নিচেকার সামনেকার পিছনকার আগেকার ইত্যাদি প্রচলিত।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন কারকে সর্বনামের রূপও দেখিয়েছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৭)। কিন্তু কোথাও বিভক্তির নাম উল্লেখ করেননি। বিভিন্ন কারকের বিভক্তি নির্দিষ্ট করে সংস্কৃতের অনুসরণে ব্যাখ্যা করার প্রচলিত রীতি মানেননি। সম্প্রদান নামটিও সর্বত্র অনুল্লিখিত থেকে গেছে।

আট. সর্বনাম প্রসঙ্গে: 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সর্বনামের একটি লম্বা তালিকা তৈরি করেছেন এবং বিভিন্ন কারক-অনুযায়ী এগুলোর ব্যবহারিক রূপ চিহ্নিত করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৭)।

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে সর্বনাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৩৭-৪৩)। রবীন্দ্রনাথ এখানে এক ধরনের শ্রেণিকরণ করতে চেয়েছেন। অনেকগুলো সর্বনামরূপের উৎসও নির্দেশ করেছেন। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও তাঁর মূল আগ্রহ চালু ভাষায় সর্বনামের ব্যবহারবিধি পরীক্ষা করা। এদিক থেকে তাঁর কয়েকটি পর্যবেক্ষণ এভাবে সূত্রবদ্ধ করা যায়:

ক) বাংলাভাষায় সর্বনামের খুব ঘটা। নানা শ্রেণির সর্বনাম, যথা, ব্যক্তিবাচক, স্থানবাচক, কালবাচক, পরিণামবাচক, তুলনাবাচক, প্রশ্নবাচক।

খ) ব্যক্তিবাচক সর্বনাম আমি, তুমি, আপনি, তিনি মানুষ সম্বন্ধেই খাটে। 'সে' কেবলমাত্র মানুষ নয় জন্তু সম্বন্ধেও খাটে। 'সে' থেকে বিশেষণ শব্দ হয়েছে 'সেই'। মানুষ, গাছ, গরু সর্বত্রই এর ব্যবহার হয়। 'এ' থেকে হয়েছে 'এই'। 'এ' বোঝায় কাছের বর্তমান পদার্থকে, 'সে' বোঝায় অবর্তমানকে। সম্মানার্থে 'এ' থেকে হয়েছে 'ইনি'।

গ) বাংলা ভাষার একটা বিশেষত্ব এই যে, সর্বনামে লিঙ্গভেদ নেই। বাংলায় ক্লীবলিঙ্গের নির্দেশ আছে, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের নেই। সে এ ও তিনি ইনি উনি: স্ত্রীও হয় পুরুষও হয়। ক্লীবলিঙ্গে 'সে' 'এ' 'ও' শব্দে নির্দেশক চিহ্ন যোগ করা চাই, যেমন, সেটা ওটা সেখানা ওখানা।

ঘ) 'যে' মানবার্থক। অন্য জীব বা বস্তুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হলে সে বস্তু, নির্বস্তুক শব্দ বা জীবের নাম সঙ্গে জুড়াতে হয়। যেমন, যে কুকুর, যে ঘটি, যে স্নেহ। 'যে' অসম্পূর্ণার্থক সর্বনাম বিশেষণ, মানবার্থে তা পূরণ হয় 'ও' এবং 'সে' দিয়ে। কখনো কখনো বাক্যকে অসম্পূর্ণ রেখেও 'যে' ব্যবহৃত হয়, যেমন, যে তোমার বুদ্ধি। বাকিটুকু উহ্য থাকে বলেই এর দংশনের জোর বেশি।

ঙ) মানুষ ছাড়া অন্য কিছু বা সমূহকে বোঝাতে গেলে 'যা' বসাতে হয়। কিন্তু 'যারা' শব্দ 'যা'র বহুবচন নয়, 'যে' শব্দেরই বহুবচন, তাই ওর প্রয়োগ মানবার্থে। 'তা' বোঝায় অচেতনকে, কিন্তু 'তারা' বোঝায় মানুষকে। 'তারা' 'সে' শব্দের বহুবচন।

চ) যত এত তত অত কত প্রভৃতি পরিমাণবাচক। এর মধ্যে 'তত' ছাড়া আর সবগুলিতে দ্বিত্ব চলে।

ছ) এখন তখন যখন কখন কালবাচক।

জ) 'কখন' শব্দ প্রায়ই প্রশ্নসূচক, কিন্তু কখনো প্রশ্নার্থক হয় না। প্রশ্নের ভাবে যখন বলা হয় 'সে কখনো এ কাজ করে' তখন 'কি' উহ্য থাকে। দ্বিত্বে 'কখনো' শব্দের অর্থ 'মাঝে মাঝে'। 'কখনোই' একটা না চায়: কখনোই হবে না।

ঝ) যেমন তেমন অমন এমন কেমন তুলনাবাচক সর্বনাম। 'কেমন' শব্দের দ্বৈতে সন্দেহ বোঝায়: কেমন কেমন ঠেকছে। 'যেন' যোগ করলে সন্দেহটা আরো ঘনীভূত হয়: লোকটাকে কেমন যেন ঠেকছে।

ঞ) 'কেন' প্রশ্নবাচক সর্বনাম। এর রূপটা করণকারকের। ঘটনা ঘটল কেন: অর্থাৎ ঘটল কী কারণের দ্বারা। 'কেন'র সঙ্গে 'বা' যুক্ত হলে অর্থব্যঞ্জনা বদলে যায়: 'কেন বা কাঁদছে' বললে কান্নাটা যে অবোধ্য বা ব্যর্থ তা বোঝায়। আর এর সঙ্গে 'ই' যুক্ত হলে তীক্ষ্ণতা আরো বেড়ে যায়। কেনই বা মরতে এখানে এলুম: এ হল পরিতাপের ধিক্কার। 'কী' শব্দের মধ্যেও একই ধরনের ভঙ্গি আছে।

নয়. অব্যয় প্রসঙ্গেঃ অব্যয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন প্রধানত *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের বিশ নম্বর পরিচ্ছেদে। অধ্যায়টি শেষ হয়েছে এভাবে: 'অব্যয় শব্দ আরো অনেক আছে, কিন্তু এইখানেই শেষ করা যাক'। অর্থাৎ নিঃশেষে অব্যয়ের তালিকা প্রণয়ন করে আলোচনা তিনি করেননি। যেগুলো সম্পর্কে তাঁর বিশেষভাবে বলবার কথা ছিল, সেগুলোর আলোচনাই করেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কয়েকটি নিচে উদ্ধৃত হল (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৫০-৫২):

ক) এবং আর ও – এ তিনটি হল যোজক অব্যয়। 'এবং' সংস্কৃত শব্দ। পুরোনো কাব্যে এর ব্যবহার পাওয়া যায় না; আধুনিক কাব্যেও নেই। এখন গদ্যে ইংরেজি and শব্দের অর্থে চলছে। খাঁটি বাংলা যোজক-শব্দ 'আর' সংস্কৃত 'অপর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'এবং' শব্দ তার অর্থের অসংগতি সত্ত্বেও পুরাতন 'আর'কে সাধুভাষা থেকে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছে। তাড়ানো যে গেছে তার কারণ, স্বাভাবিক বাংলায় দ্বন্দ্বসমাসেই যোজকের কাজ সারা হয়। যেমন, হাতিঘোড়া লোকলস্কর নিয়ে রাজা চলেছেন। ইংরেজিতে এখানে and না হলে চলে না।[১৭]

খ) 'আর' শব্দের আরো কয়েকটি ব্যবহার আছে। যেমন, আর কত খাবে – এখানে অতিরিক্ত অর্থে; আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না – এখানে পুনশ্চ অর্থে। তোমাকে আর চালাকি করতে হবে না – প্রভৃতি ভঙ্গিওয়ালা কথায়ও 'আর' ব্যবহৃত হয়।

গ) সাহিত্যে 'ও' শব্দটা 'এবং'-এর সমান পর্যায়ে চলেছে। কিন্তু চলতি কথায় 'ও' সংস্কৃত 'চ'-এর মতো। যেমন, আমি যাচ্ছি তুমিও যাবে। যোজক 'ও'র উৎপত্তি ফার্সি উঅ (অন্ত্যস্থ ব) থেকে। সুতরাং and-এর প্রতিশব্দ রূপে অবৈধ নয়। কিন্তু এটি বাংলায় ভালো করে মিশ খায়নি। তুমি ও আমি একসঙ্গেই যাবঃ এ খাঁটি বাংলা নয়। বলা যায়ঃ তুমি আমি একসঙ্গেই যাব। সে এগোয়ও না পিছোয়ও নাঃ 'ও' শব্দের এই যথার্থ ব্যবহার। সে এগোয় না ও পিছোয় নাঃ এ বাক্যটা দুর্বল।

ঘ) প্রয়োগবিশেষে 'যে' সর্বনামশব্দ অব্যয়রূপ ধারণ করে, যেমন, হরি যে গেল না। 'তা' শব্দটাও কোথাও সর্বনাম কোথাও অব্যয়। তা, এক কাজ করলে হয়ঃ একটা বিশেষ কাজের দিক ধরিয়ে দিল 'তা'।

ঙ) 'বুঝি' সহজ অর্থে 'বোধ করি'। অথচ বাংলা ভাষায় 'বুঝি', 'বোধ করি', 'বোধ হচ্ছে' বললে সংশয়যুক্ত অনুমান বোঝায়।

চ) 'তো' অব্যয়ে অনেক স্থলে 'তবু' বোঝায়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ভর্ৎসনা বা বিস্ময়ের আভাস লাগে।

ছ) 'গো' 'হে' 'রে' 'লো' ইত্যাদি নানা ধরনের অব্যয় সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়।

দশ. ক্রিয়াপদঃ *বাংলাভাষা-পরিচয়ের* আঠার ও উনিশ-সংখ্যক পরিচ্ছেদে ক্রিয়ার আলোচনা। এই দুই পরিচ্ছেদের প্রধান সিদ্ধান্তগুলো নিম্নরূপ (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৪৬-৪৯):

ক) হওয়া থাকা আর করা – ক্রিয়াপদ এই তিন অবস্থাকে প্রকাশ করে। কিন্তু 'হওয়া' ক্রিয়া বাংলায় প্রায়ই উহ্য থাকে। এর একটা নিয়ম এভাবে বলা যায়ঃ নিত্য অবস্থা বোঝালে ক্রিয়া উহ্য থাকে: 'রাস্তাটা সোজা', 'পুকুরটা গভীর'। কিন্তু 'বর্ষায় পুকুর ঘোলা হয়েছে' – এটা আকস্মিক অবস্থা, তাই হওয়ার কথাটা তুলতে হয়েছে। ওর লোভ হয়েছে, মনে হচ্ছে ওর জ্বর হবে – বাক্যগুলিও এরকম।

খ) পুরোনো বাংলায় ইংরেজি is ও are-এর অনুরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন, এই নদী গঙ্গাই বটে; সে কে বটে; আমি রাজার ঝিয়ারি বটি। তবে আধুনিক বাংলায় 'বটে' শব্দটা অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গ) বাংলায় থাকার কথাটা জানানোর জন্য আছি বা আছে, ছিলে ছিল বা ছিলুম ইত্যাদি ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। বাংলা ক্রিয়াপদের রূপ প্রধানত এই থাকার ভাবকে আশ্রয় করে। করেছে করছে করেছিল করছিল – শব্দগুলো আছি ক্রিয়াপদকে ভিত্তি করে স্থিতির অর্থকেই মুখ্য করেছে। সংস্কৃত ভাষায় এটা নেই, গৌড়ীয় ভাষায় আছে। হিন্দিতে বলে 'চলা থা', চলেছিল। কাজটা যদিও চলা, তবু থা শব্দে বলা হচ্ছে, চলার অবস্থাতে স্থিতি করেছিল। গতিটা যেন স্থিতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

ঘ) যে কাজকে নির্দেশ করা হচ্ছে প্রধানত সেই কাজের মূল ধাতুকে দিয়েই ক্রিয়াপদের গড়ন। 'খা' ধাতুতে খাওয়া বোঝায়, খাওয়া কাজের সমস্ত ক্রিয়ারূপ এই ধাতুর যোগেই তৈরি।

ঙ) বাংলা ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে কার্যটা ক্রিয়ার রূপ ধরে নি। ক্ষুধা পাওয়া, তৃষ্ণা পাওয়া প্রতিদিনের ঘটনা; অথচ বাংলায় সেটা ক্রিয়ারূপ নেয় নি, বিশেষ্যের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে বলতে হয়ঃ ক্ষুধা পেল, তৃষ্ণা পেল। 'ক্ষুধিল' 'তৃষিল' কাব্যে চলে, কিন্তু গদ্যে চালু হয় নি।

চ) বাংলায় দুটো ক্রিয়াপদ জুড়ে ক্রিয়াবিশেষণ গড়ার একটা রীতি আছে। তাতে যে ইঙ্গিতের ভাষা তৈরি হয়েছে তার ভাবপ্রকাশের শক্তি অসাধারণ। সামান্য এই কথাটা 'রয়ে বসে কাজ করা' যা বলে তা কোনো বাঁধা সংস্কৃত শব্দে বলাই যায় না। 'উঠেপ'ড়ে' বা 'নেচেকুদে' প্রভৃতি শব্দের ভাব-প্রকাশক শব্দ অভিধানে পাওয়া যায় না।

এখানে রবীন্দ্রনাথ ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া এবং নানা ধরনের দ্বিত্বের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন মূলত বাংলা ক্রিয়ার বিশিষ্টতা ও শক্তি বোঝানোর জন্য।

ছ) বাংলা ক্রিয়াপদে আর-এক বিশেষত্ব দুটো ক্রিয়ার জোড় দেওয়া, তাদের মধ্যে অর্থের সংগতি না থাকলেও, যেমনঃ হয়ে যাওয়া, হয়ে পড়া, হতে থাকা, হয়ে ওঠা; করে যাওয়া, করে ফেলা, করে তোলা, করে দেওয়া। হয়ে পড়া, করে ফেলা'র ভাবটা একইঃ একটা অক্রিয়, একটা সক্রিয়। আর-একরকম আছে বিশেষ্যের সঙ্গে ক্রিয়ার বা দুই ক্রিয়ার অসংগত যোগ, যেমনঃ মার খাওয়া, খেয়ে বাঁচা, নেড়ে দেওয়া।

জ) বাংলা ক্রিয়াপদে দু রকমের অনুজ্ঞা আছে। এক, উপস্থিত ব্যক্তিকে অনুরোধ বা আদেশ করা। আর, উপস্থিত বা অনুপস্থিত কারও সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করা, যেমন 'ও করুক'।

ঝ) চলতি বাংলা ভঙ্গিপ্রধান ভাষা, তার একটা লক্ষণ ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় অসংগতভাবে 'না' শব্দের ব্যবহার। এর কাজ হচ্ছে আদেশ বা অনুরোধকে অনুনয়ে নরম করে আনা।

ঞ) 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের রূপ বাংলাভাষার আর-একটি বিশেষত্ব, যথাঃ আমি নই, তুমি নও, সে নয়, তিনি নন ইত্যাদি।

ট) বাংলা ক্রিয়াপদে নানারকম শব্দ-যোজনায় নানারকম ভঙ্গি। ক্রিয়াপদে এতরকম ইশারা বোধ হয় আর-কোনো ভাষায় নেই। পড়ল বা, করলই বা, হল বুঝি, হল তো, হোক না, হবেও বা, হবেই হবে, হতেই হবে, হলেই হল, হোকগে ছাই ইত্যাদি বৈচিত্র্যে অর্থপ্রকাশের নানা সূক্ষ্মতার মওকা মিলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩.১ শব্দ ও রূপের আলোচনা: কয়েকটি মূলনীতি

অন্য ভাষার ব্যাকরণ বা ভাষা-বর্ণনার কোনো সাধারণ ছাঁচ ব্যবহার না করে সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষার পর্যাপ্ত উপাত্ত জড়ো করা, এবং তা থেকে নিজস্ব ছাঁচ তৈরি করা। এই স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তাঁর পক্ষে এমন কিছু বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছিল, যা দুনিয়ার আর কোথাও এর আগে হয়নি। উদাহরণস্বরূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমে এ ধরনের শব্দ নিয়ে পদ্ধতিমাফিক আলোচনা শুরু করেছিলেন জে আর ফার্থ ১৯৩০ সালে (পবিত্র ১৯৯৯: ৬০)। আরেক ধরনের আলোচনা হয়েছে ভাষার উৎপত্তিগত অনুসন্ধানের অংশ হিসাবে। কিন্তু সে আলোচনা ভাষাবিজ্ঞানীমহলে বিশেষ গ্রাহ্য হয়নি। 'ফলে আমাদের হস্তগত সূত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই এ বিষয়ে আলোচনার প্রথম প্রবর্তক, প্রথম সার্থক ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষক এবং এ বিষয়ে সম্ভবত প্রথম ইংরেজি ভাষায় গবেষণার প্রায় ত্রিশ বছর আগে তাঁর 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধটি (১৩০৭) প্রকাশিত হয়েছে' (পবিত্র ১৯৯৯: ৬১)। কিন্তু এ প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ নিজের পদ্ধতি সম্পর্কে তৃপ্ত ছিলেন না। এখানে তাঁর সংগৃহীত উপাত্তের পরিমাণ বিস্ময়কর, এবং মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ (সুনীতি ১৯৭২: ৪৬)। তবু তিনি অধিকতর শব্দ-সংগ্রহের কথা বলেছেন। এ সংগ্রহ কেবল ভাষার সম্ভাব্য সব উপাদানকে বিবেচনার আওতায় আনার জন্য নয়। তাঁর কাছে প্রয়োজনটা পদ্ধতিগত। অধিকতর উপাত্ত নিয়ে কাজ করলেই কেবল, তাঁর মতে, ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়মগুলো আবিষ্কার করা যাবে। বিশেষ ছাঁচে ভাষার কিছু উপাদানকে মিলিয়ে দেওয়ার যে আলোচনা-পদ্ধতি – এ দৃষ্টিভঙ্গি তার তুলনায় মৌলিকভাবে আলাদা।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিশ্লেষণে তিনি নিজে 'অকারাদি বর্ণানুক্রমে' উপাত্তগুলো সাজিয়েছেন। কিন্তু, তাঁর মতে, আরো কার্যকরভাবে সাজানো সম্ভব। তিনি দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। কাজের পদ্ধতিগত ইশারাও দিয়ে দিয়েছেন।

> এক. চলন, কর্তন, পতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে শব্দগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা। তাহা হইলে সহজে বুঝা যাইত, কোন্ কোন্ শ্রেণীর বর্ণনায় এই শব্দগুলি ব্যবহার হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ধ্বনির ঐক্য আছে কি না। ঐক্য থাকাই সম্ভব। ছেদনবোধক শব্দগুলি চকারান্ত বা টকারান্ত; কচ এবং কট – তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদন কচ, এবং গুরু অস্ত্রে কট। এই পর্যায়ের সকল শব্দই ক-বর্গের মধ্যে সমাপ্ত; ক্যাঁচ খ্যাঁচ গ্যাঁচ ঘ্যাঁচ। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৮৭-৮৮)
>
> দুই. ইহাদিগকে স্থাবর ও জঙ্গমে একটা মোটা বিভাগ করা যায়, অর্থাৎ স্থিতিবাচক এবং গতিবাচক শব্দগুলিকে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে। ... স্থিতিবাচক শব্দ অতি অল্প। কেবল শূন্যতাপ্রকাশক শব্দগুলিকে ওই দলে ধরা যাইতে পারে; যথা, মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, অথবা রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এই ধূ ধূ এবং ঝাঁ ঝাঁ ভাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম স্পন্দনের ভাব আছে বলিয়াই তাহারা এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের দলে মিশিতে পারিয়াছে। আমাদের এই শব্দগুলি সচলধর্মী। চকচকে জিনিস স্থির থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জ্যোতি চঞ্চল। যাহা পরিষ্কার তকতক করে, তাহার আভাও স্থির নহে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৮৬)

তাঁর সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের অন্যতম 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিতে'র ক্ষেত্রেও তিনি কোনো সাফল্যের দাবি করেননি।[১৮] বরং তাঁর এই উদ্যোগকে পূর্ণতর করে তোলার জন্য তিন ধাপে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এক. প্রত্যেক প্রত্যয়জাত শব্দের তালিকা সম্পূর্ণ করা। 'প্রত্যয়গুলির মধ্যে পক্ষপাতের ভাব দেখা যায়; তাহারা কেন যে কয়টিমাত্র শব্দকে বাছিয়া লয়, বাকি সমস্তকেই বর্জন করে, তাহা বুঝা কঠিন'। তালিকা সম্পূর্ণ হলে, তাঁর মতে, নিয়ম

আবিষ্কারের আশা করা যায়। দুই. কোন্ প্রত্যয়যোগে শব্দের কী প্রকার রূপান্তর হয় তাও নিয়মবদ্ধ করা আবশ্যক। ‘নোড়া শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় করিলে হয় নুড়ি; দাড়ি শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় দেড়ে; টোল শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় টুলো’ – এ রূপান্তরগুলোর নিয়ম সূত্রবদ্ধ করা দরকার। তিন. প্রত্যয়গুলো কিভাবে লিখিত হওয়া উচিত, তা বিচারের দ্বারা ক্রমশ স্থির করা। ‘যাহাকে অস্ প্রত্যয় বলিয়াছি, তাহা অস্ অথবা অ বর্জিত, সা প্রত্যয়টি স+আ অথবা সা’ ইত্যাদি স্থির করা।

তবে প্রচুর ব্যতিক্রম না থাকলে কিংবা নিয়মের চাপে ব্যাখ্যার স্বাভাবিক গতি বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে নিয়ম খুঁজে বের করারই পক্ষপাতী ছিলেন। ‘বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ’ প্রবন্ধে তিনি বীম্‌স্-বর্ণিত এক নিয়মের ত্রুটি দূর করে নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৫৮-৫৯)। বীম্‌স্ বাংলা উচ্চারণের একটি নিয়মে বলেছিলেন, চলিত কথায় আ স্বরের পর ই স্বর থাকলে সাধারণত উভয়ে সংকুচিত হয়ে এ হয়। যেমন, খাইতে – খেতে, পাইতে – পেতে। আরো বলেছেন, অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দে এরূপ সংকোচ ঘটে না; যথা, গাইতে হতে গেতে হয় না। গাইতে শব্দ খাইতে ও পাইতে শব্দের চেয়ে মোটেই অপ্রচলিত নয়। এমতাবস্থায় বীম্‌সের নিয়মটি সম্পূর্ণ করতে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় এই জাতীয় ক্রিয়াপদগুলো একত্র করেছেন – খাইতে চাইতে ছাইতে ধাইতে নাইতে পাইতে বাইতে ও যাইতে। লক্ষ করেছেন, ‘এই নয়টির মধ্যে কেবল খাইতে পাইতে ও যাইতে, এই তিনটি শব্দ বীম্‌স্ সাহেবের নিয়ম পালন করে, বাকি ছয়টি অন্য নিয়মে চলে’। এই ছয়টির মধ্যে গাহিতে চাহিতে নাহিতে ও বাহিতে (বহন করিতে) – এ চারটি শব্দের মাঝখানে একটা হ লুপ্ত হয়েছে। এ থেকে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নিলেন, ‘হ আশ্রয় করিয়া যে ইকারগুলি আছে তাহার বল অধিক দেখা যাইতেছে’। এর অনুকূল অন্য দৃষ্টান্তও আছে। করিতে চলিতে প্রভৃতি শব্দে ইকার লোপ হয়ে করতে চলতে হয়; হইতে শব্দের ইকার লোপ হয়ে ‘হতে’ এবং লইতে শব্দের ইকার স্থানভ্রষ্ট হয়ে ‘নিতে’ হয়। কিন্তু বহিতে সহিতে কহিতে শব্দের ইকার বইতে সইতে কইতে শব্দের মধ্যে টিকে থাকে। অথচ সমস্ত বর্ণমালায় হ ব্যতীত আর কোনো অক্ষরের এরূপ ক্ষমতা নেই।

এ ধরনের সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো রবীন্দ্রনাথের ভাষা-আলোচনার এক কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। আপাতদৃষ্টিতে নিয়মের বশীভূত নয়, এমনসব বিষয়েও তিনি গভীরতর স্তরের নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। যেমন, কর্মে কোথায় ‘কে’ বিভক্তি বসে আর কোথায় বসে না – তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিকল্প সূত্র সন্ধান করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৪৪)। অবশ্য, যেমনটা আগেই ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, নিয়ম স্থির করেই তিনি কর্তব্য শেষ করেননি। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল নিয়মগুলোর কারণ ব্যাখ্যা করা। কারণ-ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই কেবল ভাষার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের কিনারা করা সম্ভব, যা তাঁর ভাষা-আলোচনার মূল প্রেরণা। ‘বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ’ প্রবন্ধে এ রকম এক উদাহরণ পাওয়া যায়। বীম্‌স্ লিখেছিলেন, বাংলা বিশেষণ শব্দে শব্দান্ত স্বরের লোপ হয় না। ১৮৩৩-এর *গৌড়ীয় ব্যাকরণে* রামমোহন রায়ও লক্ষ করেছিলেন, ‘গৌড়ীয় ভাষায় অকারান্ত বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারণ হয়’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৫৫)। রবীন্দ্রনাথ এ দুজনের মন্তব্য ও বিশ্লেষণেই নানা বিভ্রান্তি শনাক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর শেষ সিদ্ধান্তটি মোটামুটি সমরূপ: ‘তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, খাঁটি বাংলায় দুই অক্ষরের অধিকাংশ বিশেষণ শব্দ হলন্ত নহে’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৫৫)। তিনি এখানেই থামেননি। আরো অগ্রসর হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন: ‘বাংলার অধিকাংশ দুই-অক্ষরের বিশেষণ, যাহা সংস্কৃত মূল শব্দ অনুসারে অকারান্ত হওয়া উচিত ছিল, তাহা আকারান্ত হইয়াছে। যথা: সহজ – সোজা, রুগ্ন – রোগা, ভগ্ন – ভাঙা, শ্বেত – শাদা, তিক্ত – তিতা, নগ্ন –

নাগা, কঠিন – কড়া ইত্যাদি' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৫৬)। এরপর তিনি দীনেশচন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* অবলম্বনে এই নিয়মের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন:

> তাম্রশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে ক-এর ব্যবহার কিছু বেশি। ... এই ক প্রাকৃতে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ... দীনেশবাবু প্রাচীন বাংলায় এই ক প্রত্যয়ের বাহুল্য প্রমাণ করিয়াছেন। এই ক-এর অপভ্রংশে আকার হয়; যেমন ঘোটক হইতে ঘোড়া, ক্ষুদ্রক হইতে ছোঁড়া, তিলক হইতে টিকা, মধুক হইতে মহুয়া ইত্যাদি। ... এই ক প্রত্যয় বিশেষণেই অধিক, এবং দুই-অক্ষরের ছোটো ছোটো কথাতেই ইহার প্রয়োগসম্ভাবনা বেশি। কারণ বড়ো কথাকে ক সংযোগে বৃহত্তর করিলে তাহা ব্যবহারের পক্ষে কঠিন হয়। এইজন্যই বাংলা দুই অক্ষরের বিশেষণ যাহা অকারান্ত হওয়া উচিত ছিল তাহা অধিকাংশই আকারান্ত। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৫৬-৫৮)

নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকারণের ব্যাখ্যা হাজির করেছেন বলেই যে ক্ষেত্রে তাঁর নিয়ম – পরবর্তী গবেষণায় বা অন্যতর তথ্য-উপাত্তের উপস্থিতিতে – বাতিল হয়েছে, সেখানেও তাঁর আলোচনা মূল্য হারায়নি। 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধ থেকে এ ধরনের দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এ প্রবন্ধে তিনি বিশেষ্যের তির্যকরূপকে 'কর্তা ও করণের খিচুড়ি' বলে বর্ণনা করেছেন:

> 'রাম হাসে' এই বাক্যে 'রাম' শব্দ কর্তৃকারক সন্দেহ নাই। কিন্তু 'বাঘে মানুষ খায়', 'ঘোড়ায় লাথি মারে', 'গোরুতে ধান খায়', বাক্যে 'বাঘে' 'ঘোড়ায়' 'গোরুতে' শব্দগুলি কর্তৃকারক এবং করণকারকের খিচুড়ি। 'বাছুরে জন্মায় বা বাছুরে মরে' এমন বাক্য বৈধ নহে, 'বাছুরে তাকে চেটেছে', চলে – অর্থাৎ এরূপ স্থলে কর্তার সঙ্গে কর্ম চাই। 'ঘোড়ায় লাথি মারে' বলি কিন্তু 'ঘোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে' বলি না। 'লোকে নিন্দে করে' বলি, কিন্তু 'লোকে জমেছে' না বলিয়া 'লোক জমেছে' বলি। আরো একটি কথা বিবেচ্য, বাংলায় কর্তৃকারকের এই প্রকার করণঘেঁষা রূপ কেবল একবচনেই চলে, আমরা বলি না 'লোকগুলোতে নিন্দা করে'। তার কারণ, লোকে, বাঘে, ঘোড়ায় প্রভৃতি প্রয়োগ একবচনও নহে বহুবচনও নহে, ইহাকে সামান্যবচন বলা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃত অর্থ, লোকসাধারণ, ব্যাঘ্রসাধারণ, ঘোটকসাধারণ। যখন বলা হয় 'রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব', তখন 'রাম ও রাবণ' ব্যক্তিবিশেষের অর্থ ত্যাগ করিয়া জাতিবিশেষের অর্থ ধারণ করে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৫-২৬)

একই প্রবন্ধে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হওয়ার বিশেষ কিছু নিয়ম শনাক্ত করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> কর্মকারকে সাধারণত প্রাণীপদার্থ সম্বন্ধেই 'কে' বিভক্তি প্রয়োগ হয়। কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম আছে। যেমন, 'এই টেবিলটাকে নড়াতে পারচি নে' 'সন্ন্যাসী লোহাকে সোনা করতে পারে' 'জিয়োমেট্রির এই প্রব্লেমটাকে কায়দা করতে হবে' ইত্যাদি। অথচ 'এই প্রব্লেমকে কষো, এই লোহাকে আনো, টেবিলকে তৈরি করো' এরূপ চলে না। অতএব দেখিতেছি, অপ্রাণীবাচক শব্দের উত্তরে 'টা' বা 'টি' যোগ করিলে কর্মকারক তদুত্তরে 'কে' বিভক্তি হয়, যেমন 'চৌকিটাকে সোরিয়ে দাও' ('চৌকিকে সোরিয়ে দাও' হয় না) 'গাছটাকে কাটো' ('গাছকে কাটো' হয় না)। ইহাতে বুঝা যাইতেছে 'টি' বা 'টা' যোগ করিলে শব্দবিশেষের অর্থ এমন একটা সুনির্দিষ্টতার জোর পায় যে তাহা যেন কতকটা প্রাণের গৌরব লাভ করে। 'লোহাকে সোনা করা যায়', বাক্যে 'লোহা' সেইরূপ যেন ব্যক্তিবিশেষের ভাব ধারণ করিয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৬)

কর্তৃকারকের ‘এ’ কর্তা ও করণের খিচুড়ি – *প্রবাসী* পত্রিকায় লিখে এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪৩৪)। তিনি প্রাকৃত, পুরাতন বাংলা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক বাংলার দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান, কর্তৃকারকে ‘এ’ বিভক্তি বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন: ‘বিজয়বাবু কর্তৃকারকের ‘এ’ চিহ্ন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমি স্বীকার করিয়া লইলাম’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৩৩)। একই পত্রে বিজয়চন্দ্র মজুমদার কর্মকারক-সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু এ দুটি প্রসঙ্গের দুই নিয়ম যদি বাতিল বলেও ধরে নেওয়া হয়, তবু বাংলা ভাষার অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক তাৎপর্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দুই বিশ্লেষণের গুরুত্ব মোটেই ক্ষুণ্ন হয় না। বাংলা ভাষার শব্দ ও রূপ-সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের বিপুল আলোচনার প্রায় যে কোনো অংশ সম্পর্কেই এ মন্তব্য সত্য।

৬.৪ বাক্যরীতি

সাধারণভাবে বাক্যতত্ত্বের যা আলোচ্য, এমনকি প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যের শব্দসজ্জা আর বাক্যগড়ন সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়, রবীন্দ্রনাথ সে ধরনের কোনো আলোচনা করেননি। তবে অন্য নানা প্রসঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজি বাক্যের সাপেক্ষে বাংলা বাক্যের বিশেষত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বাইশ-সংখ্যক পরিচ্ছেদে চলতি বাংলার বাক্যস্বভাব সম্পর্কে আলোচনা আছে।

পৃথকভাবে আলোচনা বেশি না করলেও শব্দ ও রূপের আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বাক্যের উদাহরণ দিয়ে বাক্যের অংশ হিসাবেই সেগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ‘বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ’, ‘বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য’, ‘বাংলা নির্দেশক’ প্রভৃতি প্রবন্ধের উদাহরণগুলো স্বভাবতই বাক্যে দেওয়া হয়েছে। এর এক কারণ, অর্থপ্রকাশের বিশিষ্টতা তাঁর সবসময়ের কেন্দ্রীয় বিবেচ্য। তাই পূর্ণাঙ্গ বাক্যের শরীরে শব্দ বা রূপাণু এবং এমনকি কখনো কখনো ধ্বনির বিশিষ্ট ভূমিকা শনাক্ত করা তাঁর ভাষা-আলোচনার অন্যতম বিশিষ্টতা। ভাষাকে তিনি একবার বর্ণনা করেছেন ‘কোঠাবাড়ির’ সঙ্গে, যেখানে ‘ধ্বনি দিয়ে আঁটবাঁধা শব্দ’ কাজ করে ‘ভাষার ইঁট’ হিসাবে (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৫৯৯)। এ উপমা থেকে ভাষার মূল-সংগঠন বা অবয়ব হিসাবে বাক্যের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট বোঝা যায়। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলার মৌলিক ফারাক চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে বাক্যের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন, তাতে এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

ব্যাপারটি তাঁর আলোচনার বিভিন্ন জায়গায় আছে। সবচেয়ে গভীর জোরালো আর বিস্তারিত আছে ‘বাংলা ব্যাকরণ’ প্রবন্ধে। এখানে তিনি সংস্কৃত বাক্যের সঙ্গে বাংলা বাক্যের গভীর অমিল বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> সংস্কৃত তৃতীয়া বিভক্তি ‘এন’ বাংলায় ‘এ’ হইয়াছে; যেমন, বাঁশে মাথা ফাটিয়াছে, চোখে দেখিতে পাই না ইত্যাদি। বাঘে খাইল, কথাটার ঠিক সংস্কৃত তর্জমা ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ। কিন্তু খাদিত শব্দ বাংলায় খাইল আকার ধারণ করিয়া কর্তৃবাচ্যের কাজ করিতে লাগিল; সুতরাং বাঘ যাহাকে খাইল, সে বেচারা আর কর্তৃকারকের রূপ ধরিতে পারে না। এইজন্য, ব্যাঘ্রেণ রামঃ খাদিতঃ, বাংলায় হইল বাঘে রামকে খাইল; বাঘে শব্দে করণকারকের এ-কার বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও রাম শব্দে কর্মকারকের কে বিভক্তি লাগিল। এ খিচুড়ি সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনো পর্যায়েই পড়ে না।
> (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১০৭)

এরপরই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মোক্ষম যুক্তিটি হাজির করেছেন: ‘‘আমাকে তোমার পড়াতে হবে’ বাক্যটির প্রত্যেক শব্দই সংস্কৃতমূলক, অথচ ইহার প্রত্যেক শব্দটিতেই সংস্কৃত নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১০৮)। এ সিদ্ধান্তের গভীর-সব তাৎপর্য আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে বলা যায়, বাক্যের স্তরেই যে ভাষার মূলচরিত্র আর নির্ণায়ক কাঠামো সূচিত হয় – এ সত্য মেনেই রবীন্দ্রনাথ ভাষা-বিশ্লেষণ করেছেন।

*শান্তিনিকেতন পত্রে*র পাঠকদের নিকট একবার রবীন্দ্রনাথ একটি ইংরেজি অনুচ্ছেদের বাংলা তর্জমা চেয়েছিলেন। আগত অনুবাদগুলোর কোনো কোনোটির পর্যালোচনা করেছিলেন তিনি ‘অনুবাদ-চর্চা’ নিবন্ধে। এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত বাংলা বাক্যের প্রকৃতি আর সংস্কৃত ও ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে বাংলা বাক্যের ফারাক সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। লিখেছেন: ‘ইংরেজি বাক্য বাংলায় তরজমা করিবার সময় অনেকেই সংস্কৃত শব্দের ঘটা করিয়া থাকেন। বাংলা ভাষাকে ফাঁকি দিবার এই একটা উপায়। কারণ এই শব্দগুলির পর্দার আড়ালে বাংলা ভাষারীতির বিরুদ্ধাচরণ অনেকটা ঢাকা পড়ে’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২১৫)। এই ‘বাংলা ভাষারীতি’ ঠিক কী বস্তু, তা তাঁর লেখায় সবিস্তার বিশ্লেষিত হয়নি। তবে এই রীতি যে উপনিবেশিত গদ্যে – যাকে তিনি বহুবার ‘ফোর্ট উইলিয়ামি পণ্ডিতদের গদ্য’ বলে চিহ্নিত করেছেন – নষ্ট হয়েছে, তা তাঁর উল্লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে বাংলা বাক্যরীতির পার্থক্যের উদাহরণ দিয়েছেন এক জায়গায়: ‘‘তিমি জাতীয় স্তন্যপায়ী জলে বাস করে, ভাসিয়া উঠিয়া যাহাদিগকে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়’ – ইহা ইংরেজি রীতি; বাংলা রীতিতে ‘যাহাদিগকে’ না বলিয়া ‘তাহাদিগকে’ বলিতে হইবে’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২১৬)। আর পণ্ডিতি গদ্যে ইংরেজিরীতির প্রভাব বাংলা অব্যয়ের ব্যবহার ও বাক্যগঠনে কী ধরনের পরিবর্তন এনেছে, তার পরিচয়ও এ প্রবন্ধে বিস্তারিত উদাহরণ ও ব্যাখ্যাসহ দিয়েছেন:

> ইংরেজিতে ‘and’ আর বাংলায় এবং শব্দের প্রয়োগ-ভেদ আছে। … and শব্দযুক্ত ইংরেজি বাক্যে তরজমা করিতে গিয়া বারবার দেখিয়াছি তাহার অনেক স্থলেই বাংলায় ‘এবং’ শব্দ খাটে না। তখন আমার এই মনে হইয়াছে ‘এবং’ শব্দটা লিখিত বাংলায় পণ্ডিতদের কর্তৃক নূতন আমদানী, ইহার মানে ‘এইরূপ’। ‘আর’ শব্দ ‘অপর’ শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহার মানে ‘অন্যরূপ’। … বাংলায় আর-একটি নূতন আমদানি যোজক শব্দ ‘ও’। লিখিত বাংলায় পণ্ডিতেরা ইহাকে ‘and’ শব্দের প্রতিশব্দরূপে গায়ের জোরে চালাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মুখের ভাষায় কখনোই এরূপ ব্যবহার খাটে না। আমরা বলি ‘রাজা চলেছেন, তাঁর সৈন্যও চলেছে’। ‘রাজা চলিয়াছেন ও তাঁহার সৈন্যদল চলিয়াছে’ ইহা ফোর্ট উইলিয়মের গোরাদের আদেশে পণ্ডিতদের বানানো বাংলা। এখন ‘ও’ শব্দের এইরূপ বিকৃত ব্যবহার বাংলা লিখিত ভাষায় এরূপ শিকড় গাড়িয়াছে যে তাহাকে উৎপাটিত করা আর চলিবে না। মাঝে হইতে খাঁটি বাংলা যোজক ‘আর’ শব্দকে পণ্ডিতেরা বিনা অপরাধে লিখিত বাংলা হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন। … একটা সুখের কথা এই যে, পণ্ডিতদের আশীর্বাদ সত্ত্বেও ‘এবং’ শব্দটা বাংলা কবিতার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২১৯-২১)

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থের বিশ নম্বর পরিচ্ছেদে অব্যয়ের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গ আবার এনেছেন (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৫০-৫১)। বোঝা যায়, বাংলা বাক্যরীতি সম্পর্কে তাঁর এ সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

জীবনময় রায়কে লেখা এক পত্রে বিরামচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আছে, যেগুলো বাক্যরীতি সম্পর্কে তাঁর ভাবনার পরিচয় বহন করে। তাঁর মতে, এই চিহ্নগুলো ভাষার বাইরের জিনিস। ইংরেজির অনুকরণে বাংলায় বিরামচিহ্নের বাড়াবাড়িকে তিনি অভিহিত করেছেন ‘হাকিমী সাহেবিয়ানা’ বলে। প্রশ্নচিহ্ন আর বিস্ময়চিহ্ন তাঁর কাছে

অপ্রয়োজনীয়; কারণ, এই অনুভূতি প্রকাশের জন্য ভাষায় বিস্তর অব্যয় রয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন: ''তুমি তো আচ্ছা লোক' এখানে 'তো' ইঙ্গিতের পিছনে আরো একটা চিহ্নের ধাক্কা দিয়ে পাঠককে ডব্‌ল্ চমক খাওয়ানোর দরকার আছে কি। পাঠক কি আফিমখোর' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৮৮-৮৯)। বিরামচিহ্নের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তাঁর আপত্তির কারণ অবশ্য আরো গভীর। একদিকে তা পাঠকের পাঠাভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত। যখন বিরামচিহ্ন ছিল না তখন 'পাঠকের আন্দাজ ছিল পাকা, বাক্যপথে কোথায় কোথায় বাঁক তা সহজেই বুঝে নিত। এখন কুঁড়েমির তাগিদে বুঝেও বোঝে না' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৮৯)। অন্যদিকে লেখকের দিক থেকেও বিরামচিহ্ন-নির্ভরতা বাক্যের আভ্যন্তর স্বয়ংসম্পূর্ণতার ঘাটতি তৈরি করে:

> চিহ্নের উপর বেশি নির্ভর যদি না করি তবে ভাষা সম্বন্ধে অনেকটা সতর্ক হতে হয়। মনে করো কথাটা এই : 'তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ'। এখানে বাবুয়ানার উপর ঠেস দিলে কথাটা প্রশ্নসূচক হয় – ওটা একটা ভাঙা প্রশ্ন – পুরিয়ে দিলে দাঁড়ায় এই, 'তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ তার মানেটা কী বলো দেখি'। 'যে' অব্যয় পদের পরে ঠেস দিলে বিস্ময় প্রকাশ পায়। 'তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ'। প্রথমটাতে প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়টাতে বিস্ময়চিহ্ন দিয়ে কাজ সারা যায়। কিন্তু যদি চিহ্ন দুটো না থাকে তাহলে ভাষাটাকেই নিঃসন্দিগ্ধ করে তুলতে হয়। তাহলে বিস্ময়সূচক বাক্যটাকে শুধরিয়ে বলতে হবে – 'যে-বাবুয়ানা তুমি শুরু করেছ'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৮৯-৯০)

এ থেকে আরেকটা জিনিস বোঝা যায়: মুখের ভাষার স্বর ও সুরকে লেখার ভাষায় যথাসম্ভব অনুসরণের কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্বীয়ভাবে তার ফায়সালা অবশ্য তিনি করেননি; কিন্তু তাঁর নিজের লেখায় – কাব্যে এবং গদ্যে – সে চেষ্টা ও সাফল্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। চলিতরীতি সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা – মুখের ভাষা লেখার ভাষা পরস্পরকে অনুসরণ করে ক্রমশ দুয়ের এক ধরনের সাম্য তৈরি করবে – তার সঙ্গে তাঁর এ প্রস্তাব অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাতে, তাঁর মতে, চলিতরীতিরই জয় হয়েছে। কারণ, একদিকে 'সীমাসরহদ্দ নিয়ে মামলা করে না' বলে চলিতরীতি পুরোনো সাধুরীতির অনেক উপাদান নিঃসঙ্কোচে হজম করে নিতে পারে। তার উপর বাক্যের গড়নেও চলিতরীতি বিশেষ 'বাঁধাবাঁধি'র ধার ধারে না। *বাংলাভাষা-পরিচয়ের* বাইশ নম্বর পরিচ্ছেদে চলিত বাংলার বাক্যরীতির এই স্বাধীনতার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। অনেকগুলো বাক্যের উদাহরণ দিয়ে বাংলা 'স্বাভাবিক' বাক্যের বৈশিষ্ট্য আর সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি:

> কোথায় গেলেন তোমার দাদা, তোমার দাদা কোথায় গেলেন, গেলেন কোথায় তোমার দাদা, দাদা তোমার গেলেন কোথায়, কোথায় গেলেন দাদা তোমার: প্রথম চারটি বাক্যে 'গেলেন' ক্রিয়াপদের উপর এবং শেষের বাক্যটিতে 'কোথায়' শব্দের উপর ঝোঁক দিয়ে এই সবকটা প্রয়োগই চলে। আশ্চর্য তোমার সাহস, কিংবা, রেখে দাও তোমার চালাকি, একেবারে ভাসিয়ে দিলে কেঁদে: সাধু ভাষার ছাঁদের চেয়ে এতে আরো বেশি জোর পৌঁছয়। যা থাকে অদৃষ্টে, যা করেন ভগবান, সে প'ড়ে আছে পিছনে: এ আমরা কেবল-যে বলি তা নয়, এইটেই বলি সহজে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৫৫)

সাধু বাংলার 'বাঁধা' বাক্যধারার বিপরীতে চলিতরীতির বাক্যের এই বৈচিত্র্যের উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে স্বাধীনতা থাকলেও বাক্যগঠনে স্বৈরাচারের সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে অন্তত একটি বাধ্যবাধকতার উল্লেখ করেছেন তিনি: 'জোড়া ক্রিয়ার জোড় ভাঙা অবৈধ'। তাই 'সে প'ড়ে সবার আছে পিছনে' বলবার বা লিখবার জো নেই। বাংলা বাক্যের এই

বৈচিত্র্যকে বাংলা ক্রিয়াপদের 'দুর্বলতা'র একটা প্রতিষেধক হিসাবে দেখেছেন তিনি। ক্রিয়ার 'একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি' এড়াবার জন্য বাক্যবিন্যাসের স্বাধীনতা, তাঁর মতে, খুব বড় ভূমিকা পালন করে।

৬.৫ অর্থ প্রসঙ্গে

অর্থ সম্পর্কে 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'অভিধান-ব্যাকরণ অর্থের লোহার সিন্ধুক – তাহারা অর্থ দিতে পারে না, বহন করিতে পারে মাত্র। চাবি লাগাইয়া সেই অর্থ লইতে হয়' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১৮)। ভাষার অর্থ যে কোনো স্থির-নির্দিষ্ট উপাদান নয়, বরং ব্যবহারগত বিভিন্নতায় নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং বহুমাত্রিক, একজন কবির পক্ষে অবশ্য সে বোধ খুবই প্রাথমিক। কিন্তু ভাষা-বিশ্লেষণের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ কথা মনে রেখে ভাষার বিভিন্ন স্তরকে সে অনুযায়ী বিন্যস্ত করার চেষ্টা খুব সুলভ নয়। রবীন্দ্রনাথ শুরুর দিকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, 'বাংলা একটা ভঙ্গিওয়ালা ভাষা'। ইশারা বা ইঙ্গিতবাক্যের সমৃদ্ধি বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের একটি ভাষার বর্ণনা কেবল শরীরের বর্ণনায় কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না। ভাষা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ সত্য তিনি এত গুরুত্বের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন যে, তাঁর সংশ্লিষ্ট সমগ্র-রচনাকে অর্থতত্ত্বের দিক থেকে পাঠ করা সম্ভব। এ সম্পর্কিত প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা হিসাবে 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধটি পাঠ করা যেতে পারে (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১২২-৩৬)।

এ প্রবন্ধে মোটামুটি তিন প্রকারের ইঙ্গিতবাক্যের কথা বলেছেন তিনি – ধ্বনিমূলক, পদবিকারমূলক, পদদ্বৈতমূলক। ধ্বনিমূলক শব্দগুলো দুই রকমের; একটা ধ্বনিদ্বৈত – কলকল ইত্যাদি, আর-একটা ধ্বনিদ্বৈধ – ফুটফাট ইত্যাদি। ধ্বনিমূলক এই শব্দগুলো ইন্দ্রিয়বোধ বেদনাবোধ ইত্যাদি অনুভূতি প্রকাশ করে।

বাংলা ভাষার এই শব্দগুলো প্রায়ই জোড়াশব্দ হয়। কারণ, জোড়াশব্দে একটা কালব্যাপকত্বের ভাব আছে। ধূধূ করিতেছে, ধবধব করিতেছে বললে অনেক্ষণ ধরে একটা ক্রিয়ার ব্যাপকত্ব বোঝায়। যেখানে ক্ষণিকতা বোঝায় সেখানে জোড়া কথার চল নেই; যেমন, ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া ইত্যাদি। যখন ধাঁ ধাঁ, সাঁ সাঁ বলা যায় তখন ক্রিয়ার পুনরাবর্তন বোঝায়।

'এ' প্রত্যয় যোগ করে এ জাতীয় শব্দ থেকে বিশেষণ তৈরি হয়ে থাকে; যেমন, ধব্‌ধবে ইত্যাদি। মাঝখানে আকার যোগ করে এরই মধ্যে একটুখানি অর্থের বিশেষত্ব ঘটানো হয়; যেমন, কপাকপ, খটাখট, গপাগপ, টপাটপ ইত্যাদি। কেবল আকারযোগে অর্থের যে সূক্ষ্ম বৈলক্ষণ্য হয়, তা কোনো বিদেশিকে অর্থবিশিষ্ট ভাষার সাহায্যে বোঝানো শক্ত। ঠকাঠক বললে এই বোঝায় যে, একবার ঠক করে পরে বলসঞ্চয়পূর্বক পুনর্বার ঠক করা; মাঝখানের সেই উদ্যত অবস্থার যতিটুকু আকারযোগে আপনাকে প্রকাশ করে। এভাবে বাংলা ভাষা যেন অ আ ই উ স্বরবর্ণ কয়টাকে সুরের মতো ব্যবহার করে। সে-সুর যার কানে অভ্যস্ত হয়েছে সে-ই তার সূক্ষ্মতম মর্মটুকু বুঝতে পারে। এরও নিয়ম আছে। আদ্যক্ষরে যেখানে অকার আছে সেখানে পরবর্তী অক্ষরে আকার-যোজন চলে, অন্যত্র নয়। যেমন টকটক থেকে টকাটক হয়েছে, কিন্তু টিকটিক থেকে টিকাটিক বা ঠুকঠুক থেকে ঠুকাঠুক হয় না। সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, বাংলা ভাষার উচ্চারণে স্বরবর্ণগুলোর কঠিন বিধি আছে।

স্বরবর্ণ আকারকে আবার আর-এক জায়গায় প্রয়োগ করলে আর-এক রকমের সুর বের হয়; টুকটাক, ঠুকঠাক, ধুমধাম, ফুসফাস ইত্যাদি। এই শব্দগুলো দুই প্রকারের ধ্বনিব্যঞ্জন করে, একটি অস্ফুট আর-একটি স্ফুট। যখন বলা

হয়, 'টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে' তখন এই বোঝায় যে, ছোট ফোঁটাটি টুপ করে এবং বড় ফোঁটাটি টাপ করে পড়ছে, ঠুকঠাক শব্দের অর্থ একটা শব্দ ছোটো আর-একটা বড়ো। উকারে অব্যক্তপ্রায় প্রকাশ, আকারে পরিস্ফুট প্রকাশ।

কেবল স্বর নয়, ব্যঞ্জনবিকারের উদাহরণও প্রচুর পাওয়া যায় : উসখুস, উস্কোখুস্কো, নিশপিশ, আইঢাই, কাঁচুমাচু, আবল-তাবল, হাঁসফাঁস, খুঁটিনাটি, আগডম-বাগডম, হিজিবিজি, ফষ্টিনষ্টি ইত্যাদি। এ কথাগুলোর অধিকাংশই আগাগোড়া অনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করে। হাতপা চোখমুখ কাপড়চোপড় নিয়ে ছোটোখাটো কত কি করাকে যে উসখুস করা বলে তা স্পষ্ট করে বলতে গেলে হতাশ হতে হয়; কী কী বিশেষ কাজ করাকে যে আইঢাই করা বলে তা কে ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন।

আর-একরকমের জোড়কথা আছে তার মূল শব্দটি অর্থসূচক এবং দোসর শব্দটি মূলশব্দেরই অর্থহীন বিকার; যেমন, চুপচাপ ঘুষঘাষ তুকতাক ইত্যাদি। চুপ ঘুষ এবং তুক এ-তিনটে শব্দ আভিধানিক – অর্থহীন ধ্বনি নয়; এদের সঙ্গে চাপ ঘাষ ও তাক, এই তিনটি অর্থহীন শব্দ শুধু ইঙ্গিতের কাজ করছে। যদি বলা যায় 'কেহ চুপ করিয়া আছে', তবে বোঝায় সে নিঃশব্দ হয়ে আছে; কিন্তু যদি বলা হয় চুপচাপ আছে, তবে বোঝায় লোকটা কেবলমাত্র নিঃশব্দ নয় একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হয়েও আছে। একটা নির্দিষ্ট অর্থের পশ্চাতে একটা অনির্দিষ্ট আভাস জুড়িয়া দেওয়া এই শ্রেণীর জোড়কথার কাজ। দ্বিগুণিত করলে তার অর্থ অন্যরকম হয়ে যায়। গোল-গোল বললে হয় একাধিক গোল পদার্থকে বোঝায়, নয় প্রায়-গোল জিনিসকে বোঝায়। কিন্তু গোল-গাল বললে গোল আকৃতি বোঝায়, সে সঙ্গে পরিপুষ্টতা প্রভৃতি আরো কিছু অনির্দিষ্ট ভাব মনে এনে দেয়।

আকার বাংলায় বড়োত্বের সুর নিয়ে আসে। আকার যোগে ঘুষঘাষ-এর ঘাষ, তুকতাক-এর তাক, ঘুষ অর্থ ও তুক অর্থকে কল্পনাক্ষেত্রে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে, অথচ স্পষ্ট কিছুই বলেনি। দ্বিগুণিত করলে এ রকম অনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনা তৈরি হয় না, বিকৃতির প্রয়োজন। তাই গোড়ায় যেখানে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে অন্য স্বরবর্ণের প্রয়োজন; ধারধোর, কাটাকুটি, ভাজাভুজি ইত্যাদি। শেষের দুই উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, পূর্বে আকার ও পরে ইকার থাকলে মাঝখানের ওকার উচ্চারণের সুবিধার জন্য উ হয়ে যায়।

মোটের উপর দেখা যায়, জোড়া কথাগুলোর প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে যেখানে ই উ বা ও আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে আকার যুক্ত হয়; যেমন, ঠিকঠাক, মিটমাট, ঢিলেঢালা, ফুটোফাটা, টুকরো-টাকরা, গোলগাল, গোছগাছ, মোটমাট ইত্যাদি। আর যেখানে প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে আকার যুক্ত আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে উ বা ওকার জুড়তে হয়; যেমন, হাপুস-হুপুস, নাদুস-নুদুস। দেখা যাচ্ছে, আকারে ওকারে একটা বোঝাপড়া আছে।

যে-জোড়াকথার প্রথমাংশ অর্থবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়াংশ বিকৃত, বাংলায় তার প্রধান কর্ণধার ট। জলটল কথাটথা গিয়েটিয়ে কালোটালো ইত্যাদি বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া কোথাও এর অনধিকার নেই। এক-এক সময় ট-এর পরিবর্তে ফ বসে, কিন্তু তাতে একটা অবজ্ঞার ভাব আনে; লুচিটুচি বললে লুচির সঙ্গে কচুরি নিমকি প্রভৃতি অনেক উপাদেয় পদার্থ বোঝাতে পারে, কিন্তু লুচিফুচি বললে লুচির সঙ্গে লোভনীয়তার সম্পর্কমাত্র থাকে না। কোথাও কোথাও ম বসে। যেমন, রেগেমেগে, জড়িয়ে-মড়িয়ে, খিটিমিটি, হুড়মুড় ইত্যাদি। ম-এর দৃষ্টান্তগুলো কিছু রুক্ষ রকমের। 'দুটো ঘুষোমুষো লাগিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে', এ কথা বলা চলে কিন্তু বন্ধুকে যত্নমত্ন বা গরিবকে দানমান করা উচিত,

একেবারে অচল। হিংসে-মিংসে করা যায়, কিন্তু ভক্তি-মক্তি করা যায় না। অতএব ট-এর ন্যায় ফ ও ম প্রশান্ত নিরপেক্ষ স্বভাবের নয়।

অন্য বর্ণও বসে। যেমন, বেছেগুছে, মিলেজুলে, খেয়েদেয়ে, সেজেগুজে, লুটেপুটে, বকেঝকে, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন, চাকর-বাকর, রকম-সকম, অলিগলি, নড়বড় ইত্যাদি। এই দৃষ্টান্তগুলির গুটিকয়েক কথার একটা উলটাপালটা দেখা যায়; বিকৃতিটা আগে এবং মূল শব্দটা পরে, যেমন : আশপাশ অন্ধিসন্ধি অলিগলি হাবুডুবু হুলুস্থুল। ঘুষোঘাষা শব্দের প্রথমার্ধের অর্থ নির্দিষ্ট ও দ্বিতীয়ার্ধের অর্থ অনির্দিষ্ট। কিন্তু ঘুষোঘুষি কথাটার ভাব অন্যরকম – দুপক্ষের সুস্পষ্ট ঘুষি চালাচালি; এর মধ্যে আভাস-ইঙ্গিত কিছু নেই। এখানে দ্বিতীয়াংশের আদ্যক্ষরে সেজন্য স্বরবিকার হয়নি। এ দলের কথাগুলো সাধারণত পারস্পরিকতা বুঝিয়ে থাকে; কানাকানি-র মানে, এর কানে ও বলছে, ওর কানে এ বলছে।

যে-সকল পদার্থ সচরাচর একসঙ্গে দেখা যায় তাদের মধ্যে দুটি পদার্থের নাম একত্রে জুড়ে বাকিগুলোকে ইত্যাদিভাবে বুঝাবার প্রথাও বাংলায় প্রচলিত আছে, যেমন ঘটিবাটি। যদি বলা হয় ঘটি-বাটি সামলিয়ো, তাহলে বোঝায় না যে কেবল ঘটি ও বাটিই সামলাতে হবে, থালা ঘড়া প্রভৃতি অনেক অস্থাবর জিনিসই এর সঙ্গে এসে পড়ে। এরূপ জোড়কথার দৃষ্টান্তঃ পথঘাট, ঘর-দুয়োর, বাঘ-ভাল্লুক, শাকভাত, কাঠখড় ইত্যাদি।

'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধটি ধ্বনিতত্ত্ব-অর্থতত্ত্ব-রূপতত্ত্বের এক অসামান্য সমন্বয়। জীয়ল ভাষার স্বভাব, ক্ষমতা ও ব্যঞ্জনাশক্তির প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ এখানে অর্থস্তরে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এভাবে 'বাবু ভাষা'র বিপরীতে স্থাপন করতে পেরেছেন চলতি বাংলাকে। মাল-মসলা সংগ্রহ, গোছগাছ আর সমগ্রতা তৈরির দিক থেকে প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের গোত্রে পড়ে। কিন্তু কেবল কাঠামোর পরিচয়দানে লিপ্ত না থেকে তিনি এখানে প্রবেশ করতে পেরেছেন ভাষার প্রাণধর্মে। চালু অর্থকে যথাবিহিত মূল্য দেওয়াতেই তা সম্ভব হয়েছে। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইয়ের 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধটিও অর্থ-নির্ভর। এখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বর্ণিত হয়েছে অনির্বচনীয়কে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ভাষিক উপাদান হিসাবেঃ

> স্থিতিবাচক শব্দ অধিকাংশই অর্থাত্মক। স্থিতি বুঝিতে মনের সত্বরতা আবশ্যক হয় না। স্থিতির গুরুত্ব বিস্তার এবং স্থায়িত্ব, সময় লইয়া ওজন করিয়া পরিমাপ করিয়া বুঝিলে ক্ষতি নাই। অর্থাত্মক শব্দে সেই পরিমাপ কার্যের সাহায্য করে। কিন্তু গতিবোধ এবং বেদনাবোধ স্থিতিবোধ অপেক্ষা অধিকতর অনির্বচনীয়। তাহা বুঝিতে হইলে বর্ণনা ছাড়িয়া সংকেতের সাহায্য লইতে হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি সংকেত। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ঃ ৮৭)

গবেষকসুলভ নিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় থাকলেও এ ধরনের রচনার সাফল্য প্রধানত তাঁর কবিপ্রতিভার কাছেই ঋণী।[১৯] আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা নিপুণভাবে শনাক্ত করা কবিত্বেরই লক্ষণ। কিন্তু চালু শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্ধারণের কাজও রবীন্দ্রনাথ করেছেন। পরিমাণে কম হলেও তা এ ধরনের কাজের আদর্শস্বরূপ গণ্য হতে পারে। *বালক* পত্রিকার পৌষ ১২৯২ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ নিম্নরূপ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন: 'বালকের যে-কোনো গ্রাহক 'হুজুগ', 'ন্যাকামি' ও 'আহ্লাদে' শব্দের সর্বোৎকৃষ্ট সংক্ষেপ সংজ্ঞা (definition) লিখিয়া পৌষমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন তাঁহাকে একটি ভালো গ্রন্থ পুরস্কার দেওয়া হইবে। একেকটি সংজ্ঞা পাঁচটি পদের অধিক না হয়' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ঃ ১৬৩)। পরে প্রাপ্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে কিছু কিছু পর্যালোচনা করে তিনি আদর্শ সংজ্ঞা

নির্ধারণের কাজ করেছেন 'সংজ্ঞাবিচার' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে শব্দগুলোর বর্তমান চলিত রূপের বা ধারণার পরিচ্ছন্ন ও উপস্থাপনযোগ্য সংজ্ঞা প্রণয়ন করতে চেয়েছেন তিনি। সংজ্ঞা আহবানের মধ্যে ভাষা-ব্যবহারকারীদের – অন্তত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের – গণতান্ত্রিক অধিকারের সুস্পষ্ট নমুনা আছে।[২০]

'নিছনি' এবং 'পহুঁ' প্রবন্ধে পুরোনো বাংলার নিছনি ও পহুঁ শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে নেওয়া রবীন্দ্রনাথের পদক্ষেপ ও অর্থনির্ণয়-প্রক্রিয়া আদর্শস্বরূপ বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৭০-৭৬)। বহু উদাহরণ সংগ্রহ করে এক বা একাধিক সম্ভাব্য অর্থের তালিকা করেছেন তিনি। এ ব্যাপারে সংস্কৃতের সাহায্য যেভাবে নিয়েছেন তাও অনুসরণযোগ্য। সংস্কৃত উৎসের সঙ্গে মিল থাকায় এবং পুরোনো কবিরা সংস্কৃত অর্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বিধায় সংস্কৃত অভিধান থেকে সাহায্য নেবার পক্ষপাতী তিনি। কিন্তু সংস্কৃত অর্থটিই বাংলা শব্দের অর্থ বলে তিনি চালিয়ে দেননি। বরং বাংলা অর্থ-নির্ণয়ে সহায়ক হিসাবে একে ব্যবহার করেছেন। এই ছিল সংস্কৃতের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের চাওয়া – সহায়ক-ভূমিকা। দশের অংশগ্রহণে তুলনামূলক বিচার ও পর্যালোচনায় অর্থ-নির্ণয়ের প্রয়াসের মধ্যে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে গেছে। সংস্কৃত উৎসকে চূড়ান্ত ধরলে এ গণতান্ত্রিকতার দরকার হত না।

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থে – বাংলা ভাষার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার বাসনার কারণেই হয়ত – অর্থের প্রতি মনোযোগ অনেক বেড়েছে। বলা যায়, অর্থ বা ব্যঞ্জনার্থের নিরিখেই তিনি এখানে ভাষার ধ্বনি-শব্দ-বাক্যের আসল পরিচয় চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সে কারণেই হয়ত, এ বইয়ের বর্ণনাভঙ্গির একটা বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছে এ রকম: অবয়বগত উপাদানগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দ্রুত শেষ করে তিনি চলে গেছেন উপাদানগুলোর বিশেষ অর্থ-প্রকাশক ব্যবহারে। এর একটা কারণ, এ ধরনের আর্থ-ব্যঞ্জনার মধ্যেই অন্য ভাষা বিশেষত সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার পার্থক্য ভালোভাবে বোঝা যায়:

> বাংলা ই এবং উ স্বরটা সম্মানী, এ এবং ও অন্ত্যজ। আ স্বরটা অনাদৃত, ওর ব্যবহার আছে অনাদরে, যেমন: মাখন=মাখ্না, মদন=মদ্না, বামন=বাম্না। ইংরেজি ... ইকার স্বরে দেয় আত্মীয়তার টান। ইকারে আদর প্রকাশ বাংলাতেও পাওয়া যায়। সেখানে আকারকে ঠেলে দিয়ে ই এসে বসে, যেমন: লতা=লতি, কণা=কণি, ক্ষমা=ক্ষেমি, সরলা=সর্লি, মীরা=মীরি। অকারান্ত শব্দেও এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেমন: স্বর্ণ=স্বর্নি। ... এ কিংবা ও স্বরের অবজ্ঞা, উ স্বরের স্নেহব্যঞ্জনা সংস্কৃতে পাই নে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৩০)

অন্যত্র ক্রিয়াপদের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বাংলা ভাষার 'ভঙ্গির প্রাবল্য' – তুলনা করেছেন ইংরেজির সঙ্গে:

> ক্রিয়াপদে একটা অনর্থক গে শব্দের যোগে যে ইঙ্গিত প্রকাশ করা হয় সেটা সহজ শব্দের দ্বারা হয় না, যথা: হোকগে করুকগে মরুকগে। এতে ঔদাসীন্যে ও ক্ষোভে জড়িয়ে যে ভাবটা ব্যক্ত করে সেটা অন্য ভাষায় সহজে বলা যায় না। কেননা গে শব্দের কোনো অর্থ নেই, ওটা একটা মুদ্রা। 'হোকগে' শব্দের ইংরেজি তর্জমা করতে গেলে বলতে হয়: Let it happen, I don't care। ওর সঙ্গে 'তুমিও যেমন' যদি যোগ করা যায় তা হলে ভঙ্গিমা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। ... 'মরুকগে' শব্দে এই ভাষাভঙ্গি খুবই স্পষ্ট হয়েছে। এই ছোট্ট বাংলা শব্দটির ইংরেজি প্রতিবাক্য: Hang it, let it go to dogs। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৪৮)[২১]

বাংলা অর্থতত্ত্বের আলোচনা হয়েছে খুবই সামান্য। প্রথাগত বা আধুনিক – দুই দিক থেকেই বাংলা অর্থতাত্ত্বিক রচনা দুর্লভ (হুমায়ুন ২০০২: ৪৭)। এক অর্থে অভিধানগুলোই কেবল বাংলা ভাষার অর্থতাত্ত্বিক রচনা। কিন্তু সংজ্ঞানির্ভর বিবরণধর্মী কোনো অভিধান এ ভাষায় এখনো রচিত হয়নি। 'বাংলা অভিধানে শব্দের সংজ্ঞার বদলে প্রায়ই দেওয়া হয় সমার্থক শব্দ' (হুমায়ুন ২০০২: ২৯)। এ ধরনের শব্দার্থকেন্দ্রিক আলোচনায় ঐতিহাসিক বিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, বিশেষভাবে দেখা হয় ব্যুৎপত্তির দিকটি – আর পুরো প্রক্রিয়ায় নির্ণায়ক-ভূমিকা পালন করে সংস্কৃতের নজির ও বিধি। প্রাকৃত বা পুরোনো বাংলার নিরিখ ব্যবহৃত হয় খুবই সামান্য। বাংলা অর্থতাত্ত্বিক আলোচনার এই মানচিত্রের কথা মনে রাখলে চলতি তথা প্রাকৃত বাংলার চালুরূপের অর্থস্তরে রবীন্দ্রনাথের লিপ্ততা ও সাফল্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।

৬.৬ রবীন্দ্রনাথের ভাষা-বিশ্লেষণ: সার্বিক বৈশিষ্ট্য ও প্রণালি-পদ্ধতি

প্রবন্ধের ভঙ্গি এবং পৌনঃপুনিক আহ্বান থেকে বোঝা যায়, বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণের একটি সুশৃঙ্খল ধারা গড়ে তোলাই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। তাঁর আগে এবং সমকালে সংস্কৃত ছাঁচে বাংলা ভাষাকে ব্যাখ্যার যে 'শৃঙ্খলা' গড়ে উঠেছিল, তা তাঁর মনঃপূত হয়নি। না হওয়ার মূল কারণ, বাংলা ভাষার একটা বড় অংশ সে ছাঁচে আঁটে না। তাছাড়া বাংলা ভাষার সামগ্রিক স্বভাব ও স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তা মোটেই উপযুক্ত নয়। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নতুন ভঙ্গিতে বাংলা ভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। তাতে তাঁর আগের ও সমকালীন ভাষাচর্চার কোনো কোনো ধারণা তিনি ব্যবহার করেছেন; কিন্তু অনুসরণ করেননি।

'বঙ্গভাষা' প্রবন্ধে 'তুলনামূলক ব্যাকরণ' রচয়িতা বীম্‌স্ এবং 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ' রচয়িতা হ্যর্নলে[২২] তাঁর কাছে 'গৌড়ভাষীদের' 'গুরু'র মর্যাদা পেয়েছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪৩)। তাঁর তুলনামূলক-পদ্ধতি অনুসরণের একটি ভালো দৃষ্টান্ত 'উপসর্গ-সমালোচনা'। এখানে পাওয়া যায় তাঁর এমন সিদ্ধান্ত: 'সংস্কৃত উপসর্গগুলির প্রচলিত নানা অর্থের মধ্যে যে-অর্থ ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় উভয় ভাষাতেই বিদ্যমান, তাহাকেই মূল অর্থ বলিয়া অনুমান করা অন্যায় নহে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৬৮)। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলো তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা নয়। তিনি খুব শীঘ্রই ভাষাবর্ণনায় সেকালের এই প্রভাবশালী ছাঁচ থেকে পুরোপুরি সরে আসেন; আর লিপ্ত হন বাংলা ভাষার চালুরূপ বর্ণনায়। সেখানে মাঝে মাঝে তুলনামূলক-পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন প্রধানত দৃষ্টান্ত বা উপাদানবিশেষের উৎস খোঁজার জন্য। তবে উৎসকে কখনো মান্য করেননি। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার কোনো উপাদান তাঁর কাছে যে রূপে ধরা পড়ল, সে রূপকে মান্য না করে বাংলা ভাষার উপাদানটি চালুরূপের সাপেক্ষেই শেষত চিহ্নিত করেছেন। ফলে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের যে ছাঁচ পরবর্তীকালে দীর্ঘদিনের জন্য বাংলা ভাষা-আলোচনায় রাজত্ব করেছে, রবীন্দ্রনাথ আসলে একটুও তার বশ মানেননি।[২৩]

তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন বাংলা ভাষা – বাংলা ভাষার বর্তমান রূপ।[২৪] আবার চালু বাংলার লেখ্যরূপ নয়, কথ্যরূপই তাঁর অবলম্বন।[২৫] পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে আরোহী পদ্ধতিতে সাধারণ-সূত্র প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন।[২৬] সাধারণ-সূত্র প্রণয়ন করতে পারলে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ব্যতিক্রমের প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল।[২৭] বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, ভাষা সজীব পদার্থের মতো, এবং নিয়মবিশেষের বশীভূত নয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রধান ঝোঁক ছিল অর্থতত্ত্বের দিকে। এমনকি রূপতত্ত্বের যেসব সূক্ষ্ম দিক বাংলা ভাষার আলোচনায় তিনি বিস্তারিত তুলে এনেছেন, সেগুলোকেও প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে জুড়ে দিয়েছেন অর্থের সঙ্গে। ভাষার সচল ব্যবহারের সাপেক্ষে, বলা যায়, বাক্যে ব্যবহারের সাপেক্ষে, ক্ষুদ্র উপাদানগুলোকে চিহ্নিত করে সূত্রায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এই সামগ্রিকতা আর ব্যবহারিক ভিত্তি তাঁর যে কোনো আলোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আলোচনার পদ্ধতির মতো নতুন ভাষা ও পরিভাষাও তাঁকে তৈরি করতে হয়েছে। বিশেষভাবে নজর রাখতে হয়েছে সংস্কৃত পরিভাষার ওই অংশের দিকে যা বাংলার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা বাংলা ব্যাকরণে প্রয়োগ করা কিরূপ বিপজ্জনক তাহা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৮৯)। একই প্রবন্ধে এই 'বিপদে'র স্বরূপ আর এ থেকে পরিত্রাণের পথও নির্দেশ করেছেন:

> সংস্কৃত ব্যাকরণে যাহাকে ণিজন্ত ধাতু বলে বাংলায় তাহাকে ণিজন্ত বলিতে গেলে অসংগত হয়; কারণ সংস্কৃত ভাষায় ণিচ্ প্রত্যয় দ্বারা ণিজন্ত ধাতু সিদ্ধ হয়, বাংলায় ণিচ্ প্রত্যয়ের কোনো অর্থ নাই। অতএব অন্য ভাষার আকারগত পরিভাষা অবলম্বন না করিয়া প্রকারগত পরিভাষা রচনা করিতে হয়। ... হেতুর একটি প্রতিশব্দ নিমিত্ত, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি বর্তমান প্রবন্ধে ণিজন্ত ধাতুকে নৈমিত্তিক ধাতু নাম দিলাম। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৮৯-৯০)

অন্য ভাষার আলোচনায় যে পরিভাষা তৈরি হয়েছে তা হুবহু একই তাৎপর্যে বাংলার আলোচনায় চালানোর ফলে যে সংকট তৈরি হয়, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য ভাষার ধারণা অনুসরণ করে তিনি কোথাও কোথাও পরিভাষা তৈরি করেছেন বটে; কিন্তু অন্য ভাষার পরিভাষা বা সংজ্ঞাটিকে আলোচনার কেন্দ্র করেননি।[২৮] কথাটা বিশ্লেষণ করে বলা যাক। তিনি সম্ভবত ইংরেজি article থেকে 'নির্দেশক' নিয়ে আলোচনার উৎসাহ পেয়েছেন। বাংলা পরিভাষাটিও তৈরি করেছেন ইংরেজির অনুসরণে। এ প্রসঙ্গে কয়েকবার ইংরেজির সঙ্গে বাংলার তুলনাও করেছেন। কিন্তু কোথাও ইংরেজির ছকে বাংলাকে আঁটাতে চাননি। আবার, বাংলা নির্দেশক নিয়ে আলোচনার কালে তিনি বিশেষভাবে কী কী বিষয়ে আলোকপাত করবেন, বা গুরুত্ব দেবেন, তাও ইংরেজি থেকে ঠিক করেননি। বাংলা উদাহরণ একত্র করে বাংলা ভাষার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো খুঁজেছেন এবং উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেছেন।[২৯] 'বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে নিজের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ নামক প্রবন্ধে, বাংলায় বিশেষ বিশেষ স্থলে কর্তৃকারকে একারযোগে যে রূপ হয় তাহাকে তির্যকরূপ নাম দিয়াছিলাম। তাহাতে কোনো পাঠক আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহাকে বলা উচিত কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি। নাম লইয়া তর্ক নিষ্ফল। ... আমার সে প্রবন্ধে আসল কথাটা ব্যাকরণের নাম নহে, ব্যাকরণের নিয়ম। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৪৩)

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা ভাষা-আলোচনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল হয়েছে। কিন্তু সমকালের মুখের ভাষা নিয়ে আলোচনার ধারাটি কোথাও রক্ষিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের এলায়িত আলোচনাভঙ্গিতে তিনি বিস্ময়করভাবে সবক্ষেত্রেই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন এবং অসংখ্য বিকল্প ও মাত্রা রক্ষা করে সূত্র-প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন। তাই অনেক ক্ষেত্রেই বিকল্প উদাহরণ দিয়ে তাঁর কোনো-একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত বাতিল করা সম্ভব। তাতে তাঁর আলোচনার মর্মগত গুরুত্ব বা তাৎপর্য বিন্দুমাত্রও কমে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে আলোচনার পদ্ধতি আর বিশ্লেষণের

উপযোগী নতুন ভাষা গড়ে তোলাই গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ হল ভাষার আকর-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার জন্য কী কী বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার তা নির্ধারণ। রবীন্দ্রনাথ বহু ক্ষেত্রেই প্রথমবারের মতো এ ব্যাপারগুলো নির্ধারণ করেছেন। এই ছকের বা মূলনীতির অংশ হিসাবে অন্য তথ্য-উপাত্ত যোগে নতুন বিশ্লেষণ সম্ভব। আনুশাসনিক ভঙ্গিতে আলোচনা করেননি বলে তাঁর প্রায় যে কোনো আলোচনায় এক আশ্চর্য নমনীয়তা আছে। তিনি বলেছেন, বাংলায় এরকম হয় না; কিন্তু নতুন কিছু উপাত্ত যোগ করে যদি বলা যায়, বাংলাভাষীরা এ রকম উচ্চারণ করে, বা এ রকম ব্যবহার বা ভঙ্গি পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর আলোচনার কাঠামোর মধ্যে তা আঁটিয়ে নেওয়া সম্ভব। বাংলা ব্যাকরণে আর কখনো এ রকম আলোচনা হয়নি। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক কাঠামোর চাপ, সংস্কৃত বা ইংরেজির কাঠামো আলোচ্য বিষয়ের নির্ধারক হওয়া ইত্যাদি কারণে বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলোচ্য-বিষয়ের গুরুত্ব নির্ধারিত হয়নি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা শব্দদ্বিত্ব বা ‘ভঙ্গিওয়ালা ভাষা’ হিসাবে বাংলার বিশেষ পাঠ রবীন্দ্রনাথের পরে আর কখনো বাংলা ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য হয়ে ওঠেনি।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

১. রবীন্দ্রনাথ ইংরেজির উচ্চারণে বিশৃঙ্খলা লক্ষ করেছিলেন। ইংরেজি 'এ' অক্ষরের অন্তত পাঁচ রকমের উচ্চারণের উদাহরণ দিয়েছেন তিনি (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৫)। তাঁর ধারণা ছিল, বাংলা উচ্চারণে এতটা বিশৃঙ্খলা নেই। কিন্তু বিলাতে 'একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময়' তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর এ ধারণা 'সম্পূর্ণ সমূলক নয়' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৭)। *জীবনস্মৃতি*র 'লোকেন পালিত' অধ্যায়ে তিনি তাঁর এই আবিষ্কার ও অব্যবহিত গবেষণার সকৌতুক বর্ণনা দিয়েছেন (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৯: ৫১২-১৩)।

২. এ নিয়মটি বর্ণিত হয়েছে 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৫৯-৬০)। বীম্‌স্ লিখেছিলেন, 'যাওয়া-সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ গেল শব্দের উচ্চারণ গ্যাল হইয়াছে, গিলিবার সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ গেল শব্দের উচ্চারণে বিশুদ্ধ একার রক্ষিত হইয়াছে। তিনি বলেন অভ্যাস ব্যতীত ইহার নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ ক্রিয়াপদগুলোর ধ্বনি-সংযোগ সম্পর্কে একটি সহজ নিয়ম আবিষ্কার করেন।

৩. বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সূত্রগুলো মূলত 'কলিকাতা বিভাগের' কথ্য-উচ্চারণের ভিত্তিতে নির্মিত (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৩)। মাঝে-মধ্যেই অন্য অঞ্চলের, বিশেষত পূর্ববঙ্গের, উচ্চারণ-পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। ভাষা-আলোচনায় কথ্যভাষার গুরুত্ব আর এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ-পার্থক্য আমলে আনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতেন বলেই তিনি 'ভিন্ন ভিন্ন জেলার উচ্চারণের তুলনা আবশ্যক' মনে করতেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৩)।

৪. ই-এর প্রভাবে আ-এর এ হয়ে যাওয়ার উল্লেখ আছে *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থেও (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬২৫)। এখানে রবীন্দ্রনাথ আবারও বাংলা আকারান্ত ক্রিয়ার একারান্ত হয়ে যাওয়ার উল্লেখ করেছেন।

৫. চলতি বাংলা বা প্রাকৃত বাংলার এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন *ছন্দ* গ্রন্থে, বিশেষত, 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' ও 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে। এখানে তিনি একে সংস্কৃত ও সাধু বাংলার বিপরীতে প্রাকৃত বাংলার অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা ও ঐশ্বর্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

৬. *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে অ ধ্বনির বিলোপ বা স্থানচ্যুতির অনেকগুলো সূত্র বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে স্বর লুপ্ত হয়ে হলন্ত ধ্বনির আগমনের একটি সূত্র আছে আরো নানা লেখায়। যেমন, 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে আছে:

> বাংলায় যে অসংযুক্ত শব্দের পূর্বে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে সে শব্দ নিজের অকার বর্জন করে। 'পাগল্' শব্দের গ আপন অকার রক্ষা করে যেহেতু পরবর্তী ল-এ কোনো স্বর নাই। কিন্তু 'পাগ্‌লা' বা 'পাগ্‌লী' শব্দে গ অকার বর্জন করে। এইরূপ – আপন – আপ্‌নি, ঘটক – ঘট্‌কী, গরম্ – গর্‌মি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, অনতিপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দে এ নিয়ম খাটে না, যেমন ঘোটক – ঘোটকী। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৪)

৭. 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে একই সূত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছিল: 'বাংলা উচ্চারণে কোনো ওকার দীর্ঘ কোনো ওকার হ্রস্ব; হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী ওকার দীর্ঘ এবং স্বরান্ত শব্দের পূর্ববর্তী ওকার হ্রস্ব। 'ঘোর' এবং 'ঘোড়া' শব্দের উচ্চারণ-পার্থক্য লক্ষ করিলেই ইহা ধরা পড়িবে'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৩)

৮. যফলা প্রসঙ্গে অনেক আগেও – 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে – এই দুই সূত্রই বলা হয়েছে। তবে ওই প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছিল, 'ইকারের পূর্বে যফলার উচ্চারণ এ হইয়া যায়, ব্যক্তি ও ব্যতীত তাহার দৃষ্টান্ত' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৬০)।

৯. বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণে চলিত উচ্চারণের কিছু বৈশিষ্ট্য আর সূত্র দেখানো হয়েছে। কিন্তু লেখ্য ও কথ্য উচ্চারণের মিশ্রণ, কিছু ভুল সিদ্ধান্ত আর সূত্রায়ণের ব্যর্থতায় এ ক্ষেত্রে তাঁকে পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া যায় না।

১০. সেকালের রীতি-অনুযায়ী তিনি সর্বত্র 'ধ্বনি' কথাটির স্থলে 'বর্ণ' ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ দুইয়ের পার্থক্য সম্পর্কে এতটাই সচেতন ছিলেন যে, কোথাও তার বিচ্যুতি ঘটেনি। এমনকি সংস্কৃত বর্ণমালার সঙ্গে বাংলা বর্ণের আলোচনায়ও সংশ্লিষ্ট ধ্বনির তুলনা করেছেন; বর্ণের সঙ্গে ধ্বনি গুলিয়ে ফেলেননি।

১১. উচ্চারণবিকারের যে নিয়মগুলো তিনি দেখিয়েছেন, তাকে মোটা দাগে দুই ভাগ করেছেন। একভাগে পড়বে সেসব পরিবর্তন যার অন্যথা হয় না। যেমন ইকার বা উকারের পূর্ববর্তী অ-এর উ হওয়া। 'টা টো টে' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> সাধুভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থ পাঠকালেও আমরা কটি এবং কটু শব্দকে কোটি এবং কোটু উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু আ> এ এবং আ> উ-এ বদলের বেলায় এ-কথা খাটে না। আমরা প্রচলিত ভাষায় যদিও মুঠাকে মুঠো বলি, তথাপি গ্রন্থে পড়িবার সময় মুঠা পড়িয়া থাকি; চলিত ভাষায় বলি নিন্দে, সাধু ভাষায় বলি নিন্দা। অতএব এই দুই প্রকারের উচ্চারণের মধ্যে একটা শ্রেণীভেদ আছে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৮)

মূলত প্রথমোক্ত উচ্চারণগুলোই বিস্তারিত বিশ্লেষণের আওতায় এসেছে। কারণ, এগুলো বিশেষ উপভাষার উচ্চারণভঙ্গি নয় কেবল, বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ-প্রক্রিয়ারই অংশ।

১২. ভাষার বর্তমান রূপকে ভাষাতত্ত্বের কেন্দ্রে নিয়ে এসে আর তা ব্যাখ্যার কিছু তত্ত্ব ও প্রণালি-পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফার্দিনাঁ দ্য সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩) 'আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে'র জনক হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন। পবিত্র সরকার জানিয়েছেন, এর আগে বোদুইন দ কুর্ত্‌নে এ ব্যাপারে যে কাজ করেছিলেন, তা ভাষাবিজ্ঞানীদের তেমন একটা নজরে আসেনি। জার্মানির নবব্যাকরণবিদেরা ধ্বনি-পরিবর্তনের নানা কারণ আর প্রতিবেশেরও আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসব কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি ঘটনাক্রমে পরিচিত হয়েও থাকেন, তবু তাঁর কাজের নতুনত্ব কমে না। পবিত্র সরকার লিখেছেন:

> তিনি বাংলা ভাষার উচ্চারণের কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সে নিয়মের সংগঠনটিও তিনি যেভাবে খাড়া করেছিলেন – অপরিবর্তিত ধ্বনি, তার পরিবর্তিত রূপ, পরিবর্তনের আপাত কারণ (অ-এ-র ক্ষেত্রে পরে ই-উ-র উপস্থিতি), গভীরতর বা শারীরিক কারণ ('রসনার শ্রমলাঘব'), ব্যতিক্রম ও ব্যতিক্রমের কারণ – ইত্যাদি সমস্ত কিছু তালিকাবদ্ধ করে – তাও খুব আধুনিক; কেবল খুব সাম্প্রতিককালেই, ১৯৫৭-র পরে, ধ্বনি-পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে এমন সর্বাঙ্গীণভাবে দেখা হচ্ছে। (পবিত্র ১৯৯৯: ৫৮-৫৯)

১৩. রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধ পাঠ করেন পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে, ১২ আশ্বিন ১৩০৮ তারিখে। ব্যোমকেশ মুস্তফী এই প্রবন্ধের 'সংগ্রহাতিরিক্ত আরও কতকগুলি প্রত্যয়ের উদাহরণ' সভায় উপস্থিত করেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪২০-২১)। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি ছাপা হয় *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*র তৃতীয় সংখ্যায়। পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ব্যোমকেশ মুস্তফীর 'বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধ (ব্যোমকেশ ১৯৮৭)। এ প্রবন্ধে তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের তালিকায় অনুপস্থিত কিছু প্রত্যয়ই চিহ্নিত করেননি, কিছু প্রত্যয়ের রূপের ক্ষেত্রেও নিজের ভিন্নমত জানিয়েছেন। প্রবন্ধের সঙ্গে সংযোজিত 'সম্পাদকীয় মন্তব্যে' অবশ্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্ধারিত রূপগুলোর প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছিল (ব্যোমকেশ ১৯৮৭: ৪৮-৫০)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং *পরিষৎ-পত্রিকা*র সম্পাদক বাংলা প্রত্যয়ের পঠন-পাঠনের যে উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি প্রস্তাব করেছিলেন, ব্যোমকেশ মুস্তফীর রচনাটি সম্ভবত সে ধারার একমাত্র চেষ্টা। পরবর্তীকালের মূলধারার ব্যাকরণগুলোতে – যেমন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিভূষণ চাকীর ব্যাকরণে – বাংলা প্রত্যয়ের আলোচনা ফিরে গেছে পুরোনো ও সহজসাধ্য সংস্কৃত কাঠামোতে।

১৪. *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের শুরুতেই তিনি এ বিষয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। লিখেছেন: 'আমাদের চলতি ভাষার কারখানায় জোড়তোড়ের কৌশলগুলো অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষ্যকে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। তাই বাংলা ভাষার আপন রীতিতে নতুন শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য'। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৩২)

'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে এ সংক্রান্ত ধ্যানধারণা ও আশাবাদের যে সবল প্রকাশ দেখা গেছে এ মন্তব্যে তার ছায়াও নেই। ওই প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় চার দশক পরেও বাংলা প্রত্যয় আলোচনার কোনো অগ্রগতি না হওয়া এই সিদ্ধান্তের একটা কারণ হতে পারে।

১৫. *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের তের-সংখ্যক পরিচ্ছেদে স্ত্রীপ্রত্যয়ের আলোচনা আছে। তাতে নতুন প্রসঙ্গ বিশেষ নেই। তবে বাংলা স্ত্রীপ্রত্যয়ের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের কথা এখানেও জোর দিয়ে বলা হয়েছে। যেমন, বর্তমান প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> একটা বিষয়ে বাংলাকে বাহাদুরি দিতে হবে। য়ুরোপীয় অনেক ভাষায়, তাছাড়া হিন্দি হিন্দুস্থানি গুজরাটি মারাঠিতে, কাল্পনিক খেয়ালে বা স্বরবর্ণের বিশেষত্ব নিয়ে লিঙ্গভেদপ্রথা চলেছে। ভাষার এই অংশগত ব্যবহার বিদেশীদের পক্ষে বিষম সংকটের। বাংলা এ সম্বন্ধে বাস্তবকে মানে। বাংলায় কোনোদিন ঘুড়ি উড্ডীয়মানা হবে না, কিংবা বিজ্ঞাপনে নির্মল চিনির পাকে সুমধুরা রসগোল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে না। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৩৬)

১৬. কর্তায় এ/য় বিভক্তি তথা তির্যকরূপ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য স্মরণীয়:

> It should be stated that although, we have been successful in removing this 'এ' from the nominative case in our modern prose, in the spoken dialect of this country – especially in Eastern Bengal – this 'এ' holds the supreme sway. রাজায় ডেকেছে, রামে চেয়েছে, বাঘে ধরেছে and hundreds of such expressions indicate that this indelible sign of the original passive construction of our sentences will ever attest the truth on this point, though we are trying our best to do away with passive forms altogether in our construction in our written prose. (Sen1921: 52)

বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণের সম্ভাব্য উপাদান ও ক্ষেত্র নির্ধারণে রবীন্দ্রনাথ কত গভীরভাবে কথ্যভাষা অবলম্বন করেছিলেন, এ থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

১৭. পণ্ডিতি গদ্যরীতিতে 'ও' আর 'এবং' ব্যবহারের যে ব্যাপকতা দেখা দেয়, রবীন্দ্রনাথ তাকে মূলত ইংরেজির প্রভাব বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য যোজক 'ও' যে ফারসি 'উও' থেকে এসেছে, তা তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শিশিরকুমার দাশ মনে করেন, এ ব্যাপারে ফারসির প্রভাবই বড় ভূমিকা রেখেছিল (Das 1966: 48-49)।

১৮. পরে 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ' ... উয়া, তা, আম প্রভৃতি প্রত্যয় সংকলন করিয়া ভাবী ব্যাকরণকারের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ তাঁহারাই করিবেন, আমার কেবল মজুরিই সার'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১০৫)

১৯. এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এ রকম:

> কি কোল, কি দ্রাবিড়, কি আর্য্য – আধুনিক কালের সমস্ত ভারতীয় ভাষার একটি প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে তাদের ধ্বন্যাত্মক শব্দ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৩০৭ সালে প্রকাশিত 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত এইরূপ শব্দের একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ দিয়েছেন, – আর এইরূপ শব্দ ব্যবহারের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বটুকু তাঁর কবিমনের কাছে যেরূপ প্রকাশ পেয়েছে তা তিনি ব্যক্ত করেছেন। ভারতের আর কোনও ভাষায় এই রকম শব্দের এর চেয়ে ভালো আলোচনা আছে কি না জানি না। (সুনীতি ১৯৭২: ৪৬)

২০. প্রবাল দাশগুপ্ত ''ন্যাকা' শব্দের অর্থকথা' প্রবন্ধে শব্দটির 'অর্থ' নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন (প্রবাল ১৯৮৭: ১৩-২৫)। তাঁর মতে, 'স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ন্যাকামি-র এমন এক সংজ্ঞার্থ আদর্শ ব'লে মেনে নিচ্ছেন যার মধ্যে ন্যাকা-র বর্ণাঢ্য, নমনীয় অর্থ পুরো ধরা পড়েনি' (প্রবাল ১৯৮৭: ১৩)। তাঁর এ সিদ্ধান্ত যথার্থ বলেই মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগের মধ্যে শব্দের অর্থ-নির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলকতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, তার গুরুত্ব নির্ণীত অর্থের অসম্পূর্ণতার কারণে কমে যায় না।

২১. অর্থের আলোচনা কেবল অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনাসূত্রে এসেছে এমন নয়। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের উপাদান-বিশ্লেষক প্রতিটি পরিচ্ছেদেই (১২-২২) আছে এই একই ভঙ্গি। নমুনাস্বরূপ সর্বনামের আলোচনা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত হল:

> 'সব' শব্দের অর্থে কোনো দূষণীয়তা নেই, 'যত' সর্বনাম শব্দটাও নিরীহ। কিন্তু দুটোকে এক করলে সেই জুড়িশব্দটা হয়ে ওঠে নিন্দার বাহন। 'মূর্খ' 'কুঁড়ে' কিংবা 'লক্ষ্মীছাড়া' প্রভৃতি কটুস্বাদ বিশেষণ ঐ 'যত সব' শব্দটাকে বাহন করে ভাষায় যেন মুখ সিট্‌কোতে আসে, যথা: যত সব বাঁদর, কিংবা কুঁড়ে, কিংবা লক্ষ্মীছাড়া। এখানে বলা উচিত ঐ 'যত' শব্দটার মধ্যেই আছে বিষ। 'যত বাঁদর এক জায়গায় জুটেছে' বললেই যথেষ্ট অকথ্য বলা হয়। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৩৭)

২২. *বাংলাভাষা-পরিচয়* বইয়ে লেখক বাংলার যে ঐতিহাসিক ধারাক্রম বর্ণনা করেছেন, তা তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত থেকেই জাত। ভারতের ভাষাগুলোর প্রাচীন ইতিবৃত্ত বর্ণনায় তিনি হর্ন্‌লের মত অনুসরণ করেছেন।

২৩. বরং 'বঙ্গভাষা', 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' কিংবা 'উপসর্গ-সমালোচনা' প্রভৃতি প্রবন্ধের কাছাকাছি সময়ে লেখা 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রচলিত ধারণাকে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বাতিল করেছেন:

> পণ্ডিতমশাই বলিবেন, সে যেমনই হউক, এ-সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার হইতে উৎপন্ন; আমিও সে কথা স্বীকার করি। প্রমাণ হইয়াছে, একই মূল হইতে 'হংস' এবং ইংরেজি 'গ্যাণ্ডার' শব্দ উৎপন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া 'গ্যাণ্ডার' সংস্কৃত 'হংস' শব্দের ব্যাকরণগত নিয়ম মানে না, এবং তাহার স্ত্রীলিঙ্গে 'গ্যাণ্ডারী' না হইয়া 'গূস্‌' হয়। ইহাও প্রমাণ হইয়াছে, একই আর্যপিতামহ হইতে বপ্‌ বার্নুফ্‌ প্রভৃতি য়ুরোপীয় শাব্দিক ও বাঙালি ব্যাকরণজ্ঞ পণ্ডিত জন্মিয়াছেন, কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা ব্যাকরণকে যে-বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপকভাবে দেখেন, আমাদের পণ্ডিতরা তাহা দেখেন না; অতএব উৎপত্তি এক হইলেও ব্যুৎপত্তি ভিন্ন প্রকারের হওয়া অসম্ভব নহে। ইন্‌ প্রত্যয় হইতে বাংলা ই প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ইন্‌ প্রত্যয়ের সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলে না; এইজন্য এই দুটিকে ভিন্ন কোঠায় না ফেলিলে কাজ চালাইবার অসুবিধা হয়। লাঙলের লোহার ফলা হইতে ছুঁচ তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই ছুঁচ দিয়া মাটি চষিবার চেষ্টা করা পাণ্ডিত্য নহে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১০-১১)

আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয়। তুলনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত প্রতিবেশী ভাষাগুলোর চালুরূপের ব্যবহার করেছেন এমনকি কোথাও কোথাও সংস্কৃতের চেয়েও বেশি। যেমন হিন্দির উদাহরণ প্রচুর টেনেছেন। আর ঐতিহাসিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে কোনো সুযোগেই নির্দেশ করেছেন প্রচলিত বাংলার স্বাতন্ত্র্য।

২৪. 'সম্বন্ধে কার' প্রবন্ধটি তিনি শুরু করেছেন এভাবে:

> সংস্কৃত কৃত এবং তাহার প্রাকৃত অপভ্রংশ কের শব্দ হইতে বাংলা ভাষায় সম্বন্ধে র বিভক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ... প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে – তাহার যাহার অর্থে তাকর যাকর শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখানো হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বর্তমানে অপ্রচলিত পুরাতন দৃষ্টান্তের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কারণ এখনো সম্বন্ধে বাংলায় কার শব্দপ্রয়োগ ব্যবহৃত হয়; যথা, এখনকার, তখনকার ইত্যাদি। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪০)

এরপর পুরো আলোচনায় তিনি কোথাও পূর্বতন ব্যবহারের বরাত দেননি। চালু বাংলায় 'কার' বিভক্তির ব্যবহার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সমগ্র রচনা সম্পর্কেই এ কথা সত্য।

২৫. বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণের আলোচনায় তিনি লক্ষ করেছেন, 'লিখিত এবং কথিত বাংলা ব্যাকরণের প্রভেদ আছে। বীম্‌সের ব্যাকরণে কোথাও বা লিখিত বাংলার কোথাও বা কথিত বাংলার নিয়ম নির্দিষ্ট হওয়ায় অনেক স্থলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৫৪)
তাঁর নিজের আলোচনায় এ ধরনের বিচ্যুতির নজির পাওয়া যায় না।

২৬. প্রথম প্রবন্ধ 'বাংলা উচ্চারণ' সম্বন্ধে তিনি নিজেই এ পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলেছেন:

> বাংলা ভাষায় এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কি না। আমার কাছে তখন খান দুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল, তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৭)

অন্য রচনাগুলোতেও ব্যাপকার্থে এর অন্যথা হয়নি।

২৭. যেমন, উচ্চারণ-নির্ধারণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মানুষের স্বাভাবিক উচ্চারণকে ভিত্তি করেছেন। কোনো পূর্বনির্ধারিত উচ্চারণবিধিকে নয়। মাঝে মাঝেই উল্লেখ করেছেন বিকল্প। অধিক বিকল্পের উপস্থিতিতে খোদ নিয়মের ব্যাপারেই সংশয় পোষণ করেছেন। যেমন, অ-এর ও হয়ে যাওয়ার ৬ষ্ঠ নিয়মের ক্ষেত্রে বলেছেন, '৬ষ্ঠ নিয়মটা তেমন পাকা নহে'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৯)

২৮. রবীন্দ্রনাথের কালে তো বটেই, এমনকি এখনো আরোপিত পরিভাষার চাপ বাংলা ভাষা-আলোচনার প্রধান সংকট। 'ভাষাবিজ্ঞান' বা 'ভাষাতত্ত্বে'র ক্ষেত্রে তা কাজ করে প্রধানত প্রণালি-পদ্ধতি আকারে, আর 'প্রথাগত' ব্যাকরণে সংস্কৃত পরিভাষার অনুকরণে। এ মর্মে হাল-আমলের উদাহরণ হিসাবে জ্যোতিভূষণ চাকী প্রণীত *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* বইয়ের উল্লেখ করা যায়। এখানে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংস্কৃত সংজ্ঞা অনুসরণ করে বাংলা উদাহরণের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য খোঁজা হয়েছে। উপসর্গের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: ''নত' বললে নতির ভাবটা যতটুকু প্রকাশ পায়, 'প্রণত' বললে নতির ভাবটা তার চেয়ে আরও বেশি তা বোঝা যায়। এই 'প্র' হল উপসর্গ, ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করল' (জ্যোতিভূষণ ২০০১: ১৪৫)। এই সংজ্ঞার দাবি মেটাতেই পুরো অধ্যায়ে বহু অচলিত সংস্কৃত শব্দ 'বাংলা ভাষা' ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করতে

হয়েছে। তাছাড়া যোগ করতে হয়েছে এমন মন্তব্য: 'ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে প্র-পরা ইত্যাদিকে উপসর্গ না বলে অব্যয় বলতে হবে। যেমন, সমুদ্র পর্যন্ত=আসমুদ্র'। (জ্যোতিভূষণ ২০০১: ১৪৮)

২৯. 'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য' প্রবন্ধের টীকায় পরিভাষা প্রসঙ্গে তাঁর প্রাসঙ্গিক বক্তব্য:

> এই প্রবন্ধে নির্দেশক নামক একটি নূতন পারিভাষিক ব্যবহার করিয়াছি। পাঠকদের প্রতি আমার নিবেদন, এইরূপ নামকরণ অভাবে ঠেকিয়া দায়ে পড়িয়া করিতে হয়। ইহাদের সম্বন্ধে আমার কোনো মমতা বা অভিমান নাই। এই-সকল নামকে উপলক্ষ করিয়া ভাষার মর্মগত সমস্ত নিয়মের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি ...। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৪৭)

সপ্তম অধ্যায়
বাংলা ভাষাচর্চার ধারা ও রবীন্দ্রনাথ

৭.১ রবীন্দ্রনাথ ও 'নবব্যাকরণবিদ' দল

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দশকে সার্বিকভাবে ভাষা এবং বিশেষভাবে বাংলা ভাষাচর্চায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল (৪.৫ দ্রষ্টব্য)। এ সময় আবির্ভূত হন কয়েকজন বিশ্লেষক, যাঁরা নতুনভাবে বাংলা ভাষার পরিচয় নির্মাণে উদ্যোগী হন। তখনো পুরোনো সংস্কৃতপন্থী বৈয়াকরণদেরই একচ্ছত্র প্রতাপ, যাঁরা মনে করতেন, বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা বা বিকৃত সংস্কৃত; তাই সংস্কৃত বিধিবিধানই বাংলার শুদ্ধতার মানদণ্ড (হুমায়ুন ২০০৪: ১৫০)। নতুন বৈয়াকরণদল এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন; আবিষ্কার করেন বাংলা ভাষা-বর্ণনার নতুন প্রণালিপদ্ধতি। হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন:

> নবব্যাকরণবিদেরা নিশ্চিত ও নির্ভুলভাবে ধরে নিয়েছিলেন যে বাঙলা একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত ভাষা; সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পর্ক সুদূর। তখনকার প্রথাগত ধারণা – বাঙলা সংস্কৃতের দুহিতা – গ্রহণযোগ্য ছিল না তাঁদের কাছে; এবং প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণগুলোকে বাতিল করে দিয়ে তাঁরা অভিনব বর্ণনামূলক ভঙ্গিতে বর্ণনা করতে শুরু করেন বাঙলা ভাষা। (হুমায়ুন ২০০৪: ১৫১)

বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসন এবং বাংলা ব্যাকরণকাঠামোর স্বাধিকার প্রথম ঘোষিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা উচ্চারণ' (১২৯২) ইত্যাদি প্রবন্ধে। সরাসরি নয়, বিশ্লেষণপ্রণালির মধ্যেই এই দাবি ঘোষিত হয়েছিল। অনতিবিলম্বে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।[১] এই তিনজনই মূলত বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণের নতুন ধারার নির্মাতা। তবে আরো কেউ কেউ এ ধারায় অবদান রেখেছিলেন।[২] এর বেশ কয়েক বছর আগে ১৮৭৭ সালে *ক্যালকাটা রিভিয়্যু* পত্রিকায় বেরিয়েছিল শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইংরেজি প্রবন্ধ 'Bengali Spoken and Written'। দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণ-প্রবণতা আর পরবর্তীদের ওপর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাবের বিবেচনায় তিনিও 'নবব্যাকরণবিদ'দের সগোত্র।

৭.১.১ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি (Ganguli 1990) আকারে দীর্ঘ এবং প্রকারে গভীর। প্রবন্ধের শিরোনাম থেকেই তাঁর ভাষাচিন্তার বৈপ্লবিক দিকটি স্পষ্ট হয় – প্রথমে মুখের বাংলা, পরে লেখার বাংলা। বিবেচনার ক্ষেত্রে কোথাও তিনি এ ক্রম লঙ্ঘন করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের সমালোচনা-সূত্রে তাঁর মতের কয়েকটি দিক আগেই উল্লেখিত হয়েছে (৪.৪.৩.২ দ্রষ্টব্য)। এখানে আরো কয়েকটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল:

এক. লেখ্য ও কথ্যরীতির ফারাক থাকবেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা দরকারিও বটে। কিন্তু ফারাকটা হতে হবে ন্যূনতম মাত্রার। বাংলার ক্ষেত্রে ঘটেছে উলটো। এখানে যতটা সম্ভব কৃত্রিম পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে। আর ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এ পার্থক্যের পরিমাণ সম্ভবত পৃথিবীর অন্য যে কোনো ভাষার চেয়ে বেশি।

দুই. লেখার বাংলায় বিশেষ্য ও সর্বনামের কিছু প্রত্যয়-ঘটিত রূপ, ক্রিয়ারূপ, বিশেষ্য ও সর্বনামের লিঙ্গচিহ্ন ইত্যাদিতে সংস্কৃতের অনুসরণ করা হয়। অনেকটা উল্টোমুখে হাঁটার মতো ভাষায় এগুলো নতুন যুক্ত হয়েছে। অন্য কিছু পার্থক্য তৈরি হয়েছে কথ্যভাষায় পরিত্যক্ত অচলিত রূপ লেখার ভাষায় ধরে রাখার ফলে। শ্যামাচরণ বহুবচনচিহ্ন, কারক ও বিভক্তি, ক্রিয়ার কৃত্রিম রূপ, স্ত্রীলিঙ্গ রূপ ইত্যাদির পর্যাপ্ত উদাহরণ দিয়েছেন।

তিন. সংস্কৃত ব্যাকরণের কিছু অংশ বাংলায় হুবহু চালানোর ফলে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণে যে গুরুতর সংকট তৈরি হয়, শ্যামাচরণ তার উদাহরণ দিয়েছেন সন্ধি থেকে। সংস্কৃতে সন্ধি বোধগম্য যুক্তিগ্রাহ্য প্রক্রিয়া। বাংলায় সংস্কৃত সন্ধি সশরীর চালান করার ফলে তা হয়ে উঠেছে অযুক্তির মূর্তিমান রূপ। যেমন, সংস্কৃতে 'মনু+আদি' থেকে হয় 'মন্বাদি' (manvadi)। খুবই বোধগম্য প্রক্রিয়া – 'উয়া' উচ্চারণের সুবিধার্থে পরিণত হয়েছে অন্তস্থ 'ব' বা 'ওয়া'-তে। বাংলায়ও 'মনু' আর 'আদি'র সন্ধিতে 'মন্বাদি' হয়, কিন্তু তা কেবল চোখের কাছে; উচ্চারণে তা 'মন্নাদি' (mannadi)। ফলে বাংলায় নিয়মটি মুখস্থ করা হয় মাত্র; ভাষার উচ্চারণ ও ব্যবহারবিধির সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই।

চার. বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দ হিসাবে সংস্কৃত থেকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে শব্দ আমদানি করা হয়। শ্যামাচরণ 'চত্বারিংশত'র বদলে 'চল্লিশ', 'পঞ্চবিংশ সহস্র' না লিখে 'পঁচিশ হাজার' ইত্যাদি প্রচলিত রূপ ব্যবহারের পক্ষপাতী।

পাঁচ. প্রচলিত লেখ্য-বাংলার শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে শ্যামাচরণের মূল অভিযোগ প্রচলশব্দের বদলে কিংবা প্রচলিত সরল শব্দের পাশাপাশি সংস্কৃত প্রতিশব্দ আমদানি। ফলে বাংলায় হুবহু একই অর্থে পাওয়া যায় 'ভাই' ও 'ভ্রাতা'; 'কাল' ও 'কল্য'; 'সোনা' ও 'স্বর্ণ' ইত্যাদি। সাধারণভাবে ভাষায় একই অর্থে দুই শব্দ থাকার কোনো কারণ নেই। কিন্তু 'শুদ্ধতা'র সংস্কার এবং অযাচিত সংস্কৃতপ্রীতি বাংলার ক্ষেত্রে এই বাড়তি বোঝা তৈরি করেছে। ফরাসি ভাষার উদাহরণ দিয়ে শ্যামাচরণ লিখেছেন, 'এ যেন লেখাপড়া শিখতে আসা কোনো ফরাসি শিশুকে 'fer'-এর বদলে 'ferrum', 'or'-এর বদলে 'aurum' লিখতে শেখানো'।

ছয়. বিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট পুরোনো ভাষার ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধ্বনি হয়েছে। ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়ম মেনেই হয়েছে। এই সূত্রগুলো অলজ্ঞনীয়। ধ্বনি ও শব্দের 'বিকৃতি' তাই আসলে সরলীকরণ – স্বল্পতম সময় ও শ্রমে উচ্চারণের সুবিধা অনুযায়ী এ সরলীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এ কারণেই 'শুদ্ধ'রূপ হিসাবে পুরোনো-রূপের নয়া আমদানি ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা ও ব্যবহারবিধির জন্য ক্ষতিকর।

সাত. অন্য ভাষা থেকে শব্দ ধার করার ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রাধান্য পাবে; কারণ, সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে বাংলাভাষীদের আংশিক পরিচয় আছে। তবে অন্য ভাষার শব্দ যদি লোকব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হয় আর সরল হয়, তাহলে লেখার বাংলায় তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সংস্কারে ভোগা উচিত নয়।

আট. ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয় ইত্যাদি উন্নত ভাষা লাতিনের উপর যতটা নির্ভর করেছে, সংস্কৃত ভাষার উপর ভারতীয় লোকভাষাগুলোর তারচেয়ে বেশি নির্ভরশীল হওয়ার কোনো কারণ নেই।

সমকালীন লেখ্য-বাংলার স্বভাব বিশ্লেষণ এবং তার বিপরীতে চলতি বাংলা গ্রহণের প্রস্তাব হিসাবে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধ তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক দুই দিক থেকেই অদ্যাবধি মূল্যবান। চলতি বাংলার যুক্তিনিষ্ঠ প্রস্তাবক হিসাবে এ প্রবন্ধের মূল্যায়ন করেছেন পবিত্র সরকার:

> এ নিবন্ধটি সম্ভবত সাহিত্যের ভাষা হিসেবে চলতি বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার পক্ষে প্রথম বিস্তারিত প্রস্তাব। এ নিবন্ধের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াতে লিখিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত রচনা 'বাঙ্গালা ভাষা'। এবং পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলা সাহিত্যের ভাষা সংক্রান্ত যাবতীয় বক্তব্য শ্যামাচরণের দীক্ষা বহন করে। প্রমথ চৌধুরী ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' পত্রিকার মধ্য দিয়ে চলিত ভাষার পক্ষে একটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু এ আন্দোলনের আদি বীজটি প্রোথিত হয়েছিল শ্যামাচরণের নিবন্ধে, সাঁইত্রিশ বছর আগে। অবশ্য শ্যামাচরণের নিবন্ধ প্রকাশের বহু আগে থেকেই মূলত 'অ্যাংলিসিস্ট' ইংরেজের দল Sanskritized Bengali-র বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর কাছাকাছি সময়ের মধ্যে জন বীম্‌সের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু শ্যামাচরণের মতো সাধু ও চলিতের চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও দুয়ের ভাষাগত তুলনা করে, তাঁর আগে বা পরে কেউ বিষয়টির অবতারণা করেননি, প্রমথ চৌধুরীও নয়। (পবিত্র ১৯৯৯: ১০)

আসলে ব্যাপকার্থে শ্যামাচরণের প্রস্তাবটি ভাষার 'মানরূপ'-সম্পর্কিত। সমকালীন লেখ্য-বাংলা আর ব্যাকরণ তাঁর বিবেচনায় 'অস্বাভাবিক', যার প্রাতিষ্ঠানিক চাপ আর ব্যবহারিক অভ্যস্ততা 'স্বাভাবিক' বাংলার চর্চা ব্যাহত করছিল। এর ফলে বাংলা ভাষাভাষীরা সামগ্রিক – ভাষার নানা ব্যবহারিক দিক থেকে তো বটেই, এমনকি সাহিত্যিক বিচারেও – ক্ষতির শিকার হচ্ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এবং বিশ্লেষণের প্রকৃতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামাচরণের সাযুজ্য বিস্ময়কর।[৩]

প্রথমে বিশ্লেষণমূলক কয়েকটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যাক। বহুবচনচিহ্নের ক্ষেত্রে শ্যামাচরণের মত এই যে, প্রকৃত বাংলা বহুবচনচিহ্ন 'রা'। চালু বাংলায় গুনো, গুনি, গুলো, গুলি, গুলিন ইত্যাদি শব্দযোগেও বহুবচন হয়। তবে লেখ্য-বাংলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় সংস্কৃত থেকে ধার করা গণ, সমূহ, বৃন্দ, মণ্ডলি ইত্যাদি, মুখের ভাষায় যেগুলো কখনোই ব্যবহৃত হয় না। রবীন্দ্রনাথের সংশ্লিষ্ট আলোচনা অনেক বিস্তৃত ও গভীর (৬.৩ দ্রষ্টব্য)।[৪] কিন্তু বাংলা ভাষার নিজস্ব বচনরূপ চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে দুজনের গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সংস্কৃত কারক-বিভক্তির অনুসরণ না করে বাংলার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নতুনভাবে কারক-বিভক্তি চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কৃত পরিভাষা ব্যবহারের নীতি গ্রহণ করেছেন দুজন।[৫] বিশেষত বাংলা বিভক্তিগুলোকে সংস্কৃতের সঙ্গে মিলিয়ে প্রথমা থেকে সপ্তমী পর্যন্ত বিন্যস্ত করা এবং বিভিন্ন কারকের সঙ্গে সেগুলোকে নিত্য-সম্পর্কে সম্পর্কিত করে দেখানোর যে রেওয়াজ বাংলা ব্যাকরণগুলোতে দেখা যায়, এঁরা দুজনই তা পরিহার করেছেন।

নতুন শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার অপটুত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় দুজনের রচনায়। শ্যামাচরণ বলেছেন, বাংলা এ ক্ষেত্রে এমনকি হিন্দুস্তানির চেয়েও পিছিয়ে আছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের রচনায় – যেমন, *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইয়ের 'ভাষার কথা' বা *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের ১৩ সংখ্যক পরিচ্ছেদ – বারবার এ সংকটের কথা বলা হয়েছে। এ 'সংকট' সমাধানের জন্য দুজনই প্রয়োজনীয় ঋণের পরামর্শ দিয়েছেন। অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃত আমদানির সমকালীন ধারার বিরোধিতা করেছেন দুজনই।[৬] বাংলা সাধিতশব্দের ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের ক্ষেত্রে, শ্যামাচরণের একটি প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লক্ষ করেছেন, বাংলায় 'ত্ব', 'য' এবং 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গুণবাচক শব্দ গঠিত হয়। এর মধ্যে 'তা' বাংলার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সবচেয়ে ভালো খাপ খায়। কারণ, 'তা' যুক্ত হলে মূল শব্দের স্বর পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু বাস্তবতা হল, 'তা' বা 'য' নয়, 'ত্ব'-ই 'ত্ত'রূপে বাংলা ভাষায় পুরোপুরি আত্মীকৃত হয়েছে। তাই শ্যামাচরণের প্রস্তাব হল, 'ত্ত'কে বাংলা প্রত্যয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তার ব্যবহারিক বিধি প্রণয়ন করা –

'ত্ব'র বোঝা বহন না করা। তাঁর মতে, 'ত্ব' হল 'দুষ্ট লিখনরীতির ছদ্মবেশে' বাংলা ভাষার একটি উপাদানকে 'মাতৃরূপের সঙ্গে সদৃশ করে' রাখার এক অনাবশ্যক প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' এবং 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে বাংলা প্রত্যয় সম্পর্কে এই প্রস্তাবই বিশদ করেছেন। লেখ্যরূপের সাদৃশ্যবশত বাংলা প্রত্যয়কে সংস্কৃত প্রত্যয়ের মতো করে তালিকাবদ্ধ করার বিরোধিতা করেছেন তিনি। 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে এ রকম বাংলা প্রত্যয়ের লম্বা তালিকা আছে। শ্যামাচরণের প্রবন্ধে যা মূলনীতি বা প্রস্তাব আকারে ছিল, রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে তা বাস্তবভিত্তি অর্জন করে।

বাংলা ভাষার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্যামাচরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল পাওয়া যায় লিঙ্গচিহ্ন[৭], সমাস[৮] প্রভৃতির বিশ্লেষণে এবং আরো নানা জায়গায়। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিল আছে দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির গোড়ার কথা – ভাষার ব্যবহারিক বাস্তবতাকে বিবেচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা। সংস্কৃতায়িত বাংলা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে শ্যামাচরণের অন্যতম প্রধান আপত্তি শিক্ষার – বিশেষত শিশুশিক্ষার – ক্ষেত্রে উদ্ভূত সংকট। প্রতিশব্দের বাহুল্যের কারণে অর্থাৎ প্রচলিত শব্দের পাশাপাশি সংস্কৃত প্রতিশব্দ শিখতে হয় বলে, শ্যামাচরণের মতে, বাঙালি শিশুর শ্রম, সময় ও মেধার অকারণ অপচয় হয়। ব্যাকরণচর্চার ক্ষেত্রেও পরিচিত ভাষার সঙ্গে সূত্রের মিল না থাকায় শিক্ষার্থীকে মুখস্থের বোঝা বইতে হয়। তিনি আরো লক্ষ করেছেন, বাংলা ভাষায় ছদ্ম-সংস্কৃত শব্দের প্রতাপের কারণে বাঙালি শিক্ষার্থীরা এমনকি সংস্কৃত শিখতে গিয়েও সমস্যায় পড়ে। লেখ্য ভাষার দুটি উচ্চতর ব্যবহার – সাহিত্যিক ও জ্ঞানজাগতিক – সম্পর্কেও শ্যামাচরণ আলোচনা করেছেন কাজের দিক থেকে। সাহিত্যিক বাংলা বিশেষত গদ্য সম্পর্কে শ্যামাচরণের মূল অভিযোগ, গুরুগম্ভীর ধ্বনি আর অলংকারবহুল ভাষার অকারণ-ব্যবহার।[৯] তাঁর মতে, ধ্বনিসাম্য ভাষাশৈলীর উঁচুদরের গুণ সন্দেহ নেই; কিন্তু তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ততা, নির্ভুলতা, স্পষ্টতা আর হৃদয়গ্রাহী হওয়া। অথচ সংস্কৃতায়িত বাংলার প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে বাংলা গদ্যে এ গুণগুলোর বিকাশ ঘটেনি। জ্ঞানচর্চার ভাষার ক্ষেত্রে তিনি লেখার ভাষা আর মুখের ভাষার সাম্যের পক্ষপাতী। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত পরিভাষার ব্যবহারও তিনি মূল্যবান মনে করেন। কারণ, দুনিয়ার জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতীয়দের অবদানের ক্ষেত্রে এসব পরিভাষা – তাঁর মতে – মূল্যবান সংযোজন বলে বিবেচিত হবে।

আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ভাষার আলোচনা করেছেন মূলত 'কেজো' বা 'ব্যবহারিক' দিক থেকে (৫.৩ দ্রষ্টব্য)। তিনি 'ভাষার বিভিন্ন রূপাণু নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, ভাষায় তাদের 'কাজে'র ভিত্তিতে ব্যাকরণ বা ভাষা ব্যবহারের নিয়ম-বিধি রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন', যাকে বলা যায় 'ক্রিয়াশীল ব্যাকরণ' (সুনীল ১৯৮৯: ১৩)। শিক্ষা তাঁর ভাষাচিন্তার অন্যতম প্রধান দিক। সাহিত্যিক ভাষা আর জ্ঞানচর্চার ভাষার বেলায়ও তিনি যথাসম্ভব ব্যবহারিক দিকগুলো বিবেচনায় রেখেছিলেন।[১০]

ভাষার নিজস্ব স্বভাব আর প্রকৃতিকে পরম মূল্য দিয়ে ভাষা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে শ্যামাচরণ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য দেখা যায়। এক জায়গায় শ্যামাচরণ লিখেছেন, বাংলা ভাষায় third day বোঝাতে 'তিনের দিন' না বলে বলা হয় 'তিন দিনের দিন'। এরপর তাঁর মন্তব্য: 'This is no doubt a cumbrous circumlocution, but things must be taken as they are.' (Ganguli 1990: 20) শ্যামাচরণ তাঁর সম্পূর্ণ আলোচনায় ব্যতিক্রমহীনভাবে এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের তাবত আলোচনার মূলেও আছে এ দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলা ভাষাকে সবসময়ে নিয়ম-শৃঙ্খলার বশীভূত করা যায় না – এমন উল্লেখ তাঁর আলোচনায় বারবার দেখা যায়। কিন্তু কোনো আরোপিত

শৃঙ্খলায় বাংলা ভাষাকে বাঁধার চেষ্টা তিনি করেননি। প্রচলিত বাগভঙ্গির মধ্যেই বাংলার সৌন্দর্য ও সামর্থ্যের সন্ধান করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, 'বাংলা ভাষা একান্ত আচারনিষ্ঠ' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৪৫)। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ের 'জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট করে বলেছেন, ভাষার ক্ষেত্রে লোকাচার শাস্ত্রের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ:

> ইংরেজি ভাষা লাটিন নিয়মে আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করে না। যদি করিত তবে এ ভাষা এত প্রবল, এত বিচিত্র, এত মহৎ হইত না। ভাষা সোনা-রুপার মতো জড়পদার্থ নহে যে, তাহাকে ছাঁচে ঢালিব। তাহা সজীব – তাহা নিজের অনির্বচনীয় জীবনীশক্তির নিয়মে গ্রহণ ও বর্জন করিয়া থাকে। সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচারকে প্রাধান্য দেয়। লোকাচারের অসুবিধা অনেক, তাহাতে এক দেশের আচারকে অন্য দেশের আচার হইতে তফাত করিয়া দেয়; তা হউক, তবু লোকাচারকে ঠেকাইবে কে। লোককে না মারিয়া ফেলিলে লোকাচারের নিত্য পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য কেহ দূর করিতে পারে না। কৃত্রিম গাছের সব শাখাই এক মাপের করা যায়, সজীব গাছের করা যায় না। ভাষারও লোকাচার শাস্ত্রের অপেক্ষা বড়ো। সেইজন্যই আমরা 'ক্ষান্ত' দেওয়া বলিতে লজ্জা পাই না। সেইজন্যই ব্যাকরণ যেখানে 'আবশ্যকতা' ব্যবহার করিতে বলে, আমরা সেখানে 'আবশ্যক' ব্যবহার করি। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ যদি চোখ রাঙাইয়া আসে, লোকাচারের হুকুম দেখাইয়া আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৫০)

ভাষার বিধি-প্রণয়ন আর বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁরা দুজনই এই 'আচার'কেই পরম মূল্য দিয়েছেন। সংস্কৃত বা ইংরেজির ছক যে তাঁদের মান্য করতে হয়নি, বা তাঁরা মান্য করেননি, তা এই সিদ্ধান্তেরই অনিবার্য সম্প্রসারণ। তবে তাঁদের দুজনের সবচেয়ে বড় মিল এই যে, দুজনেই ব্যাপকার্থে কাজ করেছেন এক সুস্থিত কিন্তু নমনীয় 'মান বাংলা'র জন্য (৮.১ দ্রষ্টব্য)। এক অর্থে অপরাপর মিলগুলো এই মিলেরই উপজাত।

৭.১.২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা ভাষার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি, এ কাজে দীর্ঘসময় ধরে নিবিষ্টও থাকেননি[১১], কিন্তু উপনিবেশিত বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণের সমস্যাগুলো তীব্র ভাষায় শনাক্ত করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্র হিসাবে তিনি তাঁর ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকরভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন, আর এভাবে শ্যামাচরণের সঙ্গে পরবর্তীদের যোগসূত্র তৈরি করেছিলেন। বাংলা ব্যাকরণ ও সার্বিকভাবে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনাচিন্তারও চিরকালীন মূল্য আছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাংলা ব্যাকরণ' (১৩০৮) প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষদের সভায় পড়েছিলেন। এতে তাঁর উচ্চারণের তীব্রতা সমকালকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ প্রবন্ধে উদঘাটিত হয় প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের স্ববিরোধ ও ত্রুটি। সেকালের বাংলা ব্যাকরণগুলোকে তিনি ভাগ করেন দুভাগে – 'মুগ্ধবোধ-প্যাটেন্ট' ও 'হাইলি-প্যাটেন্ট'। দু ধরনের ব্যাকরণেই বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য উপেক্ষিত হচ্ছিল। অনুসৃত হচ্ছিল যথাক্রমে সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শ। এর ফলে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সমকালের ব্যাকরণ বইগুলোতে কারকের আলোচনা যেভাবে হত, তার পর্যালোচনা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন, তাতে কেবল সংস্কৃত ছাঁচের হুবহু অনুসরণই করা হয় না, ওই ছাঁচের সঙ্গে মিলানোর জন্য নানা গোঁজামিলও দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর 'অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে কারক ও বিভক্তিকে আলাদা করে রাখার ব্যাকুল চেষ্টায়' (পবিত্র ১৯৯৯: ৪৩)। তিনি লিখেছেন, 'কারক অর্থসাপেক্ষ, বিভক্তি শব্দসাপেক্ষ' (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৫৯৪)। তাছাড়া সংস্কৃত কারক ও বিভক্তির নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার

সঙ্গে বাংলা ভাষার এত অমিল যে সেই ছাঁচে বাংলা কারক-বিভক্তির আলোচনা হতেই পারে না। বাংলায় বিভক্তি 'তিন-চারটি', তার মধ্যে এ বিভক্তি আবার সকল কারকেই হয়। তাই 'সংস্কৃতের মতো প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী ইত্যাদি এবং একবচন, বহুবচন করিয়া একটা লম্বা গাছ আঁকিবার প্রয়োজন' নেই (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৫৯৯)। বিভক্তি 'শব্দের অঙ্গ ও কারক অর্থের অঙ্গ' হওয়ায় বাংলায় কারক ও বিভক্তির স্বতন্ত্র পাঠ হওয়া উচিত।

বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে জোরালো প্রশ্ন তুলেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর মতে, খাঁটি বাংলা শব্দে সন্ধি হয় না। বাংলায় যে এত সন্ধিবদ্ধ পদ দেখা যায়, তার মূলে আছে আরেক গলদ – প্রচলিত শব্দ পরিহার করে সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করা। সংস্কৃত থেকে প্রয়োজনীয় সমাসনিষ্পন্ন বা প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদ ধার করলে, 'সন্ধিতে জমাট করা' সে সকল শব্দ আস্ত শব্দ আকারে ব্যবহার করা উচিত। সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বাংলায় ধার করার দরকার নেই। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের 'অব্যয়' ও 'সব্যয়', 'মিশ্রক্রিয়া', 'উষ্মবর্ণ' প্রভৃতি পরিভাষা নিয়ে তিনি তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন। লক্ষণীয়, সব ক্ষেত্রেই তাঁর অন্যতম বিবেচ্য ছিল শিশুশিক্ষা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধ পড়েন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে। ওই সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন; সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করেছিলেন (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৬১২)। 'শাস্ত্রীমশায় যে আলোচনার সূত্রপাত করেন তার অনুবৃত্তি রূপে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' এবং সপ্তম মাসিক অধিবেশনে 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধ দুটি পড়েন (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৬১৫)। সভা দুটিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চম অধিবেশনে তিনি বলেন:

> রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে আজ আমার আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে। এক মাস পূর্বে আমি এ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করি, রবীন্দ্রবাবুর মতো লোকে যে এত শীঘ্র সহায়তা করিবেন সে আশা করি নাই। আরো অনেকে প্রস্তুত হইতেছেন। (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৬১৫)

দেখা যাচ্ছে, 'নবব্যাকরণ'-আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনাকারী ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথ অনতিবিলম্বে সে আন্দোলনে শরিক হন। তাঁর কাজে হরপ্রসাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। ওই দুই অধিবেশনের বক্তৃতায় তিনি কেবল রবীন্দ্রনাথের সমর্থন করেননি, বিরোধী মতও খণ্ডন করেছিলেন। এই উৎসাহ যে রবীন্দ্রনাথের কাজে লেগেছে, তার প্রমাণ তাঁর রচনাতেই পাওয়া যায়। সংস্কৃত পরিভাষা ও ব্যাকরণসূত্র হুবহু ব্যবহারের বিরোধিতা, প্রাকৃত বাংলাই যে প্রকৃত বাংলা সে ঘোষণা এবং সংস্কৃতের নিয়মে বাংলার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের বিরোধিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদের সাক্ষ্য ব্যবহার করেছেন[১২]। ব্যাকরণে সন্ধি না রাখা, প্রকৃতি-প্রত্যয় ও সমাস আলোচনার ধরন, প্রচলিত শব্দভাণ্ডার ও প্রকাশভঙ্গিতে 'খাঁটি বাংলা' আবিষ্কারের অব্যাহত চেষ্টা – ইত্যাদি বিচিত্র ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গির সহযাত্রী ছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। তবে তাঁদের দুজনের ব্যাকরণচিন্তার গোড়ার সত্য এই যে, দুজনেই চেয়েছিলেন 'খাঁটি বাংলা' বা 'তদ্ভব বাংলা' বা 'প্রাকৃত বাংলা'র ব্যাকরণ রচিত হোক।

এই 'খাঁটি বাংলা' প্রসঙ্গ – কী তত্ত্বে কী নিজের রচনায় – হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষাচিন্তার প্রধান দিক। ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার যে প্রেক্ষাপটে 'খাঁটি বাংলা'র কথা বিশেষভাবে তুলতে হয়েছে, তিনি বিভিন্নভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন। 'বাংলা ভাষা' (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৫৫৯-৬৬) প্রবন্ধকে বলা যায় সে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ। এখানে তিনি পুরোনো বাংলার উল্লেখ করেছেন: 'ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে যে-সকল পদ্য লিখিত হইয়াছিল, তাহা বিশুদ্ধ

বাংলাভাষায় লিখিত। ... কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি কবিগণের লেখা বিশুদ্ধ বাংলা'। পদ্যের বাইরেও বিশুদ্ধ বাংলা সম্পর্কে তাঁর ধারণা অতি স্পষ্ট: 'গদ্য না থাকিলেও ভদ্র সমাজে যে ভাষা প্রচলিত থাকে তাহাকেই বিশুদ্ধ বাংলাভাষা কহে'। এ ধরনের বাংলা, হরপ্রসাদের মতে, তিন ধরনের ছিল – উর্দু-মিশানো বাংলা, সংস্কৃত-মিশানো বাংলা, বিষয়ী লোকের বাংলা। কিন্তু উপনিবেশ আমলের বাংলা গদ্যে এই তিন প্রকারের 'বিশুদ্ধ বাংলাভাষা' বাদ পড়ে যায়। তখন 'ইংরেজ মহাপুরুষেরা বাঙালিদিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য উদ্যোগী' হন, এবং পরিচয়সূত্রে বাংলা বই লেখার দায়িত্ব দেন সংস্কৃত-পণ্ডিতদের। এই পণ্ডিতদের সঙ্গে বাংলাভাষী জনসাধারণের কোনো যোগ ছিল না। 'সুতরাং তাঁহারা দেশে কোন্ ভাষা চলিত কোন্ ভাষা অচলিত, তাহার কিছুই বুঝিতেন না'। এই অপরিচয়জনিত কারণে এবং 'পণ্ডিতস্বভাবসুলভ দাম্ভিকতা'হেতু তাঁরা যে বাংলা গদ্য লিখলেন, তাতে 'রাশি রাশি সংস্কৃত শব্দ বিভক্তি পরিবর্জিত হইয়া বাংলা অক্ষরে উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়া পুস্তকমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল'। এর অন্যতম প্রধান কারণ, তাঁরা প্রধানত সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছিলেন। ইংরেজি থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রেও খাঁটি বাংলা বাদ পড়ে। অন্যদিকে 'ইংরেজিওয়ালারা' সংস্কৃত-পণ্ডিতদের ন্যায় সমাজবিচ্ছিন্ন ছিলেন। ফলে তাঁদের লেখায়ও প্রচলিত বাংলার ঐশ্বর্য ধরা পড়েনি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত-পণ্ডিতদের গদ্য, ইংরেজি থেকে অনূদিত গদ্য এবং ইংরেজিওয়ালাদের গদ্যের উদাহরণ দিয়েছেন যথাক্রমে তারাশঙ্কর তর্করত্নের *কাদম্বরী*, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *জীবনচরিত* এবং অক্ষয়কুমার দত্তের *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* থেকে। শেষে তাঁর সিদ্ধান্ত: 'যাঁহারা বাংলা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভালো বাংলা শিখেন নাই'।

উনিশ শতকের গদ্য সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এ সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর[১৩]; কিন্তু উপনিবেশিত বাংলা গদ্যের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে এর গভীরতর তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। পুরোনো বাংলার বিপরীতে উপনিবেশিত নতুন গদ্যসৃষ্টির যে প্রক্রিয়া তিনি বর্ণনা করেছেন, এবং সে প্রক্রিয়ার ফলকে যেভাবে চিহ্নিত করেছেন, পরবর্তী গবেষণায় তা যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও লক্ষ করেছেন, 'লিখিত বাংলা ও কথিত বাংলা এত তফাত হইয়া পড়িয়াছে যে, দুইটিকে এক ভাষা বলিয়াই বোধ হয় না' (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৫৬৫-৬৬)। এই লেখ্য-বাংলা কিভাবে প্রভাব-প্রতিপত্তি হাসিল করেছে, তারও পরিচ্ছন্ন বয়ান তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। এতে রাষ্ট্রপক্ষের সহযোগিতা ও নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমর্থন ছিল; কিন্তু সবচেয়ে কার্যকর প্রভাব রেখেছে শিক্ষাবিভাগ ও পাঠ্যপুস্তক। অন্যদিকে ১২৮৮ সালে ছাপা ওই প্রবন্ধেই হরপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন, পুরোনো 'বিষয়ী লোকের ভাষা' এত পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, তা পুনরুদ্ধার করার কোনো উপায় আর নেই।[১৪] তাহলে গদ্যের আদর্শ কোথায় মিলবে? এ বিষয়ে তিনি পুরোপুরি দ্বিধাহীন – চলতি বাংলাই হবে লেখ্য-বাংলার ভিত্তি। এ প্রসঙ্গ তাঁর রচনায় বারবার উঠে এসেছে। 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির সম্বোধন' (১৯১৫)-এ লিখেছেন:

> দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা নয়, যে-সব কথা ভদ্রলোকের কাছে কহিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভালো হইবে। ... এখন বাংলাকে এই সংস্কৃত ও ইংরাজির হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে। ... লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর করিতে পারে না। যত দিন যাইতেছে কথাটা ক্রমেই শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমি বলি, যাহা চলতি, যাহা সকলে বুঝে – তাহাই চালাও; যাহা চলতি

> নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি তাহা ইংরাজিই হউক, পারসিই হউক, সংস্কৃতই হউক – চলুক। তাহাকে বদলাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। 'রেলওয়ে'কে 'লৌহবর্ত্ম' করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। ... এরূপ করা বড়োই অন্যায়। (হরপ্রসাদ ২০০০/বিঃ ৩৭১)

এ নীতিনির্ধারণের বাইরে হরপ্রসাদের বড় কৃতিত্ব এই যে, তাঁর প্রচারিত 'খাঁটি বাংলা'র নমুনা তাঁর নিজের গদ্য। বাংলা গদ্যের বিশ্লেষকেরা এ গদ্যের 'খাঁটি বাংলাত্ব' স্বীকার করে নিয়েছেন।[১৫] কিন্তু তাঁর এ প্রকল্প শুধু গদ্য বা সাহিত্যিক গদ্যের প্রকল্প নয়। 'তাঁর চিন্তায় এবং গবেষণায় 'খাঁটি বাংলা' কথাটির তাৎপর্য খুব ব্যাপক ও গভীর। 'খাঁটি বাংলা' বলতে তিনি বাঙালি জাতি এবং বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির যে মৌল বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করেন, আর্য-ভারতবর্ষ বা ব্রাহ্মণ্য-আশ্রিত ভারতবর্ষ থেকে তা স্বরূপে আলাদা' (হরপ্রসাদ ২০০০/বিঃ ২৯)। ব্রাহ্মণ্য উপাদান, বৌদ্ধ উপাদান, ইসলামের উপাদান – যা কিছু এখানে এসেছে, সবই এখানকার আদি জনবৃত্তের ধ্যান-ধারণার আনুগত্য মেনে নিয়েছে।[১৬] এই বিচিত্র উপাদানের মিশেলে বাংলার যে নিজস্ব চরিত্র তৈরি হয়েছে, শাস্ত্রী ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারই প্রতিফলন দেখতে চান। ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও গদ্যের প্রশ্নে তাঁর এ চাওয়া একটা নতুন ও সঙ্গত তাৎপর্য পায়। নতুন কালে গড়ে ওঠা নতুন চিন্তা-চেতনার গুরুত্ব তাঁর কাছে মোটেই কম নয়। কিন্তু এর জনবিচ্ছিন্নতা আর চেতনাগত ছেদের পাকা হিসাব করেই তিনি প্রাপ্তির মূল্যায়ন করেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রসঙ্গে তাঁর এই বিবেচনা-পদ্ধতির স্বচ্ছ প্রকাশ ঘটেছে:

> বেশি সংস্কৃত পড়িলে লোকে ব্রাহ্মণ হইতে চায়, ঋষি হইতে চায়, সেটা খাঁটি বাংলার জিনিস নয়; তাহার সঞ্চার পশ্চিম হইতে। বেশি ইংরাজি পড়িলে কী হয় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। ... ইংরাজিই পড়ো, আর সংস্কৃতই পড়ো, ফারসিই পড়ো আর উর্দুই পড়ো, বাংলার উপর তোমার নজরই পড়িবে না। বাংলার ভালো-মন্দ তুমি দেখিতেই পাইবে না, মোট কথা বাংলার উপর তোমার প্রীতিই থাকিবে না। সেই প্রীতিটুকুই অক্ষয়বাবু আমাদের দিয়া গিয়াছেন। (হরপ্রসাদ ২০০০/বিঃ ১২০-২১)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'খাঁটি বাংলা' তাই শুধু ভাষা ও সাহিত্যের বিবেচনা নয়; তা এক সামগ্রিক ধারণা। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে যে অধীনতার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার মোকাবেলার প্রস্তাব ও প্রস্তুতি এতে আছে। এতটা ব্যাপক ও সর্বাত্মকভাবে লিপ্ত না হলেও ভাষাপ্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাকৃত বাংলা' যে হরপ্রসাদের 'খাঁটি বাংলা'রই সহোদর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৭.১.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে খুব বেশি লেখেননি; কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আর বিবেচনা-পদ্ধতি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও মূল্যবান। *শব্দ-কথা* (১৯১৭) গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোতে একই সঙ্গে 'নবব্যাকরণবিদ'দলের সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য এবং নিজস্বতা – দুইই বিশেষভাবে চোখে পড়ে।[১৭]

সমকালীন ব্যাকরণ-বিতর্কে রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষার নিজস্বতার যুক্তিটিকেই মান্য করেছেন। সে অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেছেন 'কারক-প্রকরণ'। এ প্রবন্ধে ইংরেজি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি একত্র করে বাংলা কারক-ব্যাখ্যার প্রচলিত ধারা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে বাংলা কারকের ছবিটি দাঁড়িয়েছে এ রকম:

> আমি এই পর্যন্ত বলিতে চাহি যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারক-প্রকরণে তিনটির বেশি কারক রাখা অনাবশ্যক। কর্তা, কর্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক, যাহার বিভক্তি-চিহ্ন এ এবং তে। করণ ও অধিকরণ এবং আর যে সকল পদের অর্থ ধরিয়া কারক নির্ণয় দুরূহ, তাহারা এই তৃতীয় কারকের অন্তর্গত হইবে। সম্প্রদান কর্ম হইতে অভিন্ন, সম্প্রদান রাখিবার দরকার নাই। ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ের অভাবে অপাদান অস্তিত্বহীন। সেই কারণে সম্বন্ধবাচক পদও কারক নহে। অতএব বাঙ্গালা ব্যাকরণে তিনটির অধিক কারকের প্রয়োজন নাই। (রামেন্দ্র ১৩৫৬: ৭৯)

কারক-নির্ণয়ে রামেন্দ্রসুন্দর অর্থের চেয়ে অর্থাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক-নির্ণয়ের চেয়ে বিভক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত অন্যদের চেয়ে অনেক আলাদা হয়েছে।

'না' প্রবন্ধটি বাংলা ভাষার বিভিন্ন নঞর্থক প্রকাশভঙ্গির বিশ্লেষণ। এ প্রবন্ধের রচনাপ্রণালির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাষা-বিষয়ক রচনার মিল আছে – সরস ভাষায় বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে ভাষার কোনো একটি দিকের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার দিক থেকে। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে *বাংলা শব্দতত্ত্বে* আলোচনা করেননি। তবে *বাংলাভাষা-পরিচয়ের* ১৯ নম্বর পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে। 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধটি স্বাধীন রচনা নয়। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পরের সংখ্যায় ব্যোমকেশ মুস্তফী নতুন কিছু তথ্য ও ভিন্নমত প্রকাশ করে লিখেছিলেন। পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুস্তফীর প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য জুড়ে দেন। এ মন্তব্যই পরে প্রবন্ধ-আকারে *শব্দ-কথা* গ্রন্থে গৃহীত হয়েছিল। আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও 'কয়েকটি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের স্বরূপ নির্দেশ এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের ব্যাখ্যা হিসেবে নিবন্ধটি মূল্যবান। রামেন্দ্রসুন্দর চমৎকার দেখিয়েছেন যে, ঈ-প্রত্যয় বলে বাংলায় কিছু নেই – তা মূলত লেখার অভ্যাস থেকে ব্যাকরণের সূত্রে গৃহীত হয়েছে' (পবিত্র ১৯৯৯: ৭৯)। রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রতি তিনি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

শব্দ-কথার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ রচনা 'ধ্বনি-বিচারে'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি সম্পর্কিত। মুখবন্ধে প্রবন্ধটির গুরুত্ব সম্পর্কে লেখক স্বয়ং মন্তব্য করেছেন: ''ধ্বনি-বিচার' প্রবন্ধটির প্রতি আমার একটু মমত্ব আছে। বোধ হয়, আমি উহাতে কিছু নূতন কথা বলিয়াছি' (রামেন্দ্র ১৩৫৬: ৩)। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ঋণের স্বীকৃতিও আছে এখানে:

> শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত এবং সপ্তম বর্ষের চতুর্থ-সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা পড়িয়া কয়েকটা কথা আমার মনে আসে। ... রবীন্দ্রনাথের ... স্পষ্ট ইঙ্গিতের নিকট আমি ঋণী; – আর কাহারই বা কাছে এমন ইঙ্গিত পাইতে পারি? এই ইঙ্গিত না পাইলে বোধ করি, ধ্বনি-বিচার প্রবন্ধের উৎপত্তি হইত না। (রামেন্দ্র ১৩৫৬: ৩)

রবীন্দ্রনাথের কাছে ইঙ্গিত পেয়ে বাংলা ধ্বনিগুলোর অর্থ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক বিস্তারিত বিশ্লেষণ হাজির করেছিলেন তিনি। সে বিশ্লেষণের মূল কথা: 'প্রত্যেক বর্গের প্রতিটি ধ্বনির এই ধরনের একটা স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা আছে এবং মূলে যা ধ্বন্যাত্মক বা নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকৃতিজাত, তার অর্থ ও তাৎপর্য ক্রমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যঞ্জনার দৌড় ক্রমে বেড়ে যায়' (নির্মল ২০০০: ২৯৭)। 'ধ্বনি-বিচার' রামেন্দ্রসুন্দরের এক উচ্চাভিলাষী প্রকল্প, যেখানে অনুমান ও কষ্টকল্পনার প্রশ্রয় থাকলেও বাংলা অর্থতত্ত্বে এ এক বিরল সংযোজন।[১৮]

উচ্চাভিলাষ আর চিন্তার ব্যক্তিত্ব খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে তাঁর 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধেও। সমসাময়িক ব্যাকরণ-বিতর্কের প্রেক্ষাপটেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। একদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর এবং অন্যদিকে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ – এই দুই দলের ব্যাকরণচিন্তার পারস্পরিক বিরোধিতা নিরসন তাঁর প্রবন্ধের এক উদ্দেশ্য। অন্যদের মত পর্যালোচনা করে তিনি নিজে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন তাতে সার্বিকভাবে ব্যাকরণ সম্পর্কে 'উঁচু ধারণা'র সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।[১৯] ব্যাকরণশাস্ত্রের আদর্শ ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন, 'ব্যাকরণ কখনও নিয়ম বাঁধে না; উহা নিয়ম আবিষ্কার করে মাত্র' (রামেন্দ্র ১৩৫৬: ১২৭)। এভাবে তিনি আনুশাসনিক ব্যাকরণের এলাকা থেকে দূরে সরে যান। এমনকি ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণেও সীমাবদ্ধ থাকেন না। ব্যাকরণের লক্ষ্য ও কাজ সম্পর্কে নিজের ধারণা তিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

> আমি ব্যাকরণ নামের যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য ভাষা শেখান নহে। উহার উদ্দেশ্য নিজে শেখা; ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা দ্বারা আবিষ্কার করা। ... বাঙ্গালা ভাষার সেই ব্যাকরণ এখনও রচিত হয় নাই, কেন না বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে কি নিয়ম আছে না-আছে, তাহা কেহই আলোচনা করেন নাই। (রামেন্দ্র ১৩৫৬: ১২২)

বৈয়াকরণের কাজ, ব্যাকরণ রচনার উপাদান, সংস্কৃত থেকে বাংলার স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রায় আক্ষরিক মিল পাওয়া যায়। তাঁরা পরস্পর প্রভাবিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। কিন্তু অন্তত দুই ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের অবস্থান আলাদা। তিনি ব্যাকরণতত্ত্বকে অধিকতর মূল্য দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃতের সূত্রাবলি চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করলেও তিনি 'সংস্কৃত ব্যাকরণের তত্ত্বকে মূল্যবান বিবেচনা করতেন, এবং নিশ্চিত ছিলেন ওই তত্ত্ব বাঙলা ভাষা ব্যাখ্যায় গৃহীত হ'তে পারে' (হুমায়ুন ২০০২: ৪১)। তাছাড়া, উনিশ শতকে সংস্কৃতায়নের ফলে বাংলায় সংস্কৃতের যেসব উপাদান নতুনভাবে যুক্ত হয়েছিল, তিনি সেগুলোকে সমান মূল্য দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। 'খাঁটি বাংলা' ব্যাকরণ তাঁর কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চান এ অংশের ব্যাকরণ রচিত হোক। কিন্তু বাংলা ভাষার 'খাঁটি সংস্কৃত' অংশও, তাঁর কাছে, সমান মূল্যবান। সে অংশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ হুবহু গ্রহণের পক্ষপাতী তিনি। তাঁর এ অবস্থান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তো বটেই, এমনকি রবীন্দ্রনাথ থেকেও আলাদা। বাংলা ব্যাকরণে 'দুই ব্যাকরণ' তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত রামেন্দ্রসুন্দরের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন (৮.২ দ্রষ্টব্য)।

উনিশ শতকের শেষাংশে একদিকে বিদেশি পণ্ডিতদের ভারতীয় ভাষাভিত্তিক আলোচনা এবং ভাষাতত্ত্বের তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন বাংলা ভাষাভাষীদের ভাষাচর্চাকে প্রভাবিত করেছিল। সম্ভবত জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের কাজের একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল। বীম্‌স্‌, হর্নলে প্রমুখ পণ্ডিতের মতো গ্রিয়ার্সনও বারবার বাংলা ভাষার উৎপত্তি প্রসঙ্গে 'মাগধী প্রাকৃতে'র কথা বলেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ:

> It is a typical descendant of the great language that, under the name of Magadhi Prakrit, was the vernacular of eastern North India for many centuries. This was the official language of the great emperor Asoka, and an allied dialect was used by the Buddha and by Mahavira, the apostle of Jainism, in their early preaching. With the shifting of political gravity at a later epoch, it became superseded as a literary form of speech by dialects current farther to the West, but as a spoken language it has developed into the modern Bengali, Oriya, Bihari, and Assamese. (Chatterji 2002: vi)

এই মত প্রধানত এই বিদেশি পণ্ডিতদের লেখায় উনিশ শতকের শেষাংশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাংলা সংস্কৃতের কন্যা – এই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করার জ্ঞানগত ভিত্তি 'নবব্যাকরণবিদ'রা অন্তত অংশত এ থেকে পেয়েছিলেন বলেই মনে হয়। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত *Linguistic Survey of India*-য় গ্রিয়ার্সন অবশ্য সমকালীন বাংলা ভাষাপরিস্থিতি নিয়েও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।[২০] বিশেষত সংস্কৃতায়নের হার, সংস্কৃতায়নের ফলে উদ্ভূত সমস্যা, কথ্য ও লেখ্য-বাংলার অস্বাভাবিক ফারাক ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর যে অবস্থান, 'নবব্যাকরণবিদ'দের সঙ্গে তা পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২১]

৭.২ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

উপরে যাঁদের 'নবব্যাকরণবিদ' বলা হয়েছে, তাঁদের সামষ্টিক যাত্রা ও কর্মকাণ্ডের সক্রিয়তম কার্যকর দশকটি অতিক্রান্ত হয়েছে মূলত *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*কে কেন্দ্র করে (হুমায়ুন ২০০২: ৩৮)। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ অবশ্য কেবল এই নব্যপন্থীদের আশ্রয় ছিল না, 'নব্য ও প্রাচীনপন্থী' কিংবা 'রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল' নির্বিশেষে সমকালের প্রায় তাবত ভাষাচর্চাকারীর মতপ্রকাশের অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। বলা যায়, নানা মতপথের উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথসহ সমমনা অন্যদের শুধু অনুপ্রাণিতই করেনি, তাঁদের আলোচ্য নির্ধারণে এবং বিশ্লেষণ-পদ্ধতির গতিপ্রকৃতিতে সাহিত্য-পরিষদের তর্কবিতর্ক নির্ণায়ক-ভূমিকা রেখেছিল।

একেবারে শুরু থেকেই পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের স্বাতন্ত্র্য-স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় *বঙ্গবাসী* পত্রিকার অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩০২ সংখ্যায়। এ প্রবন্ধে বাংলা ভাষার প্রকৃতি-সম্পর্কিত বিশদ আলোচনার পাশাপাশি প্রচলিত ব্যাকরণ-অভিধানের সমালোচনাও করা হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য, এ প্রশ্নই মূলত তাঁর আলোচনার ভিত্তি। এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তঃ

> আমাদের দেশে চক্ষুর দ্বারা সংস্কৃত শব্দের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়; কর্ণের দ্বারা সে পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব সংস্কৃত শব্দই যখন নাই, তখন বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ আসিয়া কোথায় বসিবে? বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃত ব্যাকরণের অধিকারের কথা অলীক কল্পনা মাত্র। (উদ্ধৃত, নির্মল ২০০০: ২৪৪-৪৫)

ভাষাচর্চার বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গির এ ধরনের আবহের মধ্যেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিতর্কমুখর বিখ্যাত প্রবন্ধগুলো লিখিত-পঠিত হয়েছিল। পরিষদের কার্যবিবরণী অনুসরণ করলে এ আবহের পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটি পড়েন পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে। সভায় তাঁর বক্তব্যের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা করেন বীরেশ্বর পাঁড়ে, চারুচন্দ্র ঘোষ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (হরপ্রসাদ ২০০০/বিঃ ৬০৪-১৫)। এর মধ্যে বীরেশ্বর পাঁড়ে আর যোগীন্দ্রনাথ বসু বাদে বাকি সকলেই জোরালোভাবে শাস্ত্রীর মত সমর্থন করেছিলেন। সমর্থনের পক্ষে তাঁরা যুক্তিতর্কও পেশ করেছেন। তাঁদের মত ও যুক্তিধারা থেকে বোঝা যায়, সংস্কৃতায়িত বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণের সমর্থকদের বিপরীতে ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গিও বিকশিত হচ্ছিল।[২২] এ দলটি আকারে ছোট হলেও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে গৌণ ছিল না; আর বঙ্গীয় সাহিত্য-

পরিষদে এঁদেরই প্রাধান্য ছিল। এই প্রাধান্য একদিকে বিরোধিতার মুখে তাঁদের অবিচলিত রেখেছে; অন্যদিকে নিজেদের আলোচনার যুক্তিধারাকে নিখুঁত করতে সহায়তা করেছে।

এ ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি ঘটেছে খোদ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই। তাঁর 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রকাশিত হয় *পরিষৎ-পত্রিকার* সপ্তম ভাগ প্রথম সংখ্যায়। একই পত্রিকার সপ্তম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাষাতত্ত্ব' প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে সংকলিত 'প্রায় দুই শত শব্দ সম্পাদক-কর্তৃক পর্যায়-বদ্ধ হইয়া' এ প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪১৭)। এই জাতীয় আরো 'প্রায় চারি শত শব্দের এবং উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি প্রবচনের তালিকা' *পরিষৎ-পত্রিকার* অষ্টম ভাগ প্রথম সংখ্যায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-কৃত 'বাঙ্গালা শব্দ-তত্ত্ব' প্রবন্ধে সংকলিত হয় (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪১৭)।[২৩] বস্তুত লেখ্য-বাংলা ও ব্যাকরণে ঠাঁই না-পাওয়া শব্দ-সংকলনের একটা ব্যাপক ও কার্যকর পর্ব চলছিল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে কেন্দ্র করে। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে 'খাঁটি বাংলা শব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকাসংকলনে'র আহ্বান জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৮৮)। *পরিষৎ-পত্রিকার* সম্পাদকও 'এই শ্রেণীর শব্দসংগ্রহের জন্য পাঠকবর্গকে আহ্বান' জানিয়েছিলেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪১৯)। পত্রিকার অষ্টম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের করা 'এই শ্রেণীর শব্দের' তালিকা প্রকাশিত হয় (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪১৯)। বোঝা যায়, ১৩০৮ সাল নাগাদ বাংলা ব্যাকরণ-সম্পর্কিত নতুন চিন্তাভাবনার যে বিকাশ – যাকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে অভিহিত করেছেন 'আন্দোলন' নামে – তাতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান ভূমিকা থাকলেও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সাংগঠনিক প্রভাব আর বহু মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণও একত্রে কাজ করে গেছে। নতুন চিন্তার বিরোধীরা যেমন সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁদের আন্তরিক অনুসন্ধিৎসায় ব্যাকরণ ও ভাষাচিন্তার প্রগতিতে ভূমিকা রেখেছিলেন, তেমনি পক্ষীয়রাও সামষ্টিক সক্রিয়তায় অংশ নিয়েছিলেন নানা প্রান্ত থেকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথায় এই জোটবদ্ধতার ইশারা পাওয়া যায়। 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটি পড়ার সময়ে তিনি ভূমিকা মন্তব্যে বলেছিলেন, 'এ আলোচনার জন্য একা আমি দাঁড়াই নাই, আমার বন্ধু-বান্ধবেরাও এ বিষয়ে প্রস্তুত হইয়াছেন' (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৬০৫)। বলা বাহুল্য, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ছায়ায় এই সামষ্টিক সক্রিয়তা সম্ভবপর হয়েছিল।

৭.৩ সমসাময়িক এবং উত্তরকালীন কয়েকটি প্রসঙ্গ

১৯০০ সালের আগে-পরে রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলো লিখছিলেন, তখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজ-সংস্কৃতির বিচিত্র কর্মকাণ্ডে খুবই সক্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচনাগুলো যে ব্যাপকভাবে পঠিত হয়েছিল এবং সমর্থন-বিরোধিতা-পর্যালোচনায় বৃত হয়েছিল, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা হয়ত তার এক কারণ। অন্য কারণটি – আগেই বলা হয়েছে – সমকালীন জ্ঞানজাগতিক পরিবেশ। 'নবব্যাকরণবিদ'দের লেখালেখি আর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন বহুজনকে ভাষার ব্যাপারে উৎসাহী করে তুলেছিল। কারণ যাই হোক, জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা-সংক্রান্ত প্রায় যে কোনো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। তিনি নিজে এসব আলোচনায় অংশ নিয়েছেন; অন্যরাও তাঁর মতামত দ্বারা চালিত হয়েছেন। বাংলা ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যকার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর ভালো উদাহরণ। তাঁর বাংলা ভাষা-বিষয়ক কাজে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল। প্রমথ চৌধুরী চলিত বাংলার পক্ষে প্রচারণা শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ সোৎসাহে সে আন্দোলনে যোগ দেন।[২৪] বিশ শতকের

তৃতীয় ও চতুর্থ দশক জুড়ে বাংলা বানান বিধিবদ্ধকরণের যে বিপুল উদ্যোগ-আয়োজন দেখা গেছে, তা রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছিল। আবার ওই শতকের তৃতীয় দশক থেকেই বাংলা ভাষার মানরূপ নির্ধারণ ও বিধিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে এক ধরনের 'পিছুটান' দেখা দেয়।[২৫] রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মতো করে এই ধারার সমালোচনা করেছেন এবং প্রচলিত মতগুলোর সঙ্গে নিজের মতের সমন্বয় করেছেন। ভাষার মতো একটা অতি প্রায়োগিক এবং সামষ্টিক উপাদানের ক্ষেত্রে তিনি বরাবরই বাস্তববাদীর ভূমিকা নিয়েছেন।

৭.৩.১ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের ভাষা-বিষয়ক রচনার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। বহু লেখায় তিনি এর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করেছেন। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত *Origin and Development of the Bengali Language* বইয়ের ভূমিকায় এ ব্যাপারে তাঁর যে মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে, পরের বিপুল রচনায় (সুনীতি ১৯৭২) তারই সম্প্রসারণ দেখা যায়। বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় আগের কয়েকজন বৈয়াকরণের কৃতিত্ব তিনি স্বীকার করতেন। এঁদের মধ্যে রামমোহন রায়, চিন্তামণি গাঙ্গুলি ও নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের নাম বারবার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সর্বত্রই তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করেছেন খাঁটি বাংলা ভাষার প্রথম প্রকৃত বিশ্লেষক হিসাবে:

> The first Bengali with scientific insight to attack the problems of the language was the poet Rabindranath Tagore; and it is flattering for the votaries of Philology to find in one who is the greatest writer in the language, and a great poet and seer for all time, a keen philologist as well, distinguished alike by an assiduous enquiry into the facts of the language and by a scholarly appreciation of the methods and findings of the modern western philologist. The work of Rabindranath is in the shape of few essays (now collected in one volume) on Bengali phonetics, Bengali onomatopoetics, and on the Bengali noun, and on other topics, the earliest of which appeared in the early nineties, and some fresh papers appeared only several years ago. These papers may be said to have shown to the Bengali enquiring into the problems of his language the proper lines of approaching them. (Chatterji 1926: xvi)

ভাষা-বিষয়ক লেখালেখিতে তিনি যে রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তার স্বীকৃতি আছে তাঁর নিজেরই রচনায় (সুনীতি ১৯৭২: ৫৪-৫৫)। ভাষা-বিশ্লেষণে সর্বত্র সে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত না হলেও (৭.৩.৪ দ্রষ্টব্য), ভাষা-বিশ্লেষণের মূলনীতি আর দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে দুজনের মিল এত প্রবল যে তাকে কিছুতেই আকস্মিক বলা যায় না। সংস্কৃত ও বাংলার সম্পর্ক, বাংলা ভাষা-ব্যাকরণে সংস্কৃতায়নের কুফল, বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের স্বীকৃতি ও ব্যবহার ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের সাযুজ্য গভীর।

বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে 'আর্য্যামি'র প্রাবল্য আর এর কুফল সম্পর্কে সুনীতিকুমার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 'বাঙলা ভাষার কুলজী' প্রবন্ধে। তাঁর মতে, 'ম্যাক্স মুলারের লেখা পড়ে আর নব্য হিন্দুয়ানির দলের বিজ্ঞানের আর ইতিহাসের বদ্‌হজমের ফলে ... কুক্ষণে এদেশে বিলেত থেকে নোতুন করে 'আর্য্য' শব্দের আমদানি হয়েছিল' (সুনীতি ১৯৮৯: ৩)। এই গোঁড়ামির মূল তিন সূত্রকে তিনি চিহ্নিত করেছেন এভাবে :

> ১) যা-কিছু ভাল তা প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে ছিল (অথচ এই আর্য্য যে কারা, সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান কারুর নেই – একটা আবছা আবছা রকমের ধারণা আছে যে মুসলমানদের আসবার পূর্বের কালের হিন্দুরাই আর্য্য)। ২) অতএব যা-কিছু খারাপ, সমস্তই আর্য্যেতর – 'অনার্য্য'। সংস্কৃত ভাষায় আর্য্য শব্দের যে মানে, ইংরেজি Aryan-এর মানে ঠিক তা নয়; non-Aryan-এর অর্থ সংস্কৃতের 'অনার্য্য' দাঁড় করানোতে যতকিছু বিভ্রাট ঘটেছে। ৩) প্রাচীন হিন্দুরা আর্য্য, আমরা হিন্দু, এদের বংশধর; সুতরাং আমাদের মধ্যে অনার্য্য কিছুই নেই। যদি বা কিছু থাকে – সে সব কথা তোলা উচিত নয়। (সুনীতি ১৯৮৯: ৩)

এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতাপের কারণে 'বাঙলার ঠিক স্বরূপটি' বিশ্লেষিত হচ্ছে না; 'বাঙলা ভাষাটা যে অনার্য্য ভাষার ছাঁচে ঢালা আর্য্যভাষা' সে সত্যও অকথিত থেকে যাচ্ছে। অন্যত্র তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের সম্পর্ক অস্বচ্ছ থেকে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

> A historical grammar of Bengali in the true sense of the term there has never been in Bengali; and there has not been a work exclusively on Bengali by any European scholar, on the lines of Trumpp's Sindhi Grammar, or Kellogg's Hindi Grammar, or C. J. Lyall's Sketch of Hindustani, to guide the Bengali scholar in acquiring a true perspective which the too near presence of Sanskrit and the fact of the language being his mother-tongue generally blur for him. (Chatterji 2002: xv)

এই অস্বচ্ছ সম্পর্কের ভিত্তিতে বাঙালি বৈয়াকরণেরা যে বিপুল ব্যাকরণ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, সুনীতিকুমার সেগুলোর সমালোচনা করেছেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বড়-আকারের এক ব্যাকরণগ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন: 'বাঙলার ব্যাকরণ দেখে আগ্রহের সঙ্গে পাতা উল্টে দেখি, লেখক বাঙলা কাকে বলে জানেন না। আগাগোড়া একখানি সংস্কৃতের ব্যাকরণ তিনি লিখে গিয়েছেন' (সুনীতি ১৯৮৯: ১০)। অন্যত্র বাংলা ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ব্যাকরণের বিস্তারিত তুলনা করে তিনি দেখিয়েছেন, দুই ভাষার আকৃতি-প্রকৃতিতে বিস্তর ফারাক (সুনীতি ১৯৮৯: ৩৪৯-৫০)। বর্ণমালা থেকে শুরু করে ধ্বনিরূপ, শব্দরূপ ও বাক্যরূপে এই দুই ভাষার পার্থক্যের তালিকা করেছেন তিনি। বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত: 'এটি বৈদিক থেকে উদ্ভূত, কিন্তু অন্-আর্য্য বা দ্রাবিড়ীয় ঢঙে এর বাক্য রচনায় প্রয়োগ। বাংলার এই নিজ রূপটি সংস্কৃত অলঙ্কারের নিচে ঢাকা পড়েছে'। (সুনীতি ১৯৮৯: ১০)[২৬]

বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি ও উপাদান সম্পর্কে সজাগ থেকেছেন বলেই সুনীতিকুমার *ODBL*-কে এর পদ্ধতিগত ছাঁচের মধ্যে থেকে বা সেই ছাঁচকে অতিক্রম করে বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণের এক বুনিয়াদি কোষগ্রন্থ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বস্তুত, ''Origin' আর 'Development' শব্দ দুটির মাঝখানে নিহিত আছে সুনীতিকুমারের গ্রন্থের গোপন আসল নামটি – বাংলাভাষার এখনকার অবস্থা, the present state of Bengali Language' (দেবেশ ২০০৩: ৪৮)। তাতে তিনি বাংলা ক্রিয়ামূলের আলোচনা করেছেন তাঁর ইন্দো-ইউরোপীয় তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ছাঁচের মধ্যে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানের ভিত্তিতে বাংলা ক্রিয়ামূলের সংখ্যা সাব্যস্ত করেছেন ১৫০০ (Chatterji 2002: 872)। এর মধ্যে 'There are a little less than 200 roots in Bengali which can mostly be traced right up to primary roots of OIA.' (Chatterji 2002: 873) যেমন, কাঁদ, কাঁপ, কর, কুঁদ, খন, খেল, টুট, টান, পুছ, ফুট, বুঝ ইত্যাদি। এভাবে প্রাকৃতজ, শুদ্ধ তৎসমের সাহিত্যিক ব্যবহার, ণিজন্ত তৎসম ইত্যাদি ভাগে

তিনি মোট ৩৫০টি মাত্র ধাতুমূল ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। অর্থাৎ, অজ্ঞাতমূল দেশি ধাতুর আলোচনায় যখন তিনি ঢুকছেন, তখন তাঁর হিসাব অনুযায়ী ১১৫০টি ধাতুরূপের ব্যাখ্যা বাকি আছে। ফলে তিনি নিজে সুষ্ঠুভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ছাঁচ ব্যবহার করলেও বাস্তবে তাঁর বর্ণনা-বিশ্লেষণ সেই ছাঁচের বাইরে চলে গেল। ছাঁচের বাইরে এসে তিনি দেশি ধাতুরূপের উদাহরণের পাহাড় গড়ে তুললেন। বস্তুত, 'যে-১৫০০ ধাতুমূলের সন্ধানে সুনীতিকুমার বেরিয়েছিলেন তার ৮৫০টিকেই তিনি বিন্যস্ত করছেন ইন্দো-ইউরোপীয় ঐতিহাসিক তুলনামূলক ছাঁচের বাইরে' (দেবেশ ২০০৩: ৫৭-৫৮)। এভাবে সুনীতিকুমার বাংলা ভাষা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তত্ত্ব-আরোপের সমস্যায় পড়েন এবং তাকে অতিক্রম করে যান।[২৭] তাই তাঁর গ্রন্থ বাংলা ভাষার উপাদান-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এতটা নির্ভরযোগ্য আকরগ্রন্থ হয়ে ওঠে।

সুনীতিকুমার যেভাবে বাংলা ভাষার প্রচলিত উপাদানকে গুরুত্ব দিয়ে ভাষা-ব্যাখ্যা করেছেন, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অন্যান্য অ-সংস্কৃত উপাদানকে পর্যাপ্ত পরিসর দিয়ে আলোচনা করেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথসহ সতীর্থ ভাষা-বিশ্লেষকদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ অনুরণন পাওয়া যায়।

৭.৩.২ সাধু-চলিত বিতর্ক

সাধু ও চলিতরীতির ধ্বনি, রূপ, বাক্য ও অর্থস্তরে কী ধরনের পার্থক্য, তা বিশদভাবে কখনো পরীক্ষিত হয়নি (হুমায়ুন ২০০২: ৮৬-৮৯)। কিন্তু রীতি হিসাবে কোনটি গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে চলেছে দীর্ঘমেয়াদি বিতর্ক। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেলেন, 'সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাত নিয়ে' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/৯: ৬১২)। সাধু-চলিতের ফারাকটা কেবল সর্বনাম ও ক্রিয়ারূপের পার্থক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার যে রেওয়াজ পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য এবং অনুরূপ আরো দু-একটি মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন, শিশিরকুমার দাশ রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* এবং *গোরা* থেকে দুটি অংশ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন – 'শব্দ গুণে গুণে যদি প্রমাণ করতে চাই যে সাধু ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি আর চলিত ভাষায় কম তাহলে এই দৃষ্টান্তগুলি তার প্রতিবাদ করবে' (শিশির ১৯৯৯: ১২৫)। তাঁর মতে, বাংলা সাধু ও চলিতরীতির কোনো নির্দিষ্ট শব্দভাণ্ডার নেই। 'এ দুইয়ের পার্থক্য আসলে রূপতাত্ত্বিক পার্থক্য। কয়েকটি সর্বনামের তির্যক রূপ এবং ক্রিয়াপদের কয়েকটি কালের রূপ এই দুই রীতিতে পৃথক' (শিশির ১৯৯৯: ১২৫)। রাজশেখর বসু লিখেছেন, 'দুই ভাষার প্রকারভেদ প্রধানতঃ সর্বনাম ও ক্রিয়ার রূপের জন্য। তাঁহারা বলিলেন, তাঁরা বললেন' (রাজশেখর ২০০১: ৪০৭)। একই লেখায় তিনি চলিতরীতির কাঠামো বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়েছে: 'প্রচলিত সাধুভাষার কাঠামো অর্থাৎ অন্বয়-পদ্ধতি বা syntax বজায় থাকুক। ইংরেজী ভঙ্গীর বেশী অনুকরণ সাধারণে বরদাস্ত করবে না' (রাজশেখর ২০০১: ৪০৯)।

কিন্তু আদিতে সাধু-চলিত বিতর্কের মূল ব্যাপারগুলো এতটা সরল ছিল না। 'উনবিংশ শতাব্দীর সাধুভাষার ধারণা ... মূলত নির্ভর ছিল ভাষার সংস্কৃতমূলকতার ওপর' (শিশির ১৯৯৯: ১০১)। প্রমথ চৌধুরীর নিজের লেখালেখিতে চলিতরীতির যে রূপই থাকুক না কেন[২৮], সাধু-চলিত বিতর্কে তিনি ওই 'সংস্কৃতমূলকতা'র সমস্যা আর সজীব চলতি ভাষার সুবিধাগুলোই যুক্তি-আকারে তুলে ধরেছেন। 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' প্রবন্ধে লিখেছেন:
প্রচলিত সাধু বাংলায়

> মুখের ভাষার যা যা দোষ সে-সব পূর্ণ মাত্রায় দেখা দেয়, কেবলমাত্র আলাপের ভাষার যে-সকল গুণ আছে – অর্থাৎ সরলতা, গতি ও প্রাণ – সেই গুণগুলিই তাতে নেই। ... আমরা যদি সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ না হয়ে ঘরের ভাষার উপরই নির্ভর করি, তাহলে আমাদের লেখার চাল স্বচ্ছন্দ হবে এবং আমাদের ঘরের লোকের সঙ্গে মনোভাবের আদান-প্রদানটাও সহজ হয়ে আসবে। (প্রমথ ২০০৯: ২৬২)

এজন্য কেবল আমদানিকৃত অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দের ভার কমালেই চলবে না, এতকালের অব্যবহৃত শব্দের ব্যবহারও বাড়াতে হবে। কারণ, মুখের ভাষার শব্দ অব্যবহৃত থাকাটা সাহিত্যের ভাষার জন্যই ক্ষতিকর: 'যে-সকল কথা আমরা ভদ্রসমাজে নিত্য ব্যবহার করি, যা কোনো হিসেবেই ইতর বলে গণ্য নয়, সেই সকল বাক্যকে সাহিত্য থেকে বহির্ভূত করে রাখায় ক্ষতি শুধু সাহিত্যের' (প্রমথ ২০০৯: ২৬২)। 'কথার কথা' প্রবন্ধে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর মত খণ্ডন করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী সাধুরীতির গদ্যের সমস্যা গভীরভাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

> ১) পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই মত প্রচার করেছেন যে, আমরা লেখায় যত অধিক সংস্কৃত শব্দ আমদানি করব, ততই আমাদের সাহিত্যের মঙ্গল। আমার ইচ্ছে, বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই লেখা হয়। (প্রমথ ২০০৯: ২৫৩)
>
> ২) যে ভাষা আমরা সকলেই জানি শুনি বুঝি, যে ভাষায় আমরা ভাবনাচিন্তা সুখদুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি, এবং সম্ভবত আরো বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙালির মুখে। (প্রমথ ২০০৯: ২৫৪)
>
> ৩) শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এই যে, বাংলাকে প্রায় সংস্কৃত করে আনলে, আসামী, হিন্দুস্তানি প্রভৃতি লোকের পক্ষে বঙ্গভাষা শিক্ষাটা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে; দ্বিতীয়ত, অন্য ভাষায় যে সুবিধাটুকু নেই, বাংলার তা আছে – যে-কোনো সংস্কৃত কথা যেখানে হোক লেখায় বসিয়ে দিলে বাংলা ভাষার বাংলাত্ব নষ্ট হয় না – অর্থাৎ যারা আমাদের ভাষা জানেন না তাঁরা যাতে সহজে বুঝতে পারেন সে উদ্দেশ্যে সাধারণ বাঙালির পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দুর্বোধ্য করে তুলতে হবে। (প্রমথ ২০০৯: ২৫৬)
>
> ৪) আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উলটোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। ... ইংরেজি সাহিত্যের ভাব, সংস্কৃত ভাষার শব্দ ও বাংলা ভাষার ব্যাকরণ – এই তিন চিজ মিলিয়ে যে খিচুড়ি তয়ের করি, তাকেই আমরা বাংলা সাহিত্য বলে থাকি। বলা বাহুল্য, ইংরেজি না জানলে তার ভাব বোঝা যায় না, আর সংস্কৃত না জানলে তার ভাষা বোঝা যায় না। আমার এক-এক সময় সন্দেহ হয় যে, হয়তো বিদেশি ভাব আর পুরাকালের ভাষা, এই দুইয়ের আওতার ভিতর পড়ে বাংলা সাহিত্য ফুটে উঠতে পারছে না। (প্রমথ ২০০৯: ২৫৭)

উদ্ধৃত মন্তব্যগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, প্রমথ চৌধুরী উনিশ শতকে গড়ে ওঠা সাহিত্যিক গদ্যের সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো সরাসরি উল্লেখ না করলেও ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে জাত বাংলা গদ্যের বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখেই যে তিনি এই সমালোচনা করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কারণেই তাঁর শনাক্তকরণে ভাবের ইংরেজিয়ানা আর ভাষার সংস্কৃতায়ন প্রায় সমান গুরুত্ব পেয়েছে। এর বিপরীতে তিনি ফিরতে চেয়েছেন দৈনন্দিন ভাব ও ভাষার সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে; বরাত দিয়েছেন সাহিত্যিক ভাষা তথা সাহিত্যের সমৃদ্ধির – ভাষাগত কোনো স্থির ও পুরোনো আদর্শের নয়। লক্ষণীয়, চলিতরীতির কোনো বিশেষরূপ তাঁর আলোচ্য ছিল না। বিবেচ্য

বিষয়, সিদ্ধান্তের ধরন আর ভাষাদৃষ্টির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে তাঁর মিল প্রায় আক্ষরিক (৫.৪ দ্রষ্টব্য)। সংস্কৃত ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক কী হবে, তা নিয়েও দুজনের কোনো দ্বিধা ছিল না। 'বাংলার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, 'সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা থেকেই আমরা সেই মনের বল ও হাতের কৌশল লাভ করব, যা আমাদের সাহিত্যের মুক্তির কারণ হবে' (প্রমথ ২০০৯: ১৩৮)। অর্থাৎ, অন্য ভাষার অধীনতা ও নির্ভরতা এবং সহায়ক উৎস হিসাবে অন্য ভাষার ব্যবহার – এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের বোধটি এখানে পরিচ্ছন্ন, যে পরিচ্ছন্নতা পরবর্তী অনেক আলোচনায় অনুপস্থিত। সাধুরীতির সঙ্গে সরল রৌপ-পার্থক্যের ভিত্তিতে চলিতরীতিকে দেখার রেওয়াজ জোরালো হয়ে ওঠায় এই অপরিচ্ছন্নতা তৈরি হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, সাধু-চলিতের তুলনামূলক পাঠ যে এর আভ্যন্তর জটিলতা ও বহুমাত্রিকতা পরিহার করে সরল রূপে এসে ঠেকেছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের মত ও মন্তব্যের প্রভাব প্রবল। কিন্তু মন্তব্যধর্মী এসব বাক্যকে তাঁর ভাষা-বিষয়ক বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায়, এগুলোই তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয় (৫ম অধ্যায়ের ২২ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য)। তাঁর দু-একটি মন্তব্য যে উত্তরকালে এতটা প্রচারিত হয়েছে এবং গ্রাহ্য হয়েছে, তা বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার জটিলতা সম্পর্কে অসচেতনতারই প্রমাণ।[২৯] সমকালীন বিতর্ক থেকে বরং বিরোধের প্রকৃত কারণগুলো অনুধাবন করা যায়। শুধু প্রমথ চৌধুরীর মতো সমমতের বিশ্লেষকদের লেখায় নয়, মোহিতলাল মজুমদার বা সুশীলকুমার দে-র মতো ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতিক্রিয়ায়ও ভাষা-পরিস্থিতির স্বচ্ছ বয়ান পাওয়া যায়।

প্রাকৃত বাংলা ও চলিতরীতির পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রচারণার প্রতিক্রিয়ায় মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন:

> এই সাধুভাষা বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির ভাষা, এই ভাষা যদি বাঙালি খুঁজিয়া না পাইত, তবে তাহার আদিম গ্রাম্যতা এখনো অক্ষুণ্ন থাকিত। যদি এই ভাষা বিজাতীয় হয়, তবে বাঙালি এতকাল ধরিয়া যাহা কিছু রচনা করিয়াছে, তাহা সাহিত্যই নয়। এই ভাষা খাঁটি বাংলা না হইয়া যদি সংস্কৃতানুযায়ী হয়, তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, জন্ম হিসাবে বাঙালি এক জাতি, কিন্তু ভাব-চিন্তার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপনয়ন-সংস্কারের দ্বারা সে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে। খাঁটি বাংলা ভাষা বলিতে এখন যাহা বুঝায়, তাহাও প্রাকৃত-বাংলা নয় – বারো আনা সংস্কৃত। (মোহিতলাল ২০০৫: ১২২)

মোহিতলালের এই মন্তব্যে উপনিবেশিত সাধুগদ্যের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এই কৃত্রিম সাহিত্যিক গদ্যের পক্ষপাতী; এবং বাংলা সাহিত্যের জন্য এই গদ্যের প্রসারকে কল্যাণকর মনে করেছেন। তাঁর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অবস্থানও স্পষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আসলে ওই গদ্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন চেয়েছেন; পরিবর্তনের সম্ভাবনায় উল্লাস প্রকাশ করেছেন। সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের হ্রস্বরূপের ভিত্তিতে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বোঝা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের সাধু-চলিত যে মোটেই রীতির ব্যাপার নয়, তা আরো খোলাখুলি বলেছেন সুশীলকুমার দে। যে ঔপনিবেশিক গদ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন, তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুশীলকুমার লিখেছেন, 'এখানে 'সাধু' বা 'কথ্য' ভাষার প্রশ্ন অবান্তর। যাহা বাংলার প্রকৃত ভাষা তাহা সাধুও নয়, কথ্যও নয়, তাহাই ইহার একমাত্র সুস্থ সহজ ও প্রাণবান ভাষা – ইহার স্বভাবধর্মের ও ঐতিহাসিক পরিণতির স্বাভাবিক বিকাশ' (সুশীল ১৯৫৪: ৩৬)। এই গদ্যের বৈশিষ্ট্য কী? সুশীলকুমারের মতে, 'প্রকৃত পক্ষে বাংলা ভাষা বলিতে এখন যাহা বুঝায় তাহার সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্য আসিয়াছে সংস্কৃত হইতে – ইহার প্রায় বারো আনাই সংস্কৃত। সংস্কৃতের আশ্রয় বাংলার পক্ষে শুধু

অপরিহার্য্য নয়, ইহা সহজ, উপযোগী ও কল্যাণপ্রদ' (সুশীল ১৯৫৪: ৩৯)। অন্যদিকে নতুন যে গদ্যের প্রচার-প্রসার চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথসহ আরো কেউ কেউ, তার বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ:

> যে সংস্কারবর্জ্জিত স্বেচ্ছাচার সংস্কৃতকে বর্জ্জন করিয়া স্বাতন্ত্র্যের আত্মপ্রসাদে প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অবশ্য পুঁথির ধার ধারে না, পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যে বুলিকে বাংলা ভাষা বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, তাহা পুঁথির ভাষা নয় সত্য, সাধু ত নয়ই, তাহা বাঙালীর বাংলা ভাষা কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। (সুশীল ১৯৫৪: ৩৫)

মোহিতলাল মজুমদার এবং সুশীলকুমার দে-র বয়ানে কোনো গোঁজামিল নেই। তাঁরা ভাষাপ্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের বিপরীত মত পোষণ করতেন, এবং সততার সঙ্গে সে মতের প্রচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত 'চলতি বাংলা'র সঙ্গে উপনিবেশিত সাধুগদ্যের ফারাক আসলে এমনই ব্যাপক-গভীর। তাঁর নিজের রচনায় তার পরিপূর্ণ মূর্তি পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কালে বাংলা গদ্যে সে মূর্তি প্রতিষ্ঠা পাবে – এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

৭.৩.৩ বানান প্রসঙ্গ

বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাঙালি ভাষা-বিশ্লেষকেদের একটা বড় অংশ বানান প্রসঙ্গে লিপ্ত ছিলেন। লেখালেখিতে চলিতরীতি তথা রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'প্রাকৃত বাংলা'র ব্যাপক প্রসারের প্রেক্ষাপটে প্রচুর নতুন শব্দ আর শব্দরূপ ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে ছাপার জগতে বানানসমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম। তার কারণ এই যে, প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার সাহিত্যে অবাধে প্রচলিত হয়ে চলেছে কিন্তু এর বানান সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে দেখে চিন্তিত হয়েছিলুম' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৫)। অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-উদ্যোগের অনেক আগে থেকেই বাংলা বানান সংস্কারের নানা ব্যক্তিগত প্রস্তাব পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল।

এসব প্রস্তাবের একটা অংশ বাংলা বর্ণমালার সংস্কার-সম্পর্কিত। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল অজ্ঞাতনামা লেখকের 'বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার' প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে লেখক বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা কমানোর সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছিলেন (হুমায়ুন ২০০২: ৬০৮-২৯)। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে *জন্মভূমি* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা বর্ণমালার অসঙ্গতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, 'বাংলা বর্ণমালা বলে এখন যা চলছে তা সংস্কৃত বর্ণমালার অনুকরণ। বাংলা বর্ণমালায় এখন যেমন কিছু অনর্থক বর্ণ রয়েছে, তেমনি লক্ষ করা যায় কিছু আবশ্যক বর্ণের অভাব' (মিতালী ২০১০: ৮৫)। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বর্ণ বাদ দিয়ে এবং কিছু সংযুক্ত করে নতুন বর্ণমালার প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রায় একই ধরনের প্রস্তাব পাওয়া যায় যোগেশচন্দ্র রায়ের 'বাঙ্গলা অক্ষর' (হুমায়ুন ৬৩০-৩৭) প্রবন্ধে। তিনি বাংলা বর্ণমালার ব্যাপক সংস্কার চেয়েছেন। বর্ণমালা বা লিপির সংস্কার চাওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাপাখানার কাজের সুবিধা-অসুবিধা। কিন্তু স্বভাবতই এর সঙ্গে বানান-প্রসঙ্গ যুক্ত হয়ে গেছে। অজরচন্দ্র সরকারের 'বাঙ্গালা টাইপ ও কেস' এমনি এক গুরুত্বপূর্ণ রচনা (অজর ১৯৯৭)। *প্রবাসী* পত্রিকায় কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত এ প্রবন্ধ ব্যাপকভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছিল (নেপাল ১৯৯৭: [৯-১০])। প্রবন্ধে অজরচন্দ্র সরকার বাংলা '৫৬৩ প্রকারের রকমারি টাইপ' সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে প্রশ্ন

তুলেছেন, 'আমাদের বাঙ্গালা টাইপ ও কেসের আগাগোড়া সংস্কার হওয়া খুবই দরকার নয় কি' (অজর ১৯৯৭: ১৩)? কিন্তু সংস্কার করতে হলে আগে যাবতীয় শব্দের বানান ঠিক করে নেওয়া দরকার: 'বাঙ্গালা টাইপের আমূল সংস্কার করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত, তদ্ভব, দেশজ এবং বিদেশী যাবতীয় শব্দের বাণান ঠিক করিয়া লইতে হইবে' (অজর ১৯৯৭: ২৫)। বর্ণ ও বানান-সংস্কারে উদ্যোগীরা এ কারণেই বাংলা বানান-নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বানান সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র নিবন্ধ লিখেছেন ১৯১৬ সালে। বৈশাখ ১৩২৩ সংখ্যা *প্রবাসী*তে প্রকাশিত এ নিবন্ধেই নিজের ভাষাচিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে বানানরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট অবস্থান ঘোষিত হয়েছে। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলার উচ্চারণরূপ আর বানানরূপের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সে সামঞ্জস্য ন্যূনতম পর্যায়েও কেন রক্ষিত হয়নি, তার কারণও নির্দেশ করেছেন তিনি:

> যে সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম হইতে বাংলা দেশ শাসন শুরু হইয়াছিল সেই সময়ে বাংলা ভাষার শাসন সেই কেল্লা হইতেই আরম্ভ হয়। তখন পণ্ডিতে ফৌজে মিলিয়া বাংলা বানান বাঁধিয়া দিয়াছিল। আমাদের ভাষায় ফোর্ট উইলিয়ামের বিভীষিকা এখনো তাই গৌড়সন্তানের চোখের জলকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য যেখানে আমাদের পিতামহেরা 'সোনা' লিখিয়া সুখী ছিলেন সেখানে আমরা সোণা লেখাইবার জন্য বেত ধরিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ামের বর্তমান দণ্ডধারীদের জিজ্ঞাসা করি – সংস্কৃত নিয়মমতেও কি সোণা কাণ বিশুদ্ধ বানান? বর্ণন হইতে যদি বানান হয়, তবে কর্ণ হইতে কি কাণ হইবে? রেফ লোপ হইলেও কি মূর্ধন্য ণ তার সঙিন খাড়া করিয়া থাকিতে পারে? (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৫৯)

বোঝা যায়, বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য-স্বায়ত্তশাসনের পুরোনো প্রশ্নই বানানের ক্ষেত্রেও প্রধান প্রশ্ন এবং বিতর্কক্ষেত্র আকারে উপস্থিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সে প্রশ্নের আংশিক সুরাহা হয়। তবে রবীন্দ্রনাথসহ 'নবব্যাকরণবিদ'দের ভাষাদৃষ্টি যে কলকাতায় ওই সময়ে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বানান-সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে। মিতালী ভট্টাচার্য এসব মতামতের সার-সংকলন করেছেন (মিতালী ২০১০: ৮১-১৪৩)। তাতে দেখা যায়, পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে মূলনীতি হিসাবে গৃহীত প্রায় সব নিয়ম সম্পর্কেই কোনো-না-কোনো – ক্ষেত্রবিশেষে অনেক – বিশ্লেষক প্রস্তাব তুলেছিলেন। সংস্কৃত বিধিবিধানের আওতায় বাংলা বানান-নির্ধারণের প্রস্তাবও অনেকে দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের কারণেই বিপরীত ঘরানার প্রস্তাবকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। মিতালী ভট্টাচার্য (২০১০) অবলম্বনে এ রকম তিনটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল:

এক. যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর প্রবন্ধে রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন (মিতালী ২০১০: ৮৮)।
দুই. যেক্ষেত্রে শব্দের মূল সংস্কৃত নয়, সেক্ষেত্রে সংস্কৃতবিধি পরিহারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (মিতালী ২০১০: ৯১)।
তিন. বিসর্গ যেখানে উচ্চারিত হয় না, সেখানে তা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন বীরেশ্বর সেন (মিতালী ২০১০: ১০০)।

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথসহ ভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপনকারী সকলেই বানানরূপ পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছেন সংস্কৃত নিয়মের বিকল্পের বরাতে। বাস্তব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই বিকল্পের সন্ধান করতে হয়েছিল।[৩০]

এরকম বিকল্পের সন্ধান অনেকেই করছিলেন। বানান 'সরল' ও 'যুক্তিগ্রাহ্য' করার জন্য বহু প্রস্তাব কলকাতার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু 'ব্যক্তিগত' সেসব বিধি বানানের সমরূপতা তৈরির পরিবর্তে নতুন বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় প্রয়োজন ছিল সামষ্টিক উদ্যোগ – প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তাব। রবীন্দ্রনাথই বাংলা বানানের ব্যবহারিক শৃঙ্খলা আনার প্রয়োজনে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচনাবলির গ্রন্থস্বত্ব বিশ্বভারতীর হাতে আসার পর 'বাঙ্‌লা বানান, বিশেষত চ'ল্‌তি ভাষার বানান-সম্বন্ধে একটি সাধারণ রীতি অবলম্বন কর্‌বার কথা হয়'। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 'চ'ল্‌তি ভাষার বানান' প্রবন্ধে সে ইতিহাস জানিয়েছেন (প্রশান্ত ১৯৯৭)। তাতে দেখা যায়, এ কাজের প্রধান দায়িত্ব পালন করেছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখা এই পদ্ধতি অনুসারে ছাপা হবে' মর্মে অনুমোদন দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; আর 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই রীতিটিকে অনুমোদন ক'রেছেন' (প্রশান্ত ১৯৯৭: ২৫৭)। 'একটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে কয়েকজন ভাষা ও সাহিত্য-বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে' বাংলা বানানরীতির ব্যাপকতর নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তনের এটিই প্রথম চেষ্টা (মিতালী ২০১০: ১১৪)। এ চেষ্টা কাঙ্ক্ষিত ফললাভে ব্যর্থ হয় (বিজন ১৯৯৭/১: ৮৬); কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-প্রস্তাব এক অর্থে এ চেষ্টারই সম্প্রসারণ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলা বানানের শৃঙ্খলাস্থাপনের কাজে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন (বিজন ১৯৯৭/২: ১৯২)। এ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়; আর কাজের পরিকল্পনা রচনার দায়িত্বও তাঁর হাতেই পড়ে। সহকারী নিযুক্ত হন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। শান্তিনিকেতনে তিনি রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে থাকেন। এ কাজ শেষ হয়নি। কিন্তু পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসংস্কার সমিতি কাজ শুরু করলে বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তাঁর কাজের ফাইলপত্রসহ সদস্য হিসাবে সে সমিতির কাজে যোগ দেন (বিজন ১৯৯৭/২: ১৯৮)। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসংস্কার-পরিকল্পনার প্রস্তাবক নন, পরিকল্পনাকারীও বটে। আবার বানানবিধি তৈরি হওয়ার পর জনগ্রাহ্যতার জন্য তাঁর একটি অনুমোদনপত্রও সঙ্গে ছাপা হয়েছিল।[৩১] এসব কারণে এই বানানবিধি সম্পর্কে যাঁরা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, তাঁদেরও বাদানুবাদের বা আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আক্রমণকারীদের মধ্যে ছিলেন রমাপ্রসাদ চন্দের মতো পণ্ডিত, যিনি তাঁর প্রবন্ধে বানানপ্রসঙ্গ মুলতুবি রেখে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেছেন (বিজন ১৯৯৭/২: ২১০)। আবার ছিলেন দেবপ্রসাদ ঘোষের (দেবপ্রসাদ ১৯৯৭) মতো সূক্ষ্ম বিশ্লেষক, যিনি তাঁর যাবতীয় রক্ষণশীলতা, প্রথানুগত্য আর সংস্কৃতানুগত্য সত্ত্বেও সমকালীন ও পরবর্তী বানানচিন্তাকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন। প্রবল সমালোচনার মুখে বিশ্ববিদ্যালয় অল্পসময়ের ব্যবধানে পুস্তিকাটির দুটি পরিমার্জিত-পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু মোটের উপর এ বিধির সমর্থকের সংখ্যাই ছিল বেশি (মিতালী ২০১০; বিজন ১৯৯৭/২)। তাই শেষ পর্যন্ত বাঙালি ব্যবহারকারীদের কাছে বিধিটি মোটামুটি সাধারণ সম্মতি লাভ করেছে।

এই সম্মতিলাভের পেছনে বানানসমিতির ঔদার্য আর দূরদৃষ্টিই প্রধান ভূমিকা রেখেছিল। তাঁরা বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকদের মধ্য থেকে অন্তত দুইশ জনের লিখিত মত নিয়েছিলেন। তাছাড়া 'তৎসম' শব্দের ব্যাপারে সংস্কৃতের

প্রাধান্যও অক্ষুণ্ন ছিল। বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিগ্রাহ্য অনেক মত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে গ্রহণ করে নেওয়ায় বিরোধিতা খানিকটা শমিত হয়েছিল বলে মনে হয়। প্রধানত অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বানান-নির্ধারণের কয়েকটি প্রবণতা এই বিধিতে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যা পরবর্তীকালের বাংলা আকাদেমি, বাংলা একাডেমী কিংবা *আনন্দবাজার পত্রিকা*র বানানবিধিতে মোটের উপর অনুসৃত হয়েছে (মিতালী ২০১০)। বলা যায়, বাংলা ভাষা-ব্যবহারকারীরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এ বিধি থেকে প্রচলিত বানানরীতিই অনুসরণ করে থাকে। বর্তমান প্রসঙ্গে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষাচিন্তা-বানানচিন্তা-উদ্যোগসহ পুরো প্রক্রিয়াটিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ মুখ্য ভূমিকায় হাজির ছিলেন।

৭.৩.৪ পুনঃরক্ষণশীলতা এবং সংস্কৃতায়নের অব্যাহত প্রতাপ

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলা ভাষাচর্চায় রক্ষণশীলতা আর প্রতিক্রিয়াশীলতার হার আবার বাড়তে থাকে। সাহিত্যে এবং অপরাপর লেখার কাজে চলিতরীতির – কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বা কথ্যভাষার – প্রতিষ্ঠাই এর প্রধান কারণ। আগের প্রায় একশ বছরে বাংলা সাধুগদ্যের যে একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল, তার ব্যত্যয় অনেকে মেনে নিতে পারেননি। অ-সংস্কৃত শব্দের বানানরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত নিয়ম না মানার ক্রমবর্ধমান প্রস্তাবও সংস্কৃতপন্থীদের আতঙ্কিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত বানান-প্রসঙ্গেই বারবার রক্ষণশীলতার বাড়াবাড়ির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ১৩৩৮ সালে সংস্কৃত কলেজে দেওয়া এক অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন: ‘বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলেও এখনকার নব পণ্ডিতদের মতো ষত্ব ণত্ব নিয়ে মাতামাতি করা হয় নি। তাহলে ‘শ্রবণ’ থেকে উদ্ভূত ‘শোনা’ কখনোই মূর্ধন্য ণ-এর অত্যাচার ঠেকাতে পারত না’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৪১)। আরো আগে ১৩২৬ সালে প্রকাশিত এক লেখায় শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে লিখেছেন: ‘বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের ব্যভিচার অনেক চলিয়াছে; কিন্তু আজকালকার দিনে পূর্বের চেয়ে পাহারা কড়াক্কড় হওয়ায় সে সম্ভাবনা আর নাই’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৮৭)। এরকম বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিস্তর পাওয়া যায়। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ‘সংস্কৃতের প্রতি অত্যাসক্তি’ লক্ষ করেছেন, যার ফলে ‘অনেক খাঁটি বাংলা, এমন কি বিদেশী, শব্দেরও আকৃতি পরিবর্তন করিয়া সংস্কৃতকল্প’ করা হচ্ছিল (বিজন ১৯৭৭: ১০৪)। তাঁর মতে, শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রভাব মোটেই কমেনি, বরং ‘সেদিক্ দিয়া আমাদের পণ্ডিতী মনোবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে’ (বিজন ১৯৭৭: ১০৪)।[৩২]

তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সংস্কৃত-মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার প্রণোদনা দিয়েছে। বাংলার বিশ্রুত ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সুকুমার সেনসহ অনেকেই এ পদ্ধতির চর্চাতেই আমৃত্যু নিরত ছিলেন। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক কায়দায় বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত-রূপকে বাংলার শুদ্ধতার মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার আরো অবারিত হয়ে উঠেছিল।[৩৩] এর প্রমাণ ব্যুৎপত্তি-শাস্ত্রের চর্চা আর অভিধান-সংকলনের ধরন পরীক্ষা করলেই পাওয়া যায়।

বাংলার ব্যুৎপত্তিশাস্ত্র মূলত সংস্কৃতভব শব্দ অবলম্বনেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু চর্চাটা খুব নিরীহ বা নির্দোষ – এমন বলা যাবে না। একদিকে এ চর্চা অ-সংস্কৃত উপাদানের দিকে মনোযোগ না দেওয়ার দোষে দুষ্ট; অন্যদিকে আবার প্রচুর অ-সংস্কৃত উপাদানকে সংস্কৃতের গণ্ডিভুক্ত করে ব্যাখ্যার ইতিহাসও আছে। বাংলা ভাষায় অনার্য-প্রভাব খতিয়ে দেখার কাজ খুব একটা হয়নি (সুনীতি ১৯৮৯: ৮)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৯: ৯) দেখিয়েছেন, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম অঞ্চলজুড়ে স্থাননামের ক্ষেত্রে অনার্য শব্দের ছড়াছড়ি। নামের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় ‘-ড়া’ বা

'-রা' বা '-লা' প্রত্যয়ের ব্যবহার। কিন্তু এসবের উৎস খোঁজার কাজ বাকি রয়ে গেছে। 'অনেক সময় আবার এ সকল নামকে সংস্কৃত করে আর্য্য করে নেওয়া হয়েছে' (সুনীতি ১৯৮৯: ৯)। এ রকম কিছু উদাহরণ দিয়েছেন পল্লব সেনগুপ্ত (পল্লব ১৯৮৬: ১৪০-৪১)।[৩৪] ব্যুৎপত্তি দেখানোর রেওয়াজ বাংলা ভাষাচর্চায় এত প্রবল যে অনাবশ্যক ক্ষেত্রেও ভুল ব্যুৎপত্তি-নির্দেশ প্রায়ই চোখে পড়ে। *চলন্তিকা* অভিধান থেকে এ রকম অপ্রয়োজনীয় ভুল ব্যুৎপত্তির উদাহরণ দিয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়:

> হাঁটু – মূল রূপ 'অস্থি', 'অষ্ঠি' নহে, ইহা সম্ভবত দেশী শব্দ, 'হাঁট্' ধাতুর সহিত সংশ্লিষ্ট। বাচ্চা – ফার্সী শব্দ; সংস্কৃত 'বৎস' হইতে 'বাছা'। নিটোল – মূল সংস্কৃত 'নিস্তল' নহে; নি+টোল – 'টোল' শব্দের উৎপত্তি অজ্ঞাত। নিঝুম – মূল সংস্কৃত 'নির্ধুন' নহে; নি+ঝুম; ঝুম, ঝিম, ঘুম – নিদ্রা-বা স্তব্ধতা-দ্যোতক দেশী শব্দ। (সুনীতি ১৯৮৯: ৯৫-৯৬)

সুকুমার সেন ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়কে শনাক্ত করেছেন 'বাংলা অভিধানের একটা বড় দোষ' হিসাবে (অরুণ ১৯৯২: [২৮]); কিন্তু নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আর সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে বরাবর নির্ভর করেছেন এ শাস্ত্রের ওপর। অবশ্য যে 'অনধিকারীদের' নিন্দা করেছেন, নিজে তিনি তাঁদের দলের নন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অ-সংস্কৃত উৎসের প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারেননি: 'ব্যুৎপত্তি সন্ধানের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বহুলাংশে 'ক্ল্যাসিকেল' – আলোচিত অধিকাংশ শব্দের মূল উৎস হিসেবে তিনি অনুমান করেছেন সংস্কৃত বা বৈদিক শব্দ। গুরু সুনীতিকুমারের মতো দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর দরজায় তিনি তেমন যেতে চাননি' (পবিত্র ১৯৯৯: ১৪৮)। বাংলা শব্দের উৎস ও শুদ্ধরূপ সম্পর্কে এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বাংলা ভাষায় 'তৎসম' উপাদান নিয়ে একটা প্রবল বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান থেকে তৎসম শব্দের সংখ্যা শতকরা চুয়াল্লিশ সাব্যস্ত করেছেন (Chatterji 2002: 218)। তিনি অবশ্য একই পৃষ্ঠায় এ পরিসংখ্যান সম্পর্কে সতর্ক করে লিখেছিলেন: 'In a dictionary, of course, all learned words have a place, and the percentage of various elements in a dictionary is not the true guide to that of the ordinary speech.' 'এই সতর্কবাণী খেয়াল না করে অনেকেই বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের অনুপাত সম্বন্ধে অস্পষ্ট, কখনো বা অতিরঞ্জিত, ধারণা পোষণ করেন'। (পবিত্র ১৯৮৮: ৬০-৬১)[৩৫]

গোড়ার গলদটি ঘটেছে অভিধান-সংকলনের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ চালু অভিধানগুলোকে স্বীকৃতি দিতে চাননি এ অভিযোগে যে প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান প্রণীত হয়নি (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৯)। সেকালের দুটি বিখ্যাত অভিধান পর্যালোচনা করলে সমস্যার গভীরতা বোঝা যাবে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* তাঁর সাতাশ বছরের একক সাধনায় নিষ্পন্ন বহুপ্রশংসিত অভিধান। এ অভিধানের শব্দসংগ্রহের নীতি সম্পর্কে ভূমিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> উপস্থিত বাঙ্গালা ভাষা যে ভাবে সংস্কৃতের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে বলা চলে যে, যে কোনও সংস্কৃত শব্দ সম্ভাব্য বা ভবিষ্যৎ বাঙ্গালা শব্দ – আবশ্যক হইলেই বাঙ্গালা ভাষা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে, আত্মসাৎ করিতে পারে। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের দ্বার বাঙ্গালার জন্য সদা উন্মুক্ত রহিয়াছে, এবং সংস্কৃত ভাষার ধাতু ও প্রত্যয়ের দ্বারা নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা ভাষা নিজের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য সদা প্রস্তুত আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালার এই সম্পর্ক বিচার করিয়া, সংকলয়িতার ইচ্ছা ছিল – একাধারে তিনি একখানি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার সম্পূর্ণ

> অভিধান প্রস্তুত করিবেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ পরামর্শদাতার উপদেশে ও অনুরোধে তিনি সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বর্জন করিয়াছেন। (হরিচরণ ২০০১: ১১)

'বর্জনে'র পরেও এ অভিধানে সংকলিত শব্দাবলির একটা বড় অংশ বিশুদ্ধ সংস্কৃত। 'হরিচরণ এমন অনেক সংস্কৃত শব্দ মনিয়ের-উইলিয়ামস বা এ ধরনের নানা অভিধান থেকে তাঁর অভিধানে গ্রহণ করেছেন যে, সেগুলির বাংলায় কোথাও প্রয়োগই হয়নি – হরিচরণ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সংস্কৃত থেকেই। এগুলি আসলে সংস্কৃত শব্দ, বাংলা শব্দ নয় – বাংলা অভিধানে এগুলির ঠাঁই পাবার কথাও নয়' (পবিত্র ১৯৯৯: ৮৭)। তবু ঠাঁই পেয়েছে 'সম্ভাব্য' বাংলা শব্দের কোটায়।[৩৬] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য 'প্রচলিত বাংলা শব্দ' সংকলন করেছেন বলে দাবি করেননি। এ দাবি আছে রাজশেখর বসুর অভিধানে। *বঙ্গীয় শব্দকোষের* ফ্ল্যাপে রাজশেখর বসু লিখেছিলেন: 'আমাদের ভাষা যতই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ হউক, খাঁটী বাঙলা শব্দের যতই বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনা-শক্তি থাকুক, বাঙলা ভাষার লেখককে পদে পদে সংস্কৃত ভাষার শরণ লইতে হয়। ... অতএব বাঙলা অভিধানে যত বেশী সংস্কৃত শব্দের বিবৃতি পাওয়া যায় ততই বাঙলা সাহিত্যের উপকার' (হরিচরণ ২০০১)। *চলন্তিকা* সংকলনের ক্ষেত্রেও এ নীতির খুব ব্যত্যয় ঘটেনি। ভূমিকায় সংকলক জানিয়েছেন, এ অভিধানে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচলিত ও প্রচলনযোগ্য শব্দকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে' (রাজশেখর ১৩৮০)। 'প্রচলনযোগ্য' শব্দ *চলন্তিকায়* প্রচুর; আর প্রচলিত শব্দের রূপ ও অর্থ-নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'সুপ্রচলিত' কথাটি সংকলক বিশেষভাবে মনে রেখেছেন।[৩৭]

উক্ত ভাষাতাত্ত্বিক কারণগুলোর বাইরে নতুন সংস্কৃতায়নের সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক কারণও খুব স্পষ্ট। বিশ শতকের প্রথম দশকগুলোতে বাঙালি মুসলমান ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক বলয়ে ঢুকতে থাকে। তিরিশের দশকে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এমতাবস্থায় এ জনগোষ্ঠীর নানা অংশ থেকে 'সংস্কৃত-বাংলা' তথা প্রচলিত সাধু বাংলার বিপরীতে আরবি-ফারসিবহুল বাংলার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ ধরনের সম্ভাব্য সংকটের ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯১৫ সালে 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির সম্বোধনে' তিনি বলেন: 'বাংলায় যখন অর্দ্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে তাহাই করিবে – এরূপ আশা করা যায় না' (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৩৭০)। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো কার্যকর উদ্যোগের খবর পাওয়া যায় না। এক ধরনের স্বতন্ত্র 'মুসলমানি' বাংলার চর্চা মুসলমান সমাজে বাড়তে থাকে। তাতে রবীন্দ্রনাথসহ অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থের 'সাহিত্যসম্মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১২: ৫৩১)। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থের 'মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা' এবং 'ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা' প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। 'সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী আরবি-ফারসির আমদানিজনিত সংকটকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে:

> জোর করে যদি আমরা বাংলা ভাষায় এমন সব আরবি কিংবা ফারসি শব্দ ঢোকাতে চেষ্টা করি, যা ইতিপূর্বে আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যায়নি, তাহলে ঐরূপ উপায়ে আমরা বঙ্গভাষাকে শুধু বিকৃত করে ফেলব।

> সম্প্রতি বাংলা ভাষার উপর ঐরূপ জবরদস্তি করবার প্রস্তাব হয়েছে বলে এ বিষয়ে আমি বাঙালিমাত্রকেই সতর্ক থাকতে অনুরোধ করি। আগন্তুক ঢাকা ইউনিভার্সিটির রিপোর্টে দেখতে পাই, একটু ঢাকা-চাপা দিয়ে ঐ প্রস্তাবই করা হয়েছে। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলির উপর আর্য আক্রমণের বিষয়ে আমি অনেকরূপ ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছি; কিন্তু ঐ স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলির উপর এই মুসলমান আক্রমণের প্রস্তাবটি আরো ভয়ঙ্কর, বাংলা ভাষার তজ্জ শব্দকে রূপান্তরিত করে তৎসম করলেও বাংলা ভাষার ধর্ম নষ্ট হয় না, কিন্তু অপরিচিত ও অগ্রাহ্য বিদেশি শব্দকে আমাদের সাহিত্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়াতে তার বিশেষত্ব নষ্ট করে তাকে কদর্য এবং বিকৃত করে ফেলা হয়। (প্রমথ ২০০৯: ২৭৬)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যে উপস্থিত সংকটের কথাই কেবল গুরুত্ব পেয়েছে। আগের অন্তত দেড়শ বছর ধরে বাংলা ভাষার আরবি-ফারসি উপাদান নিয়ে যে বিচিত্র টানাপোড়েন চলেছে, তা উপেক্ষিত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, বাংলা ভাষার আরবি-ফারসি উপাদানের হিসাব মোটেই নতুন আমদানির ব্যাপার ছিল না। প্রচলিত উপাদানগুলো বাংলা-উপাদান হিসাবে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত হবে কি না – তা-ই ছিল বিতর্কের বিষয়। পুরো ব্যাপারটি বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। 'মুসলমানি' বাংলার নতুন চরমপন্থী প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে সে গোড়ার সমস্যা আড়ালে চলে গিয়ে নতুন প্রস্তাবটিই বিবেচনার কেন্দ্রে চলে আসে।[৩৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী – দুজনই প্রচলিত আরবি-ফারসি উপাদানগুলোকে বাংলা ভাষার জন্য জরুরি মনে করতেন। তাঁদের নিজেদের লেখায়ও এ ধরনের উপাদানের ব্যবহার প্রচুর। কিন্তু যাঁরা তা করতেন না, তাঁরা মুসলমানদের ওই প্রস্তাবকে বাংলা ভাষার নতুন সংস্কৃতায়নের যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গির নজির পাওয়া যায় (দীপঙ্কর ২০০৭)। এ প্রসঙ্গে পবিত্র সরকার লিখেছেন, পাকিস্তান-প্রস্তাবের পর হিন্দু-মুসলমানের অন্যান্য সমস্যার মতো ভাষা-সমস্যাও প্রকট হয়ে ওঠে। ভাষা-সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গটি তখন অনেকেই তুলেছেন। কিন্তু হিন্দু লেখকেরা 'সমস্যাটির বাইরে থেকে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করেননি, এবং এ বাহির হিন্দুয়ানির দ্বারা গণ্ডিবদ্ধ, সংস্কৃতবহুল এক অলীক গদ্যভাষার পক্ষপাতী'। (দীপঙ্কর ২০০৭: তিন)

সংস্কৃতায়নের এ নতুন যুক্তি প্রত্যক্ষভাবে সেকালের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতি আর হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। হিন্দিভাষার ইতিহাসে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। হিন্দির পরিচয় দিতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> হিন্দুস্থানী ভাষার দুইটা সাহিত্যিক রূপ – হিন্দী, উর্দূ। ইহাদের ধ্বনি ও ব্যাকরণ এক – প্রভেদ শুধু বর্ণমালা ও উচ্চ-ভাবের শব্দাবলী লইয়া। ফারসী হরফে লেখা এবং প্রচুর ফারসী-আরবী শব্দ-যুক্ত হিন্দুস্থানী ভাষার নাম "উর্দূ", এবং দেবনাগরী অক্ষরে লেখা ও প্রচুর সংস্কৃত-শব্দে-ভরা হিন্দুস্থানী ভাষার নাম "হিন্দী"; ... এইরূপে একই দেশের মানুষ একই ভাষাকে, ধর্ম-অনুসারে বিভিন্ন বর্ণমালায় লিখিয়া এবং অন্য ভাষা হইতে উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতির শব্দ গ্রহণ করিয়া, দুইটী পৃথক্ সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করিয়াছে। (সুনীতি ১৯৮৯/ক: ৪৪৯-৫০)

হিন্দির এই স্বতন্ত্র নতুনরূপ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা আছে; কিন্তু পরের হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এর যোগ অতি প্রত্যক্ষ (সুরজিৎ ১৪০৯: ৪১-৪৩)। তা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক ব্যাকরণে সংস্কৃতায়ন আর উন্নাসিক আভিজাত্যের বোধ বাংলা ভাষার আকৃতি-প্রকৃতি যতটা বদলে দিয়েছিল, হিন্দির ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। বিশ শতকের প্রথম দশকগুলোতে সর্বভারতীয় রাজনীতির হিসাব অনুযায়ী হিন্দির সংস্কৃতায়ন

বাড়তে থাকে। হিন্দি ভাষায় প্রাকৃত হিন্দির নিয়মকানুন প্রাধান্য পেয়েছে – এ বাস্তবতার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ বারবার করেছেন। একই সঙ্গে নব্য সংস্কৃতায়নের নিন্দাও করেছেন। বিমলনারায়ণ চৌধুরীর পত্রের উত্তরে লেখা 'বাংলার বানান সমস্যা' প্রবন্ধে লিখেছেন:

> এমন সময়ে সাহিত্যে সর্বসাধারণের অকৃত্রিম গদ্য দেখা দিল। তার শব্দ প্রভৃতির মধ্যে যে অংশ সংস্কৃত সে অংশে সংস্কৃত অভিধান-ব্যাকরণের প্রভুত্ব মেনে নিতে হয়েছে – বাকি সমস্তটাই তার প্রাকৃত, সেখানে বানান প্রভৃতি সম্বন্ধে পাকা নিয়ম গড়ে ওঠে নি। হতে হতে ক্রমে সেটা গড়ে উঠবে সন্দেহ নেই। হিন্দি ভাষায় গড়ে উঠেছে – কেননা, এখানে পণ্ডিতির উৎপাত ঘটে নি, সেইজন্যই হিন্দি পুঁথিতে 'শুনি' অনায়াসেই 'সুনি' মূর্তি ধরে লজ্জিত হয় নি। কিন্তু শুনছি বাংলার দেখাদেখি সম্প্রতি সেখানেও লজ্জা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, ওরাও জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে বসেছে আর কি! (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬০)

একেবারে সমধর্মী উল্লেখ পাওয়া যায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনায়ও। 'বাঙলা ভাষার কুলজী' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'আজকালকার 'সাধু' হিন্দীর মন্দিরে বাঙলার অনুকরণে সংস্কৃতের অশত্থ গাছের বীজ চূড়োয় বসানো হয়েছে' (সুনীতি ১৯৮৯: ১১)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দুজনেই এখানে বাংলার অনুসরণকেই হিন্দির সংস্কৃতায়নের জন্য দায়ী করেছেন; কিংবা অন্তত দুই ভাষার সংস্কৃতায়নের প্রক্রিয়াকে সমরূপ ভেবেছেন। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় সর্বভারতীয় ভাষা-সমন্বয়ের একটা যুক্তিও বারবার ব্যবহৃত হয়েছে – যথাসম্ভব সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে ভাষাকে ভারতের অন্য ভাষাভাষীদের কাছে বোধগম্য করে তোলা। রবীন্দ্রনাথ বারবার এ যুক্তির উল্লেখ করেছেন এবং ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিরোধিতা করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১২: ৫২৩-২৪; ২০০৬/১৩: ৬১১)। কিন্তু হিন্দির মতো বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও যুক্তিটি শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* গ্রন্থের ভূমিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অভিধানটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে যুক্তিই দিয়েছেন: 'সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত এবং সংস্কৃত শব্দের দ্বারা পরিপুষ্ট যে সকল ভারতীয় ভাষা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও জাতীয় সংহতিকে দৃঢ়তর করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বাংলা ভাষা অন্যতম' (হরিচরণ ২০০১: ৯)। একই মত রাজশেখর বসুরও: 'অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার যোগসূত্র সংস্কৃত শব্দাবলী, শব্দের বানান আর অর্থ বিকৃত করলে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হবে, অন্য প্রদেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা দুর্বোধ হবে'। (রাজশেখর ১৩৬৩: ১০৫)

উপরোল্লিখিত নানা কারণে বাংলা ভাষাচর্চায় সংস্কৃতের ক্ষতিকর প্রভাব ক্রমশ বেড়েছে এবং অদ্যাবধি তা অত্যন্ত প্রবল। ফলে রবীন্দ্রনাথসহ 'নবব্যাকরণবিদ'দের চর্চায় বাংলা ভাষাচর্চার যে অগ্রগতি হয়েছিল তার কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। এর সবচেয়ে ভালো প্রমাণ পাওয়া যাবে বিশ শতকের প্রভাবশালী বাংলা ব্যাকরণগুলোতে। হুমায়ুন আজাদ লক্ষ করেছেন: 'বিশশতকে রচিত বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকগুলো প্রকৃতি-প্রণালিতে উনিশশতকী ব্যাকরণই, যদিও কোনোকোনোটি বেশ ব্যাপক' (হুমায়ুন ২০০২: ৩৮)। তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণের* কথা মনে রেখে এ মন্তব্য করেছেন। এ ব্যাকরণটি বেরিয়েছিল ১৯৩৯ সালে। ১৯২৬ সালের *ODBL* আর ১৯৩৯ সালের এ ব্যাকরণ মিলিয়ে পড়লেই আগের জমানার 'প্রগতিশীলতা' আর পরের 'পশ্চাৎপদতা' সহজে শনাক্ত করা যায়। *ODBL*-এ ছাঁচের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার প্রাকৃত উপাদানের বহুলতা ছিল (৭.৩.১ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ* কাজ করেছে প্রধানত বাংলার 'তৎসম' উপাদান নিয়ে; অধ্যায়গুলোতে পরিশিষ্টের মতো

করে ‘বাংলা’ উপাদানের আলোচনা যোগ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ধ্বনি, সন্ধি, প্রত্যয় ইত্যাদির আলোচনা পাঠ করা যায়। দেখা যাবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংস্কৃত উপাদান ও নিয়মকে মূল ধরে বাংলা উপাদানগুলোকে দেখানো হয়েছে বিচ্যুতি হিসাবে। তাই বাংলায় কখনো ব্যবহৃত হয়নি, এমন বর্ণ বা ধ্বনির আলোচনা তাতে পাওয়া যায়। সন্ধি-অংশে পাওয়া যায় এমন বহু শব্দ যেগুলো কোনো অর্থেই বাংলা শব্দ নয়। প্রত্যয় হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে খাঁটি সংস্কৃত রূপ, যার সঙ্গে বাংলা উচ্চারণভঙ্গি ও শব্দরূপনির্মিতির কোনো সম্পর্ক কখনোই ছিল না। খানিকটা দ্বিধা সত্ত্বেও কারকের তালিকায় ‘সম্প্রদান’ থেকে যায়, যা বাংলা ভাষার অনেক পুরোনো ব্যাকরণে বাদ পড়েছিল (প্রবাল ১৩৯৪: ২৩৭)। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এবং সমসাময়িক আরো অনেকের আলোচনা সুনীতিকুমার আমলে আনেননি। রবীন্দ্রনাথ ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, ইঙ্গিতমূলক শব্দ, বহুবচন ও লিঙ্গের চিহ্ন সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব করেছিলেন, তার প্রায় কিছুই এ ব্যাকরণে গৃহীত হয়নি। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে অধ্যায়-বিভাজনের যে রীতি বাংলা ব্যাকরণে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সুনীতিকুমার প্রায় হুবহু তার অনুসরণ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, ‘এই ব্যাকরণে সাধু ভাষার সহিত চলিত ভাষাও স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু সাধুর আসনই মুখ্য। ব্যাকরণটি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহার রূপও সাধু। বস্তুত তাঁহার নিজের পক্ষপাত সাধুর দিকেই’ (বিজন ১৯৭৭: ১৭১)। অথচ আগের বছর, ১৯৩৮ সালেই বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের *বাংলাভাষা-পরিচয়*, যা চলিতরীতির ভিত্তিতে রচিত। তাই ‘বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ’, শৃঙ্খলা ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এ ব্যাকরণ বাংলা ভাষাচর্চায় কোনো নতুন পথ তৈরি করেনি। আদতে এ ব্যাকরণ সংস্কৃতরীতিতে বাংলা ব্যাকরণ লেখার দীর্ঘ প্রক্রিয়াকে চরম প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল; কারণ, ‘বাজারের ব্যাকরণগুলিতে স্বভাবতই সুনীতিবাবুর অনুসরণ দেখা যায়’ (বিজন ১৯৭৭: ১৭১)।

‘নবব্যাকরণবিদ’রা বাংলা ব্যাকরণের যে ধরন প্রস্তাব করেছিলেন, সুনীতিকুমার যে মোটেই তার অনুসরণ করেননি, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন আরেক ভাষাতাত্ত্বিক-বৈয়াকরণ সুকুমার সেন। তিনি লিখেছেন: ‘শাস্ত্রী মহাশয় প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের যে দোষ দেখিয়েছিলেন তা আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো বিদ্বান মনীষী সংশোধনের অথবা প্রতিকারের জন্য কলম ধরেন নি। এমন-কি সুনীতিবাবুও তা এড়িয়ে গেছেন তাঁর বিরাট ‘ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’-এ’ (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৬০৩)। উদাহরণ এবং কারণও জানিয়েছেন সুকুমার সেন:

> বাংলা ব্যাকরণের শব্দরূপে সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের জোট মেলাবার চেষ্টা করে লেখকেরা যে বিভক্তি-কারক-case-এর ঘণ্ট পাক করে গেছেন তা এখনো বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে। এই দোষের ভাগী আমিও, সুনীতিবাবুর মতো। সুনীতিবাবুর সঙ্গে মিলে আমিও একদা স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলুম। অপরাধ যেমন স্বীকার করছি, তেমনি এ কথাও জোর করে বলছি যে বাংলা ব্যাকরণ আমাদের নিজস্ব চিন্তা ও গবেষণার সাহায্যে রচনা ও প্রকাশ করার কোনো উপায় ছিল না। সেই বই শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ কখনোই পঠন-পাঠনযোগ্য বলে সমর্থন করতেন না। (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৬০৩)

সুকুমার সেনের এ বয়ান সংস্কৃতপন্থীদের সংখ্যাধিক্য এবং শক্ত ভিত্তির কথা বলে। সুনীতিকুমার এবং তিনি নিজেও আসলে সেই প্রতাপশালী কাঠামোকে সমর্থন জুগিয়েছেন। তার প্রমাণ এই যে, তাঁরা স্বাধীনভাবে ‘অন্যরকম’ কোনো ব্যাকরণ রচনা করেননি। সুনীতি-সুকুমারের ব্যাকরণ বাংলাভাষীরা গ্রহণ করত না – সাধারণভাবে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কালের সংস্কৃতপন্থীদের সঙ্গে পরবর্তীকালের সংস্কৃতপন্থীদের একটা পার্থক্য সহজেই নজর কাড়ে। সেকালের সংস্কৃতপন্থীরা ছিলেন শুধুই সংস্কৃতের পণ্ডিত – বাংলাবিদ্যা বা অপরাপর বিদ্যায় তাঁদের সাধারণ স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালের সংস্কৃত-সমর্থক অনেকেই বাংলা ভাষা ও ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত। তাই তাঁদের মত সহজেই গ্রাহ্য হয়েছে। উপরে ভাষাতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক যে প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে, তার বাইরে এ বাস্তবতার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের সংস্কৃতায়নের বিরোধিতাকারীদের – যাঁদের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের সুনীতিকুমারও পড়বেন – একজনও সংস্কৃত ভাষার প্রতি কোনো বিরূপতা দেখাননি। তাঁদের প্রস্তাব ছিল ভাষাতত্ত্বসম্মত। তবু বিপরীত ধারারই প্রতিষ্ঠা ঘটল। সে প্রতিষ্ঠা কত প্রবল আর কার্যকর, তা বোঝার জন্য অনেক পরে প্রকাশিত আরেকটি ব্যাকরণগ্রন্থের পর্যালোচনা করা যাক।

জ্যোতিভূষণ চাকীর *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। সরস কথ্যভঙ্গিতে রচিত ব্যাকরণটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু এর যে কোনো অংশ পড়লেই বোঝা যায়, এটি বর্ণনামূলক নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে আনুশাসনিক। সে অনুশাসন সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন। বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রচলিত বিভাজন তিনি মেনে নিয়েছেন; তবে তাতে সংস্কৃত শব্দের পরিসর আগের চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তৎসম শব্দের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, ''সংস্কৃতের মতো' বলতে বুঝতে হবে উচ্চারণে তফাত হলেও আকৃতিতে অর্থাৎ বানানে যা অপরিবর্তিত থাকছে তা' (জ্যোতি ২০০১: ২৭)। এ সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিচয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও অন্য অনেকের উত্থাপিত মূল প্রশ্ন – বাংলায় আগত সংস্কৃত শব্দগুলো আসলে কেবল দেখায় অর্থাৎ বানানে তৎসম, বলায় বা উচ্চারণে নয় – তিনি এড়িয়ে গেছেন। অন্যদিকে পুরো বইতে ব্যবহার করেছেন বিপুল সংস্কৃত শব্দ, যেগুলো বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। 'প্রতিশব্দ' অনুচ্ছেদে (জ্যোতি ২০০১: ২৮) অগ্নি ও অগ্নিবাচক শব্দের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে তনূনপাৎ, চিত্রভানু, বিভাবসু, কৃপীটযোনি, বায়ুসখ, হুতভুক্‌, হুতাশন, হব্যবাহন, বীতিহোত্র, বহ্নি, পাবক ইত্যাদি। বাংলা স্বরবর্ণের সংখ্যা, তাঁর মতে, ১৪টি। 'ধ্বনি বর্ণ উচ্চারণ' শিরোনামের অধ্যায়টিতে বাংলা ভাষার এ বৈয়াকরণ সংস্কৃত উচ্চারণকে নির্দেশ করেছেন মূল-উচ্চারণ হিসাবে; আর বাংলা উচ্চারণ দিয়েছেন তার বিকৃতি হিসাবে। ষত্ব ও ণত্ব বিধান, সন্ধি, প্রত্যয় ও উপসর্গসহ প্রায় সকল অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে এমন নিয়ম, যার অনুকূলে বাংলা ভাষা থেকে কোনো উদাহরণই দেওয়া যায়নি। এর মধ্যে প্রত্যয়ের আলোচনা সবচেয়ে সুলিখিত; কারণ এ অধ্যায়ের সূত্রগুলো প্রত্যয়ের রূপসহ হুবহু সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়েছে। অব্যয় কিংবা উপসর্গের মতো অধ্যায়ের আলোচনায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভালো ধরা পড়ে। এই পরিভাষাগুলো বাংলায় হুবহু সংস্কৃতের মতো নয়। জ্যোতিভূষণ এসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত সংজ্ঞা-অনুযায়ী আলোচনা করে পরে বাংলার ব্যতিক্রম নির্দেশ করেছেন। গ্রন্থটির একটি পৃথক অংশে পশ্চিমা ব্যাকরণচিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূল আলোচনায় তার কোনো ব্যবহার নেই। তা সম্ভবও ছিল না, হয়ত দরকারও ছিল না। লেখক নতুন ভাষায় পুরোনো ব্যাকরণই লিখতে চেয়েছেন। ভূমিকায় অবশ্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন: 'নতুন করে ব্যাকরণটি লিখতে চেষ্টা করেছি বৈয়াকরণ রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেনকে সর্বদা মনের মধ্যে রেখে'। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* কার্যত *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে*র একটি আধুনিক সংস্করণ হয়েছে; সুকুমার সেনের ছায়াও হয়ত এতে পাওয়া যাবে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রস্তাব পরোক্ষভাবেও এতে অনুসৃত হয়নি। এ ব্যাকরণও 'প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ হয়ে উঠতে পারেনি'। (পবিত্র ২০০৩: ১৪৬)

টীকা

১. এঁদের তিনজনের দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য এবং সহযাত্রা প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলাভাষা' প্রবন্ধে লিখেছেন:

> রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক দু'জন বিশিষ্ট পণ্ডিত বাঙলাদেশে দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট প্রকৃতি ধর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিলেন আর জোর গলায় ব'লেছিলেন যে, সংস্কৃতের সব নিয়ম বাঙলায় চ'ল্‌বে না, বাঙলার নিজস্ব স্বরূপটিকে ধ'রে দিতে হবে, যেটি বাঙলাকে চিরকাল ধ'রে সংস্কৃতের সঙ্গে এক দড়িতে বেঁধে রাখ্‌বে না। এই দুইজন মনীষী হচ্ছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এঁদের পথেরই পথিক ছিলেন, আর মনে হয় এঁদের চেয়ে আগেই এদিকে তাঁর দৃষ্টি প'ড়েছিল। (সুনীতি ১৯৭২: ৫৬)

২. এঁদের একজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার* ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের দু সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'উপসর্গের অর্থবিচার' নামক 'দীর্ঘ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন' প্রবন্ধটি। এ প্রবন্ধে 'সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হয় নবব্যাকরণদৃষ্টি, যার লক্ষ্য বাঙলা ভাষাকে বাঙলা ভাষা হিশেবেই ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করা'। (হুমায়ুন ২০০২: ৩৮)

৩. পবিত্র সরকার লিখেছেন, 'শ্যামাচরণের নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বিচারধর্মী ভাষাতাত্ত্বিক রচনাগুলোর আদর্শ ছিল – এমন অনুমান করতে প্রলোভন জাগে' (পবিত্র ১৯৯৯: ১৩)। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কোথাও শ্যামাচরণের উল্লেখ করেননি। কিন্তু সমকালে খুবই আলোচিত এই প্রবন্ধ তাঁর নজরে না পড়ার সম্ভাবনা কম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজেকে 'শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের চেলা' বলে পরিচয় দিয়েছেন (হরপ্রসাদ ২০০০/বিঃ ১৯)। গ্রিয়ার্সনের লেখায় শ্যামাচরণের কথা একাধিক প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। বাংলা বানান ও উচ্চারণের পার্থক্য সম্পর্কে শ্যামাচরণের এই প্রবন্ধ থেকে লম্বা উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, এ হল বাংলা ভাষার নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতের কথা (Grierson 1903: 16)। আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ তো ছিলই। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যদি এ প্রবন্ধ না পড়ে থাকেন, তাহলে বলতেই হয়, ভাষাবোধের বিস্ময়কর গভীর সাদৃশ্যই দুজনের মতের মিলের কারণ।

৪. রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারবিধির দিক থেকে বচনের আলোচনা করেছেন – বিশেষ কোনো তত্ত্ব বা পদ্ধতির অনুসরণে নয়। পরবর্তীকালে যাঁরা ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ও পদ্ধতি মোতাবেক এই আলোচনা করেছেন, তাঁদের মূল সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন, হুমায়ুন আজাদ *বাক্যতত্ত্বে* রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের প্রণালিপদ্ধতি মোতাবেক বচনের আলোচনা করেছেন (হুমায়ুন ১৯৯৪: ৩০৫-১০)। স্বভাবতই তাঁর আলোচনার সজ্জা ও পদ্ধতি আলাদা। কিন্তু তাঁকে বাংলা বচন সম্পর্কে এমন কোনো মৌলিক ধারণা প্রস্তাব করতে হয়নি, যা রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাধর্মী অর্থলিপ্ত আলোচনায় নেই।

৫. শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্বোধন, করণ আর অপাদানের আলোচনা করেছেন। সম্বোধনের আলোচনায় বলেছেন, বাংলায় সম্বোধন না থাকলেও 'সখে', 'পিতঃ' প্রভৃতি রূপ সংস্কৃত থেকে আমদানি করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় সম্বোধন পদের উল্লেখ নেই। লেখ্য-বাংলায় এর ব্যবহার ততদিনে পরিত্যক্ত হওয়াই সম্ভবত এর কারণ। শ্যামাচরণের মতে, বাংলায় করণ কারক নেই – সম্বন্ধের পর 'দ্বারা', 'দিয়া' বা 'দে' বসিয়ে কর্তার (agency) ধারণা প্রকাশ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ করণ কারক স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর বিশ্লেষণে বাংলা করণের বৈশিষ্ট্য শ্যামাচরণের অনুরূপ। অপাদানের আলোচনায়ও দুজনের মতৈক্য আছে।

৬. বাংলা ভাষার নতুন শব্দ বানানোর 'অপটুত্ব' সম্পর্কে শ্যামাচরণের আরেকটি গভীর বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাংলায় 'ভাই' শব্দ থেকে সাধারণত গুণবাচক শব্দ তৈরি হয় না। সংস্কৃত থেকে ধার করে লেখা হয় 'ভ্রাতৃভাব' এবং 'ভ্রাতৃত্ব'। কিন্তু শ্যামাচরণ বলছেন, বাংলায় 'ভাইভাব' এবং 'ভাইওত্ব' শব্দ যে চালু হয়নি, তার কারণ সংস্কৃত বিকল্প বাধাহীনভাবে বাংলায় ঠাঁই পেয়েছে। তা না হলে 'ভাইভাব' বা 'ভাইওত্ব' শব্দ দুটি এখন যেমন 'অস্বাভাবিক' মনে হয়, তেমন মনে হত না (Ganguli 1990: 37)।

৭. বাংলায় ব্যাকরণিক লিঙ্গ নেই – এ বাস্তবতাকে দুজনই ব্যাখ্যা করেছেন বাংলা ভাষার সুবিধা হিসাবে। সে ক্ষেত্রে সংস্কৃতের অনুকরণে লিঙ্গচিহ্নের আমদানি বা বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গরূপ ব্যবহারকে তাঁরা দেখেছেন পশ্চাৎপদতা হিসাবে। অবশ্য অল্প কিছু ক্ষেত্রে আমদানি করা স্ত্রীলিঙ্গরূপ যে বাংলা ভাষায় নানাভাবে আত্মীকৃত হয়ে গেছে, তাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

৮. শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির মতে, সমাস ভাষার শক্তিমত্তার পরিচায়ক। বাংলা ভাষায় এ প্রক্রিয়ায় শব্দ তৈরির ক্ষমতা হিন্দুস্থানির চেয়ে অনেক বেশি। দরকারমাফিক সংস্কৃত থেকে সমাসনিষ্পন্ন যৌগিক শব্দ ধার করা যেতে পারে। কিন্তু 'জনৈকে'র মতো শব্দ আমদানির তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি। কারণ, বাংলায় 'একজন' বা 'জনেকে'র মতো শব্দ আছে, যেগুলো বাংলার উচ্চারণভঙ্গির সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ সমাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন *বাংলাভাষা-পরিচয়ে*র ২১ নম্বর পরিচ্ছেদে। তাতে এ ব্যাপারে সংস্কৃত ভাষার অসাধারণ নৈপুণ্যের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে রীতিতে বিশ্লেষণে অগ্রসর হননি। লিখেছেন: 'বাংলা ভাষায় নিয়মের খবরদারি যথেষ্ট পাকা নয়, কিন্তু সেও কতকগুলো নির্মাণরীতি বানিয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলোকে সমাসের পর্যায়ে ফেলা যায়' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৫২)। বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার এই শব্দনির্মাণ কৌশলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য সংস্কৃতের সুবিধাজনক প্রযুক্তি ধার করার পক্ষপাতী – ছাঁচটি নয়। অন্যত্র তিনি বাংলা ভাষার যুগ্মশব্দমাত্রকেই সংস্কৃত সমাসের কোঠায় ফেলার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন:

> জোড়াশব্দের দুই অংশই অর্থবিশিষ্ট। সে স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তাহাকে সমাসের কোঠায় ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু কেন যে তাহা সম্ভবপর নহে দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা বোঝানো যাক। ছাইভস্ম কালিকিষ্টি লজ্জা-শরম প্রভৃতি জোড়াকথার দুই অংশের একই অর্থ; এ কেবল জোর দিবার জন্য কথাগুলাকে গালভরা করিয়া তোলা হইয়াছে। ... যতপ্রকার জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেছে সংস্কৃত সমাসের সঙ্গে তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, শব্দগুলির যে-অর্থ তাহাদের ভাবটা তাহার চেয়ে বেশি এবং এই কথার জুড়িগুলি যেন একেবারে চিরদাম্পত্যে বাঁধা। বাঘভাল্লুক না বলিয়া বাঘসিংহ বলিতে গেলে একটা অত্যাচার হইবে; বনজঙ্গল এবং ঝোপঝাড় শব্দকে বনঝাড় এবং ঝোপজঙ্গল বলিলে ভাষা নারাজ হয় অথচ অর্থের অসংগতি হয় না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৩৩-৩৫)

৯. শ্যামাচরণ উদাহরণ দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে। লিখেছেন, সাহিত্যিক বাংলায় 'observing that the sun was about to set' কথাটির প্রামাণিক রূপ 'দিনমণি অস্তাচলে গমণোদ্যত দেখিয়া'। ইংরেজিতে আক্ষরিক অনুবাদ করলে বাক্যটি দাঁড়ায় 'observing the gem-of-day exerting (himself) for proceeding to the setting-immobile. (immobile = mountain).' (Ganguli 1990: 37) আলঙ্কারিক অর্থে সূর্যকে 'দিনমণি' বা পাহাড়কে 'অচল' বলা যায়। কিন্তু এ ধরনের উপলক্ষ প্রাত্যহিক জীবনে সাধারণত ঘটে না। তাছাড়া পাহাড়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার ধারণাও বাঙালির জন্য জুৎসই নয়। এ ধারণা এসেছে সম্ভবত পুরোনো পাঞ্জাব থেকে যেখানে লোকে সোলেমান পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবতে দেখত।

এভাবে শ্যামাচরণ উনিশ শতকের সাহিত্যিক বাংলায় জ্ঞাত-অজ্ঞাত আলঙ্কারিকতার প্রতাপ লক্ষ করেছেন, যা কাব্যের জন্য কোথাও কোথাও উপকারী হতেও পারে, কিন্তু গদ্যের যুক্তিশীলতার জন্য ক্ষতিকর। তিনি একে দেখেছেন সেকালের সাহিত্যিক সংস্কৃতি হিসাবে। তাঁর মনে হয়েছে, অসামান্য সৃষ্টিশীলতা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র লোকগ্রাহ্য হতেন না, যদি তিনি সংস্কৃতায়িত গদ্যে না লিখতেন। পুরোনো বাংলায় নব্যন্যায়ের তথা যুক্তির অসামান্য বিকাশ ঘটেছিল – এ তথ্য মনে করিয়ে দিয়ে শ্যামাচরণ আশা করেছেন, বাংলা গদ্যে আবার আলঙ্কারিক বাগাড়ম্বরের বদলে সরল ও বলিষ্ঠ যুক্তিশীলতার বিকাশ ঘটবে।

১০. ভাষার ব্যবহারিক দিকের বিবেচনায় শ্যামাচরণের ব্যাপ্তি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি। এ ব্যাপারে তাঁর অধিকতর মিল আছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে। বিশেষত কথ্য ভাষাকে সমস্ত বিবেচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা আর ভাষাভাষী সমগ্র জনগোষ্ঠীকে ভাষা-প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এই মিল খুব স্পষ্ট।

১১. হুমায়ুন আজাদের মতে, ‘রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরে যে ভারসাম্য ও গভীরতা বিদ্যমান, তা নেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাঙলা ভাষাবোধে’ (হুমায়ুন ২০০২: ৪০)। শাস্ত্রীর ‘ভাষাবোধ’ সম্পর্কে এ মন্তব্য সতর্কতার সঙ্গে বিবেচ্য। যে ‘বাংলা ব্যাকরণ’ প্রবন্ধ সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ এই মন্তব্য করেছেন, সে প্রবন্ধ সম্পর্কে সুকুমার সেনের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৬০৩-০৪)। সম্প্রদান কারক সম্পর্কে আংশিক ভিন্নমত দিয়ে সুকুমার সেন লিখেছেন, ‘শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক মত’। ব্যাকরণের ক্ষেত্রে শাস্ত্রী কাজ করেছিলেন সেকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী অনুঘটক হিসাবে। তাঁর অনেক মন্তব্য ও আলোচনায় পদ্ধতি-সম্মতি মেলে না; কিন্তু গভীর ‘ভাষাবোধে’র পরিচয় মেলে। যেমন, ১৩২১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণে দেওয়া বাংলা বিভক্তিগুলোর ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে তাঁর মতের পর্যালোচনা করে সুকুমার সেন লিখেছেন, ‘শাস্ত্রীমহাশয় এখানে শব্দবিদ্যায় অপ্রস্তুত বিচক্ষণতা ও সাহস দেখিয়েছেন’ (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৩৪৩)। এ হল তাঁর ব্যাকরণবোধের দিক। আর ‘ভাষাবোধে’র ব্যাপারে সুকুমার সেনের মন্তব্য ধার করে বলা যায়, ‘ ... শাস্ত্রী মহাশয়ের যে অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে তা আর কোনো বাংলাভাষার আলোচনাকারীদের মধ্যে’ দেখা যায়নি (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৫৬৭)।

১২. দুটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ:
এক. ‘শ্রু’ ধাতু যে-নিয়মে ‘শ্রাবি’ হয়, সেই নিয়মে শুন্ ধাতুর ‘শু’ ‘শৌ’ হইয়া ও পরে ইকার যোগে ‘শৌনিতেছে’ হইত। হয়ত খুব ভালোই হইত, কিন্তু হয় না যে সে আমার বা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের দোষ নহে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১৫)
দুই. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়েছিল। তিনি প্রাকৃত বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র রূপ স্বীকার করবার পক্ষপাতী ছিলেন এ কথা বোধ হয় সকলের জানা আছে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৮০-৮১)
লক্ষণীয়, ভাষা-আলোচনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথ স্বগোত্রীয় মনে করতেন। বিরুদ্ধবাদী ‘শাস্ত্রীমহাশয়’দের বিপরীতে স্বপক্ষীয় ‘শাস্ত্রী’ হিসাবে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নজির উপস্থাপন করেছেন।

১৩. যেমন হুমায়ুন আজাদের সিদ্ধান্ত: ‘শাস্ত্রী একটু বেশি পরিমাণেই ছিলেন বাঙলাপন্থী’ (হুমায়ুন ২০০২: ৪০), প্রমাণ করে শাস্ত্রীর মন্তব্যকে তিনি ‘অতিকথন’ হিসাবেই পাঠ করেছেন। বস্তুত, উপনিবেশিত বাংলা গদ্যের ‘বি-উপনিবেশায়ন’ যথেষ্ট গভীরভাবে সম্পন্ন না হওয়ার কারণেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বিশ্লেষকদের ‘বাংলাপন্থী’ মনে না হয়ে ‘বেশি পরিমাণে’ বাংলাপন্থী মনে হয়।

১৪. পুরোনো বাংলা বা 'খাঁটি বাংলা' সম্পর্কে হরপ্রসাদের সিদ্ধান্ত অনেকখানিই প্রজ্ঞাপ্রসূত। পর্যাপ্ত নথিপত্র থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকটা প্রমাণ-প্রস্তুতি-নিরপেক্ষভাবে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পরবর্তী গবেষণায় তার যথার্থতা স্বীকৃত হয়েছে। দেবেশ রায় মনে করেন, পুরোনো গদ্য, চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের যে সংগ্রহগুলো পরে প্রকাশিত হয়েছে তাতে উপনিবেশ-পূর্ব গদ্য সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমানের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে (দেবেশ ১৯৮৭: ১৬)।

১৫. যেমন 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সুকুমার সেন লিখেছেন:

> শাস্ত্রী মহাশয়ের আগে এবং পরে অনেক প্রতিষ্ঠিত বাংলা লেখক পণ্ডিত বাড়ির ছেলে ছিলেন এবং নিজেরাও চৌকস পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউই পুরানো চলিত বাংলা শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।
> এমন শব্দ যথাসম্ভব নিজের রচনায় ব্যবহার করে শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের যে জ্ঞানাঞ্জন উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন তা আমরা এতদিন চোখে লাগাতে পারি নি। আর পারবো বলেও বোধ হচ্ছে না। তবে ভবিষ্যতে শব্দবিদ্যানুসন্ধিৎসুরা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদত্ত জ্ঞানাঞ্জন চোখে লাগালে দেশের ও দশের উপকার হবে। (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৫৬৭)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গদ্য নিঃসন্দেহে বি-উপনিবেশিত বাংলা গদ্যের নমুনা।

১৬. সাধারণভাবে এ মন্তব্য বাংলার ইতিহাসধারায় জনপ্রিয়। কিন্তু অন্তত 'মুসলমানি' উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে কথাটা বিশেষভাবে খতিয়ে দেখার রেওয়াজ উনিশ শতকে তৈরি হয়নি। বরং বিপরীত ভাবই প্রবল ছিল। এ প্রসঙ্গে শাস্ত্রী-রচনাবলির ভূমিকায় সত্যজিৎ চৌধুরী লিখেছেন:

> সূচনার সংঘর্ষের স্তর পেরিয়ে ইসলাম যে বাংলায় সামঞ্জস্যে মিলেছে, বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে এই বাইরে থেকে পাওয়া উপাদান আত্মস্থ করে সমৃদ্ধ হয়েছে, স্মার্ত ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে হরপ্রসাদই অন্ধ বিরুদ্ধতার মুখে দাঁড়িয়ে একথা বারবার বলেন। কারণ তিনি মুক্ত মনে এ সত্য মানেন যে, 'গত সাত শত বৎসর ধরিয়া মুসলমান ছাড়িয়া বাংলার কোনো কাজই হইতেছে না'। এমন-কি সাহিত্য পরিষদে প্রশ্ন তোলেন, 'বাঙালি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অধিকার বিস্তার করিতে যাইতেছেন, তবে বাংলায় বসিয়া যাঁহারা ফারসি, উর্দু ও মুসলমানি বাংলায় বহু সংখ্যক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দেন কী করিয়া? সেও তো বঙ্গীয় সাহিত্য।' শুধু প্রশ্ন তোলা নয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে মুসলমানি বাংলা সাহিত্য এবং মুসলমান ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে লেখা বই সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন। (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ২৯-৩০)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'খাঁটি বাংলা' আসলে – মুসলমান জনগোষ্ঠীর অংশসহ – 'খাঁটি বাঙালি'রই প্রকাশ। শাস্ত্রীয় নিক্তিতে তিনি এ বাঙালিত্বের শুদ্ধাশুদ্ধি মাপেননি। অনেকটা কালের ধারার বিপরীতে তাঁর দৃষ্টি বর্তমান প্রাসঙ্গিকতাতেই নিবদ্ধ ছিল।

১৭. 'রবীন্দ্রনাথ ও হরপ্রসাদের তুলনায় ভাষাবিজ্ঞানের নিবন্ধরচনারীতি রামেন্দ্রসুন্দরে অনেক বেশি সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ। এ নিশ্চয়ই তাঁর বিজ্ঞানদীক্ষার ফল'। – এ মন্তব্য পবিত্র সরকারের (পবিত্র ১৯৯৯: ৮২)। হুমায়ুন আজাদও লক্ষ করেছেন, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সমসাময়িক এবং সমমনাদের তুলনায় অনেক বেশি গভীর আর স্থিতধী (হুমায়ুন ২০০২: ৪০-৪১)। বাংলা ব্যাকরণের উপাদান হবে 'বাংলা ভাষার সমুদ্র', কিংবা 'বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি নির্দ্ধারণ করিয়া' বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করতে হবে – এই মূলনীতিতে রবীন্দ্রনাথ ও হরপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর পূর্ণ সাযুজ্য আছে; আবার নিজস্ব বিশ্লেষণরীতি অবলম্বনে তিনি অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধ থেকে বোঝা যায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। উনিশ শতকে লেখ্য-বাংলার যে রূপ গড়ে উঠেছিল তাকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে নতুন ব্যাকরণচিন্তা ও নতুন বাংলা ভাষার একটা সমন্বয়-সাধন তাঁর লক্ষ্য ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে রামেন্দ্রসুন্দরের সবচেয়ে বড় ঋণ বোধ হয় আলোচ্য বিষয়ের নির্ধারণে। অন্য ভাষার বা অন্য ব্যাকরণের ছক মান্য না করে বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তত্ত্ব নির্মাণে অগ্রসর হলে এমনকিছু আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে যা বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এবং 'নবব্যাকরণবিদ'রা এ রকম অনেক বিষয়ে নজর দিয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালে খুব একটা অনুসৃত হয়নি।

১৯. রামেন্দ্রসুন্দর – হরপ্রসাদের তুলনায় – 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণের প্রসঙ্গটি আরো গভীরভাবে অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছেন' (নির্মল ২০০০: ২৯৪)। হুমায়ুন আজাদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'রামেন্দ্রসুন্দর এ-প্রবন্ধে ব্যাকরণ সম্বন্ধে এমন কিছু ধারণা ব্যক্ত করেন, যা পাশ্চাত্যেও উন্মেষিত হয় কয়েক দশক পরে – সাংগঠনিক ও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাতাত্ত্বিকদের রচনায়'। (হুমায়ুন ২০০২: ৪০)

২০. বীম্‌স্‌, গ্রিয়ার্সন প্রমুখের অবস্থান যে হ্যালহেড কিংবা কেরির তুলনায় এত বদলে গেল, তার একটা কারণ বোধ হয় সময়ের বদল। হ্যালহেড-কেরিদের সময়ে বাংলার প্রতি নতুন নজর পড়েছে, বাংলার রূপ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার উপায় তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে সম্ভাব্য নিরূপিত রূপ তৈরি করে সহজে ভাষাটি রপ্ত করার ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। বিপরীতে বীম্‌স্‌-গ্রিয়ার্সনদের সময়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা অঞ্চলের সঙ্গে ইংরেজদের আত্মীয়তা অনেক গভীর হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের অঙ্গ হিসাবে বাংলাচর্চার যুগও অতিক্রান্ত হয়েছে। ফলে আসল বাংলা উচ্চারণে বাংলা শেখা সময়ের দাবি হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। এ সময়ে বই পড়ে বাংলা শেখার ফলে ইংরেজরা যে ধরনের কৃত্রিম বাংলায় অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল, তার অসুবিধা পরিষ্কার হওয়ার কথা। গ্রিয়ার্সনের এই ছোট্ট বর্ণনায় অন্তত দুবার বিদেশিদের বাংলা শেখার জটিলতার কথা এসেছে।

২১. যেমন, বাংলায় সংস্কৃতায়নের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বীম্‌সের বক্তব্যের সমর্থন করে তিনি লিখেছেন:

> Instead of strengthening the existing wave from the same material, every effort was made in Calcutta, then the only seat of instruction, to embroider upon the feeble old frame a grotesque and elaborate pattern in Sanskrit, and to pilfer from that tongue whatever in the way of vocabulary and construction, the learned considered necessary to satisfy the increasing demands of modern intercourse. He who trusts to the charity of others, says Swift, will always be poor; so Bengali, as a vernacular, has been stunted in its growth by the process of cramming with a class of food it is unable to assimilate. The simile used by Mr. Beames is a good one. He likens Bengali to an overgrown child tied to its mother's apron-sting, and always looking to her for help, when it ought to be supporting itself. (Grierson 1903: 14)

তিনি অবশ্য সংস্কৃতায়নের দায় পুরোপুরি সংস্কৃত-পণ্ডিতদের ওপর চাপিয়েছেন। পুরো প্রক্রিয়ায় প্রাচ্যবাদীদের আর ইংরেজ বৈয়াকরণ-অভিধানকারদের যে ঐতিহাসিক দায় ছিল, তাঁর আলোচনায় তার উল্লেখমাত্র নেই।

২২. নমুনা হিসাবে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের দুটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হল:

> ১) ভাষার স্রোতকে ব্যাকরণের বাঁধ দিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করা আমার বোধ হয় ঐরাবতের গঙ্গাস্রোতরোধ চেষ্টার মত উপহাসাস্পদ। আমার বিশ্বাস উহা মানুষের ক্ষমতায় হয় না। ব্যাকরণের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য নহে – ভাষার বিদ্যমান অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়াই ব্যাকরণের কার্য্য। (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৬০৯)

> ২) সংস্কৃত বঙ্গ ভাষার আদি জননী বলিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে গড়িতে চাহেন, তাঁহাদের একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা, লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন হইলেও কাহারও ব্যাকরণ লাটিন ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত নহে। সমস্ত মানবজাতি মনুর অপত্য বলিয়া যদি ইউরোপীয় ও ভারতীয় জাতিকে কেহ এক বলিতে চাহেন, তাহা যেমন ভুল হয়, হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া সংস্কৃতের সহিত এক বলাও সেইরূপ ভুল। (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৬১০-১১)।

বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথসহ 'নবব্যাকরণবিদ' সম্প্রদায়ের চর্চার ধরন ও দৃষ্টিভঙ্গির একটা সামাজিক আনুকূল্য ছিল।

২৩. 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত আরো দুটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪১৭-১৮)। একটি লিখেছেন শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাঙ্গলা শব্দ-দ্বৈত' নামের প্রবন্ধটি ছাপা হয় *প্রদীপ* ১৩০৭ সনের ফাল্গুন সংখ্যায়। *ভারতী* পত্রিকার ১৩০৮ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বিহারীলাল গোস্বামীর 'বাঙ্গালা শব্দের দ্বিরুক্তি'। উভয় লেখকই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের 'সামান্য ত্রুটী' সম্পর্কে নিজেদের সমালোচনা লিখেছেন। শেষোক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজের মন্তব্য লিখেছেন ১৩০৮ আষাঢ় সংখ্যা *বঙ্গদর্শনে*র 'মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা'য় (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৭৬-৭৭)।

২৪. রবীন্দ্রনাথসহ সতীর্থদের লেখালেখি প্রমথ চৌধুরীর চলিতরীতি-আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল – এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। এ অনুমানের ভিত্তি প্রমথ চৌধুরীর সংশ্লিষ্ট রচনার যুক্তি আর দৃষ্টিভঙ্গি। আবার রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় অংশগ্রহণই এ আন্দোলনকে ত্বরিত সাফল্য এনে দেয়। রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলনকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল ভেবেছেন এবং নিজের 'প্রাকৃত বাংলা' তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে চলিতরীতির পক্ষে কথামালা সাজিয়েছেন।

২৫. 'নবব্যাকরণবিদ'দের রচনায় বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে যে 'প্রগতি' দেখা গিয়েছিল তার সাপেক্ষে এ সময়ের প্রভাবশালী মতামতের ধারাকে বলা যায় 'রক্ষণশীল' ও 'প্রতিক্রিয়াশীল'। ভাষাচিন্তার এই পশ্চাদ্‌গতির কারণ কোথাও বিশ্লেষিত হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখায় বারবার এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে (৭.৩.৪ দ্রষ্টব্য)। একুশ শতকে এসেও বাংলা ব্যাকরণ রচনায় যে কাঙ্ক্ষিত 'প্রগতি' সাধিত হয়নি, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতৈক্য দেখে মনে হয়, বাংলা ভাষাচিন্তার এই রক্ষণশীল ধারা শেষ পর্যন্ত ভাষাচর্চায় অনভিপ্রেত প্রভাববিস্তার করতে পেরেছিল।

২৬. শব্দস্তরে সংস্কৃতমূলক তথা তদ্ভব উপাদানের প্রাধান্য সত্ত্বেও বাক্যসংস্থানের ধরন ও ভাষার ব্যাকরণ বা প্রকৃতির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, সে কথা রবীন্দ্রনাথসহ 'নবব্যাকরণবিদ'রা বারবার বলেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক থেকে কথাটা আরো স্পষ্ট করেছেন। 'বাঙলা ভাষার কুলজী' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> একদিকে বেদের আর প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থের ভাষা – আর একদিকে বাঙলা প্রভৃতি; এদের যদি দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যায়, দেখা যায় যে, তামিল তেলুগুর যে ছাঁচ, বাঙলারও সেই ছাঁচ; যদিও বাঙলার ধাতুগুলি আর শব্দগুলি মুখ্যত তদ্ভব, অর্থাৎ বৈদিক থেকে উৎপন্ন। বৈদিক ক্রমে প্রাকৃত হল, – প্রাকৃত বাঙলা প্রভৃতিতে দাঁড়াল। এই পরিবর্তন কিন্তু একটানা ভাবে হয় নি। বাঙলা প্রভৃতির উৎপত্তি আর প্রকৃতি বিচার করলে এইটুকু বোঝা যায় যে, বৈদিক কালের 'জাত্‌' আর্য্যভাষীর বংশধরের মুখে মুখে বদলে এলে যে রকমটি এর রূপ দাঁড়াত, এর এখনকার রূপটি সেরকম নয়। আর্য্যভাষা অনার্য্যভাষীর দ্বারা গৃহীত হওয়াতেই এর পরিবর্তন স্বাভাবিক হয় নি। ... 'আর্য্যীকৃত' দ্রাবিড়, কোল ও মিশ্র জাতিদের মুখে আর্য্যভাষা আপনার স্বরূপ বজায় রাখতে পারল না। আর্য্যভাষার মালমশলা, পুরানো দেহটা – রইল বটে, কিন্তু তার চেহারা বদলে গেল। (সুনীতি ১৯৮৯: ৪-৫)

বাংলার নিজস্ব প্রকৃতির বদলে সংস্কৃতই যে বাংলাচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, তার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো প্রায় একই ভাষায় উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়াকে দায়ী করেছেন: 'ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের আর শ্রীরামপুরের পণ্ডিতদের হাতে পড়ে বাঙলা ভাষা ভোল ফিরিয়ে বসল, বাঙলা ব্যাকরণ বলে লোকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি আর কৃৎ তদ্ধিত শব্দসিদ্ধি পড়ুতে লাগল (সুনীতি ১৯৮৯: ১১)।

২৭. *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা গ্রিয়ার্সনের মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেবেশ রায় লিখেছেন,

> The theoretical studies under the guidance of some of the greatest European authorities on Indian philology – এইভাবে সুনীতিকুমারের হাতেই পরাভূত হয়, অবান্তর হয়ে যায়। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের কোনো তত্ত্ব বা সূত্র দিয়েই – আগলানো, ওছলানো, কামড়ানো, লেংচানো, ভেংচানো, ভাপসানো ব্যাখ্যা করা যায় না, বা টকটক, টুকটুক, টিকটিক, টুকটাক – এই শব্দগুলির ভিতরকার পার্থক্য বোঝা যায় না। (দেবেশ ২০০৩: ৫৯)

সুনীতিকুমার সে চেষ্টা করেননি। বরং এসব ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাজ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়।

২৮. প্রমথ চৌধুরীর চলিত গদ্য কতটা 'চলতি', তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার অবকাশ আছে, এবং উঠেছেও। যেমন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লক্ষ করেছেন, 'প্রমথ চৌধুরী যিনি চলিত ভাষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে রীতিমত একটা আন্দোলন চালিয়েছেন, তাঁরও ভাষা উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের বৈঠকখানার মজলিশি ভাষা'। (হীরেন্দ্রনাথ ১৯৮৮: ৯৭)

২৯. চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যদের 'মধ্যপন্থা' শেষ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ঔপনিবেশিক মতাদর্শ ও চর্চাকে নতুন তকমায় দীর্ঘমেয়াদি রাজত্বের সামর্থ্য গড়ে দিয়েছিল (৪.৪.৩.৩ দ্রষ্টব্য)। একই ব্যাপার আবার লক্ষ করা যায় চলিতরীতির প্রতিষ্ঠায়। চলিতরীতির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে কার্যত লেখ্য-বাংলার এক শৈলী বা গদ্যরীতি হিসাবে। অন্তত তত্ত্বায়নের ঘাটতির দিক থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে – '*জীবনস্মৃতি* তার সমস্ত কথ্যতা ও জীবনৈকট্য সত্ত্বেও সাধুরীতির, আর *কুলায় ও কালপুরুষ* বা *স্বগত*, তৎসম-অতিরেক ও কথ্যতা থেকে দূরত্ব সত্ত্বেও, চলিত রীতির' (হুমায়ুন ২০০২: ৮৪)। ফলে উপনিবেশিত সাধুগদ্যের তাত্ত্বিক সমস্যা সম্পর্কে 'নবব্যাকরণবিদ'দের রচনায় যে বোঝাপড়া দেখা যায়, এবং তাঁদেরই লেখালেখির ফলে কলকাতার ভাষাচর্চার পরিমণ্ডলে সামগ্রিকভাবে এ ধরনের সচেতনতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, চলিতরীতি-সংক্রান্ত পরবর্তী আলোচনাধারায় তা প্রায় অনুপস্থিত। উপনিবেশিত সাধুরীতির গভীরতর সব বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনা মুলতুবি রেখে কেবল সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের আকারের মধ্যে চলিতরীতির ব্যাখ্যা আদতে বাংলা ভাষার বি-উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়াকে প্রলম্বিত করেছে।

৩০. ছাপাখানায় সংস্কৃতের ব্যবহারিক প্রতাপ বাংলা মুদ্রণে কী সমস্যা তৈরি করেছে, তার পরিচয় দিয়েছেন অজরচন্দ্র সরকার। সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁকে বাংলা ও সংস্কৃত টাইপকে আলাদা রাখার প্রস্তাব করতে হয়েছে:

> বিদ্যাসাগর মহাশয় এমন ভাবে নূতন নূতন যুক্তাক্ষর টাইপ তৈয়ার করাইয়া ছিলেন, যাহাতে সংস্কৃত ভাষাও বাঙ্গালা টাইপের দ্বারা অনায়াসে সুষ্ঠুভাবে মুদ্রিত করা যায়। এক ঢিলে দুই পাখী-মারা বিদ্যার আমি কিন্তু ঘোর বিরোধী। আর এই একমাত্র কারণেই বাঙ্গালা টাইপ ও কেস এইরূপভাবে জবড়জং ও গুরুভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। কবে কোন্ শুভ মুহূর্তে একটি সংস্কৃত জটিল শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইবে কি না-হইবে, অথবা হয়ত ক্বচিৎ-কখন একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া বা উদ্ধৃত করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জাহির করিতে হইবে, এই কারণে সংস্কৃত ভাষায়

বহুব্যবহৃত যুক্ত টাইপগুলি যে বাঙ্গালা কেস জোড়া করিয়া আজও বিরাজ করিতেছেন, ইহা মোটেই কাজের কথা নয়। (অজর ১৯৯৭: ২৪)।

৩১. দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৫)। বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলা বানানের নিয়ম' শীর্ষক যে পুস্তিকা বের করেছিল, তার ভূমিকায় উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও একই কথা জানিয়েছেন। বানানসমিতির সদস্যদের একটা বড় অংশ ভাষা ও বানান বিষয়ে রবীন্দ্রমতের সমর্থক ছিলেন। তদুপরি, পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনপত্র: 'বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি' (বিজন ১৯৯৭/২: ২০৭)। তাই বলা যায়, এই বানানবিধির বিরোধীদের মধ্যে যাঁরা পুরো প্রক্রিয়াটির জন্য রবীন্দ্রনাথকেই দায়ী ভেবেছেন, তাঁরা বেশি ভুল করেননি।

৩২. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতায় দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের অটুট প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। রামমোহনের ব্যাকরণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি সমকালীন ব্যাকরণচর্চার হাল ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

> How many grammarians in Bengal of this age would care to observe the laws of the Bengali language so scrupulously. They would rather copy rules from the Mugdhabodh, whether they apply to Bengali or not, and give a dignified classical position to Bengali without much labour. (Sen 1921: 66)

৩৩. দরকার ছিল 'সিনক্রোনিক' বা সমকালিক আলোচনা, যার সঙ্গে সংস্কৃত রূপ বা বাংলার প্রাচীনতর রূপ তুলনাসূত্রে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু বাংলা ভাষার আলোচনা হয়েছে মুখ্যত 'ডায়াক্রোনিক', যেখানে পুরোনো লিখিত উপাদানগুলোর বরাত শেষ পর্যন্ত সবসময়েই সংস্কৃতে গিয়ে ঠেকেছে। সংস্কৃতই থেকে গেছে কেন্দ্র। পবিত্র সরকার ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

> এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান যেখানে পৌঁছেছিল, সেখানে ভাষার ইতিহাস রচনার দুটি মডেল গড়ে উঠেছিল, একটি অনেক বেশি গৃহীত, অন্যটি কঠিন বলেই অপেক্ষাকৃত কম অবলম্বিত। প্রথমটি হল পুরোনো বইপত্র, শিলালিপি, ভূমিদানপত্র, দলিলদস্তাবেজ, চিঠিপত্র ইত্যাদি 'লিখিত' ভাষা অবলম্বন করে ভাষার ইতিহাস রচনা। এখানে বিশ্বাস এরকম যে, লিখিত ভাষার মধ্যে ঐ সময়কার 'উক্ত' ভাষার যথাসম্ভব বিশ্বস্ত প্রতিফলন থাকে, ফলে 'লিখিত' ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসই হয়ে ওঠে ভাষার ইতিহাস। এই পদ্ধতি ফিলোলজিক্যাল পদ্ধতি, স্যোসুর এই পদ্ধতির একটু নিন্দেমন্দ করেছেন। তার কারণ, এমন অনেক সময়ই দেখা যায় যে লিখিত ভাষা আমাদের উচ্চারণের যথাযথ প্রতিরূপ নয়। ... আর একটা মডেল হল ওই ভাষার যে কটা উপভাষা আছে নানা অঞ্চলে, তাদের শব্দাবলি সংগ্রহ করে তা থেকে তুলনাত্মক পুনর্গঠনের দ্বারা ভাষার ইতিহাস রচনা। এটা স্যোসুরের কথা অনুসরণ করে 'লিঙ্গুয়িস্টিক' পদ্ধতি বলা যায়। প্রথমটিতে লিখিত প্রমাণের প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে মৌখিক ভাষার আধিপত্য। প্রথমটি নিষ্পন্ন হয় আদিকাল থেকে সময়ের রেখা ধরে এগিয়ে গিয়ে, প্রাক্তন থেকে সদ্যতনে পৌঁছে, দ্বিতীয়টি সম্পাদিত হয় এখন থেকে তখনে পিছিয়ে সময়স্রোতের উজান ধরে। দুয়ের মধ্যে সম্মিলন ও ভারসাম্যস্থাপন অবশ্যই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এইরকম একটি ব্যাকরণ বা ইতিহাস রচনার কথা বলেছিলেন ১৯০৫-এ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' নামের বিখ্যাত বক্তৃতায়। (পবিত্র ১৯৯৯: ১৩১)

এ পদ্ধতির ভাষা-বিশ্লেষণের আরেকটি বড় সমস্যা এই যে, এতে ভাষার শব্দস্তরই মূল উপাদান হিসাবে বিশ্লেষিত হয়। তাতে যে ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না, তা ব্যাখ্যা করেছেন সোস্যুর ও অন্যরা (দেবপ্রসাদ ২০০৬: ১৪৩-৪৪); রবীন্দ্রনাথও নিজের মতো করে এ প্রসঙ্গে বারবার সতর্ক করেছেন (৫.৩ দ্রষ্টব্য)।

৩৪. যেমন, পুরুলিয়া জেলায় 'কুঁকড়ামুড়া' নামের এক গ্রাম আছে। জনৈক গবেষক এ নামের উৎস স্থির করেছেন 'কুক্কুরমুণ্ড'। পল্লব সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন, দেবতার থানে জ্যান্ত মুরগীর মাথা ছিঁড়ে উৎসর্গ করার স্থানীয় রেওয়াজ থেকে এ নাম এসেছে। যদিও ভাষাতত্ত্বের সূত্রানুযায়ী 'কুক্কুরমুণ্ড' থেকে 'কুঁকড়ামুড়া' হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

৩৫. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তৎসম শব্দের এ পরিসংখ্যান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ শব্দগুলো আদৌ তৎসম কি না, সে প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য: 'গাণিতিক হিসাব দেখাইয়া পণ্ডিতেরা বাংলা সাধুভাষায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন শতকরা ৪৪টা। বাংলা ভাষায় বহু খ্যাতনামা লেখকের লেখায় তথাকথিত বিশুদ্ধ শব্দের সংখ্যা শতকরা ৪৪ অপেক্ষাও অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্যত কয়টি খাঁটি তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক'। (বিজন ১৯৭৭: ৯৮-৯৯)

৩৬. ১৮৭৭ সালে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি সংস্কৃত শব্দ আমদানির সমকালীন প্রবণতা সম্পর্কে লিখেছিলেন: 'No limit is set, in fact, to the extent to which words are to be borrowed from Sanskrit, so that every Sanskrit word is considered to have rightful claim to be incorporated into Bengali.' (Ganguli 1990: 24)
দেখা যাচ্ছে, প্রায় ছয় দশক পরে এ দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই পরিবর্তিত হয়নি; বরং অনেক ব্যাপক ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩৭. *চলন্তিকার* মূলনীতি উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করেছেন ঋষি দাস:

> বাংলা অভিধানকারদের এই অত্যুগ্র বিশুদ্ধতাবাদ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ রাজশেখর বসু প্রণীত বহুল-প্রচলিত *চলন্তিকা* অভিধান। রাজশেখর বসু সুলেখক ও সুপণ্ডিত। বাংলাভাষায় তাঁর অধিকার সর্ববাদিসম্মত। তাই অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই *চলন্তিকা* অভিধানকে অতিশয় নির্ভরযোগ্য মনে করে ব্যবহার করেন। কিন্তু এই অভিধানে লৌকিক শব্দগুলিকে যেভাবে উন্নাসিক উপেক্ষার সঙ্গে বর্জন করা হয়েছে, তা যদি অভিধান-সংকলকের আদর্শ হয়ে ওঠে, তবে বাংলাভাষার প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ অভিধান কখনো রচিত হবে না। *চলন্তিকার* সপ্তম সংস্করণটি আমার হাতের কাছে আছে। তা থেকেই কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করতে চাই। ধরুন 'সম্বন্ধী' শব্দটি। সংস্কৃতে 'সম্বন্ধী' শব্দের অর্থ কুটুম্ব। কিন্তু কোনো বাঙালি যদি মামা, মেসো বা পিসেকে সম্বন্ধী বলেন, তবে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা বাঙালিমাত্রই কল্পনা করতে পারেন। অথচ *চলন্তিকা* অভিধানে 'কুটুম্ব' অর্থটিকেই সর্বপ্রথম দেওয়া হয়েছে। পরে বন্ধনীর মধ্যে 'বাং' লিখে দেওয়া হয়েছে 'শ্যালক' শব্দটি। বাংলা অভিধানে বন্ধনীর মধ্যে তো 'সং' থাকারই কথা। বাংলাভাষায় 'পার্বত্য' শব্দটি সমধিক প্রচলিত। 'পার্বত' শব্দটির প্রচলন নেই বললেই চলে। কিন্তু 'পার্বত্য' শব্দটি *চলন্তিকায়* স্থান পায় নি, স্থান পেয়েছে পার্বত্যের পরিবর্তে 'পার্বত' শব্দটি। 'পার্বত' শব্দটির ব্যাকরণগত কৌলিন্য কি আছে জানি না, তবে তা যে কোনো কারণেই বাংলা অভিধানে 'পার্বত্য' শব্দকে স্থানচ্যুত করতে পারে, মনে করি না। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কৃতবিদ্য বহু লেখকই 'কেন্দ্রিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'কৈন্দ্রিক' শব্দটি চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু *চলন্তিকায়* 'কেন্দ্রিক' শব্দটি ব্যাকরণগত অশুদ্ধতার অপরাধে স্থান পায় নি, স্থান পেয়েছে 'কৈন্দ্রিক' শব্দটি। গণতান্ত্রিক এই দেশে নিত্যব্যবহৃত

> ‘গণতান্ত্রিক’ শব্দটিও স্থান পায় নি। সম্ভবত গণতন্ত্র+ষ্ণিক=গাণতান্ত্রিক, ব্যাকরণগত এই সূত্রের অজুহাতে। (ঋষি ১৯৮৬: ১২৪)

উল্লেখ্য সংকলকের জীবদ্দশায় অভিধানটির আরো সংস্করণ হয়েছে (রাজশেখর ১৩৮০)। কিন্তু উদ্ধৃত উদাহরণগুলোর বা মূলনীতির কোনো বদল হয়নি।

৩৮. দেবেশ রায় ভাষারাজনীতির সে প্রেক্ষাপট এবং স্ববিরোধ সম্পর্কে লিখেছেন:

> ১৮৩৫-এ রাজকার্যের একমাত্র ভাষা হিশেবে পারসিক ভাষার স্বীকৃতি চলে যায়। তার জায়গায় আসে ইংরেজি। সাহেবদের আনুকূল্যে বাংলা গদ্যের যে আকার খুব কম সময়ের মধ্যে তৈরি করে তোলা হয় তাতে সংস্কৃত নির্ভর হিন্দু সাম্প্রদায়িক আধিপত্য নতুন ছাপাখানার দৌলতে এমন গেড়ে বসে, যেন কারো মনেই থাকল না, এই সেদিনও পারসিক না জানলে তাকে কেউ গ্রাহ্যই করত না। প্রায় একশ বছর পর ঐ ১৯৩৫ নাগাদই ইসলামি-বাংলার কথা উঠলে আমাদের মনে হয়েছিল – ধর্মীয় জাতিবাদের সঙ্গে ভাষা-জাতিবাদকে মিলিয়ে, রাজনীতির আধিপত্যকে সাংস্কৃতিক আধিপত্যে বদলে নেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। সে চেষ্টা তখনকার বাংলায় কোনো বদল ঘটাতে পারেনি, পরের পূর্ব পাকিস্তানেও পারেনি, তারও পরের বাংলাদেশেও পারেনি। কিন্তু উনিশ শতক জুড়ে বাংলা ভাষার ওপর হিন্দু আধিপত্য যে শিকড়-বাকড় চারিয়ে দিয়েছে, তা নিয়ে আমরা ভাবিওনি, উদ্বেগও বোধ করিনি। (দেবেশ ২০০৩: ১২)

অষ্টম অধ্যায়
বাংলা ভাষার প্রায়োগিক দিকগুলোতে রবীন্দ্রচিন্তার উপযোগিতা

৮.০ রবীন্দ্রচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা

উপনিবেশ আমলে ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় বাংলা ভাষার পঠন-পাঠনের একটা ধারা তৈরি হয়েছিল। এর একদিকে ছিল বাংলা গদ্যের চর্চা, অন্যদিকে ব্যাকরণ-অভিধান প্রণয়ন। দুই ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষাচর্চায় ঔপনিবেশিক প্রভাব গভীরভাবে জেঁকে বসেছিল। ব্যাকরণ প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই সেকালের বাস্তবতার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

> বাংলা গদ্য প্রথমত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে গড়ে ওঠার জন্যে এবং সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সগোত্রতার জন্যে ... বাঙালি পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষার সূত্রাদির ভিত্তিতে তার প্রকৃতি বিচার করতেন। এমনকি দেশজ, দ্বিত্ববোধক ও ধ্বন্যাত্মক প্রভৃতি বাংলা ভাষার অবিমিশ্র শব্দাবলীর ব্যবহার বাংলায় অপাংক্তেয় বলে ভাষার শাস্ত্র তথা ব্যাকরণে তাদের উল্লেখও দূষণীয় মনে করতেন। (মুহম্মদ আবদুল ১৯৯৪: ৪৩৮)

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষাচর্চায় এ বাস্তবতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বিস্তারিত ও ধারাবাহিক আলোচনা করেন। তাঁরা এ থেকে পরিত্রাণের উপায়ও নির্দেশ করেছিলেন। এঁদের ভাষা-আলোচনায় দৃষ্টিভঙ্গিগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সহজেই আলাদা করা যায়। তাঁর দীর্ঘদিনের লিপ্ততা, রচনার পরিমাণ ও বিষয়-পরিধি, সৃজনশীলতা, আলোচনার নতুন এলাকা ও আলোচনা-পদ্ধতি নির্দেশ, তাত্ত্বিক-প্রায়োগিক বিশ্লেষণের সাফল্য তাঁকে বাংলা ভাষার বি-উপনিবেশায়ন-পর্বের প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেয়। পরবর্তী ভাষাবিশ্লেষকদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো ভিন্নমত দেখা যায় না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাজের স্বীকৃতি মিললেও তাঁর কাজের অনুসরণ খুব সামান্যই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাজের লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষার ব্যাপক বর্ণনামূলক ব্যাকরণের ভিত্তি তৈরি করা, যেখানে বাংলার 'স্বাতন্ত্র্য' ও 'স্বায়ত্তশাসন' রক্ষিত হবে। বিশ শতকের ষাটের দশকে মুনীর চৌধুরী খেয়াল করেছেন, বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এ লক্ষ্য অর্জিত হয়নি: 'বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সমস্যা এই যে, বাংলা ব্যাকরণ এখনো লিখিত হয় নি। এই বিষয়ে একমাত্র সোপারেশ এই হতে পারে যে, এখন একাধিক বাংলা ব্যাকরণ রচিত হোক, তা বর্ণনামূলক হোক, তা বাংলা ভাষার বর্ণনা হোক, তার বর্ণনারীতি আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বানুমোদিত হোক' (মুনীর ১৯৭৬: ২১৪)। মুনীর চৌধুরীর 'সোপারেশ' রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবের নতুন সংস্করণ মাত্র। ১৯৮৯ সালেও সুনীল সেনগুপ্তকে একই অভাবের উল্লেখ করতে দেখা যায়:

> তিনি আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে 'বাংলা অনুরাগী'দের বাংলা ব্যাকরণের অভাব পূরণের জন্য ডাক দেন। আজকে কি আমাদের বর্তমান অবস্থায় তার পরিবর্তন হয়েছে? ... যে অভাব মেটানোর কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তা আজও মেটেনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা আমাদের যেভাবে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিল তার কাছাকাছি আমরা পৌঁছতে পারিনি। (সুনীল ১৯৮৯: ১০)

হুমায়ুন আজাদের মতে, বাংলা ভাষার তাবত ব্যাকরণগ্রন্থ তত্ত্ব, বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ (হুমায়ুন ২০০৪: ১৫০)। তিনি আরো লক্ষ করেছেন: 'বাঙলা ভাষার খাঁটি, গভীর, ব্যাপক, পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ লেখার কথা বলা হচ্ছে এক শতাব্দী ধ'রে, কিন্তু আজো ওই স্বপ্নের ব্যাকরণ রচিত হয় নি' (হুমায়ুন ২০০৪: ১৫৫)। তাতে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথসহ সেকালের সমমনা বিশ্লেষকেরা বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণের যে তাত্ত্বিক কাঠামো ও প্রণালি-পদ্ধতি প্রস্তাব করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়নি। এর এক কারণ ওই প্রস্তাবের উচ্চাভিলাষ: 'তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] প্রকৃত ও প্রাকৃত বাংলাভাষার ব্যাকরণ-চিন্তা এবং রাজধানীতে গড়ে-ওঠা একটা সর্বজনীন কথ্যরীতির ব্যবহারকে সৃষ্টিশীল পর্যায়ে রূপ দেওয়ার চেষ্টা সময়ের দিক থেকে এতই অগ্রসরশীল ছিল যে, এখনো তা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে'। (মনিরুজ্জামান ১৪১৯: ৭৭)

কিন্তু পরবর্তীকালের ভাষাবিজ্ঞানীরা যেভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে বোঝা যায়, মূল সমস্যাটা বোধগম্যতার নয়।[১] বাংলা ভাষা-সম্পর্কে উপনিবেশিত ধ্যানধারণার প্রত্যাবর্তনই সংকটের মূল কারণ (৭.৩.৪ দ্রষ্টব্য)। অন্য কারণটি হল, আরোপিত তত্ত্ব অনুযায়ী ভাষা-বিশ্লেষণ। ভাষাবিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত গৌণ এবং অকার্যকর ধারায় আমাদের ভাষাবিজ্ঞানীরা অধিকতর নিরত থেকেছেন: 'তাঁরা ঐতিহাসিক ও খানিকটা তুলনামূলক এবং ব্যুৎপত্তিগত-অনুসন্ধানে ইউরোপীয় ধারার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে কালক্ষেপণ করেছেন বিস্তর' (মনিরুজ্জামান ১৮১৯: ৯০)। পরবর্তীকালে বর্ণনামূলক ধারা, রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণসহ পশ্চিমা নানা প্রণালিতে বাংলা ভাষা বিশ্লেষিত হয়েছে (হুমায়ুন ২০০২: ৪১-৪৭; নির্মল ২০০০: ৩১৮-৩৭)। এসব আলোচনায় বাংলা ভাষার ইতোমধ্যে নিরূপিত রূপকে মানদণ্ড ধরে বিশ্লেষণ করায় বাংলা ব্যাকরণ ও মানরূপের সংকট নিরসনে সেগুলো বিশেষ সহায়ক হয়নি।[২] রবীন্দ্রনাথ দেবপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে পত্রালাপে এ গোড়ার সমস্যাটাই উল্লেখ করেছিলেন: 'প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয় নি, কেননা, আজও তার প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারে নি' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৯)। এ কথা পশ্চিমা প্রণালি-পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার যে কোনো বিশ্লেষণ সম্পর্কেই সত্য। যদি বাংলা ভাষার আভ্যন্তর বিধি ও প্রবণতাগুলো সুস্থির ও নমনীয়ভাবে শনাক্ত করার কাজ হয়ে যেত, তাহলে নতুন প্রণালি-পদ্ধতির প্রয়োগ গ্রহণ-বর্জনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষা-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসতে পারত। কিন্তু গোড়ার কাজটা না হওয়ায় রবীন্দ্র-পরবর্তী ভাষাতাত্ত্বিকদের কাজগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যতটা তত্ত্বের পরীক্ষা হয়েছে, ততটা বাংলা ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। ছাঁচের মধ্যে ফেলে ভাষা-ব্যাখ্যার তুলনায় এ কাজটা অনেক জটিল। রবীন্দ্রনাথ এ জটিল অঙ্গনেই বারবার বাংলা ভাষাবিশ্লেষকদের আহ্বান করেছিলেন। আরেকটি উদাহরণ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবের সঙ্গে পরবর্তী গবেষকদের ফারাক বোঝা যাবে।

উপভাষাতত্ত্ব এলাকায় বাঙালি ভাষাবিজ্ঞানীরা বিস্তর কাজ করেছেন (হুমায়ুন ২০০২: ৯৩-৯৬; নির্মল ২০০০: ৩৩৫-৩৭)। কিন্তু 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন উপভাষার পৃথক ও তুলনামূলক আলোচনার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/২: ৭০১-১১), পরবর্তী কোনো বিশ্লেষকই সেদিকে পা বাড়াননি। ভাষার মানরূপ স্থির করার ক্ষেত্রে এবং আভ্যন্তর বিধি ও শৃঙ্খলা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলার ঔপভাষিক বৈচিত্র্যকে ব্যবহারের কথা রবীন্দ্রনাথ আরো অনেক জায়গায় বলেছেন। পরবর্তীকালের উপভাষাচর্চায় এ ধরনের সমন্বিত কোনো দৃষ্টিভঙ্গির দেখা মেলেনি।

যদি রবীন্দ্রনাথসহ 'নবব্যাকরণবিদ'দের দেখানো পথে বাংলা ভাষাচর্চা অগ্রসর হত, তাহলে হয়ত এরই মধ্যে ঔপনিবেশিক ভাষাদর্শ থেকে বাংলা ভাষাচর্চা মুক্ত হত। নির্ণীত হত সুস্থির কিন্তু নমনীয় মানরূপ; আর তার ভিত্তিতে প্রণীত হত বাংলার 'খাঁটি' ব্যাকরণ-অভিধান। কিন্তু তা না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সাত দশক পরেও তাঁর ভাষাচিন্তা নতুনভাবে চর্চিত হওয়ার বিষয় রয়ে গেছে। তাঁর তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অব্যবহৃত ও প্রাসঙ্গিক থেকে গেছে।

৮.১ মান বাংলা

'মানভাষা' বা 'প্রমিত ভাষা' কথাগুলো রবীন্দ্রনাথ পরিভাষা-আকারে ব্যবহার করেননি। কিন্তু তাঁর সমগ্র আলোচনা সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠ করলে বোঝা যায়, তিনি বাংলা ভাষার একটি সর্বজনীন মানরূপ নির্ধারণের জন্যই কাজ করেছিলেন। এ কাজের প্রথম প্রস্তাবক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (1990)। পবিত্র সরকারের মতে, এ হল 'সাহিত্যের ভাষা হিসেবে চলতি বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার পক্ষে প্রথম বিস্তারিত প্রস্তাব' (পবিত্র ১৯৯৯: ১০)। প্রমথ চৌধুরীর পরে বাংলা ভাষাচর্চায় 'চলিত' কথাটি যে অর্থে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার সঙ্গে শ্যামাচরণের প্রস্তাবের গভীর পার্থক্য আছে। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত এ প্রবন্ধে লেখক মূলত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মুখের ভাষাকে লেখার অবিকল্প রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। নিজ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা থেকে: 'In England, at the present day, the language spoken by the highest and best-educated has more in common with that of the lower orders than with that of men of inferior education.' (Ganguli 1990: 25) অবশ্য, বাঙালি ভদ্রলোকদের কথ্যরীতিও প্রায় সমরূপ: 'The language in which eminent Pandits like Iswar Chandra Vidyasagar and Taranath Tarkavachaspati converse differs in nowise from that of Bengali gentlemen possessing no knowledge of Sanskrit.' (Ganguli 1990: 27) আবার, তাঁর ভদ্রলোকদের তালিকায় কেবল কলকাতার ভদ্রলোকেরাই ঠাঁই পায়নি, বাংলার অন্য উপভাষা-অঞ্চলের মুখের ভাষাও তাঁর বিবেচনায় ছিল: 'The provincial Bengali of the Malda, as of the Dacca and of the Bakarganj District, as spoken by men of the upper castes is quite intelligible to people in Calcutta, as the present writer can say from his own experience.' (Ganguli 1990: 27) এই কথ্য-বাংলাকে শিক্ষা, জ্ঞানচর্চাসহ অন্য নানা কাজে ব্যবহার করলে বাংলাভাষী সমগ্র জনগোষ্ঠী তাতে উপকৃত হবে; কারণ, এর সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক পরিচয় আছে। লক্ষণীয়, শ্যামাচরণ সাহিত্যিক ভাষার আলোচনা করেননি। সাহিত্যিক রীতি বা ব্যক্তিগত গদ্যরীতি হিসাবে কোনো নির্দিষ্ট ছক বেঁধে দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়। আসলে সাহিত্যিক ভাষার বিবেচনাকে তিনি বিশেষ কোনো মর্যাদাও দেননি। বঙ্কিমচন্দ্রসহ বাংলা ভাষার রীতি ও নীতি-নির্ধারক পরবর্তী বহু তাত্ত্বিকের সঙ্গে এখানেই তাঁর মূল পার্থক্য। লেখার বাংলা থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা আদায়ের লক্ষ্যে তিনি সর্বজনীন বোধগম্যতার ওপর কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়েছেন, আর এ কারণেই মুখের ভাষা অবলম্বনে লেখার ভাষা গড়ার তাগিদ দিয়েছেন।

একই ধরনের প্রস্তাব আরো জোরালোভাবে আছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখায়। উপনিবেশ-পূর্ব বাংলা ভাষার সর্বজনবোধ্য রূপটিকে তিনি অভিহিত করেন 'বিষয়ীলোকের বাংলা' নামে। এই বাংলায় 'সংস্কৃতও থাকিত আরবিও থাকিত পারসিও থাকিত উর্দুও থাকিত, কিন্তু কিছুই অধিক পরিমাণে থাকিত না, কোনো কড়া শব্দ থাকিত না, যাহা

দেশে প্রচলিত, যাহা সকলে বুঝিতে পারিত – সেই শব্দই থাকিত' (হরপ্রসাদ ১৯৮৯: ৭৩১)। ঔপনিবেশিক আমলের বিচিত্র ভাঙাগড়ায় সে ভাষা বদলে গেছে। তাই বর্তমান লেখার ভাষা সম্পর্কে হরপ্রসাদের প্রস্তাব, 'ইংরেজি, পারসি, বাংলা ও সংস্কৃতময় যে ভাষায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনাদি প্রসিদ্ধ ভদ্রসমাজে কথাবার্তা চলে সেই ভাষায় লেখা' (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৫৬৬)। হরপ্রসাদের প্রস্তাবে লেখ্যবাংলার মূল ভিত্তি গণগ্রাহ্যতা – ব্যবহারের দিক থেকেও বটে, বোধগম্যতার দিক থেকেও বটে। 'চলতি' ভাষাকে 'মান' ভাষা হিসাবে নেওয়ার আরেকটা কারণ, এর মধ্য দিয়েই কেবল ভাবের ইংরেজিয়ানা ও সংস্কৃতয়ানা রোধ করা সম্ভব – উপনিবেশিত বাংলার যা প্রধান ত্রুটি। 'নূতন কথা গড়া' প্রবন্ধে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন পরিভাষা থেকে: 'ভারতবর্ষের উত্তর অংশের পর্বতময় প্রদেশকে লোকে উত্তরাখণ্ড বলে, কিন্তু ইংরেজিতে উহাকে Himalayan regions বলে বলিয়া বাংলা পুস্তকে উহার নাম হিমালয় প্রদেশ হইয়াছে' (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৫৫৫)। শাস্ত্রীর 'চলতি' বাংলা এভাবেই তাঁর 'খাঁটি' বাংলার সমার্থক হয়ে ওঠে। এটি মোটেই 'ভাষারীতি'র মতো সংকীর্ণ ধারণা নয় – ভাষার ব্যবহারিক ব্যাপকতা আর ভাবের খাঁটিত্ব এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

'মান' বাংলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো এতটা পষ্ট নয়। তাঁর প্রস্তাবের ধরন ভিন্ন। তিনি কেবল 'আদর্শ' প্রস্তাব রেখে দায়িত্ব শেষ করেননি। দশের কাছে সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করানোর জন্য দশকের পর দশক কাজ করেছেন। তাই প্রভাবশালী মত-পথের সঙ্গে তাঁকে বারবার আপোস করতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও ভাষা-বিষয়ক তাঁর সমস্ত রচনায় অন্তর্গত মেজাজ আর ভাবের দিক থেকে সুস্থির কিন্তু নমনীয় এক 'মান' বাংলার আকুতি পাওয়া যায়। সেই 'মান' বাংলার ভিত্তি মুখের ভাষা। একেবারে শুরু থেকেই ভাষা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ভাষার মৌখিক রূপকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। উচ্চারণ-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুচ্ছে 'পশ্চিমবঙ্গবাসী' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৪) তথা 'কলিকাতা বিভাগে'র (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৩) উচ্চারণরূপ নির্দেশ করাই ছিল তাঁর ঘোষিত লক্ষ্য। 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধেও তিনি 'কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে' আলোচনা করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৮৯)। এজন্য প্রায়শই তিনি পূর্ববঙ্গীয় বা অপরাপর উপভাষার ভিন্নতাও নির্দেশ করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী 'চলিত'রীতিকে সাহিত্যের ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করার পর কোন উপভাষা এ রীতির ভিত্তি হবে সে বিতর্ক শুরু হয়। এ বিতর্কে সাধুরীতি তথা সংস্কৃত-বাংলার পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি ছিল এই যে, কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আঞ্চলিক ভিন্নতা আর বিরোধের প্রেক্ষাপটে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার প্রচলন সুবিধাজনক। এমতাবস্থায় চলিতরীতির ভিত্তি হিসাবে একটি বিশেষ উপভাষার প্রস্তাব এবং তার পক্ষে যুক্তি তৈরি করা জরুরি হয়ে ওঠে।[৩] তাতে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অনেকেই 'দক্ষিণী বাংলা'র পক্ষ নেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য:

> মোটামুটি এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে, নদীয়া শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে, ভাগীরথীর উভয় কূলে এবং বর্তমান বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পূর্বে ও দক্ষিণাংশে যে ডায়ালেক্ট প্রচলিত ছিল, তাই কতক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সাধুভাষার রূপ ধারণ করেছে। এর একমাত্র কারণ, বাংলাদেশের অপরাপর ডায়ালেক্ট অপেক্ষা উক্ত ডায়ালেক্টের সহজ শ্রেষ্ঠত্ব। (প্রমথ ২০০৯: ২৬৫)

বিশেষ উপভাষার শ্রেষ্ঠত্বের এ ধারণা সেকালে এবং একালেও একপ্রকার সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ধারণাটি ত্রুটিপূর্ণ। উপভাষা আসলে হেরে-যাওয়া ভাষা, আর ভাষা বা মানভাষা শক্তি-পরীক্ষায় জয়ী উপভাষা মাত্র (Philipson

2003: 39)। চলিতরীতির ভিত্তি হিসাবে নদীয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলের কথ্যভাষার পক্ষে যুক্তি দেওয়ার কালে ক্ষমতা-সম্পর্কের সঙ্গে মানভাষার অন্তরঙ্গ যোগের বিষয়টি অনেকেই বিবেচনায় আনেননি। 'শ্রেষ্ঠত্বে'র ধারণাই তাতে যুক্তি হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ব্যাপারে গ্রিয়ার্সন লিখেছেন:

> According to tradition, the Bengali spoken in Nadia is the purest form of the language, but actual experience shows that this is tradition and nothing more. All that can be said in its favour is that the colloquial Bengali of Nadia is more Sanskritised than elsewhere, a peculiarity which is no doubt due to the influence of the Sanskrit schools which flourish in that district. (Grierson 1903: 18)

বোঝা যায়, মানবাংলার ভিত্তি হিসাবে নদীয়ার ভাষাকে গ্রহণ শুধু যুক্তির ব্যাপার ছিল না, ছিল 'ঐতিহ্যে'র ব্যাপার। সেই ঐতিহ্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন মৃণাল নাথ (১৯৯৪)।

মৃণাল নাথ দেখিয়েছেন (মৃণাল ১৯৯৪: ৯১-৯৭), সেনরাজাদের কেন্দ্র বিক্রমপুর থেকে শুরু করে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে সতের শতক পর্যন্ত ঢাকার ওই গুরুত্ব ছিল, যে গুরুত্বের কারণে ঢাকা অঞ্চলের ভাষা প্রতাপশালী উপভাষা হিসাবে ষোল-সতের শতকের সাহিত্যিক ভাষার গড়নে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল। পনের শতক-পরবর্তী কাব্যসাহিত্য যে সাহিত্যিক ভাষায় লিখিত তা একপ্রকার সাধু ভাষা। *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* গ্রন্থটি ঢাকাই বুলির ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল। এর ক্রিয়ারূপের সঙ্গে সাধু ভাষার নৈকট্য রয়েছে।[৪] উনিশ শতকে বিকশিত নতুন গদ্যে পুরোনো ভাষারূপের ছায়া আছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় পুরোনো ধারার সঙ্গে ঐক্য ও ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। গড়ে ওঠে নতুন সাহিত্যিক ভাষা। নতুন এ ভাষা-গঠনে নদীয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

সতের ও আঠার শতকে আর্থিক-সাংস্কৃতিক কারণে বাংলা অঞ্চলে নদীয়ার প্রাধান্য ছিল। কলকাতা রাজধানী হওয়ার পর এ অঞ্চলের বিপুল বাসিন্দা সেখানে স্থানান্তরিত হন। সুকুমার সেন কলকাতার অভিবাসী বাসিন্দাদের সম্পর্কে লিখেছেন: 'কলিকাতার প্রাচীনতর বাসিন্দাদের মধ্যে, এবং পরবর্তী কালে আগতদের মধ্যেও, মধ্য এবং দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসীরাই প্রধান এবং বিশিষ্ট ছিলেন' (সুকুমার ১৯৯৮ক: ২০)। কলকাতার আদি অধিবাসীরা সব অর্থেই নিম্নবর্গের মানুষ। স্বভাবতই অভিবাসী মানুষেরাই সেখানে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তাঁদের ভাষাই ভদ্রলোকের ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। বিশ শতকের গোড়ায়ও এই অভিবাসী ভদ্রলোকদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের কথ্যভাষার পার্থক্য যে প্রকট ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে। প্রমথ চৌধুরী 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' প্রবন্ধে লিখেছেন:

> কলকাতার লোকের আটহাত আটপৌরে ধুতির মতো তাদের আটপৌরে ভাষাও বি-কচ্ছ, এবং সেই কারণেই তার সাহায্যে ভদ্রতা রক্ষা হয় না। স্ত্রীর প্রতি ম-কারাদি প্রয়োগ করা, যাদের জঙ্গল কেটে কলকাতায় বাস, সেই সকল ভদ্রলোকেরই মুখে সাজে, বাঙালি ভদ্রলোকের মুখে সাজে না। এই কারণেই বাঙালে ভাষা কিংবা কলকাত্তাই ভাষা, এ উভয়ের কোনোটিই অবিকল লেখার ভাষা হতে পারে না। (প্রমথ ২০০৯: ২৬৭)

কলকাতার স্থানীয় উপভাষা যে একটা 'অপভাষা' এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মনেও কোনো দ্বিধা ছিল না। 'কলকাতার ভাষা' প্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই মনে করিয়ে দিয়েছেন, এ ভাষা কলকাতার স্থানীয় 'কক্‌নি' নয়। যেমন, 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'কলিকাতার একটা স্বকীয় অপভাষা আছে যাহাতে 'গেনু' 'করনু' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় এবং

'ভেয়ের বে' (ভাইয়ের বিয়ে) 'চেলের দাম' (চালের দাম) প্রভৃতি অপভ্রংশ প্রচলিত আছে, এ সে ভাষাও নয়' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৯-১০)। অন্যত্র তিনি এ দুয়ের পার্থক্য বোঝানোর জন্য উদাহরণের আশ্রয় নিয়েছেন: 'কলকাতার কথিত ভাষার মধ্যেও সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। লন্ডনেও ভাষার একটা নিম্নস্বর আছে তাকে বলে কক্‌নি। সেটা সাহিত্যভাষা থেকে দূরবর্তী' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৩৬)। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ উচ্চারণের পার্থক্য মাত্রাগত, গুণগত নয়। কিন্তু এই সূক্ষ্ম পার্থক্যই দুজনের অবস্থানে তাৎপর্যপূর্ণ ফারাক তৈরি করেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় কাঙ্ক্ষিত উপভাষার শনাক্তকরণে। প্রমথ চৌধুরী 'দক্ষিণদেশী ভাষা'র শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ: 'সকল দোষগুণ বিচার করে মোটের উপর দক্ষিণদেশী ভাষাই যে বঙ্গদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ডায়ালেক্ট এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই' (প্রমথ ২০০৯: ২৬৬)। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এরকম শ্রেষ্ঠত্বের বরাত দেননি। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এরূপ: 'যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১০: ৬১৬)।

এই 'চলে যাচ্ছে' কথাটা রবীন্দ্রনাথের 'মান বাংলা'-সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনার চাবিশব্দ – ভাষারূপ নির্ধারণের মূলমন্ত্র। প্রথমে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর মতের পর্যালোচনা করা যাক। 'চলতি ভাষার রূপ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

> যেটাকে লেখ্য ভাষা বলি সেটা কৃত্রিম, তাতে প্রাণপদার্থের অভাব, তার চলৎশক্তি আড়ষ্ট, সে বদ্ধ জলের মতো, সে ধারা জল নয়। তাতে কাজ চলে বটে কিন্তু সাহিত্য শুধু কাজ চলবার জন্যে নয়, তাতে মন আপনার বিচিত্র লীলার বাহন চায়। এই লীলা-বৈচিত্র্য বাঁধা ভাষায় সম্ভব হয় না। এইজন্যেই কলকাতা অঞ্চলের চলতি ভাষাই সাহিত্যের আশ্রয় হয়ে উঠেচে। একদা যখন সাধুভাষার একাধিপত্য ছিল তখনো যে কোনো জেলার লেখক নাটক প্রভৃতিতে কলকাতার কথাবার্তা ব্যবহার করেচেন, কখনোই পূর্ব বা উত্তরবঙ্গের উপভাষা ব্যবহার করেন নি – স্বভাবতই কলকাতার চলতি ভাষা তাঁরা গ্রহণ করেচেন। এর থেকে বুঝবে সাহিত্য স্বভাবতই কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন করেচে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৩৫)

এ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, সাধুরীতির প্রতি তাঁর অনীহা নিখাদ সাহিত্যিক যুক্তিতেই। এর বিপরীতে তিনি কিন্তু নিজে থেকে 'কলকাতার ভাষা' ব্যবহারের প্রস্তাব দিচ্ছেন না; বলেছেন, লেখকেরা এ ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। পরের যুক্তিটি আরো মোক্ষম। সাধুরীতির একাধিপত্যের কালেও লেখকেরা নিজ তাগিদেই সংলাপে চলতি কথা ব্যবহার করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য থেকেই বোঝা যায়, কলকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষাকে সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে ব্যবহারের রীতিটি আরোপিত নয়, লেখকদের স্বেচ্ছা-নির্বাচন। কিন্তু সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে এর কোনো আদর্শ এখনো নির্মিত হয়নি। এর জন্য আরো সময় দরকার: 'আমাদের চলিত ভাষামূলক আধুনিক সাহিত্য ভাষার আদর্শ এখনো পাকা হয়নি বলে লেখকদের রুচি ও অভ্যাস-ভেদবশত শব্দব্যবহার সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার আছে। আরো কিছুকাল পরে তবে এর নির্মাণকাজ সমাধা হবে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৩৬)। এ কাজ করবে কে? রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কোনো পণ্ডিত বা বোদ্ধার হাতে কাজটা ছেড়ে দেননি। তাঁর উত্তরটা সহজ-সরল। যার প্রতিভা আছে সেই ভাষারীতি ঠিক করবে: 'যখনি শক্তিশালী সাহিত্যিকেরা এই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবেন তখনি ইহা পরিব্যক্ত হইয়া উঠিবে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১)। এসব মন্তব্যে একদিকে ভাষা-রাজনীতি ও ক্ষমতা-সম্পর্কের সঙ্গে ভাষার প্রত্যক্ষ

যোগাযোগ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পর্যাপ্ত সতর্কতার পরিচয় আছে; অপরদিকে প্রতিভাবান লেখকের হাতে যে কোনো অবহেলিত উপভাষাও যে সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা পেতে পারে, সে স্বীকৃতি ও সুযোগও অক্ষুণ্ন থেকেছে।

এ হল 'সাহিত্যিক ভাষা'র বিবেচনা। এ ভাষা অনুসরণ করবে, রবীন্দ্রনাথের মতে, কথ্য ভাষাকে। লোকমুখে 'চলে যাওয়া' এ কথ্য ভাষা চিহ্নিতকরণেও রবীন্দ্রনাথ সমধর্মী যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি পক্ষ নিয়েছেন কলকাতার ভাষার। সে ভাষার মূল অবলম্বন 'দক্ষিণী বাংলা' বটে, কিন্তু কলকাতার ভাষা পুরোপুরি দক্ষিণী বাংলা নয়। কলকাতা 'সমস্ত বাংলাদেশের একমাত্র রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমস্ত বাংলাদেশের একটি সাধারণ ভাষা আপনি জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহা ফরমাশে গড়া কৃত্রিম ভাষা নহে, তাহা জীবনের সংঘাতে প্রাণ লাভ করিয়া সেই প্রাণের নিয়মেই বাড়িতেছে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১০)। একে বলা যায় 'মানভাষার রাজধানীতত্ত্ব'। রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ভাষাকে ভৌগোলিক বা আঞ্চলিকভাবে দেখেননি। আদতে এটি কোনো বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়: 'কলকাতা সমস্ত বাংলার রাজধানী। এখানে নানা উপলক্ষে সকল জেলার লোকের সমাবেশ ঘটে আসচে। তাই কলকাতার ভাষা কোনো বিশেষ জেলার নয়' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৩৫)। তা 'বাংলার রাজধানীতে সকল প্রদেশের মথিত একটি ভাষা' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১০)।

মানভাষা-সম্পর্কিত যে কোনো বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের এই 'রাজধানীতত্ত্ব' গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি উপনিবেশ আমলে জাত ভাষিক বিচ্ছেদ ঘোচাতে চান; জনগোষ্ঠীর মানসিক বিভাজন দূর করে জাতিগঠনের কাজে ভাষাকে ব্যবহার করতে চান; শিক্ষা ও অপরাপর কাজে বাংলার অবারিত ব্যবহার চান। এ জন্য তিনি লেখার ভাষা ও মুখের ভাষার ভিন্নতা যথাসম্ভব কমিয়ে আনার প্রয়োজন বোধ করেন:

> য়ুরোপের সকল দেশেই প্রদেশভেদে উপভাষা প্রচলিত আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে সকল দেশে ভদ্রসাধারণের কথিত ভাষার প্রভেদ নেই। এবং সেই ভদ্রসমাজের কথিত ভাষার সঙ্গে সে-সকল দেশের সাহিত্যের ভাষা মোটের উপর অভিন্ন। আমাদের দেশেও ভাষার মধ্যে যথাসম্ভব মিল প্রার্থনীয়। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৩৬)

অন্যত্র তিনি ইতালির উদাহরণ টেনেছেন: 'বিশেষ কারণে টস্‌কানি প্রদেশের উপভাষা সমস্ত ইটালির এক ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। তেমনি কলকাতা শহরের নিকটবর্তী চারদিকের ভাষা স্বভাবতই বাংলাদেশের সকল দেশী ভাষা বলে গণ্য হয়েছে' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১০: ৬১৬)। এক জায়গার ভাষা সকল জায়গার ভাষা হয়ে ওঠার এ প্রক্রিয়া মোটেই আরোপণমূলক নয়। কারণ ভাষাটি তৈরি হয়েছে নানা উপভাষার মানুষের সম্মিলনে। রাজধানী হওয়ার কারণে নানা অঞ্চলের মানুষ বিচিত্র প্রয়োজনে কলকাতায় বসতি গড়েছে। তাতে এ রাজধানী শহর হয়ে উঠেছে 'সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৭)। আরোহী পন্থায় জমে ওঠা এই ভাষাটিই ক্রমে সমস্ত বাংলায় ছড়িয়েছে: 'তাহাদের সকলের সম্মিলনে যে-এক ভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১)। পুরো প্রক্রিয়াটা গণতান্ত্রিক, স্বাভাবিক এবং অংশগ্রহণমূলক। এই সর্বজনীন বাংলার ভিত্তি যে 'দক্ষিণ বাংলা'র ভাষা, তা-ও ওই উপভাষাটির অন্তর্গত কোনো গুণের কারণে নয় – ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরার ফল। ঢাকার উদাহরণ দিয়ে কথাটা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

> ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোকভাষার উপর আমাদের ভাষার সাধারণ পত্তন হইত এবং তা লইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা যদি মুখ বাঁকা করিত তবে সে বক্রতা আপনিই সিধা হইয়া যাইত, মানভঞ্জনের জন্য অধিক সাধাসাধি করিতে হইত না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১)

'রাজধানীতত্ত্ব' থেকে বোঝা যায়, মানভাষা-সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব ভাষার স্বভাবকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক আর অংশগ্রহণমূলক। উপভাষাচর্চার যেসব প্রণালি ও উদ্দেশ্য তিনি সুপারিশ করেছেন, তাতেও এর প্রমাণ মেলে। একটি বিশেষ ভাষা 'বাংলাদেশের সমস্ত ঘরের ভাষা' হয়ে ওঠা তাঁর কাছে জনগোষ্ঠীর কল্যাণের সঙ্গেই সম্পর্কিত (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১; ২০০৬/১০: ৬১৬)। কিন্তু এ ধরনের প্রস্তাব ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, মানভাষার শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই অপরাপর উপভাষাগুলোকে ফ্যাসিবাদী কায়দায় বিপন্ন করে তোলে। এ ঝুঁকি এড়ানোর একমাত্র উপায় সম্ভাব্য মানভাষা নিরূপণের ক্ষেত্রে সকল উপভাষার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শে সে নিশ্চয়তা ছিল:

> In the development of literary languages, political capitals have in the past exercised but too much influence. Provincialisms have not been allowed fair play. They have but too frequently been kept out of the literary language, simply because they have been provincialisms. A better course than this would be to absorb into the cultivated dialect all that is of value in the several kindred dialects. Such absorption would be more real enrichment of a language than thoughtless borrowing under the bias of learning. If this principle were admitted and acted upon, provincial peculiarities would, generally speaking, have a chance of being incorporated into the literary language, in proportion to the mental activity of the people who speak such dialects. Local centres of culture would thus have their due share of influence on the literary language of a country. (Ganguli 1990: 27-28)

বাংলার ঔপভাষিক বৈচিত্র্য এবং সে বৈচিত্র্যকে মানবাংলা নির্ধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মত শ্যামাচরণের প্রায় সমরূপ। ১৩১১ সালের ১৭ চৈত্র তারিখে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' নামে যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন, তাতে উপভাষাগুলোর সমন্বয়ে বাংলার মানরূপ নির্ধারণের প্রস্তাব ছিল (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/২: ৭০৬)। তাঁর মতে, বাংলা ভাষার 'যথার্থ' ব্যাকরণ কেবল তখনি সম্ভব হবে, যখন 'বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে' তার সবগুলোর তুলনামূলক ব্যাকরণ রচিত হবে। বোঝা যায়, উপভাষাচর্চা তাঁর কাছে মানভাষা থেকে বিযুক্ত আলাদা কোনো চর্চা নয়; বরং উপভাষাগুলোর ন্যায্য হিস্যাই কেবল মানভাষার সর্বজনীনতার দাবিকে ন্যায্যতা দিতে পারে। পরিমাণে কম হলেও রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখায় উপভাষার এ ধরনের ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, *বাংলা শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থের 'পঁহু' প্রবন্ধে তিনি শব্দের অর্থ-নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'আমার কোনো শ্রদ্ধেয় পূর্ববঙ্গবাসী বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে, তাঁহাদের দেশে 'নিছেপুঁছে' শব্দের চলন আছে। এবং নববধূ ঘরে আসিলে তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে 'নিছিয়া' লওয়া হয়। অতএব এরূপ চলিত প্রয়োগ থাকিলে নিছনি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৭৬)।

অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের কাছে 'মানভাষা' অনমনীয়-অপরিবর্তনীয় কোনো ব্যাপারও নয়; বরং ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষার বদলের প্রেক্ষাপটে নিয়ত পরিবর্তনশীল। কোনো বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ রীতি, শব্দ বা

উচ্চারণভঙ্গি ভদ্র জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় প্রচলিত হয়ে উঠলে তাকে অঙ্গীভূত করে নেওয়াই মানভাষাকে প্রাসঙ্গিক রাখার উপায়। রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়েছেন কলকাতার ভদ্রলোকগোষ্ঠীর ভাষার ওপর পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব থেকে:

> এই ভাষায় ক্রমে পূর্ববঙ্গেরও হাত পড়তে আরম্ভ হয়েছে, তার একটা প্রমাণ এই যে আমরা দক্ষিণের লোকেরা 'সাথে' শব্দটা কবিতায় ছাড়া সাহিত্যে বা মুখের আলাপে ব্যবহার করি নে। আমরা বলি 'সঙ্গে'। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কানে যেমনি লাগুক, 'সঙ্গে' কথাটা 'সাথে'র কাছে হার মেনে আসছে। আরো একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। মাত্র চারজন লোক: এমন প্রয়োগ আজকাল প্রায়ই শুনি। বরাবর বলে এসেছি 'চারজনমাত্র লোক', অর্থাৎ চারজনের দ্বারা মাত্রা-পাওয়া, পরিমিত-হওয়া লোক। অবশ্য মাত্র শব্দ গোড়ায় বসলে কথাটাতে জোর দেবার সুবিধে হয়। ভাষা সব সময়ে যুক্তি মানে না। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১০: ৬১৬)

কোনো বহিরাগত বা আরোপিত 'যুক্তি' নয়, 'চলে যাওয়া'ই রবীন্দ্রনাথের মানভাষাতত্ত্বের মূলকথা।

৮.২ বাংলা ব্যাকরণ

'নবব্যাকরণবিদ'দের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছিলেন। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইয়ের প্রবন্ধগুলো নতুন প্রণালির ব্যাকরণেরই প্রস্তাব, যদিও তার সজ্জা ব্যাকরণগ্রন্থের মতো নয়। বাংলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ তিনি লিখিয়েছিলেন নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীকে দিয়ে। এ বইটি তিনি নিজে আদ্যোপান্ত সম্পাদনাও করেছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি পরে আর পাওয়া যায়নি (নির্মল ২০০০: ২৯৮; রফিকুল ও পবিত্র ২০১১/২: ৩৫)। ফলে ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও পদ্ধতির হদিশ সরাসরি জানার সুযোগ নষ্ট হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কোন পথে হওয়া দরকার, অন্তত এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কী চিন্তা করতেন, তার বিশদ পরিচয় আছে পূর্বোক্ত গ্রন্থে; আর চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত *বাংলাভাষা-পরিচয়ে*। একে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন 'চলতি' বাংলার প্রথম ব্যাকরণ হিসাবে: 'চলতি বাংলা চলতি বলেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়। ... এখন থেকে বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই। এই গ্রন্থে রইল তার প্রথম চেষ্টা' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৫৯৬)। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এটি এ ধরনের শেষ চেষ্টাও বটে।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রচনার চেষ্টা পরে আর দেখা না গেলেও তাঁর আকাঙ্ক্ষা – বিশেষত খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার আকাঙ্ক্ষা – বহু বৈয়াকরণকে প্রভাবিত করেছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* প্রকাশ করেন ১৯৩৫ সালে। ভূমিকায় তিনি রবীন্দ্রনাথসহ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত অন্য বৈয়াকরণদের স্মরণ করেছেন। বলেছেন, 'ইহাতে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আছে, তেমনই সাধু বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত উপাদানেরও ব্যাকরণ আছে' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৫: ১৪৮)। সংস্কৃত উপাদানের ক্ষেত্রেও তিনি খানিকটা ভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছেন। ইৎ-সহ প্রত্যয় নির্দেশের যে রেওয়াজ পূর্ববর্তী ব্যাকরণগুলোতে দেখা যায়, তিনি তা বাদ দিয়ে 'ইৎ-শেষে যে প্রত্যয় থাকে' কেবল তা-ই উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁর ব্যাকরণে খল্, খ, ঘঞ্, অল্, অচ্, অট্ ইত্যাদি সমস্ত প্রত্যয়ই 'অ' প্রত্যয় হিসাবে নির্দেশিত হয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তও এর অনুকূল: 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিক্ষাদানকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রত্যয়ের সংজ্ঞা পরিত্যাগ করা উচিত' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৫: ১৪৮)। উল্লেখ্য, বাংলা প্রত্যয়গুলোর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ তিনি নিয়েছেন প্রধানত রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধ থেকে। বস্তুত,

'বাংলা ব্যাকরণ যে একটি পৃথক ব্যাকরণ এই বোধের পরিচয় গ্রন্থটির প্রায় সর্বত্র প্রত্যক্ষ করা যায়' (রফিকুল ও পবিত্র ২০১১/২: ২৯)। তা সত্ত্বেও এই ব্যাকরণে নতুন বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নের কোনো সাফল্য দেখা যায় না। তিনি 'সংস্কৃত ব্যাকরণকে এবং তাঁর পূর্ববর্তী প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতাদেরই অনুসরণ করেছেন' (হুমায়ুন ১৯৮৮: ১২২)।

মুহম্মদ এনামুল হকের ব্যাকরণেও 'নতুন বাংলা ব্যাকরণ' রচনার দাবি আছে। 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে তিনি লিখেছেন:

> বহুদিন হইতে একখানা খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ লেখার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। নানা কারণে তাহা এতদিন সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। এখনও যে সম্ভবপর হইয়াছে, তেমন নহে; তবে তাহার সূত্রপাত হইল। এই ব্যাকরণখানির অন্য-কিছু না দেখিয়া শুধু সূচিপত্রটুকু দেখিলেই, উক্তিটির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে।
>
> এই ব্যাকরণটিকে বাজারে প্রচলিত যে কোনো বাংলা-ব্যাকরণ হইতে নানা বিষয়ে পৃথক ও নূতন বলিয়া মনে হইবে। ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠ্যতালিকার মধ্যে থাকিয়া, সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্বগ্রাসী কবল হইতে বাংলা ব্যাকরণের মুক্তির যথাসাধ্য চেষ্টা এই পার্থক্য ও নূতনত্বের জন্য একমাত্র দায়ী। ... মোটের উপর ইহার দুই-তৃতীয়াংশ খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ। ইহাই এই ব্যাকরণের মূল বৈশিষ্ট্য। (মুহম্মদ এনামুল ১৯৯৩: ৩০৩)

সন্ধির ক্ষেত্রে এবং প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে বাংলা অংশ আর সংস্কৃত অংশ আলাদা করা এবং বাংলা অংশ যথাসম্ভব বিস্তারিত করে লেখা থেকে মনে হয় এনামুল হক 'বাংলা ব্যাকরণ' সম্পর্কে অন্য অনেকের চেয়ে বেশি সতর্ক ছিলেন। অন্তত তিনটি পরিচ্ছেদ – বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত, দ্বিরুক্তি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ – রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণচর্চার কথা মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য এ পর্যন্তই। 'প্রাকৃত বাংলা'র কোনো অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের চেষ্টা এই ব্যাকরণে দেখা যায় না। বরং ব্যাকরণিক বিভিন্ন উদাহরণে পাওয়া যায় পুরোনো ব্যাকরণের একরাশ শব্দ ও প্রয়োগ, যেগুলো বাংলার সঙ্গে মোটেই সম্পর্কিত নয়। সন্ধি, প্রত্যয় ও সমাসের ক্ষেত্রে এরকম উদাহরণ বিস্তর। রবীন্দ্রনাথ-কথিত তৎসম ব্যাকরণ ও প্রাকৃত ব্যাকরণ – এই দুইয়ের সমন্বয় সাধনের একটা দুর্বল চেষ্টা এ ব্যাকরণে এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ব্যাকরণে লক্ষ করা যায়।

সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচ থেকে বেরিয়ে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার কোনো ব্যাপক চেষ্টা বিশ শতকে দেখা যায়নি।[৫] বাংলা একাডেমীর *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থের মুখবন্ধে এর কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে: 'সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতসমাজ এবং তাঁদের অনুসারী বিদগ্ধজনের একটি রক্ষণশীল অংশ সংস্কৃতানুসারিতা থেকে মুক্ত হতে না পারায় কথ্য বা প্রমিত চলিত বাংলা ভাষার একটি আদর্শ ব্যাকরণ-গ্রন্থ গোটা বিশ শতকেও তৈরি করা সম্ভব হয়নি' (রফিকুল ও পবিত্র ২০১১/১: সাত)। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ গ্রন্থের সম্পাদকীয় দাবি: 'প্রমিত বাংলা ভাষার এই ব্যাকরণ বাঙালির শতাধিক বৎসরের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন'। তাঁদের এ দাবির পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ এ ব্যাকরণে পাওয়া যায়। পুরোনো বাংলা ব্যাকরণের কাঠামো এতে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়েছে। প্রথম পর্বের শিরোনাম 'ধ্বনিবিজ্ঞান' আর দ্বিতীয় পর্বের শিরোনাম 'প্রমিত বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব' এবং এই দুই পর্বের উপশিরোনামগুলো দেখলে বোঝা যায়, প্রধানত পশ্চিমা ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতি অনুযায়ী শতাধিক বছর ধরে বাংলা ভাষার যেসব ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ হয়েছে, সেগুলোই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে – সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ব ও তদনুযায়ী বিশ্লেষিত বাংলা বর্ণপরিচয় নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটেছে তৃতীয় পর্বের 'প্রমিত বাংলা ভাষার

রূপতত্ত্ব' অংশে। পুরোনো ব্যাকরণগ্রন্থগুলোতে, প্রধানত সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে, খুব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হত বাংলা ভাষার শব্দস্তর, যদিও বাংলা শব্দের বিশিষ্টতাগুলো তাতে ঠাঁই পেত না। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে*ও বাংলা রূপতত্ত্বের বিশদ বর্ণনা আছে। কিন্তু তাতে সমাস-উপসর্গ-সন্ধি-প্রত্যয় পুরোনো রূপে হাজির হয়নি; এগুলোর প্রাধান্যও রক্ষিত হয়নি। চতুর্থ পর্বে আলোচিত হয়েছে 'প্রমিত বাংলা ভাষার বাক্যতত্ত্ব', আর পঞ্চম পর্বে 'প্রমিত বাংলা ভাষার বাগর্থতত্ত্ব ও ব্যঞ্জনাতত্ত্ব'। পুরোনো ব্যাকরণগুলোতে এ দুটির খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেত। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে* যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অবলম্বিত হয়েছে মূলত আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতি।

রবীন্দ্রনাথসহ 'নবব্যাকরণবিদ'দের কয়েকটি আকাঙ্ক্ষা এ ব্যাকরণেই প্রথমবারের মতো পরীক্ষিত হয়েছে। একটি হল, বাংলা ভাষা ব্যাখ্যার জন্য অন্য ব্যাকরণ, বিশেষত সংস্কৃত ব্যাকরণকে, ভিত্তি না করা। বাংলা ব্যাকরণের নিজস্ব কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় ও আধুনিক পশ্চিমা ভাষাবিজ্ঞান এতে ব্যবহৃত হয়েছে সহায়ক ভূমিকায়। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার কথ্য মানরূপই এতে বিশ্লেষিত হয়েছে – অচলিত ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যরূপের দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। তৃতীয়ত, বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে ব্যবহৃত হয়েছে বেশ কিছু নতুন – অন্তত পুরোনো ব্যাকরণগুলোর সাপেক্ষে – পরিভাষা। পুরোনো পরিভাষাগুলোও সংজ্ঞার্থের দিক থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। একই কারণে বদলে গেছে গৌণ-মুখ্যের ভেদ। যেমন, 'কারক ও বিভক্তি' এবং 'সমাস' এখানে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব পেয়েছে। পারিভাষিক শব্দের এই পরিবর্তনের একটা ভালো উদাহরণ পাওয়া যায় 'শব্দভান্ডার' অধ্যায়ে। এখানে বহুপ্রচলিত 'তৎসম' শব্দটি পরিহার করা হয়েছে দুই কারণে (রফিকুল ও পবিত্র ২০১১/১: ৩২০): এক. শব্দগুলো বানানরূপে মোটামুটি সংস্কৃতের মতো হলেও উচ্চারণ-রূপে নয়; দুই. সংস্কৃত থেকে আসা এ ধরনের শব্দকে 'তৎসম' বললে অন্য ভাষার শব্দকেও একই যুক্তিতে তৎসম বলতে হয়। এ অবস্থান সর্বত্রই রক্ষিত হয়েছে।

অন্যদিকে, 'সম্পাদকীয় ভূমিকা'য় যেমনটা বলা হয়েছে, 'প্রথম প্রয়াসে'র নানা দ্বিধা আর অপূর্ণতাও ব্যাকরণটিতে দৃষ্টিগোচর হয়। এ দ্বিধার বড় দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় খণ্ড। এ খণ্ডে তত্ত্বাকারে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে, তার অধিকাংশই প্রথম খণ্ডের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোতে সংযোজিত হতে পারত। হয়নি যে তার কারণ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারা। এ সমস্যাটা বাহ্যিক এবং পরের সংস্করণগুলোতে তার সমাধান সম্ভব।[৬] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাকরণচিন্তার সারসত্য অবলম্বনে এ ব্যাকরণের আরো দুটি তত্ত্বীয় সংকট চিহ্নিত করা যায়, যেগুলো সহজে সমাধানযোগ্য নয়: এক. কথ্য ও লেখ্য 'মানবাংলা'কে আলাদা করা; দুই. বাংলা ভাষার 'বাংলা অংশ' ও 'সংস্কৃত অংশে'র আলাদা ব্যাকরণ কল্পনা করা। প্রথমটি সম্পর্কে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ কথ্য ভাষার ভিত্তিতেই তাঁর যাবতীয় আলোচনা করেছেন; কিন্তু লেখ্য-বাংলার ব্যাকরণ আলাদা হওয়া দরকার – এমন কোনো ধারণা তাঁর বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায় না। শুধু লেখ্য-বাংলা নয়, সাহিত্যিক বাংলাকেও তিনি যথাসম্ভব কথ্যের অনুগামী দেখতে চেয়েছেন। তাই অন্তত 'মান বাংলা'র ক্ষেত্রে পৃথক ব্যাকরণের প্রশ্ন আসেনি।

বাংলা ভাষার 'বাংলা অংশ' ও 'সংস্কৃত অংশে'র আলাদা ব্যাকরণের কথা প্রথম বিস্তারিত বলেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রস্তাবে এ ধরনের দুই-ধারা ব্যাকরণের কোনো কথা ছিল না। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর বিখ্যাত 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'সংস্কৃতপন্থী' ও 'বাংলাপন্থী' দুই পক্ষের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে। তাই তাঁকে সংস্কৃতপন্থীদের এই নিশ্চয়তা দিতে হয়েছিল যে, বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দাদির

ক্ষেত্রে সংস্কৃতের নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকবে। সে নিয়ম বাঙালিদের তৈরি করার দরকার নেই। কারণ, সংস্কৃত ব্যাকরণেই তা লভ্য। কিন্তু 'খাঁটি বাংলা' অংশের ব্যাকরণ এখনো রচিত হয়নি। এখন সে অংশের ব্যাকরণ তৈরি করাই আশু কর্তব্য। তাঁর ভাষায়:

> এখন যাহাকে বাঙ্গলা ব্যাকরণ বলা হয়, উহা বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে। বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের নিকট যাহা পাইয়াছে, সংস্কৃতের নিকট যে অংশ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেই অংশের ব্যাকরণ। ... সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার জন্য আমাদিগকে কষ্ট করিতে হইবে না। পাণিনি তাহা করিয়া গিয়াছেন; ... বাঙ্গলার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা নহে, যে অংশ খাঁটি বাঙ্গলা, সে অংশের ব্যাকরণ নাই। সেই অংশের ব্যাকরণ এখন গড়িতে হইবে; খাঁটি বাঙ্গলার আলোচনা করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। (রামেন্দ্র ১৩৫৬: ১২২-২৩)

'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পড়লে এবং পরিপ্রেক্ষিতের কথা মনে রাখলে বোঝা যায়, প্রতাপশালী সংস্কৃতপন্থীদের কাছে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার দাবি গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর এ ধরনের প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু একই সঙ্গে এ-ও সত্য, তিনি চাইতেন, বাংলা ভাষার সংস্কৃত অংশের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় ও ব্যবহার সংস্কৃত বিধি অনুযায়ী হোক। ফলে বাংলা ব্যাকরণের দুই আলাদা অংশ তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামোতেই স্বীকৃত। বাংলা ভাষাপ্রশ্নে সংস্কৃতপন্থীদের সঙ্গে জীবনভর রবীন্দ্রনাথকেও লড়তে হয়েছিল। তিনিও অনেকবার এই সরল সমাধানের কথা বলেছেন। সংস্কৃত থেকে ধার করা অংশ অনাহত রেখে খাঁটি বাংলা অংশের ব্যাকরণ লেখার কথা তাঁর লেখায় বারবার পাওয়া যায়। 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: 'বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ কিরূপ নিয়মে ব্যবহার করা যাইবে, তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে যত ইচ্ছা লড়াই করুন, বাংলা বৈয়াকরণের সে-যুদ্ধে রক্তপাত করিবার অবকাশ নাই' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১৭)। জগৎমোহন সেনকে এক পত্রে লিখেছেন: 'বাংলার যে অংশটা সংস্কৃতের অনুবর্তী, যেমন সন্ধি তদ্ধিতপ্রত্যয় সমাস, সেইগুলোই গোড়া থেকে জানা চাই। বাংলায় তৎসম শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার কিছুপরিমাণ সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে সম্ভবপর হয়' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৫৫)। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের ব্যাকরণের প্রতি তাঁর পক্ষপাত প্রকাশিত হয়েছে এভাবে: 'শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ভাষার বাংলা ও সংস্কৃত দুই অংশকেই খাতির দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; ইহাতে তিনি পণ্ডিতসমাজে সুস্থ শরীরে শান্তি রক্ষা করিয়া আছেন কি না সে সংবাদ পাই নাই'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১২৩)

এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কি না বলা মুশকিল। কিন্তু উদ্ধৃত মন্তব্যগুলো থেকে বাংলা ব্যাকরণের বাংলা ও সংস্কৃত অংশের আলাদা নিয়মের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। একই সঙ্গে কোন পরিস্থিতিতে কী কারণে তিনি এসব কথা বলেছেন, তারও ইঙ্গিত মেলে।[৭] বাংলা ব্যাকরণের সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণকে বাংলা ব্যাকরণ হিসাবে চালানোর বাস্তবতায় এ প্রস্তাবে যে আপোসরফার সূত্র পাওয়া যায়, পরবর্তী বৈয়াকরণেরা তাতে সায় দিয়েছিলেন বলেই মনে হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং মুহম্মদ এনামুল হকের ব্যাকরণের কথা আগেই বলা হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং জ্যোতিভূষণ চাকীর ব্যাকরণে এ পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়েছে। যদিও এ চারটি ব্যাকরণেই কথিত 'বাংলা অংশ' পরিমাণে খুব সামান্য, আর কাঠামো ও

তত্ত্বায়নের দিক থেকে পুরোপুরি উপেক্ষিত। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে* এই দুই সমস্যার একটা সুরাহা হয়েছে। কিন্তু এখানেও 'সংস্কৃত অংশ' আলাদা রাখার প্রস্তাব থেকে গেছে। 'রূপতত্ত্বের ভূমিকা' অংশে সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন:

> সংস্কৃত শব্দের নির্মাণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অংশ, যেমন অন্য ভাষার শব্দের নির্মাণ সেই সেই ভাষার ব্যাকরণের অংশ। স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের একটা লক্ষ্য থাকে লিখিত ভাষা, বিশেষত তার বানান-পদ্ধতি শেখানো, ফলে তাতে সংস্কৃত শব্দের সন্ধি-সমাস প্রকরণের বিস্তারিত পাঠ থাকে। এই ব্যাকরণের লক্ষ্য প্রমিত বাংলার ব্যাকরণ, ফলে এ ব্যাকরণে বাংলা শব্দনির্মাণই বিশেষভাবে অনুধাবন করা হবে, সংস্কৃত বা অন্যান্য ভাষার শব্দনির্মাণ নয়। সে সব ভাষার শব্দনির্মাণের জন্য প্রথাগত নানা ব্যাকরণ দেখা যেতে পারে, যেমন সংস্কৃত শব্দনির্মাণ প্রণালী দেখার জন্য পরিচিত নানা সংস্কৃত ব্যাকরণ ছাড়াও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (১৯৩৯ : ১২০-২৩৬)-এর পাঠ দেখা যেতে পারে। (রফিকুল ও পবিত্র ২০১১/১: ১৬০)

এ সিদ্ধান্তে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামতের প্রতিফলন আছে। কিন্তু পদ্ধতিটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার জন্য যথেষ্ট অনুকূল নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় উদ্ধৃত মন্তব্যেই – বাংলা ভাষার একটি অংশের বিশ্লেষণ দেখার জন্য অন্য ব্যাকরণের বরাত দিতে হয়েছে। ওই অংশের শব্দ হিসাবে উল্লেখিত 'ব্যাকরণ', 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়', 'ঐশ্বরিক', 'পর্বতসানুদেশ', 'পাণ্ডব' ও 'গ্রামান্তর' প্রভৃতি কথ্য মানবাংলায় নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে। কাজেই এ ধরনের শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ব্যাকরণসূত্র প্রমিত বাংলা ব্যাকরণের বাইরে থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ধরনের সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষা-বিষয়ক রচনায় এমন বহু মন্তব্য-বিশ্লেষণ-সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, যা এ ধরনের দ্বি-কক্ষ ব্যাকরণের বিরোধী। অন্তত ভবিষ্যতে দ্বি-ধারা ব্যাকরণ এক ধারায় উপনীত হবে – এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

এ সমস্যার মূলে আছে উনিশ শতকের ভাষাদর্শ, যেখানে বাংলার সংস্কৃত ও অ-সংস্কৃত উপাদানগুলোকে আলাদা মূল্য দেওয়া হয়েছে। এ রীতি অনুযায়ী ইংরেজি ব্যাকরণে 'ফরাসি অংশ' এবং 'লাতিন অংশ' থাকার কথা। কিন্তু এ ধরনের বিভাজন প্রচলিত ইংরেজি ব্যাকরণগুলোতে দেখা যায় না। ফরাসি ও লাতিন উৎসের শব্দগুলোর কিছু ব্যাকরণিক ও বানানগত বৈশিষ্ট্যসহ রচিত হয় ইংরেজি ব্যাকরণ। বাংলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধের এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যে: 'যে সংস্কৃত শব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, তাহা সংস্কৃতেই আছে, যাহা বাংলা হইয়া গেছে, তাহা বাংলাই হইয়াছে – এই সহজ কথাটা মনে রাখা শক্ত নহে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১৪)। বাংলাভাষীদের ক্ষেত্রে 'সহজ কথাটা' শক্তই থেকে গেছে মূলত বানানরূপের কারণে। এজন্য রবীন্দ্রনাথ বারবার বানানরূপ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। দেবপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত প্রথম পত্রে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> বাংলা ভাষার উচ্চারণে তৎসম শব্দের মর্যাদা রক্ষা হয় বলে আমি জানি নে। কেবলমাত্র অক্ষর বিন্যাসেই তৎসমতার ভান করা হয় মাত্র, সেটা সহজ কাজ। বাংলা লেখায় অক্ষর বানানের নির্জীব বাহন – কিন্তু রসনা নির্জীব নয় – অক্ষর যাই লিখুক, রসনা আপন সংস্কারমতই উচ্চারণ করে চলে। সেদিকে লক্ষ করে দেখলে বলতেই হবে যে, অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি, সেই সকল শব্দের প্রায় ষোল আনাই অপভ্রংশ। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৫)

এ ধরনের মন্তব্য রবীন্দ্রনাথে বিস্ময়করভাবে বিপুল (৮.৩ দ্রষ্টব্য)।[৮] তাতে বোঝা যায়, সংস্কৃতপন্থীদের বিরোধ এড়ানোর জন্য 'সংস্কৃত' অংশের জন্য সংস্কৃত নিয়মের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু আদতে তিনি বাংলা ভাষায় 'খাঁটি' সংস্কৃতের উপস্থিতি বিষয়েই সন্দিহান ছিলেন। এ সন্দেহ ভাষাবিজ্ঞানসম্মত। শব্দঋণের প্রাথমিক সূত্র এই যে, ঋণী ভাষার ধ্বনি-রূপতাত্ত্বিক সূত্র মেনেই অন্য ভাষার কোনো উপাদান ভাষায় প্রবেশাধিকার পায়। ঔপনিবেশিক ভাষাদর্শে সংস্কৃতের বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছিল বলেই সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে এ প্রাথমিক সূত্রের প্রতি নজর পড়েনি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর ভাষাচর্চায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। স্ত্রীলিঙ্গ-প্রত্যয় ব্যবহার প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে সে সতর্কতার পরিচয় মেলে:

> এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি। সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘ ঈকার বা ন'এ দীর্ঘ ঈকার মানবার যোগ্য নয়। খাঁটি বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদসূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার দ্বারা তার ব্যভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এই-সকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ইকারকে মানব। 'ইংরেজি' বা 'মুসলমানি' শব্দে যে ই-প্রত্যয় আছে সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই অসংকোচ হ্রস্ব ইকার ব্যবহার করা উচিত। ওটাকে ইন্‌-ভাগান্ত গণ্য করলে কোন্ দিন কোনো পণ্ডিতাভিমানী লেখক 'মুসলমানিনী' কায়দা বা 'ইংরেজিনী' রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন এমন আশঙ্কা রয়ে যায়। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৬৩৬)

এখানে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ব্যাকরণ রচনার একটি ঐতিহাসিক সংকটের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন – প্রথমে বানানরূপে সংস্কৃতের অনুসরণ, পরে সেই বানানরূপের বরাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের আমদানি। এ সংকট মোচনের জন্যই তিনি বানানরূপ নির্ধারণের ব্যাপারে বারবার সতর্ক করেছেন।

যে সকল শব্দ অন্য ভাষার নিয়মে সাধিত হয়ে পরে বাংলায় এসেছে, বাংলা ব্যাকরণে সেগুলোর অন্তর্ভুক্তির উপায় ও ধরন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া যায়। 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে বাংলা প্রত্যয় শনাক্ত করার উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাদের সংস্কৃত বলিতে হইবে, এ কথা মানি না। সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেইজন্য তাহা সংস্কৃত পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত) শব্দ কোনো অবস্থাতেই দাগিন হয় না। ... বাংলায় সংস্কৃতেতর শব্দেও যে সকল প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়, আমরা তাহাকে বাংলাপ্রত্যয় বলিয়া গণ্য করিব। ... হিন্দি পার্সি প্রভৃতি হইতে বাংলায় যে-সকল প্রত্যয়ের আমদানি হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেও আমার ওই একই বক্তব্য। সই প্রত্যয় সম্ভবত হিন্দি বা পার্সি; কিন্তু বাংলা শব্দের সহিত তাহা মিশ্রিত হইয়া ট্যাকসই প্রমাণসই মানানসই প্রভৃতি শব্দ সৃজন করিয়াছে। ... অর্থাৎ যে-সকল প্রত্যয় সংস্কৃত অথবা বিদেশীয় শব্দসহযোগে বাংলায় আসিয়াছে, বাংলার সহিত কোনো প্রকার আদানপ্রদান করিতেছে না, তাহাকে আমরা বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়রূপে স্বীকার করিতে পারি না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৯০-৯১)

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে ব্যুৎপন্ন পূর্বোক্ত শব্দগুলোর মধ্যে 'ঐশ্বরিক', 'গ্রামান্তর' প্রভৃতি শব্দ এ সূত্রানুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায়। 'ইক' প্রত্যয়যোগে বহু বাংলা শব্দের বিশেষণরূপ নির্মিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে মূল শব্দের

আদিস্বরের বৃদ্ধি ঘটে। ফলে এই নিয়মকে বাংলা ব্যাকরণের সূত্র হিসাবে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। সংস্কৃত সূত্রের বরাত ছাড়াই তা সম্ভব। 'গ্রামান্তর' শব্দের 'অন্তর' অংশ ব্যবহৃত হয় বহু প্রচলিত বাংলা শব্দে। তাই সমাসেই হোক বা সাদৃশ্যসূত্রেই হোক, এ ধরনের শব্দের গড়ন বাংলা ব্যাকরণেরই আলোচ্য। 'ব্যাকরণ' বা 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়'র মতো যে সকল শব্দের গড়ন কেবল সেই শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য বাংলা শব্দ বা সমরূপ নতুন শব্দের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না, সেগুলো বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সেগুলোর জন্য মূলভাষার ব্যাকরণ দেখতে হবে, অন্য কোনো বাংলা ব্যাকরণ নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে এই মতই দিয়েছিলেন (হরপ্রসাদ ২০০০/বিঃ ৫৯৮)। ইংরেজি ভাষায় এ রীতি বিপুলভাবে অনুসৃত হয়। এ ভাষায় প্রচুর জ্ঞানজাগতিক শব্দ গৃহীত হয়েছে গ্রিক ও লাতিন থেকে। সেসব শব্দের ব্যাকরণ ইংরেজি ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। গ্রিক-লাতিনের বরাতেই এ ধরনের শব্দের অর্থ নির্ণীত হয়ে থাকে।

কথিত 'তৎসম' শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার নির্ধারণের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ চলতি ব্যবহারকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।[৯] 'প্রদোষ' শব্দের ব্যবহার নিয়ে তাঁর যুক্তিতর্ক ও সিদ্ধান্ত এর ভালো উদাহরণ। *প্রবাসী* পত্রিকার 'পারস্য যাত্রা' নিবন্ধে 'রাত্রির অল্পান্ধকার পরিশেষ' বোঝাতে 'প্রদোষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। তাতে সংস্কৃত অর্থ রক্ষিত না হওয়ায় তাঁর নিন্দা হয়। এ প্রসঙ্গে সুশীলচন্দ্র মিত্রকে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন:

> প্রয়োজনের তাগিদে শব্দের অর্থবিস্তৃতি ভাষায় ঘটে থাকে। সংস্কৃত অভিধানে যে শব্দের যে অর্থ, বাংলা ভাষায় সর্বত্র তা বজায় থাকে নি। সেই ওজর করেই আলোচিত লেখাটিকে যখন গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করব তখন প্রদোষ কথাটার পরিবর্তন করব না এই রকম স্থির করেচি। সম্ভবত এই অর্থে এই শব্দটার প্রয়োগ আমার রচনায় অন্যত্রও আছে এবং ভাবীকালেও থাকবে। রাত্রির আরম্ভে ও শেষে যে আলো-অন্ধকারের সংগম, তার রূপটি একই, এবং একই নামে তাকে ডাকবার দরকার ঘটে। সংস্কৃত ভাষায় সন্ধ্যা শব্দের দুই অর্থই আছে কিন্তু বাংলায় তা চলবে না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২০৩)

পরে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে তিনি শব্দটির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন: 'দোষ শব্দের অর্থ রাত্রি – প্র উপসর্গটা সামনের দিকে তর্জনী তোলে – অতএব ওই শব্দটাকে বিশ্লেষণ করে দুই অর্থই পাওয়া যেতে পারে – অর্থাৎ যে সময়টার সম্মুখে রাত্রি, অথবা রাত্রির সম্মুখে যে সময়। রাত্রির প্রবণতা যে দিকে'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২০৫)

বাংলা ভাষার রূপ, শুদ্ধতা ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার রাবীন্দ্রিক-পদ্ধতির আদর্শ উদাহরণ 'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক' নিবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যবহৃত 'গা'ব' শব্দটিকে অশুদ্ধ প্রয়োগরূপে দেখিয়েছিলেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। বিজনবাবুর সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বাংলা শব্দতত্ত্বের একটি নিয়মের উল্লেখ করে বললেন, 'বাংলা গাওয়া শব্দটার মূলধাতু 'গাহ্' – যে ইকার এই হ ধ্বনির সঙ্গে মিলিত, তার বৈধব্য ঘটলেও বিনাশ হয় না, হ লোপ হলেও ই টিঁকে থাকে'। রবীন্দ্রনাথ পরে আলাপ করেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর এবং পণ্ডিত হরিচরণের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, তাঁদের কাছে এই প্রয়োগ কটু ঠেকছে না, বরং তাঁরাও এরকম ব্যবহার করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাকে চিন্তা করতে হল। শব্দের ব্যবহারটা কী, আগে স্থির হলে তবে তার নিয়ম পরে স্থির হতে পারে। বলা বাহুল্য, বাংলার যে ভূভাগের ভাষা প্রাকৃত বাংলা বলে আজকালকার সাহিত্যে চলেছে সেইখানেই অনুসন্ধান করতে হবে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৪৮)। অনুসন্ধান তিনি করেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৪৮-৪৯)। প্রথমে হ ধ্বনিযুক্ত ক্রিয়াপদের তালিকা তৈরি করেছেন – কহ্, গাহ্, চাহ্, নাহ্, সহ্, বহ্, বাহ্, রহ্, দোহ্। দেখা যায় অধিকাংশ স্থলে

এই-সকল ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎ কারকে বিকল্পে ই থাকে এবং লোপ পায়। 'কথা কইবে'ও হয় 'কথা ক'বে'ও হয়। ভিক্ষে চা'ব না বললেও হয়, ভিক্ষে চাইব না বললেও হয়। কেবল বহা ও বাহা ক্রিয়াপদে 'ব'বে' 'বা'বে' ব্যবহার শোনা যায় না। তার কারণ পাশাপাশি দুটো 'ব'-কে ওষ্ঠ পরিত্যাগ করতে চায়।

রবীন্দ্রনাথের এসব মত, সিদ্ধান্ত, বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিকভাবে পাঠ করলে বোঝা যায়, তাঁর কাঙ্ক্ষিত ব্যাকরণে কথ্য-লেখ্যের ফারাক নেই, 'বাংলা অংশ' ও 'সংস্কৃত অংশে'র আলাদা ভাগও নেই। বরং বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসনই তাঁর মূল উদ্দিষ্ট।

আবার মান বাংলার মতো ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক[১০] আর সমন্বয়ধর্মী প্রস্তাব পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের রচনায়। *আত্মশক্তি* গ্রন্থের 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে তিনি এই 'বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ' রচনার প্রস্তাব দিয়েছেন:

> বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/২: ৭০৬)[১১]

আগের বছর 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধেও তিনি একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

> যে-বাংলা ঘরে ঘরে মুখে মুখে দিনে দিনে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, বাংলার সমস্ত প্রদেশেই সেই ভাষার অনেকটা ঐক্য থাকিলেও সাম্য নাই। থাকিতেও পারে না। সকল দেশেরই কথিত ভাষায় প্রাদেশিক ব্যবহারের ভেদ আছে। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয়, তবে বাংলা ভাষা বাঙালির কাছে ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে। তাহা হইলে বাংলা ভাষার কারক ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম অনেকটা সহজে ধরা পড়ে।
>
> কিন্তু তাহার পূর্বে উপকরণ সংগ্রহ করা চাই। নানা দিক হইতে সাহায্য পাইলে তবেই ক্রমে ভাবী ব্যাকরণকারের পথ সুগম হইয়া উঠিবে। ... ঐক্য নির্ণয় করিয়া বাংলা ভাষার নিত্য প্রকৃতিটি বাহির করিতে হইলে প্রথমে তাহার ভিন্নতা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১২৩)[১২]

রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্যাকরণ রচনার যে পদ্ধতি প্রস্তাব করেছেন তা তাঁর সামগ্রিক ভাষাচিন্তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এ ব্যাকরণ আরোহী, গণতান্ত্রিক ও স্বনির্ভর। তা গড়ে উঠবে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে; উপাত্ত সংকলিত হবে সব উপভাষা থেকে; আর বিশ্লেষিত হবে আরোপিত কোনো ছাঁচে নয়, বরং আভ্যন্তর বৈশিষ্ট্যের তুলনাসূত্রে। এভাবেই কেবল মানভাষা আর মানভাষার ব্যাকরণ পুরো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাষার পাঠ অন্য দশ উপাদান থেকে আলাদা নয়। নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো ভাষার সঙ্গে মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্বের ঐক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন:

> Language as communication and as culture are … products of each other. Communication creates culture: culture is a means of communication. Language carries culture, and culture carries, particularly through orature and literature, the entire body of values by which we come to perceive ourselves and our place in the world. How people perceive themselves affects how they look at their culture, at their politics and at the social production of wealth,

> at their entire relationship to nature and to other beings. Language is thus inseparable from ourselves as a community of human beings with a specific form and character, a specific history, a specific relationship to the world. (Thiong'o 2007: 15-16)

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে এ ধরনের সামগ্রিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। ওই 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধেই তিনি ভাষারহস্যকে স্থান ও কালের বিপুল বিস্তৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন: 'আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/২: ৭০৫)। এ বক্তৃতাটি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অনুষ্ঠানে। তিনি চেয়েছেন এই পরিষদের কাজে ছাত্রদের সম্পৃক্ত করতে। সে কাজ শুধু ব্যাকরণ তৈরির কাজ নয়। দেশের সার্বিক পরিচয় তৈরির কাজ। ব্যাকরণ রচনার বিখ্যাত প্রস্তাব সেই কাজের অংশ মাত্র। সে ব্যাকরণ তৈরির মূলপ্রেরণা কিন্তু ভাষার পাঠ নয়, বরং দেশের সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বড় অর্থে এক কেজো দিকের সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছেন। শুধু ব্যাকরণ রচনার আরোহী প্রস্তাবে সে কাজের শেষ নয়; পুরো ব্যাপারটাকে তিনি সম্পর্কিত করে দিয়েছেন বৃহত্তর জাতীয় দরকারের সঙ্গে।

এ দরকার কখনো ফুরাবার নয়। জনগোষ্ঠীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বদলে যায় ভাষার গড়ন। বদলে যায় উপাদান ও ব্যবহারবিধি। তাই ব্যাকরণ রচনার কাজও একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের সম্পর্ক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য: 'যে ভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে, সে ভাষার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ব্যাকরণ ভাষাকে বাঁচাইতে পারে না তো, প্রাচীন ইজিপ্টবাসীদের ন্যায় ভাষার একটা 'মমি' তৈরী করে মাত্র' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৬: ৫১৩)। পুরোনো ব্যাকরণ তাই সুদীর্ঘকাল প্রাসঙ্গিক না-ও থাকতে পারে; কিন্তু তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতি প্রাসঙ্গিক থেকে যায়।

৮.৩ বাংলা বানান

বাংলা বানান-প্রশ্নে প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয়তার মূল এলাকা ছিল 'প্রাকৃত বাংলা'র বানানে ব্যুৎপত্তিগত বিবেচনা পরিহার করা, অর্থাৎ যথাসম্ভব উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানরূপ নির্ধারণ। লেখ্য-বাংলায় চলিতরীতির প্রবর্তন এবং প্রধানত কথাসাহিত্যে কথ্য-বাংলার ব্যাপক প্রচলনের প্রেক্ষাপটে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে প্রচুর নতুন শব্দ লেখায় ব্যবহৃত হতে থাকে। শব্দগুলোর বানানরূপ নির্ধারিত না থাকায় এক ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়।[১৩] এ প্রেক্ষাপটে বানানে সমতা আনতে এবং 'অ-তৎসম' বানানে 'তৎসমে'র বিধি প্রচলন রোধ করতে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় হন। তাঁর সংশ্লিষ্ট মত-মন্তব্যের কয়েকটি নিচে উদ্ধৃত হল:

> এক. পণ্ডিতমশায় বলিবেন, বানানের মধ্যে পূর্ব ইতিহাসের চিহ্ন বজায় রাখা উচিত। দেখা যাক, মেছনি কথাটার মধ্যে পূর্ব ইতিহাস কতটা বজায় আছে। ৎ, স এবং যফলা কোথায় গেল? ম-এ একার কোন্ প্রাচীন ব্যবহারের চিহ্ন। ন-টা কোথাকার কে। ওটা কি মৎস্যজীবিনীর ন। তবে জীবিটা গেল কোথায়। এমন আরো অনেক প্রশ্ন হইতে পারে। সদুত্তর এই যে, ৎ এবং স বাংলায় ছ হইয়া গেছে – এই ছ-ই ৎ এবং স-এর ঐতিহাসিক চিহ্ন, এই চিহ্ন বাংলা বাছা শব্দের মধ্যেও আছে। পরিবর্তনপরম্পরায় যফলা লোপ পাইয়া পূর্ববর্ণের অকারকে আকার করিয়াছে, যেমন লুপ্ত যফলা অদ্যকে আজ, কল্যকে কাল করিয়াছে – অতএব এই আকারই লুপ্ত যফলার ঐতিহাসিক চিহ্ন। ইহারা

পূর্বইতিহাসেরও চিহ্ন, এখনকার ইতিহাসেরও চিহ্ন। মাছ শব্দের উত্তর বাংলা প্রত্যয় উয়া যোগ হইয়া 'মাছুয়া' হয়, মাছুয়া শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার 'মেছো'; মেছো শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নি প্রত্যয় হইয়াছে। এই নি প্রত্যয়ের হ্রস্ব ই প্রাচীন দীর্ঘ ঈকারের ঐতিহাসিক অবশেষ। আমরা যদি বাংলার অনুরোধে মৎস্যকে কাটিয়া কুটিয়া মাছ করিয়া লইতে পারি এবং তাহাতে যদি ইতিহাসের জাতি নষ্ট না হইয়া থাকে, তবে বাংলা উচ্চারণের সত্য রক্ষা করিতে দীর্ঘ ঈ-র স্থলে হ্রস্ব ই বসাইলেও ইতিহাসের ব্যাঘাত হইবে না। মুখে যাহাই করি, লেখাতেই যদি প্রাচীন ইতিহাস রক্ষা করা বিধি হয়, তবে 'মৎস্য' লিখিয়া 'মাছ' পড়িলে ক্ষতি নাই। ('বাংলা ব্যাকরণ'; রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১২-১৩)

দুই. যত শীঘ্র পারা যায় এই কঠোর বন্ধন শিথিল করে দেওয়া উচিত। বস্তুত একেই বলে ভূতের বোঝা বওয়া। এতকাল ধরে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য না নিয়ে যে বহুকোটি বাঙালি নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার করে এসেছে এতকাল পরে আজ তাদের সেই ভাষাই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। এই জন্য তাদের সেই খাঁটি বাংলার প্রকৃত বানান নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে। ('শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত পত্র ২'; রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৮১)

তিন. বানানটা ব্যবহারের জিনিস, শব্দতত্ত্বের নয়। পুরাতত্ত্বের বোঝা মিউজিয়ম বহন করিতে পারে, হাটে বাজারে তাহাকে যথাসাধ্য বর্জন করিতে হয়। এইজন্যই লিখিবার বেলায় আমরা 'নুন' লিখি, পণ্ডিতই জানেন উহার মূল শব্দে একটা মূর্ধন্য ণ ছিল। এইজন্যই লিখিবার বেলা গাম্ভলা না লিখিয়া আমরা গাম্‌লা লিখি, পণ্ডিতই অনুমান করেন উহার মূল শব্দ ছিল কুম্ভ। আমরা লিখিয়া থাকি আঁতুর ঘর, তাহাতে আমাদের কাজের কোনো ক্ষতি হয় না – পাণ্ডিত্যের দোহাই মানিয়া যদি অন্ত্র-ক্রট্‌ ঘর বানান করিয়া আঁতুর ঘর পড়িতে হইত তবে যে-শব্দ প্রাচীনের গর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে তাহাকে পুনশ্চ গর্ভবেদনা সইতে হইত। ('বাংলা বানান'; রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৫৮)

চার. একদা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রাকৃতজনের বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিলেন। সেই অবজ্ঞার অপমান দুঃখ আজও দেশের লোকের মনের মধ্যে রয়ে গেছে। আমাদের সাহিত্যভাষার বানানে তার পরিচয় পাই। বাংলা ভাষাকে যে হরিজন পঙ্‌ক্তিতে বসানো চলে না তার প্রমাণ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক কুলজির থেকেই আহরণ করা যথেষ্ট হয় নি। বর্ণপ্রলেপের যোগে সবর্ণত্ব প্রমাণ করে দেবার চেষ্টা ক্রমাগতই চলছে। ইংরেজ ও বাঙালি মূলত একই আর্যবংশোদ্ভব বলে যাঁরা যথেষ্ট সান্ত্বনা পান নি তাঁরা হ্যাটকোট প'রে যথাসম্ভব চাক্ষুষ বৈষম্য ঘোচাবার চেষ্টা করেছেন এমন উদাহরণ আমাদের দেশে দুর্লভ নয়। বাংলা সাহিত্যের বানানে সেই চাক্ষুষ ভেদ ঘোচাবার চেষ্টা যে প্রবল তার হাস্যকর দৃষ্টান্ত দেখা যায় সম্প্রতি কানপুর শব্দে মূর্ধন্য ণয়ের আরোপ থেকে। ভয় হচ্ছে কখন কানাইয়ের মাথায় মূর্ধন্য ণ সঙিনের খোঁচা মারে। ('বাংলা বানান ৩'; রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬৪)

এ ধরনের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিস্তর পাওয়া যায়। তাতে বোঝা যায়, অ-তৎসম শব্দের বানান-নির্ধারণের ক্ষেত্রে যাঁরা ব্যুৎপত্তি মেনে চলার পক্ষপাতী, তাঁদের বিরুদ্ধে যুক্তি, তর্ক, উদাহরণ, শ্লেষ, কৌতুক ইত্যাদি সব ধরনের অস্ত্র শানিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক নিরন্তর লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান-সংস্কার সমিতি এক অর্থে তাঁর এই সক্রিয়তারই ফল (৭.৩.৩ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীকালের কার্যকর প্রায় সব প্রস্তাবে এই সমিতির মূলনীতিগুলো মোটের ওপর মেনে নেওয়া হয়েছে। তাই বলা যায়, 'তদ্ভব শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা অনেকাংশে পরবর্তী বানান-সংস্কার প্রয়াসের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে'। (পবিত্র ২০০৪: ১৩৩)

বানান 'ব্যবহারের জিনিস'। ব্যবহারকারীর পুরোনো অভ্যস্ততা নতুন বিধি চালু করা বা সমতা-বিধানের সবচেয়ে বড় বাধা। তাই এ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথ এ সত্য মেনেই বানানবিধি প্রণয়নের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণ নিয়েছিলেন।[১৪] গুটিকতক গৌণ আপত্তি সত্ত্বেও এ বানানবিধি মেনে চলার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি।[১৫] কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতি যে রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত সংস্কার করেনি, তা-ও নানা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। দেবপ্রসাদ ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> যে-সকল অবিসংবাদিত তদ্ভব শব্দ অনেকখানি সংস্কৃত-ঘেঁষা, তাদের প্রতি হস্তক্ষেপ করতে গেলেও পদে পদে গৃহবিচ্ছেদের আশঙ্কা আছে। এরা উচ্চারণে প্রাকৃত কিন্তু লেখনে সংস্কৃত আইনের দাবি করে। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতি কতকটা পরিমাণে সাহস দেখিয়েছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁদের মনেও ভয় ডর আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৫)

দেবপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে বানান-সংস্কার সমিতির 'বাড়াবাড়ি' ও 'অন্যায় হস্তক্ষেপে'র নালিশ জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু জানিয়েছেন, প্রতিপক্ষের বিরোধিতা এড়ানোর চিন্তা থাকায় যতটা দরকার ততটা সংস্কার করা হয়নি। তিনি সে দায়িত্ব দিয়েছেন ভবিষ্যৎ সংস্কারকদের হাতে। 'বানান-বিধি' প্রবন্ধে লিখেছেন:

> বানানের বিধিপালনে আপাতত হয়তো মোটের উপরে আমরা 'বাধ্যতামূলক' নীতি অনুসরণ করে একান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে যোগ দেব। কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যপথে ব্যাপারটা থামবে না। অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে যাঁরা নিঃসংকোচে বানানকে দিয়ে সম্পূর্ণভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৩)

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বানানের সত্য হল উচ্চারণের সত্য। সে সত্য আংশিকভাবে পালন করায় বানান সমিতি তাঁর প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু প্রশংসাবাচনের ক্ষেত্রে তাঁর সতর্কতা লক্ষণীয়। তাঁর মতে, কাজ শেষ হয়নি, শুরু হল মাত্র:

> মুদ্রাযন্ত্রকে দিয়ে সবই ছাপানো যায় কিন্তু রসনাকে দিয়ে তো সবই বলানো যায় না। কিন্তু যে মূর্ধন্য ণয়ের উচ্চারণ প্রাকৃত বাংলায় একেবারেই নেই, গায়ে পড়ে তার আনুগত্য স্বীকার করতে যাব কেন? এই পাণ্ডিত্যের অভিমানে শিশুপালদের প্রতি যে অত্যাচার করা যায় সেটা মার্জনীয় নয়। প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধন্য ণয়ের স্থান কোনোখানেই নেই এমন কথা যে-সাহসে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করতে পেরেছেন সে সাহস এখনো আরো কতক দূর তাঁদের ব্যবহার করতে হবে। এখনো শেষ হয় নি কাজ। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৪)

'মান বাংলা' আর 'খাঁটি বাংলা ব্যাকরণে'র মতো বানান-সংস্কারের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ আসলে আমূল সংস্কারবাদী। বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে বানানকে ধারাবাহিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে বাংলা উচ্চারণরীতির সমরূপ করে তোলাই তাঁর প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য। কথিত 'তৎসম' শব্দগুলোও তাঁর প্রস্তাবের আওতাভুক্ত। এ কারণেই বাংলা বর্ণমালার 'বেকার' বর্ণগুলো নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।[১৬] বারবার বলেছেন, উচ্চারণে তৎসমত্ব বজায় না থাকা সত্ত্বেও কেবল বানানের জোরেই বহু শব্দ 'তৎসম' সেজে আছে। তাঁর এ-সম্পর্কিত বহু মত-মন্তব্য থেকে এখানে একটি মাত্র উদ্ধৃত করা হল:

> বাংলা ভাষা উচ্চারণকালে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ধ্বনির ভেদ ঘোচানো অসম্ভব কিন্তু লেখবার সময় অক্ষরের মধ্যে চোখের ভেদ ঘোচানো সহজ। অর্থাৎ লিখব এক পড়ব আর, বাল্যকাল থেকে দণ্ডপ্রয়োগের জোরে এই কৃচ্ছ্রসাধন সাহিত্যিক সমাজপতিরা অনায়াসেই চালাতে পেরেছেন। সেকালের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত জানতেন এই সংবাদটা ঘোষণা

> করবার জন্যে তাঁদের চিঠিপত্র প্রভৃতিতে বাংলা শব্দে বানানের বিপর্যয় ঘটানো আবশ্যক বোধ করেন নি। কেবল ষত্ব ণত্ব নয়, হ্রস্ব ও দীর্ঘ ইকার ব্যবহার সম্বন্ধেও তাঁরা মাতৃভাষার কৌলীন্য লক্ষণ সাবধানে বজায় রাখতেন না। আমরা বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের দাবি করে থাকি কৃত্রিম দলিলের জোরে। বাংলায় সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ-বিকার ঘটে নি এমন দৃষ্টান্ত অত্যন্ত দুর্লভ। 'জল' বা 'ফল', 'সৌন্দর্য' বা 'অরুণ্‌গ' যে তৎসম শব্দ সেটা কেবল অক্ষর সাজানো থেকেই চোখে ঠেকে, ওটা কিন্তু বাঙালির হ্যাটকোট পরা সাহেবিরই সমতুল্য। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬৫)

এই কৃত্রিম সাহেবিয়ানা যে তিনি বানান থেকে দূর করার পক্ষপাতী, তার বহু প্রমাণ তাঁর লেখায় ও প্রস্তাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের বানান-সংস্কার-প্রস্তাবের তিনটি ধাপ স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়। প্রথম ধাপে তাঁর লক্ষ্য প্রাকৃত বাংলার বানান-রূপে সংস্কৃত-নিয়মের সংক্রমণ রোধ করা এবং এ শব্দগুলোর উচ্চারণ-অনুসারী বানান নিশ্চিত করা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে এ মূলনীতি সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয়নি বলেই এর অনুসরণে তাঁর দ্বিধা ছিল। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লক্ষ করেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত নিয়ম পালন করার প্রতিশ্রুতি' দিলেও তাঁর অনেক মন্তব্যের সঙ্গে এ প্রতিশ্রুতির সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না (মণীন্দ্র ১৪০৯: ২৫)।[১৭] মণীন্দ্রকুমার আরো লক্ষ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্যবহারে 'সংস্কৃতেতর শব্দে উচ্চারণানুগ বানান' লেখার ঝোঁক দেখা যায়। এর উদাহরণ, 'হ্রস্ব-ইকারের প্রতিষ্ঠা, ঙ-কে একক মর্যাদাদান, বর্গ্য জ-এর প্রাধান্য স্থাপন, মূর্ধন্য ণ-এর নির্বাসন, বিসর্গ বিসর্জন, ও-কারের আবাহন, ই-কার ও-কারের দু-একটি বাংলা সন্ধি প্রভৃতি'। (মণীন্দ্র ১৪০৯: ২৫-২৬)

দ্বিতীয় ধাপে তিনি হাত দিয়েছেন সংস্কৃত থেকে আসা শব্দের ভাণ্ডারে। এ শব্দগুলোর মধ্যে ব্যবহারের দিক থেকে যেগুলোর কোনো-না-কোনো 'বাংলারীতি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি সেগুলোর প্রচলিত রূপকেই শুদ্ধরূপ ঘোষণার পক্ষপাতী। 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে এ পক্ষপাত তিনি কোনো রাখঢাক না রেখেই প্রকাশ করেছেন:

> পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার আইনকে আমল দেন নাই। পণ্ডিতমশাই যদি সংস্কৃত রীতির উপর ভর দিয়া বাংলারীতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তবে আমরাই বা কেন বাংলারীতির উপর ভর দিয়া যথাস্থানে সংস্কৃতরীতিকে লঙ্ঘন করিতে সংকোচ করি? 'মনোসাধে' আমাদের লজ্জা কিসের? 'সাবধানী' বলিয়া তখনি জিব কাটিতে যাই কেন? এবং 'আশ্চর্য হইলাম' বলিলে পণ্ডিতমশায় 'আশ্চর্যান্বিত হয়েন' কী কারণে? (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৮-৯)

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তৎসমের জন্য সংস্কৃত নিয়ম চেয়েছেন। কিন্তু বাংলায় তৎসমের যে পরিমাণ তিনি স্থির করেছেন, তা অতি নগণ্য। ওই নগণ্য সংখ্যকের জন্য তিনি যে এত বাক্যব্যয় করেছেন, তার কারণ, সেকালের সংস্কৃতপন্থীদের সঙ্গে আপোসরফা। এর গুরুতর প্রমাণ, যেখানেই 'পণ্ডিতেরা' কোনো সংস্কৃত-নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, সেখানেই তিনি উল্লাস প্রকাশ করেছেন। কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। নমুনা হিসাবে দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা প্রথম পত্র থেকে একটা অংশ উদ্ধৃত হল:

> রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যলয় যে নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা নিয়ে বেশি তর্ক করবার দরকার আছে বলে মনে করি নে। যাঁরা নিয়মে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিতের নাম দেখেছি। ... অন্তত তৎসম শব্দের ব্যবহারে তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার করতে কোনো ভয় নেই, লজ্জাও নেই। শুনেছি 'সৃজন' শব্দটা ব্যাকরণের বিধি অতিক্রম করেছে, কিন্তু যখন বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত কথাটা চালিয়েছেন তখন দায় তাঁরই, আমার কোনো ভাবনা নেই। অনেক পণ্ডিত 'ইতিমধ্যে' কথাটা চালিয়ে এসেছেন, 'ইতোমধ্যে' কথাটার

> ওকালতি উপলক্ষে আইনের বই ঘাঁটবার প্রয়োজন দেখি নে – অর্থাৎ এখন ওই 'ইতিমধ্যে' শব্দটার ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্ব-বিচারের দিন আমাদের হাত থেকে চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়-বানান-সমিতিতে তৎসম শব্দ সম্বন্ধে যাঁরা বিধান দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন, এ নিয়ে দ্বিধা করবার দায়িত্বভার থেকে তাঁরা আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন থেকে কার্ত্তিক, কর্ত্তা প্রভৃতি দুই ত-ওয়ালা শব্দ থেকে এক ত আমরা নিশ্চিন্ত মনে ছেদন করে নিতে পারি। ... এখন থেকে ভট্টাচার্য্য শব্দের থেকে য-ফলা লোপ করতে নির্বিকার চিত্তে নির্মম হতে পারব, কারণ নব্য বানান-বিধাতাদের মধ্যে তিনজন বড়ো বড়ো ভট্টাচার্য্যবংশীয় তাঁদের উপাধিকে য-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন। এখন থেকে আর্য্য এবং অনার্য্য উভয়েই অপক্ষপাতে য-ফলা মোচন করতে পারবেন, যেমন আধুনিক মাঞ্চু ও চীনা উভয়েরই বেণী গেছে কাটা। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৬-৭৭)

শুধু বানানরূপের প্রতি পক্ষপাতেই নয়, বলার ভঙ্গির দিক থেকেও এখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি পরিচ্ছন্ন। সমকালীন পরিস্থিতির বিবেচনায় একে বলা যায় তাঁর এক কার্যকর কৌশল – সংস্কৃত থেকে ধার করা শব্দগুলোর বানান-পরিবর্তন তিনি পণ্ডিতদের দিয়েই করাতে চেয়েছেন।

বাকি শব্দগুলোর জন্য প্রস্তাব করেছেন তৃতীয় ধাপ। তিনি 'তৎসম' শব্দের ক্ষেত্রেও বানানের পরিবর্তন চান; কিন্তু সমসাময়িক পণ্ডিতকুলের যথেষ্ট সায় তাতে মেলেনি। তাই এ দায়িত্ব দিয়েছেন পরবর্তীদের হাতে। বাংলা বানানরাজ্যে বারবার কামনা করেছেন এক 'কেমাল পাশা'র অভ্যুদয়:

> অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি, সেই সকল শব্দের প্রায় ষোল আনাই অপভ্রংশ। যদি প্রাচীন ব্যাকরণকর্তাদের সাহস ও অধিকার আমার থাকত, এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে পারতুম। প্রাকৃত বাংলা ব্যাকরণের কেমাল পাশা হবার দুরাশা আমার নেই কিন্তু কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ। উক্ত পাশা এ দেশেও দেহান্তর গ্রহণ করতে পারেন। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৫)

এ তিন ধাপ সমন্বিত করে পাঠ করলে বোঝা যায়, ব্যুৎপত্তি-অনুসারী বানানের চেষ্টাকে তিনি সম্ভাব্য সব উপায়ে প্রতিহত করতে চেয়েছেন।[১৮] তাঁর একটা যুক্তি ছিল বাংলা ভাষার কুলজি-সংক্রান্ত। যদি অতীত ইতিবৃত্তের দিকে নজর দিতেই হয়, তাহলে বাংলার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের তুলনায় প্রাকৃতের যুক্তিই বেশি প্রযোজ্য হওয়ার কথা। কারণ কেবল এই নয় যে, প্রাকৃতই বাংলার সাক্ষাৎ পূর্বসূরি, বরং ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রাকৃতের উচ্চারণভঙ্গিই বাংলার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। গ্রিয়ার্সন এ বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

> Now there is no doubt about the fact that it is from some Eastern form of this Magadhi language (or Prakrit, as it is called) that Bengali is directly descended. The very same incapacities of the vocal organs exist with Bengalis now, that existed with their predecessors eight hundred years ago. A Bengali can not pronounce *kshm* any more than they could. He can not pronounce a clear *s*, but must make it *sh*. … in other words, he writes Sanskrit, and reads and talks another language. It is exactly as if an Italian were to write *factum*, while he says *fatto*, or as if a Frenchman were to write the Latin *sicca*, while he says *seche*. (Grierson 1903: 15)

ইউরোপীয় ভাষাগুলোর ক্ষেত্রে এরকম ঘটেনি, যেমন ঘটেছে বাংলার ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ একেই বারবার বানানের 'অসততা' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ধ্বনি-অনুসারী বানান করাই ভারতীয় নীতি: 'ধ্বনিসংগত বানান এক

আছে সংস্কৃত ভাষায় এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায়। আর কোনো ভাষায় আছে কিংবা ছিল কি না জানি নে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬৪)। এ প্রসঙ্গে তিনি বারবার প্রাকৃতের বানানরীতির উদাহরণ দিয়েছেন:

> তখনকার দিনে প্রাকৃতকে যাঁরা বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন পরম পণ্ডিত। অথচ প্রাকৃতের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা ছিল না। সংস্কৃত ব্যাকরণের চাপে তাঁরা প্রাকৃতকে লুপ্তপ্রায় করেন নি। তার কারণ ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের ছিল সহজ বোধশক্তি। আমরা আজকাল সংস্কৃত শিখে ভুলে যাই যে বাংলার একটি স্বকীয়তা আছে। অবশ্য সংস্কৃত থেকেই সে শব্দসম্পদ পাবে, কিন্তু তার নিজের দৈহিক প্রকৃতি সংস্কৃত দ্বারা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা অসংগত। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কখনো সে চেষ্টা করেন নি। আমি সেকালের পণ্ডিতদের বাংলায় লেখা অনেক পুরানো পুঁথি দেখেছি। তার বানান তাঁরা বাংলা ভাষাকে প্রাকৃত জেনেই করেছিলেন। তাঁদের ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ছিল না, এ কথা বলা চলে না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৪১)

উল্লেখ্য এ অভিভাষণ তিনি দিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজ কর্তৃক 'কবি সার্বভৌম' উপাধিদান ও অভিনন্দনের উত্তরে। লক্ষণীয়, এখানে প্রাচীন প্রাকৃতের পাশাপাশি তিনি পুরোনো বাংলা পুঁথিকেও সাক্ষী মেনেছেন। 'প্রাচীন গ্রন্থসকলের যে-সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান-সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃত বানানকে বাংলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলা বানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন। ... আধুনিক বাংলার আদর্শে যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিয়া থাকেন তাঁহারা পরম অনিষ্ট করেন' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৯৩)। – রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে। তা হল, উপনিবেশ-পূর্ব নমুনাকে বাংলা শব্দরূপ ও বানানরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বসূরির মর্যাদা দেওয়া।[১৯] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'The old spellings of MSS are of very great help in tracing the history of the sounds, as they are frankly phonetic, when the scribes were not troubled by the ghost of Sanskrit.' (Chatterji 2002: 227) ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে সংস্কৃতায়নের প্রচণ্ড প্রতাপের মধ্যে পূর্বতন 'বাংলারীতি'গুলো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত মন্তব্যে সে বাস্তবতার কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন।

যাঁরা বানানের সংস্কৃতায়নের পক্ষপাতী, তাঁদের প্রধান যুক্তি ব্যুৎপত্তির ইতিহাস রক্ষা করা। এ ব্যাপারে তাঁরা সাধারণত ইংরেজির নজির দিয়ে থাকেন, সংস্কৃতের নয়। রবীন্দ্রনাথ নিপুণ যুক্তিজালে প্রতিপক্ষের এ বক্তব্য খারিজ করেছেন। তাঁর যুক্তির মূলকথা এই যে, ইংরেজির বানাননীতি আর ভারতীয় বানাননীতি পরস্পর-বিরোধী: 'ইংরেজিতে বানানে-উচ্চারণে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক, পরস্পরের মাঝখানে প্রাচীন শব্দতত্ত্বের লম্বা ঘোমটা। ... কিন্তু আমাদের দেশের নজির উলটা। প্রাকৃত ও পালি, বানানের দ্বারা নির্ভয়ে নিজের শব্দেরই পরিচয় দিয়েছে, পূর্বপুরুষের শব্দতত্ত্বের নহে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৫৮)। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালির যুক্তিতেই বানানের সংস্কৃতায়নের বিরোধিতা করেছেন। এমনকি ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে অন্য যুক্তি ব্যবহৃত হলেও তাঁর কাছে তা বৈধ হয়ে যায় না। সংস্কৃত কলেজে দেওয়া বক্তৃতায় তাঁর এ অবস্থান খোলাখুলি প্রকাশিত হয়েছে:

> যাঁরা মনে করেছেন বাইরে থেকে বাংলাকে সংস্কৃতের অনুগামী করে শুদ্ধিদান করবেন, তাঁরা সেই দোষ করছেন যা ভারতে ছিল না। এ দোষ পশ্চিমের। ইংরেজিতে শব্দ ধ্বনির অনুযায়ী নয়। ল্যাটিন ও গ্রীক থেকে উদ্ভূত শব্দে বানানের সঙ্গে ধ্বনির বিরোধ হলেও তাঁরা মূল বানান রক্ষা করেন। এই প্রণালীতে তাঁরা ইতিহাসের স্মৃতি বেঁধে

> রাখতে চান। কিন্তু ইতিহাসকে রক্ষা করা যদি অবশ্যকর্তব্য হয় তবে ডারউইন-কথিত আমাদের পূর্বপুরুষদের যে অঙ্গটি খসে গেছে সেটিকে আবার সংযোজিত করা উচিত হবে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৪১-৪২)[২০]

রবীন্দ্রনাথ এখানে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে জ্ঞানতাত্ত্বিক উপনিবেশায়নের একটি সূক্ষ্ম দিক চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে সমস্যাটি নিছক তত্ত্বীয়ও নয়। ইংরেজি-ফরাসির উদাহরণ বাংলার ক্ষেত্রে না খাটার অন্য কারণ ভাষার ইতিহাসগত ভিন্নতা। দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা দ্বিতীয় পত্রে তিনি তত্ত্বের পাশাপাশি ঐতিহাসিক ভিন্নতার যুক্তিগুলোও খতিয়ে দেখেছেন:

> আপনার চিঠিতে ইংরেজি ফরাসির নজির দেখিয়ে আপনি বলেন ওই সকল ভাষায় উচ্চারণে বানানে সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু এই নজিরের সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি নে। ওই-সকল ভাষার লিখিত রূপ অতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, এই পরিণতির মুখে কালে কালে যে-সকল অসংগতি ঘটেছে হঠাৎ তার সংশোধন দুঃসাধ্য। প্রাকৃত বাংলা ছাপার অক্ষরের এলেকায় এই সম্প্রতি পাসপোর্ট পেয়েছে। এখন ওর বানান নির্ধারণে একটা কোনো নীতি অবলম্বন করতে হবে তো। ... ইউরোপীয় ভাষাগুলি যখন প্রথম লিখিত হচ্ছিল তখন কাজটা কী রকম করে আরম্ভ হয়েছিল তার ইতিহাস আমি জানি নে। আন্দাজ করছি কতগুলি খামখেয়ালি লোকে মিলে এ কাজ করেন নি, যথাসম্ভব কানের সঙ্গে কলমের যোগ রক্ষা করেই শুরু করেছিলেন। তাও খুব সহজ নয়, এর মধ্যেও কারো কারো স্বেচ্ছাচার যে চলে নি তা বলতে পারি নে। কিন্তু স্বেচ্ছাচারকে তো আদর্শ বলে ধরে নেওয়া যায় না – অতএব ব্যক্তিগত অভিরুচির অতীত কোনো নীতিকে যদি স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি তবে উচ্চারণকেই সামনে রেখে বানানকে গড়ে তোলা ভালো। প্রাচীন ব্যাকরণকর্তারা সেই কাজ করেছেন, তাঁরা অন্য কোনো ভাষার নজির মিলিয়ে কর্তব্য সহজ করেন নি। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৮১-৮২)

রবীন্দ্রনাথ এই ‘জটিল’ কর্তব্যের দিকেই বাংলাভাষীদের আহ্বান করেছেন। বানান তাঁর কাছে পাণ্ডিত্য জাহিরের ময়দান নয়, নিতান্তই ‘কেজো’, ‘ব্যবহারিক’ এবং ভাষাভাষীদের ‘সুবিধা-অসুবিধা’র ব্যাপার। এ কারণেই বানান-প্রসঙ্গে বারবার তিনি শিশুশিক্ষার উল্লেখ করেছেন। ‘বাংলা বানান’ শিরোনামের রচনাগুচ্ছে এক জায়গায় লিখেছেন:

> বাংলা ভাষার অধিকাংশ বানানই নিজের ধ্বনিবিদ্রোহী ভুল বানান। আভিজাত্যের ভান করে বানান আপন স্বধর্ম লঙ্ঘনের চেষ্টা করাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেটা পরম দুঃখকর হয়েছে। ... শিশুদের পড়ানোয় যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন বাংলা পাঠশিক্ষার প্রবেশপথ কি রকম দুর্গম। এক যানের রাস্তায় আর-এক যানকে চালাবার দুশ্চেষ্টাবশত সেটা ঘটেছে। বাঙালি শিশুপালের দুঃখ নিবৃত্তি চিন্তায় অনেকবার কোনো-এক জন বানান-সংস্কারক কেমাল পাশার অভ্যুদয় কামনা করেছি। দূরে যাবারই বা দরকার কী, সেকালের প্রাকৃত ভাষার কাত্যায়নকে পেলেও চলে যেত। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬৪)

শুধু শিশু নয়, আপামর জনসাধারণের ভাষা-ব্যবহার যথাসম্ভব জটিলতামুক্ত করাও তাঁর ভাষা-প্রকল্পের অংশ। বিশেষত শুদ্ধ বাংলা লেখার জন্য সংস্কৃতের বরাত তিনি কিছুতেই ন্যায্য মনে করেননি। তাঁর মতে, ‘সংস্কৃত ভাষা ভালো করে জানা না থাকলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা থাকবেই না, ভাষাকে এমন অস্বাভাবিক অত্যাচারে বাধ্য করা পাণ্ডিত্যাভিমানী বাঙালির নূতন কীর্তি’ (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৮১)। তিনি এ অবস্থার অবসান চেয়েছেন। অন্যদিকে ভাষার ব্যবহারগত সুবিধার প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগের উদাহরণ ‘অ্যা’ ধ্বনি বোঝাতে মাত্রাযুক্ত একার ব্যবহারের প্রস্তাব। বাংলাভাষীরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। কিন্তু এই অসফল প্রস্তাব থেকে বাংলা ভাষার আভ্যন্তর

বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ-সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। এ ক্ষেত্রে তাঁর আরেক প্রস্তাব – অব্যয় 'কি' আর সর্বনাম 'কী'-কে আলাদা করা – প্রায় সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।[২১] এসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, 'ব্যাকরণ বাঁচিয়ে' বানানকে যথাসম্ভব 'সরল' ও ব্যবহারিক দিক থেকে 'সুবিধাজনক' করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।[২২]

বানানকে তিনি সরল করতে চেয়েছেন, কিন্তু বানানরাজ্যে বিশৃঙ্খলা চাননি। কতগুলো মূলনীতি ঠিক করে না নিলে এ বিশৃঙ্খলার অবসান হবে না। রবীন্দ্রনাথ বিশৃঙ্খলার অবসান চেয়েছেন। কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে 'প্রাকৃত বাংলা'র বানান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বানানবিধি প্রণয়নের মূলতত্ত্বটিও চিহ্নিত করেছেন:

> আমাদের সাহিত্যে প্রাকৃত বাংলার প্রচলন প্রতিদিন বেড়ে উঠেছে। সেই বাংলায় বানান সম্বন্ধে কোনো আইন নেই, তাই স্বেচ্ছাচারের অরাজকতা চলেছে। যাঁরা হবেন প্রথম আইনকর্তা তাঁদের বিধান অনিন্দনীয় হতেই পারে না, তবু উচ্ছৃঙ্খলতার বাঁধ বেঁধে দেবার কাজ তো শুরু করতেই হবে। সেই জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়েরই শরণ নিতে হল। কালক্রমে তাঁদের নিয়মের অনেক পরিবর্তন ঘটবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই পরিবর্তনের গতি একটা সুচিন্তিত পথ অনুসরণ যদি না করে তাহলে অব্যবস্থার অন্ত থাকবে না। নদীর তট বাঁধা আছে তবু তার বাঁক পরিবর্তন হয়, কিন্তু তট না থাকলে তার নদীত্বই ঘুচবে, সে হবে জলা। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৯৭)

এই মূলতত্ত্বে নদীর উপমা ভাষার নিত্য-পরিবর্তনশীলতার কথা বলে। কিন্তু ব্যবহারিক কারণেই বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। দরকার হবে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। 'এ ক্ষেত্রে প্রবীণদের অভ্যাস ও আচারনিষ্ঠতার প্রতি সম্মান করতে যাওয়া দুর্বলতা' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৮)। ভাষার পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে মিল রেখে বানানরীতিরও বদল ঘটতে থাকবে। তবে সে বদলে মূলনীতিটা স্থির রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই মূলনীতি, বলা যায়, দুটি – উচ্চারণের অনুসরণ, আর বাংলা ভাষার স্বভাবের স্বীকৃতি।[২৩]

রবীন্দ্রনাথের কাছে বানান-সংস্কার ছিল এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। উচ্চারণের সঙ্গে বানানের অব্যাহত সম্মিলনই তাঁর আরাধ্য। এ কারণেই পত্রিকায় গিলবার্ট মারের ইংরেজি বানান সংস্কার-বিষয়ক পত্র পড়ে তিনি গিলবার্টকে বাহবা দিয়েছেন। তাঁর বানান-বিষয়ক রচনায় ইংরেজি বানানে উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনতার কথা বারবার এসেছে। কারণ, তাঁর মতে তিনি নিজেও এর ভুক্তভোগী। গিলবার্টের বরাত দিয়ে তিনি এই সংবাদ দিতে ভোলেননি যে, 'ইংরেজি ভাষার যেমন ক্রমশ পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি মাঝে মাঝে তার বানান সংস্কার ঘটেছে'। আমেরিকার বানান সংস্কারে তিনি উল্লাস প্রকাশ করেছেন।[২৪] লিখেছেন, 'মার্কিন দেশীয় বানানে through শব্দ থেকে তিনটে বেকার অক্ষর বর্জন করে বর্ণবিন্যাসে যে পাগলামির উপশম করা হল আমাদের রাজত্বে সেটা গ্রহণ করবার যদি বাধা না থাকত তা হলে সেইসঙ্গে বাঙালির ছেলের অজীর্ণ রোগের সেই পরিমাণ উপশম হতে পারত' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬৮)। তাঁর মতে ইংরেজরা যেমন আচারনিষ্ঠ, তেমনি বাঙালিও আচারনিষ্ঠ। ঠাট্টা করে বলেছেন, 'এই সম্বন্ধে রাজায় প্রজায় মনোভাবের সামঞ্জস্য দেখা যায়'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬৯)

রবীন্দ্রনাথের বাংলা বানাননীতি তাঁর মানবাংলানীতি ও ব্যাকরণনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

৮.৪ অভিধান ও পরিভাষা প্রসঙ্গে

অভিধান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কোনো আলোচনা করেননি। তবে ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে তাঁর মত-মন্তব্য-বিশ্লেষণ থেকে অভিধানে শব্দভুক্তির আদর্শ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। সে দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন যে অন্তত সমকালীন অভিধানগুলোতে তিনি পাননি, তা বোঝা যায় তাঁর এ মন্তব্য থেকে: 'আজ পর্যন্ত বাংলা অভিধান বাহির হয় নাই' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৮৯)। 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ মন্তব্য করেছেন। ততদিনে বাংলায় অসংখ্য অভিধান সংকলিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এ মন্তব্যের একটাই তাৎপর্য হতে পারে – বাংলা অভিধান যে রকম হওয়া উচিত তেমন হয়নি। ওই অভিধানগুলোর একটি ত্রুটি নির্দেশ করেছেন তিনি 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে: 'বাংলা ভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ এক শ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই। অথচ সে সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৭৯)। একই প্রবন্ধে আরো লিখেছেন: 'ইহারা বাংলা ভাষার পশ্চাতে বাঁকে বাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে, অথচ রীতিমত শব্দশ্রেণীতে ভর্তি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যন্ত কাজের অথচ অখ্যাত অবজ্ঞাত' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৮২-৮৩)। এই অবজ্ঞাত শব্দসম্ভারের কদর নিশ্চিত করাই রবীন্দ্রনাথের অভিধানতত্ত্বের মূলকথা।

তিনি নিজে এ ধরনের বিপুল শব্দ ও রূপ সংকলন করেছেন 'বাংলা শব্দদ্বৈত', 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ', 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত', 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রভৃতি প্রবন্ধে। 'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা' শিরোনামে বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন তাঁর অন্যতম প্রধান আভিধানিক কাজ। এ ধরনের 'অবজ্ঞাত' শব্দ-সংকলনের জন্য সমকালে তিনি তিরস্কৃত হয়েছিলেন। যাঁরা তিরস্কার করেননি, তাঁদের একজন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

> সেই সকল শব্দের মধ্যে অনেক অসাধু শব্দ রহিয়াছে, অনেক গ্রাম্য শব্দ রহিয়াছে, যাহা সাধু সাহিত্যে আদৃত হয় না ও আদৃত হইবে না। বস্তুতই তন্মধ্যে অনেক শব্দ আছে, যাহা প্রকৃতই slang, অপভাষা ও গ্রাম্য ভাষা। এই অপভাষার আলোচনাই অনেকের প্রীতিকর হয় নাই। তাঁহারা হয়ত মনে ভাবিয়াছেন, এই সকল শব্দের প্রতি লেখকের একটা আন্তরিক আকর্ষণ আছে ও অনুরাগ আছে; তিনি ব্যাকরণ আলোচনা উপলক্ষ্য করিয়া ঐ সকল অপশব্দ সাহিত্যে চালাইতে চাহেন, এবং যদিও সম্প্রতি উহাদের ব্যবহারে সাহসী হন নাই, ভবিষ্যতে কোন্ দিন ব্যবহার করিয়া ফেলিবেন। (রামেন্দ্র ১৩৫৬: ১১৮)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এখানে রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে সমর্থন জানিয়েছেন, তা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে না। যাঁর কাছে বাংলা ভাষার সবচেয়ে অকৃত্রিম নিদর্শন মেয়েদের ছড়া, বাউল গান আর *মৈমনসিংহ গীতিকা*, তাঁর সম্পর্কে এই বিবৃতি সত্য হতে পারে না। একথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথ কলকাতার স্থানীয় শব্দরীতি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন; কিন্তু তা করেছেন কেবল সেসব ক্ষেত্রে, যেখানে প্রচলিত কথ্য-বাংলাতেই বিকল্প আছে। তদুপরি তিনি আপত্তি তুলেছেন এমন শব্দের তালিকায় 'ভদ্রব্যবহারে' নতুন আমদানি করা শব্দের সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া, 'ব্যাকরণের শব্দ', 'লেখার শব্দ', 'বলার শব্দ' ইত্যাদি বিভেদ কমিয়ে এনে ভাষাকে যথাসম্ভব সমরূপ করে তোলাই তাঁর প্রধান প্রকল্প (৮.১ ও ৮.২ দ্রষ্টব্য)। বস্তুত, নিজের সংকলিত বহু শব্দ রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যবহার করেননি বটে, কিন্তু এগুলোকে 'ব্যবহারযোগ্য ভেবেছিলেন' (দেবেশ ২০০৩: ১১)। প্রাকৃত বাংলার শব্দস্বভাব সম্পর্কে তাঁর অসংখ্য

বিবৃতি এ সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। নানা ধরনের শব্দের মেশামিশি, তাঁর মতে, সাধুভাষায় চলে না; কারণ, 'সেখানে জাতি রক্ষা করাকেই সাধুতা রক্ষা করা বলে' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১১: ৫৭৪)। বিপরীতে 'প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য গদ্যে-পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ'। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১১: ৫৭৪)

অভিধানে সংকলনযোগ্য বাংলা শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য কথ্য-বাংলায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দ সম্পর্কে তাঁর মতামত পরীক্ষা করা যেতে পারে। বাংলা ভাষার ঔপনিবেশিক ইতিহাসের টানাপোড়েনে এ ধরনের শব্দ নিয়ে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব, মত ও ভিন্নমত ক্ষণে-ক্ষণে মাথাচাড়া দিয়েছে। তাতে প্রকাশক্ষমতার দিক থেকে ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দেবেশ রায় লিখেছেন, 'অস্বীকার করে লাভ নেই – বর্ণহিন্দু-নিয়ন্ত্রিত বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দই সাম্প্রদায়িক কারণে শিষ্ট ব্যবহারে আসেনি' (দেবেশ ২০০৩: ৭৪)। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বাংলা ভাষার স্বাভাবিক গড়নের অনিবার্য অংশ হিসাবেই আরবি-ফারসি শব্দকে বিচার করেছেন – জাতের প্রসঙ্গ তোলেননি। ধর্মীয় বা অন্য কোনো প্রণোদনায় নতুন বা অচলিত আরবি-ফারসির আমদানি তাঁর তীব্র তিরস্কারের শিকার হয়েছে (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৩০৩-০৪); কিন্তু প্রচলিত শব্দগুলোর পক্ষপাত করেছেন বিশুদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক কারণেই:

> যত বড়ো নিষ্ঠাবান হিন্দুই হোক-না কেন ঘোরতর রাগারাগির দিনেও প্রতিদিনের ব্যবহারে রাশি রাশি তৎসম ও তদ্ভব মুসলমানী শব্দ উচ্চারণ করতে তাদের কোনো সংকোচ বোধ হয় না। এমন-কি, সে-সকল শব্দের জায়গায় যদি সংস্কৃত প্রতিশব্দ চালানো যায় তা হলে পণ্ডিতী করা হচ্ছে বলে লোকে হাসবে। বাজারে এসে সহস্র টাকার নোট ভাঙানোর চেয়ে হাজার টাকার নোট ভাঙানো সহজ। সমনজারি শব্দের অর্ধেক অংশ ইংরেজি, অর্ধেক পারসী, এর জায়গায় 'আহ্বান প্রচার' শব্দ সাধু সাহিত্যেও ব্যবহার করবার মতো সাহস কোনো বিদ্যাভূষণেরও হবে না। কেননা, নেহাত বেয়াড়া স্বভাবের না হলে মানুষ মার খেতে তত ভয় করে না যেমন ভয় করে লোক হাসাতে। 'মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে', এ কথা সহজেই মুখ দিয়ে বেরোয় কিন্তু যাবনিক সংসর্গ বাঁচিয়ে যদি বলতে চাই মনের গতিকটা বিকল কিংবা বিমর্ষ বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছে তবে আত্মীয়দের মনে নিশ্চিত খটকা লাগবে। যদি দেখা যায় অত্যন্ত নির্জলা খাঁটি পণ্ডিতমশায় ছেলেটার ষত্ব-ণত্ব শুদ্ধ করবার জন্যে তাকে বেদম মারছেন, তা হলে বলে থাকি, 'আহা বেচারাকে মারবেন না'। যদি বলি 'নিরুপায় বা নিঃসহায়কে মারবেন না' তা হলে পণ্ডিতমশায়ের মনেও করুণরসের বদলে হাস্যরসের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। নেশাখোরকে যদি মাদকসেবী বলে বসি তা হলে খামখা তার নেশা ছুটে যেতে পারে, এমন-কি, সে মনে করতে পারে তাকে একটা উচ্চ উপাধি দেওয়া হল। বদমায়েসকে দুর্বৃত্ত বললে তার চোট তেমন বেশি লাগবে না। এই শব্দগুলো যে এত জোর পেয়েছে তার কারণ বাংলা ভাষার প্রাণের সঙ্গে এদের সহজ যোগ হয়েছে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৩০২)

উদ্ধৃত অংশে শব্দের ব্যবহারিক তাৎপর্য সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রকাশ ঘটেছে, যা রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক ভাষাবোধের সমান্তরাল। শব্দার্থ স্থির হয় লোকব্যবহারে – পণ্ডিতের ব্যুৎপত্তি-সংক্রান্ত জ্ঞানের বরাতে নয়। এ কারণেই 'সমার্থক' শব্দ দিয়ে লোকমুখে চালু কোনো শব্দকে আসলে বদলে ফেলা যায় না। তাতে ভাষার সামগ্রিক জৈবসত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ সবগুলো উদাহরণ দিয়েছেন বাক্যযোগে। কারণ, প্রচলিত বাকরীতির অঙ্গীভূত হওয়াই শব্দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছাড়পত্র। উদ্ধৃত অংশের উদাহরণগুলো শুধু আরবি-ফারসি নয়, যে কোনো শব্দের ক্ষেত্রেই অর্থনির্ণয় ও প্রয়োগবিধি-সম্পর্কিত রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

তাঁর অভিধান-সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ চিন্তা একত্র করলে তাঁর কাঙ্ক্ষিত অভিধানের একটা চেহারা পাওয়া যাবে। তিনি ব্যুৎপত্তিকেন্দ্রিক ভাষা-বিবেচনার বিরোধী। তাই অর্থগত ও ব্যবহারিক প্রয়োজন না থাকলে তাঁর কাঙ্ক্ষিত অভিধানে ব্যুৎপত্তি প্রাধান্য পাওয়ার কথা নয়। শব্দের ঐতিহাসিক বিবর্তনের তুলনায় চালুভাষার বর্তমান রূপই তাঁর বিবেচ্য। এমনকি কোনো পুরোনো ব্যাকরণের অনুরোধেও তিনি চালুরূপ পরিবর্তন করার পক্ষপাতী নন। তাই তাঁর অভিধানে চালুরূপগুলোই প্রাধান্য পাওয়ার কথা। 'সংজ্ঞাবিচার' প্রবন্ধের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রতিশব্দকে অর্থ হিসাবে উল্লেখ করার বদলে চাইতেন শব্দের ব্যবহারিক সংজ্ঞা। আর প্রায় সব ক্ষেত্রে বাক্যযোগে অর্থনির্ণয় থেকে বোঝা যায়, প্রচলিত বাগভঙ্গি ও পূর্ণাঙ্গ বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ থেকেই চালু অর্থগুলো পরিচ্ছন্ন হোক – এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ ব্যবহার চাইতেন বলে রবীন্দ্রনাথ বাংলা পরিভাষা চয়নের ব্যাপারেও মনোযোগী ছিলেন। বিশেষত উচ্চশিক্ষার জন্য পারিভাষিক শব্দভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি: 'দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় যে-সকল শব্দের দরকার তাহা আমাদের ভাষায় জমে নাই। এইজন্য আমাদের ভাষায় শিক্ষার উচ্চ অঙ্গ কানা হইয়া আছে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৮৩-৮৪)। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২৫ মাঘ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বিশেষ অধিবেশনে এ ধরনের শব্দাবলির একটি তালিকা তিনি উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর নিজের সাক্ষ্য-মোতাবেক এ কাজে তিনি ব্যবহার করেছিলেন 'অমরকোষ, মনিয়ার বিলিয়মস্, আপ্তে এবং বিল্‌সনের অভিধান' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৪৪১)। এছাড়া আগে-পরে তাঁর ব্যবহৃত-সংকলিত-নির্মিত পরিভাষার তালিকা বিরাট (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৩৬৩-৪০৬)। এর মধ্যে আছে 'আবাসিক', 'অনাবাসিক', 'অনীহা', 'অনুষঙ্গ', 'ঐচ্ছিক', 'জনপ্রিয়', 'প্রতিমা', 'প্রতিষ্ঠান', 'অনুষ্ঠান' প্রভৃতির মতো চমৎকার শব্দ, যেগুলো বাংলার স্বাভাবিক শব্দভাণ্ডারের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু এ তালিকার বিপুল-অধিকাংশ শব্দই পরিত্যক্ত হয়েছে। পরিভাষার ক্ষেত্রে তাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নির্বাচনের চেয়ে তাঁর মূলনীতি আর কর্মপ্রক্রিয়া অধিকতর প্রাসঙ্গিক।

মূলনীতি প্রসঙ্গে বলা যায়, আলাদা করে কোনো শব্দের প্রতিশব্দ তৈরি না করে 'রচনার প্রসঙ্গে' অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মিলিয়ে পরিভাষা চয়ন করা সুবিধাজনক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জুতার উপমা ব্যবহার করেছেন: 'পা রইল এ পাড়ায় আর জুতো তৈরি হচ্ছে ও পাড়ায় ব্যবহারের পক্ষে এটা অনেক সময়েই পীড়াজনক ও ব্যর্থ হয়। অপরপক্ষে নূতন জুতা প্রথমটা পায়ে আঁট হলেও চলতে চলতে পা তাকে নিজের গরজে আপনার মাপের করে নেয়। পরিভাষা সম্বন্ধেও সেরকম প্রায়ই ঘটে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৯৬)। বিশেষত পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে সমস্ত পরিভাষা তৈরি করে পরে লেখায় হাত দেওয়া জরুরি নয়। কারণ, 'ভাষায় সব সময়ে যোগ্যতমের নির্বাচন নীতি খাটে না – অনেক সময়ে অনেক আকস্মিক কারণে অযোগ্য শব্দ টিকে যায়। ... কাজ চলতে চলতে ভাষা গড়ে উঠবে – তখন পারিভাষিক শব্দগুলি অনেক স্থলে প্রথার জোরেই ব্যাকরণ ডিঙিয়ে আপন অর্থ স্থির করে নেবে'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২০০)

রবীন্দ্রনাথ নিজে অনেক পরিভাষা তৈরি করেছেন উপস্থিত প্রয়োজনে। বিশেষত ইংরেজি শব্দের প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ না পেলে নতুন শব্দ খুঁজে নিতে হয়েছে, বা তৈরি করতে হয়েছে। প্রথমেই তিনি খুঁজেছেন সংস্কৃত উৎসে। পত্রিকায় একবার জানতে চেয়েছেন, 'যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে, সংস্কৃত ভাষায়

পারিভাষিক ও সহজ অর্থে feeling শব্দের কোন কোন প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৯০)? সংস্কৃত ভাষায় 'চালু' এবং 'সহজ' শব্দ পাওয়া গেলে বাংলা পরিভাষা হিসাবে তা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ – জটিল, দুর্বোধ্য ও নতুন-তৈরি লম্বা শব্দ নয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে তিনি মূল – সম্ভবত ইংরেজি – শব্দটি হুবহু গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন: 'পত্রলেখক romantic শব্দের বাংলা জানিতে চাহিয়াছেন। ইহার বাংলা নাই এবং হইতেও পারে না। ইংরেজিতে এই শব্দটি নানা সূক্ষ্মভাবে এমনি পাঁচরঙা যে ইহার প্রতিশব্দ বানাইবার চেষ্টা না করিয়া মূল শব্দটি গ্রহণ করা উচিত' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৯৪)। এ প্রসঙ্গে পরে আবার লিখেছেন: 'আমার মনে হয় নেশান, ন্যাশনাল প্রভৃতি শব্দ ইংরেজিতেই রাখা ভালো। যেমন অক্সিজেন হাইড্রোজেন। ওর প্রতিশব্দ বাংলায় নেই'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৯৭)[২৫]

বাংলা পরিভাষার অপর সম্ভাব্য উৎস 'প্রাকৃত বাংলা'। চলতি বাকরীতি ও শব্দভাণ্ডারে সম্ভাব্য পরিভাষার সন্ধান করা এবং ভাষার উন্নতি ও জনগোষ্ঠীর জ্ঞানজাগতিক লাভালাভের সঙ্গে এর সুদূরপ্রসারী সম্পর্কের কথা প্রথম তুলেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। 'নূতন কথা গড়া' প্রবন্ধে তিনি সংক্ষেপে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৫৫২-৫৮)। 'অভিধান' প্রবন্ধে রাজশেখর বসু সংকলিত *চলন্তিকা* অভিধানের সমালোচনায় পশ্চিমা নানাশাস্ত্রের পরিভাষা হুবহু গ্রহণের প্রতি তাঁর পক্ষপাত প্রকাশিত হয়েছে (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৮০৩)। আবার অর্দ্ধেন্দু শেখর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি থিয়েটারের ইংরেজি পরিভাষাগুলোর বদলে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের 'ছোটো, মিষ্ট দেশী শব্দ' গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ১০৯)। কিন্তু চালুভাষার লোকপ্রচলিত শব্দের দিকেই ছিল তাঁর মূল পক্ষপাত। 'নূতন কথা গড়া' প্রবন্ধ ছাড়াও 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্য-শাখায় সভাপতির সম্বোধন' প্রবন্ধে তাঁর এই পক্ষপাত ঘোষিত হয়েছে:

> বাংলায় আকাশে তারা মাপিবার যন্ত্রঘর ছিল না। যখন কলিকাতায় সেই ঘর হইল, পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার তর্জমা করিলেন 'পর্যবেক্ষণিকা'। কথাটা একে তো চোয়ালভাঙা, তাহাতে আবার কঠিন সংস্কৃত – শুদ্ধ কি না সে বিষয়েও সন্দেহ। হিন্দুস্থানি গাড়োয়ানেরা অত শত বুঝে না – তাহারা উহার নাম রাখিল 'তারা-ঘর', মোটামুটি উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল, কথাটি শুনিতেও মিষ্ট। তবে উহা চালাইতে দোষ কী? এইরূপ অনেক নূতন জিনিস, নূতন ভাব নিত্যই আসিতেছে; তাহাদের জন্য কথা গড়া একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার বোধ হয়, বাংলা হইতেই এ সমস্যার পূরণ হওয়া ভালো, বাংলা কথা দিয়াই নূতন কথা গড়া উচিত। নিতান্ত না পারিলে, আসামি, হিন্দি ও উড়িয়া খুঁজিয়া দেখা উচিত; তাহাতেও না হইলে যে ভাষার ভাব, সেই দেশের কথাতেই লওয়া উচিত। আমরা তো চিরকালই তাহাই করিয়া আসিতেছি, নহিলে 'বাতাবি লেবু', 'মর্তমান কলা', 'চাঁপা কলা' কোথা হইতে পাইলাম? সেইরূপ এখনো সোজা বাংলায়, সোজা কথায় এ সকল নূতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা উচিত; নহিলে কতকগুলো দাঁতভাঙা কট্‌কটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না। (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৩৭১-৭২)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত চর্চায় চলতি বাংলা থেকে পরিভাষা বা প্রতিশব্দ খোঁজার চেষ্টা খুব একটা করেননি। তাঁর তত্ত্ব-তালাশ প্রধানত সংস্কৃত-উৎসেই আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু চলতি বাংলায় এ ধরনের জুতসই প্রতিশব্দ খোঁজার তাৎপর্য সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। শুধু তাই নয়। যে ধরনের সংস্কারের বশে চালুশব্দের মধ্যে দরকারি পরিভাষা ও প্রতিশব্দ না-খোঁজার রেওয়াজ তৈরি হয়েছে, তারও পরিচয় দিয়েছেন:

> ইংরেজি অনেক নিত্যপ্রচলিত সামান্য শব্দ আছে বাংলায় তাহার তর্জমা করিতে গেলে বাধিয়া যায়। ... ইহার একটা কারণ, তর্জমা করিবার সময় আমরা স্বভাবতই সাধু ভাষার সন্ধান করিয়া থাকি, চলিত ভাষায় যে-সকল কথা অত্যন্ত পরিচিত সেইগুলিই হঠাৎ আমাদের মনে আসে না। চলিত ভাষা লেখাপড়ার গণ্ডির মধ্যে একেবারেই চলিতে পারে না এই সংস্কারটি থাকাতেই আমাদের মনে এরূপ বাধা ঘটিয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৮৮)

তিনি উদাহরণ দিয়েছেন sympathy শব্দ থেকে। বলেছেন, আমার পরে তাহার sympathy নাই – এই বাক্যের সহজ বাংলা 'আমার পরে তাহার দরদ্ নাই'। সমকালে এ অর্থে নতুন চালু হওয়া 'সহানুভূতি' শব্দটিকে তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৮৮; ২৮৭; ৩৬১)। বিপরীতে 'দরদ্' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: 'চলিত বাংলাকে অপাঙ্‌ক্তেয় ঠিক করিয়াছি বলিয়া ক্লাসে বা সাহিত্যে উহার গতিবিধি বন্ধ'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৮৮)

পরিভাষা বা প্রতিশব্দ সংকলনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজের চেষ্টায়ও তা প্রায় 'বন্ধ' ছিল। তাঁর স্থির-করা অধিকাংশ পরিভাষা গ্রাহ্য না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ত এই বাস্তবতা। কিন্তু তাঁর পদ্ধতিটি মূল্যবান। তাতে দেখা যায়, তিনি এক-একটি প্রতিশব্দ বা পরিভাষা প্রস্তাব করছেন, আর তা বিচারের ভার ছেড়ে দিচ্ছেন বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর দাবি অতি সামান্য: 'চেষ্টার দ্বারা চেষ্টাকে উত্তেজিত করা যায়, সেইটেই লাভ। এইজন্যই, কোনো ওস্তাদীর আড়ম্বর না করিয়া আমাদের সাধ্যমত পত্রলেখকদের প্রেরিত ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ভাবিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৯৩)। এ থেকে বোঝা যায়, অন্য অনেক ব্যাপারের মতো এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ সামষ্টিক – রচনা ও গ্রহণ দুই অর্থেই – অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। সামষ্টিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে এর কোনো বিকল্পও নেই। তবে বিচার-বিশ্লেষণ করে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য বিকল্প নির্বাচনের বহু নজির তাঁর রচনায় লভ্য, যা এ কাজে পরবর্তীদের পথ-প্রদর্শক হতে পারে।[২৬]

টীকা

১. মনিরুজ্জামান অবশ্য বোধগম্যতার ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন: 'রবীন্দ্রনাথ অল্পে যা বুঝেছিলেন বাঙালি পণ্ডিত সমাজের কাছে আজও তা জ্ঞানবহির্ভূত। এখনো তাঁরা তার মর্ম বুঝতে পারেন নি'। (মনিরুজ্জামান ১৪১৯: ৭৬)

২. ব্যতিক্রম বা আংশিক ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* এরকম এক দৃষ্টান্ত। এ গ্রন্থে পশ্চিমা ধ্বনিতত্ত্বের অনুসরণ আছে; কিন্তু বিশেষ কোনো ছাঁচের প্রতাপ নেই। বাংলা ভাষার তথ্য-উপাত্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণের জন্য তিনি পশ্চিমা ভাষাতত্ত্বের ধারণা প্রয়োগ করেছেন। তাতে তাঁর সাফল্য এক ধরনের সর্বজনীন স্বীকৃতিও পেয়েছে।

৩. এ ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে কার্যকর আলোচনা করেছেন শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। সংস্কৃতের ঋণ ছাড়া বাঙালির কোনো সাধারণ ভাষা সম্ভব নয় – এমন যুক্তির প্রেক্ষাপটে তাঁর বক্তব্য:

> If this is the fact, then Bengal by all means should have several written languages instead of one. Convenience – human happiness – must be the plea for cultivating the Bengali language at all. If, by ceasing to borrow, from Sanskrit, words of the commonest kind, we are to dissolve the linguistic unity of the people of Bengal, by all means let such factitious unity be dissolved at once. Popular education would spread better, and so human happiness would be better promoted, if the different sections of Bengal set up each its own dialect as the language of writing. (Ganguli 1990: 27)

শ্যামাচরণ অবশ্য সংস্কৃতপন্থীদের দাবি বাতিল করে দিয়েছেন: 'The fact, however, is that there is a general grammatical correspondence among the different dialects of Bengal, and the vocables in common use, too, are in general the same all over the country.' (Ganguli 1990: 27)

৪. সাধু ভাষার ক্রিয়ারূপের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নানা উপভাষার ক্রিয়ারূপের মিল আরো অনেকেই শনাক্ত করেছেন। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে বইয়ের ভাষার সঙ্গে যথাক্রমে কলকাতা, বাঁকুড়া, মালদা আর ঢাকার উপভাষার ক্রিয়ারূপের যে তুলনামূলক ছক তৈরি করেছেন, তাতে দেখা যায়, ঢাকাই উপভাষা ক্রিয়ারূপের দিক থেকে, শ্যামাচরণের ভাষায়, standard book-Bengali-র অনেক নিকটবর্তী (Ganguli 1990: 17)।

৫. বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাসকার নির্মল দাশ নতুন ধরনের কয়েকটি কাজের উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর মূল্যায়ন নিম্নরূপ:

> বাংলা ব্যাকরণচর্চার ক্ষেত্রে ইদানীং কালে তেমন কোনো অভূতপূর্ব বা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেনি, – একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে বাংলা ভাষার স্বরূপ উদঘাটন ও পরিচায়নের ব্যাপারে সক্রিয় ও প্রয়োজনভিত্তিক চিন্তাভাবনার কাজও ইদানীংকালে বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। এইসব কাজ ঘটেছে ও ঘটছে স্কুল-ব্যাকরণের সীমানার বাইরে, অন্যদিকে এইসব কাজ দেখা দিচ্ছে নিভৃত একক চিন্তা বা সভাসমিতির নিতান্ত তাত্ত্বিক বাদানুবাদের পরিণাম হিসেবে নয়। এইসব কাজ উঠে আসছে কর্মক্ষেত্রের বাস্তব ও প্রায়োগিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে যৌথ চিন্তার ভিত্তিতে। এই ধরনের প্রয়োজনভিত্তিক কাজের মধ্যে তিনটি উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল অধ্যাপক ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের নেতৃত্বে জাপানের তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সাধিত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল

ইনস্টিটিউটের গবেষণা প্রকল্প ‘গীতাঞ্জলি: সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাষাভিত্তিক বিশ্লেষণ’। এই বিশ্লেষণে কম্পিউটার-প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। বিশ্লেষণের সময় সম্পাদকমণ্ডলি ও গবেষণা-সহায়করা লক্ষ করেছেন বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রচলিত কাঠামো বিজ্ঞানসম্মত নয়, কাজেই সম্পাদকমণ্ডলী প্রচলিত ব্যাকরণ-কাঠামোকে ভেঙে বিশ্লেষণের নতুন ব্যাকরণগত ছক তৈরি করে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় কাজ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বিদ্যার্থী অভিধান প্রকল্প। এখানেও যৌক্তিকতার স্বার্থে সম্পাদকেরা অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েছেন প্রচলিত ব্যাকরণকাঠামোকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে। তৃতীয় কাজটি হল সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের বিভিন্ন শাখায় দৈনন্দিন বাংলা ব্যবহারের মধ্যে একটা যুক্তিভিত্তিক সামঞ্জস্য আনার উদ্যোগ। বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে *আনন্দবাজার পত্রিকা* এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা নেয় এবং সেই উপলক্ষে *বাংলা : কী লিখবেন কেন লিখবেন* প্রকাশিত হয়। ... এইসব প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্ম সবই ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে। প্রতিষ্ঠান-আশ্রিত এইসব যৌথ চিন্তা ও পরামর্শ যে সমস্তই নিশ্ছিদ্র ও ত্রুটিহীন – ঘটনা এমন নয়। তবু এইসব প্রয়াস থেকে বোঝা যায় যে বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে অর্থাৎ বাংলা ভাষাচর্চার হাজার বছর পর বাংলা ভাষার রূপ ও স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য নূতনতর ব্যাকরণকাঠামোর কথা ভাবার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। (নির্মল ২০০০: (৭)-(৮))

৬. এই ব্যাকরণের প্রায় প্রতিটি প্রসঙ্গে বিস্তর কৈফিয়ত দেওয়া হয়েছে। এর কারণ অবশ্য অনুমান করা যায়। অন্য ধাতুর ব্যাকরণে অভ্যস্ত পাঠক আর ভিন্ন মতাবলম্বী বৈয়াকরণদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। ক্রমশ মূলনীতি হিসাবে এ ব্যাকরণের নতুন প্রস্তাবগুলো গ্রাহ্যতা পেলে এ অংশগুলো বাদ দেওয়া সম্ভব।

৭. ‘বাংলা ব্যাকরণ’ প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছ প্রতিফলন পাওয়া যায়। এখানে তিনিটি অংশ উদ্ধৃত হল:

এক. বাংলায় যাহা-কিছু সংস্কৃতের নিয়ম মানে না, তাহাকে একদল লোক কুলত্যাগী বলিয়া ত্যাগ করিতে চান, এবং সংস্কৃতের নিয়মকে বাংলায় সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহাদের চেষ্টা। তাঁহাদের বিশ্বাস, স্বরচিত ব্যাকরণে তাঁহারা সংস্কৃত-নিয়মকে জাহির করিলে এবং বাংলা-নিয়মের উল্লেখ না করিলেই, বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহারা মনে করেন, ‘পাগলাম’ এবং ‘সাহেবিয়ানা’ কথা যে বাংলায় আছে, ও ‘আম’ এবং ‘আনা’ নামক সংস্কৃতেতর প্রত্যয় দ্বারা তাহারা সিদ্ধ, এ কথা না তুলিলেই আপদ চুকিয়া যায় – এবং যখন প্রয়োজন হয়, তখন ‘উন্মত্ততা’ ও ‘ইংরাজানুকৃতিশীলত্ব’ কথা ব্যবহার করিলেই গ্রাম্য কথা দুটির অস্তিত্বই ঢাকিয়া রাখা যাইবে।
বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাংলার কারক-বিভক্তিকে সংস্কৃত কারক-বিভক্তির সঙ্গে অন্তত সংখ্যাতেও সমান বলিতে চান। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১০৬)

দুই. ণিচ্-এর সংকেত বাংলায় খাটে না, তবু পণ্ডিতমশায় যদি ওই কথাটাকে বাংলায় চালাইতে চান, তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সংস্কৃত নৌকা দাঁড়ে চলে, অতএব বাংলা ফসলের খেতে লাঙল চলিবে কেন, নিশ্চয়ই দাঁড় চলিবে। কিন্তু দাঁড় জিনিসটা অত্যন্ত দামি উৎকৃষ্ট জিনিস হইলেও তবু চলিবে না। শ্রু ধাতু যে-নিয়মে ‘শ্রাবি’ হয়, সেই নিয়মে শুন্ ধাতুর ‘শু’ ‘শৌ’ হইয়া ও পরে ইকার যোগে ‘শৌনিতেছে’ হইত। হয়ত খুব ভালোই হইত, কিন্তু হয় না যে সে আমার বা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের দোষ নহে। সংস্কৃতে পঠ্ ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া পাঠন হয়, বাংলায় সেই অর্থে পড়ু ধাতু হইতে ‘পড়ান’ হয়, ‘পাড়ন’ হয় না। অতএব যেখানে তাহার সংকেতই কেহ মানিবে না, সেখানে অস্থানে অকারণে বৃদ্ধ ণিচ্ সিগ্‌নালার তাহার প্রাচীন পতাকা তুলিয়া কেন বসিয়া থাকিবে, সে নাই-ও। তাহার স্থলে আর-একটি যে-সংকেত বসিয়া আছে, সে হয়ত তাহারই শ্রীমান পৌত্র, আমাদের ভক্তিভাজন ণিচ্ নহে;

কৌলিক সাদৃশ্য তো কিছু থাকিবেই, কিন্তু ব্যবহারের ব্যতিক্রমেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১৫)

তিন. খাঁটি বাংলা কথাগুলির নিয়ম অত্যন্ত পাকা; ... দাগ শব্দের উত্তর কোনো মতেই ইত প্রত্যয় করিয়া 'দাগিত' হইবে না, ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ যতই চক্ষু রক্তবর্ণ করুন। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের বেলায় আমাদের স্বাধীনতা অনেকটা বেশি। আমরা ইচ্ছা করিলে 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দরী' বলিতে পারি, আবার 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দর' ইহাও বলা চলে। ... সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার সুবিধামত কখনো নিজের নিয়মে চলে, কখনো বাংলানিয়মে চলে। কিন্তু খাঁটি বাংলা কথার সে-স্বাধীনতা নাই – 'কথাটা উপযুক্তা হইয়াছে' এমন প্রয়োগ চলিতেও পারে, কিন্তু 'কথাটা ঠিক হইয়াছে' না বলিয়া যদি 'ঠিকা হইয়াছে' বলি, তবে তাহা সহ্য করা অন্যায় হইবে। অতএব বাংলা রচনায় সংস্কৃত শব্দ কোথায় বাংলানিয়মে, কোথায় সংস্কৃতনিয়মে চলিবে তাহা ব্যাকরণকার বাঁধিয়া দিবেন না, তাহা অলংকারশাস্ত্রের আলোচ্য। কিন্তু বাংলা শব্দ ভাষার ভূষণ নহে, ভাষার অঙ্গ – সুতরাং তাহাকে বোপদেবের সূত্রে মোচড় দিলে চলিবে না, তাহাতে সমস্ত ভাষার গায়ে ব্যথা লাগিবে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১১৬-১৭)

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কেবল তথাকথিত 'বাংলা অংশে'র ন্যায্য হিস্যা দাবি করেননি; বরং ওই অংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কথিত 'সংস্কৃত অংশে', তাঁর মতে, বাংলার নিয়ম চলতেও পারে; কিন্তু 'বাংলা অংশে' সংস্কৃতের নিয়ম চলার কোনো উপায় নেই।

৮. বাংলা ভাষার 'তৎসম' উপাদানের তৎসমত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে, যদিও সে স্বীকৃতি বাংলা ব্যাকরণের প্রগতির পক্ষে বিশেষ ব্যবহৃত হয়নি। এখানে এরকম দুটি মত-মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল:

এক. প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণকারদের অনুসরণ করিয়া বাংলা ভাষার বৈয়াকরণগণ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত-আকৃতিবিশিষ্ট শব্দকে তৎসম নামে অভিহিত করিতেছেন। ... প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ 'সম' বলিয়াছেন কোন্ অর্থে? রূপের দিক দিয়া সমান? না, ধ্বনির দিক দিয়া সমান? বাংলায় সংস্কৃতের রূপটাকেই গণনা করা হয়। প্রাকৃতে কি হইত? শুধু রূপ বা শুধু ধ্বনি অথবা রূপ এবং ধ্বনি উভয়েরই সমতা বিচার করা হইত? আমাদের মনে হয় কেবল ধ্বনিটাকে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। রূপ তাঁহাদের গণনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমাদের ধারণা সত্য প্রমাণিত হইলে বলিতে হইবে বাংলা ভাষায় যে শব্দগুলির তৎসম নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহারা আর যাহাই হউক তৎসম নয়। (বিজন ১৯৭৭: ৯৫)

উল্লেখ্য, এই প্রবন্ধে লেখক এ মতের পক্ষে বিস্তর সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়েছেন।

দুই. তৎসম শব্দ খুঁজিয়া পাইতেছি না। 'বণিক্' 'দিক্' হসন্ত হারাইল, তাহাদের তৎসমত্ব বজায় রহিল কি? 'বস্তুতঃ' বিসর্গ হারাইল, তাহা তৎসম রহিল কি? ... 'সুরিয়' যখন সূর্য হইল, 'নক্ষত্র' যখন 'নক্‌খত্র' হইল তখন তো তাহা খাঁটি বাংলাই হইয়া গেল, উহাদের তৎসমত্ব বজায় রহিল কি? ... যাহাকে একান্তভাবে বাংলার শব্দ বলিয়াই জানিতাম বাচস্পতি মনিয়র উইলিয়াম সাহেব তাহাদের তৎসম বলিয়া শনাক্ত করিয়াছেন। যেমন, ভগিনী হইতে ভগ্নী আসিয়াছে। বাংলার স্বভাবধর্ম মানিয়া আমরা 'ভগ্নী'কে হ্রস্বত্ব দান করিলাম – 'ভগ্নী' হইল 'ভগ্নি'। কিন্তু উইলিয়াম সাহেব বলেন 'ভগ্নী'ই তৎসম, আবার তাহার দীর্ঘত্বের কথা চিন্তা করিতে হইল। 'ভাণ্ডার' শব্দটিরও একই অবস্থা। জানিতাম 'ভাণ্ডাগার' হইতে 'ভাণ্ডার'। সাহেব বলিলেন, তাহা নহে – 'ভাণ্ডার'ই সংস্কৃত। (জ্যোতি ২০০৫: ১৩৬-৩৭)

৯. এর বিপরীত উদাহরণও আছে। সংস্কৃত উৎসেও অনেক শব্দের অর্থ খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সে খোঁজাখুঁজির একটা কারণ ছিল প্রচলিত বা সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের সুবিধাজনক অর্থ-নির্ণয়; আর অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতপন্থীদের দাবি যে খোদ সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধানেই সিদ্ধ নয়, সে প্রমাণ দাখিল করা। সাধারণভাবে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুযায়ী বাংলা ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর এ অবস্থান স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে:

> মৃত্যুঞ্জয় শর্মা প্রভৃতিরা একদিন বাংলা গদ্যসাহিত্যকে সংস্কৃত ভিতের উপর গড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। আজ তাহার ধ্বংসাবশেষও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার পরে ইংরেজিনবিশ বঙ্কিমচন্দ্রের দল যখন কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন তখন তাঁহাদের ষত্বণত্ব লইয়া সংস্কৃত কেল্লা হইতে অনেক গোলাগুলি চলিয়াছিল কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি আজও দুষ্ট ব্যাকরণের কলঙ্ক গায়ে মাখিয়াও উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে। আজ কলঙ্ক-ভঞ্জনের চেষ্টা হইতেছে। ঘটে যে ছিদ্র ছিল তাহা কেহ অস্বীকার করিতেছে না কিন্তু তবু সে ঘট পূর্ণ হইয়া আছে। কলঙ্ক সত্ত্বেও গৌরবহানি হইতেছে না। জল তোলা চলিতেছে বটে কিন্তু কোডাক্ ক্যামেরার দ্বারা ধরা পড়িয়াছে ছিদ্র আছে; সেটা একেবারে সপ্রমাণ হইয়া গেছে, জল পড়ুক না পড়ুক মাথা হেঁট করিতেই হইবে – কিন্তু আমি বলিতেছি ছিদ্র সারিবে না, তবু কলঙ্ক মোচন হইবে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৫৪)

১০. রবীন্দ্রনাথের ভাষা-সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনায় এ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের ভূমিকা-মন্তব্যে তিনি লিখেছেন: 'এই গ্রন্থে সমর্থিত কোনো উচ্চারণ বা ভাষারীতি কারো কারো অভ্যস্ত নয়। সুতরাং ব্যবহারে পরস্পরের পার্থক্য আছে। সেই অবস্থায় রাশীকরণের প্রণালীতে অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের সাংখ্যিক তুলনায় তার বিচার স্থির হতে পারবে'। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩: ৫৯৬)

১১. মনসুর মুসা মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী আসলেই বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ, এক. 'বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ' নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; দুই. 'যতগুলো উপভাষা প্রচলিত আছে' – কথাটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা দুরূহ। তাঁর সিদ্ধান্ত:

> সুতরাং যাচাইকরণ-যোগ্যতার মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ সম্ভবপর না হলেও কিঞ্চিৎ জটিল ব্যাকরণ কিংবা কিঞ্চিৎ পরিব্যাপ্ত ব্যাকরণ যে লেখা যায় না, তা নয়। সে অর্থে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন বা ধারণার আংশিক বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। অবশ্য ইচ্ছা পূরণের ব্যাকরণের উপযোগিতা কী হবে, সেটা আগেই ভেবে কাজে হাত দেওয়া উচিত বলে মনে করি। কারণ সব ব্যাকরণ একই সঙ্গে নির্মাণ করা দুঃসাধ্য, এবং সে ধরনের ব্যাকরণ যাচাইকরণের অসুবিধার কারণে 'বৈজ্ঞানিক' হবে না। (মনসুর ১৯৯১: ২১)

এ মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবকে খুব আক্ষরিকভাবে বিচার করা হয়েছে। তাঁর অন্য রচনা ও মতের সাপেক্ষে এই প্রস্তাবের আভ্যন্তর প্রেরণা ও চাওয়াটি খতিয়ে দেখা হয়নি। বিপরীতে 'বৈজ্ঞানিক' বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'ভাষাবিজ্ঞানে'র প্রচলিত বিজ্ঞান-কাঠামোকে স্থির ধরা হয়েছে। বাংলা ভাষার পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ আসলে 'প্রমিত বাংলা'র কথাই বলেছেন। কিন্তু 'প্রমিত' কথাটির মধ্যে বিশেষ স্থান ও সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির যে অগণতান্ত্রিক আধিপত্য থাকে, তা যথাসম্ভব কমিয়ে এনে, ভাষার প্রাথমিক বিধিবদ্ধকরণকে যথাসম্ভব বিশদ, গ্রহণযোগ্য ও গণতান্ত্রিক করাই তাঁর প্রস্তাবের নিহিত সুর। সে ব্যাকরণ একটি না হয়ে অনেকগুলো হতে পারে, বিদেশিদের জন্য বা শিশুর জন্য হতে পারে; দাপ্তরিক কাজ ও সামাজিক ব্যবহারের জন্য হতে পারে – তার কোনো গণ্ডি তিনি ঠিক করে দেননি। কাজটি একবার হবে তারও কোনো মানে নেই।

রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, এটা একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া। কাজটি কঠিন, এবং আক্ষরিক অর্থে করা সম্ভব নয় – এজন্য একে অবৈজ্ঞানিক বলা যায় না।

১২. মনসুর মুসা 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধের উল্লেখ করে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু উচ্চবাচ্য করেন নি' (মনসুর ১৯৯১: ১৭)। এ তথ্য যথার্থ নয়। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধ ছাড়াও ১৩২৬ বঙ্গাব্দে রচিত 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে প্রসঙ্গটি আবার আলোচিত হয়েছে:

> বাংলা শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত উচ্চারণগুলির তুলনা আবশ্যক। অনেক বাংলা শব্দের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কৃতকার্য হওয়া যায় না। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারিত শব্দগুলি মিলাইয়া দেখিলে সেই মূল ধরিতে পারা সহজ হইতে পারে। তাহা ছাড়া উচ্চারণতত্ত্বটি শব্দতত্ত্বের একটি প্রধান অঙ্গ। স্বর ও ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির কী নিয়মে বিকার ঘটে তাহা ভাষাতত্ত্বের বিচার্য। এজন্যও ভিন্ন জেলার উচ্চারণের তুলনা আবশ্যক। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২২৩)

বোঝা যায়, এ প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণচিন্তার অংশবিশেষ নয়, বরং সমগ্রের ভিত্তি।

১৩. মনীন্দ্রকুমার ঘোষ লক্ষ করেছেন, বানান-সংস্কার সমিতির স্থির করে দেওয়ার আগে 'করছি' শব্দটির 'বানান ছিল ডজন-তিনেক'। 'ক, ক', কো; র, র্, রেফ, সম্পূর্ণ র বা রেফবিহীন; চি, চ্চি, ছি, চ্ছি – এই বর্ণগুলির প্রায় সবরকম বিন্যাস দেখা যেত'। (মনীন্দ্র ১৪০৯: ২৬)

১৪. ভাষা-প্রসঙ্গে সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ এ 'কেজো' দিকের প্রতি লক্ষ রেখেছিলেন। 'বানান-বিধি' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যখন লিপিবদ্ধ হয়েছে তখন সে যে ছদ্মবেশে সংস্কৃত ভাষা, পণ্ডিতেরা এমন অভিমান রাখেন নি; তাঁদের যথার্থ পাণ্ডিত্য প্রমাণ হয়েছে বানানের যাথার্থ্যে।
>
> সেই সনাতন সদৃষ্টান্ত গ্রহণ করবার উপযুক্ত সময় এসেছে। এখনো প্রাকৃত বাংলায় বানানের পাকা দলিল তৈরি হয় নি। এই সময়ে যদি উচ্চারণের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান রক্ষা করে বানানের ব্যবস্থা হতে পারত তাহলেও কোনো পক্ষ থেকেই নালিশ-ফরিয়াদের যে কোনো আশঙ্কা থাকত না তা বলি নে, কিন্তু তার ধাক্কা হত অনেক কম। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬৯-৭০)

দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা প্রথম পত্রে এ কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য:

> প্রাকৃত বাংলায় তদ্ভব শব্দ বিভাগে উচ্চারণের সম্পূর্ণ আনুগত্য যেন চলে এই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যদি নিতান্তই সেই ভিত্তিতে বানানের প্রতিষ্ঠা নাও হয় তবু এমন একটা অনুশাসনের দরকার যাতে প্রাকৃত বাংলার লিখনে বানানের সাম্য সর্বত্র রক্ষিত হতে পারে। সংস্কৃত এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা ছাড়া সভ্য জগতের অন্য কোনো ভাষারই লিখনব্যবহারে বোধ করি উচ্চারণ ও বানানের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই কিন্তু নানা অসংগতিদোষ থাকা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে একটা অমোঘ শাসন দাঁড়িয়ে গেছে। কাজ চলবার পক্ষে সেটার দরকার আছে। বাংলা লেখনেও সেই কাজ চালাবার উপযুক্ত নির্দিষ্ট বিধির প্রয়োজন মানি, ... বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতির বিধানকর্তা হবার মতো জোর আছে – এই ক্ষেত্রে যুক্তির জোরের চেয়ে সেই জোরেরই জোর বেশি এ কথা আমরা মানতে বাধ্য। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৫-৭৬)

১৫. প্রত্যক্ষত এ রকম তিনটি আপত্তির উল্লেখ পাওয়া যায় সংশ্লিষ্ট রচনাগুলোতে। এক. 'খেও', 'দিও' বানানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতে 'খেয়ো' এবং 'দিয়ো' যুক্তিসঙ্গত (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬২-৬৩)। দুই. প্রস্তাবিত 'কাল' (কালো অর্থে) বানান তিনি মানেন নি; কারণ, তাঁর ভাষায়, 'কালো উচ্চারণের ওকার প্রাকৃত বাংলার একটি মূল তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। তত্ত্বটি এই যে

দুই অক্ষরবিশিষ্ট বিশেষণ পদ এই ভাষায় প্রায়ই স্বরান্ত হয়ে থাকে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭১)। তিন. প্রস্তাবিত কোনও, কখনও, যখনই, তখনই প্রভৃতির বদলে তিনি কোনো, কখনো, যখনি, তখনি লেখা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭২-৭৩)।

অন্যত্র কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখিত এক পত্রে এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য: 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-বিধির সম্বন্ধে দুটিমাত্র আপত্তি। কখনো কোনো আমারি তোমারি আজো প্রভৃতি শব্দে অন্তস্বর যুক্ত থাকিবে। দ্বিতীয়, ছোটো বড়ো কালো ভালো প্রভৃতি বিশেষণ পদের অন্তস্বর লোপ করা অবৈধ হবে বলে মনে করি'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ৩০০)

১৬. 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> তিনটে স, দুটো ন ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে স-এর হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পূর্বে পণ্ডিতমশায় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, 'দেখো বাপু, 'সুশীতল সমীরণ' লিখতে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তো লিখে দিও 'ঠাণ্ডা হাওয়া''। এছাড়া দুটো ব-এর মধ্যে একটা কোনো কাজে লাগে না। ঋ ৯ ঙ ঞ-গুলো কেবল সঙ সাজিয়া আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘহ্রস্ব স্বর। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৬)

১৭. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন তা নেওয়া হয়েছে দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা প্রথম পত্র থেকে:

> তৎসম শব্দ সম্পর্কে আমি নমস্যদের নমস্কার জানাব। কিন্তু তদ্ভব শব্দের অপণ্ডিতের অধিকারই প্রবল, অতএব এখানে আমার মতো মানুষেরও কথা চলবে – কিছু কিছু চালাচ্ছিও। যেখানে মতে মিলছি নে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানছি। কেননা, অক্ষরকৃত অসত্যভাষণের দ্বারা তাদের মন মোহগ্রস্ত হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতির চেয়েও তাদের কথার প্রামাণিকতা যে কম তা আমি বলব না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৭৭)

১৮. পবিত্র সরকার রবীন্দ্রনাথের বানান-সংক্রান্ত লেখালেখি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'তিনি শেষ পর্যন্ত একটি বাস্তবসম্মত আপোসরফা করেছেন' (পবিত্র ২০০৪: ১৩১)। 'কিছু বানান আগের মতোই রাখতে হবে, কিছু বানান ধ্বনিসংগত করা যেতে পারে' – তাঁর মতে, এই ব্যবস্থার প্রতিই রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত। তাঁর এ সিদ্ধান্ত বাংলা বানানের চলমান ধারার ক্ষেত্রে যতটা সত্য, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ততটা নয়। এ ধরনের কিছু মত-মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে সমস্ত শব্দের যথাসম্ভব ধ্বনি-অনুসারী বানানই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

১৯. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য পুরোনো বাংলা পুঁথিতে কিছু অনুসন্ধান চালিয়ে লিখেছেন:

> বাংলা ভাষার প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, যেমন রচনাপদ্ধতিতে তেমনি বানান-পদ্ধতিতেও সংস্কৃতের প্রভাব অল্প ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই এই প্রভাব অতিশয় বৃদ্ধি পায়। ইহার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা বানানে শৃঙ্খলার অভাব ছিল একথা সত্য, কিন্তু বানানকে যে উচ্চারণের অনুগত করিবার চেষ্টা ছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। (বিজন ১৯৭৭: ১০০)

অন্যত্র পুরোনো বাংলা পুঁথির বানান-শৃঙ্খলা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> পুরাতন বাংলা পুঁথির বানানে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না এইরূপ একটি ধারণা আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ... একটু অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে প্রথম দৃষ্টিতে যাহাকে অনিয়ম বলিয়া মনে করা হয় তাহার মধ্যেও কয়েকটা নিয়মের সূত্র আবিষ্কার করা যাইতে পারে। সে নিয়ম আদ্যন্ত নীরন্ধ্র ও নির্বিকল্প না

হইতেও পারে কিন্তু তাহার মধ্য হইতেই তৎকালীন লিপিকারগণ কোন্ ধ্বনি বুঝাইতে সাধারণত কোন্ বর্ণ ব্যবহার করিতেন তাহার একটা নির্দেশ পাওয়া যাইবে। (বিজন ১৯৭৭: ৫১)

উনিশ-বিশ শতকে বাংলা বানান-নির্ধারণের প্রশ্নে এ উৎসের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা বাংলার ইতিহাসে যে সর্বাঙ্গীণ ছেদ তৈরি করেছিল, এটি তার এক উদাহরণ।

২০. বানান-প্রসঙ্গে রাজশেখর বসুকে লেখা এক পত্রে অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়:

> প্রাকৃত বাংলার বানান সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য আছে। ইংরেজি ভাষার লিখিত শব্দগুলি তাদের ইতিহাসের খোলস ছাড়তে চায় না – তাতে করে তাদের ধ্বনিরূপ আচ্ছন্ন। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাকৃত এ পথের অনুসরণ করে নি। তার বানানের মধ্যে অবঞ্চনা আছে, সে যে প্রাকৃত, এ পরিচয় সে গোপন করে নি। বাংলা ভাষায় ষত্বণত্বের বৈচিত্র্য ধ্বনির মধ্যে নেই বললেই চলে। সেই কারণে প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পুঁথিতে লোকভাষা লেখবার সময় দীর্ঘহ্রস্ব ও ষত্বণত্বকে সরল করে এনেছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল না পাছে সেজন্য তাঁদের কেউ মূর্খ অপবাদ দেয়। আজ আমরা ভারতের রীতি ত্যাগ করে বিদেশীর অনুকরণে বানানের বিড়ম্বনায় শিশুদের চিত্তকে অনাবশ্যক ভারগ্রস্ত করতে বসেছি। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৯৮)

২১. এ প্রসঙ্গে তিনি দেবপ্রসাদ ঘোষকে এক পত্রে লিখেছেন:

> অব্যয় শব্দ 'কি' এবং সর্বনাম শব্দ 'কী' এই দুইটি শব্দের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভিন্ন বানান না থাকলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে। এমন-কি, প্রসঙ্গ বিচার করেও বাধা দূর হয় না। 'তুমি কি জানো সে আমার কত প্রিয়' আর 'তুমি কী জানো সে আমার কত প্রিয়', এই দুই বাক্যের একটাতে জানা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হচ্ছে আর একটাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে জানার প্রকৃতি বা পরিমাণ সম্বন্ধে, এখানে বানানের তফাত না থাকলে ভাবের তফাত নিশ্চিত রূপে আন্দাজ করা যায় না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৮৪-৮৫)

জীবনময় রায়কে লেখা পত্রে আবার প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে:

> প্রশ্নসূচক অব্যয় 'কি' এবং প্রশ্নবাচক সর্বনাম 'কি' উভয়ের কি এক বানান থাকা উচিত। আমার মতে বানানের ভেদ থাকা আবশ্যক। একটাতে হ্রস্ব ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ ঈ দিলে উভয়ের ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝবার সুবিধা হয়। 'তুমি কি রাঁধছ' 'তুমি কী রাঁধছ' – বলা বাহুল্য এ দুটো বাক্যের ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র। তুমি রাঁধছ কি না, এবং তুমি কোন্ জিনিস রাঁধছ, এ দুটো প্রশ্ন একই নয়, অথচ এক বানানে দুই প্রয়োজন সারতে গেলে বানানের খরচ বাঁচিয়ে প্রয়োজনের বিঘ্ন ঘটানো হবে। যদি দুই 'কি'-এর জন্য দুই ইকারের বরাদ্দ করতে নিতান্তই নারাজ থাক তাহলে হাইফেন ছাড়া উপায় নেই। দৃষ্টান্ত : 'তুমি কি রাঁধ্‌ছ' এবং 'তুমি কি-রাঁধ্‌ছ'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৯০)

২২. যেমন, প্রবোধচন্দ্র সেন 'ং' এবং 'ঙ'-কে বিকল্প হিসাবে সর্বত্র শুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছেন:

> কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার বানানবিধিতে সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম উদ্ধার করে সংগীত, অহংকার প্রভৃতি ধরনের শব্দে ঙ্গ ঙ্ক যুক্তাক্ষরের জায়গায় অনুস্বার দিয়ে লেখাকে সিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু লেখালেখির কারবার যারা করেন তাদের সবাইকেই ব্যাকরণ জানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কাজেই সঙ্গী, বঙ্গ এসব শব্দও সংগী, বংগ হিসাবে লেখা হতে লাগল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে এ বানান স্বীকৃত নয়। আমার কিন্তু মত হল যে, এসব বানান স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এতে ভ্রান্তি কম হবে এবং যুক্তাক্ষরের ব্যবহারও কিছু কমবে। আমরা বাংলায় ং কে 'ঙ'-র স্থলবর্তী বলে ধরে নিতে পারি। প্রাচীন বাংলা পুথিতে 'বংশ' শব্দ 'বঙ্‌শ' হিসাবে লিখিত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ ং ও ঙ পরস্পরের স্থলবর্তী হয়েছে। উচ্চারণের ক্ষেত্রেও তাই। সে কারণে যুক্তাক্ষরে 'ঙ'-এর জায়গায় ং লেখা

হতে পারে। সকলে তো আর ব্যাকরণ জেনে বানান লেখেন না, কিন্তু এরকম বিধান থাকলে বানান ভুলের দায় থাকবে না। (প্রবোধ ১৯৮৬: ৩)

২৩. বাংলা ভাষার স্বভাব আবিষ্কারের প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক ভাষাচর্চার কেন্দ্রীয় বিবেচ্য। প্রাকৃত বাংলার বানান বিধিবদ্ধকরণ প্রসঙ্গে তিনি কথাটা স্পষ্ট করে বলেছেন। লিখেছেন, এ কাজটা 'সুনীতিকুমারের দলের। বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে স্বীকার করে তার স্বভাবসংগত নিয়মগুলি তাঁরাই উদ্ভাবন করে দিন'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬০)

২৪. 'ফরাসি আকাদেমি তার বিখ্যাত অভিধান প্রথম প্রকাশ করবার সময়, পাঁচ হাজার ফরাসি শব্দের, অর্থাৎ তখনকার (১৭৬২) ফরাসি ভাষার মোট শব্দ সম্ভারের প্রায় বার ভাগের এক ভাগ শব্দের বানান সংস্কার করেছিল' (মুস্তাফা ১৯৭৬: ৪৮)। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ফরাসি ভাষার উদাহরণ ব্যবহার করেননি – আমেরিকার বানান-সংস্কার নিয়ে কথা বলেছেন।

মূলত ফ্রাঙ্কলিন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওয়েবস্টার ১৭৮৯ সালের পর থেকে বানান ও উচ্চারণের সংস্কার শুরু করেন। একটা লম্বা প্রক্রিয়ায় ক্রমশ গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এই সংস্কার গৃহীত হয়, এবং এর একটা অংশ নানারূপে (শব্দ, বানান, উচ্চারণ ও রূপ) ইংল্যান্ডের ইংরেজিকেও প্রভাবিত করেছে। (Baugh and Cable 2002: 369-72)

ইংরেজি ছাড়াও হিন্দি বানানের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বারবার টেনেছেন। হিন্দির উচ্চারণ-অনুসারী বানানের প্রশংসা করেছেন তিনি; একই সঙ্গে ভাষায়-বানানে সংস্কৃতায়নের নতুন প্রবণতার নিন্দাও করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৬০)।

২৫. বাংলা ভাষার পরিভাষা হিসাবে ইংরেজি শব্দ গ্রহণের ক্ষেত্রে যে দ্বিধা দেখা যায় তার উৎস উপনিবেশ আমলে জেঁকে বসা ভাষার বিশুদ্ধতা-সম্পর্কিত এক কুসংস্কার। ভাবা হয়, অন্য ভাষার শব্দ আত্মীকরণের ফলে ভাষার বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে মনোভাবটা ঠিক তার উলটো। এ ক্ষেত্রে যে কোনো সংস্কৃত শব্দকেই বাংলা ভাষার সম্ভাব্য শব্দ হিসাবে ভাবা হয়। দুই সিদ্ধান্তই বিভ্রান্তিকর। বাংলা ভাষার স্বভাব ও চালু সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সংস্কৃত শব্দ পাওয়া গেলে এবং অনুরূপ শব্দ বাংলায় না থাকলে তা ধার করার ক্ষেত্রে কোনো পক্ষেরই ভিন্নমত দেখা যায়নি। কিন্তু তা ভিন্ন ভাষার ঋণ হিসাবেই বিবেচ্য। বিপরীতে প্রধানত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বহু পরিভাষা ব্যবহারিক কারণেই বাংলাভাষীদের মুখে উঠে আসে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে চালু হয়ে যাওয়া সে সকল শব্দ বাংলা শব্দ হিসাবেই লেখার ভাষায় ব্যবহার করা উচিত। এ ব্যাপারে সমকালীন বাস্তবতায় রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল। কিন্তু মূলনীতি হিসাবে তিনি এ সত্য মেনে নিয়েছেন। দিলীপকুমার রায়কে লেখা এক পত্রে তিনি লিখেছেন: 'সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় যেখানে সহজে সাড়া না দেয় সেখানে মূল শব্দের শরণ নিয়ো। ভাষায় ম্লেচ্ছ সংস্রবদোষ একদা গর্হিত ছিল। এখন সেদিন নেই – এখন ভাষার অন্নিবাসে ফিরিঙ্গিতে বাঙালিতে ঘেঁষাঘেঁষি বসে'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ১৯৬)

২৬. *বাংলা শব্দতত্ত্বে* এরকম বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। এখানে নমুনা হিসাবে দুটি উদ্ধৃত হল:

বাংলায় এভোল্যুশন থিওরি-র অনেকগুলি প্রতিশব্দ চলিয়াছে। লেখক মহাশয় তাহার মধ্য হইতে ক্রমবিকাশতত্ত্ব বাছিয়া লইয়াছেন। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এরূপ স্থলে অভিব্যক্তিবাদ শব্দ ব্যবহার করেন। অভিব্যক্তি শব্দটি সংক্ষিপ্ত; ক্রমে ব্যক্ত হইবার দিকে অভিমুখভাব অভি উপসর্গযোগে সুস্পষ্ট; এবং শব্দটিকে অভিব্যক্ত বলিয়া বিশেষণে পরিণত করা সহজ। তাছাড়া ব্যক্ত হওয়া শব্দটির মধ্যে ভালোমন্দ উন্নতি-অবনতির কোনো বিচার নাই; বিকাশ শব্দের মধ্যে একটা উৎকর্ষ অর্থের আভাস আছে। লেখক মহাশয় natural selection-কে বাংলায় নৈসর্গিক মনোনয়ন বলিয়াছেন। এই সিলেকশন শব্দের চলতি বাংলা 'বাছাই করা'। বাছাই কার্য যন্ত্রযোগেও হইতে পারে; বলিতে পারি চা-বাছাই করিবার যন্ত্র, কিন্তু চা মনোনীত

করিবার যন্ত্র বলিতে পারি না। ... অতএব বাছাই শব্দ এখানে সংগত। বাংলায় বাছাই শব্দের সাধু প্রয়োগ নির্বাচন। 'নৈসর্গিক নির্বাচন' শব্দে কোনো আপত্তির কারণ আছে কি না জানিতে ইচ্ছুক আছি। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২১০)

নবম অধ্যায়
উপসংহার

৯.১

বাংলা ভাষা বিশেষত লেখ্য-বাংলার সঙ্গে উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার সম্পর্ক আপতিক বা আকস্মিক নয়। এ সম্পর্ক বেশ অন্তরঙ্গ – জটিল ও গভীর। উনিশ শতকের উপনিবেশিত বাংলায় গদ্যের ব্যাপক-বহুমাত্রিক চর্চা হয়েছে – এই তথ্যে সেই জটিলতা-গভীরতার হদিশ পাওয়া যায় না। চর্চার বিষয় আর চর্চিত গদ্যের রূপ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষতায় কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তার বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। উপনিবেশিত সমাজের পঠন-পাঠন বাংলা ভাষাচর্চার ব্যাকরণ বুঝতে সাহায্য করে, আবার বাংলা ভাষার পর্যালোচনাও উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার সর্বব্যাপ্তি নির্দেশ করে।

উপনিবেশ আমলের আগে বাংলা অঞ্চলের প্রশাসনিক-রাষ্ট্রিক কাজে বাংলার ব্যবহার ছিল। ইংরেজ আমলের গোড়ায় বাংলা ভাষার এ মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। সর্বভারতীয় যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে হিন্দুস্থানি ও পর্তুগিজের ব্যাপকতার প্রেক্ষাপটে বাংলা দীর্ঘদিন বিদেশি শাসকদের মনোযোগ পায়নি। এ সময়ে ব্রিটিশ-বাংলার রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসি। রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক কারণে পূর্ববর্তী মুসলমান শাসনামলের এই রাষ্ট্রভাষা বদলানো ইংরেজ শাসক এবং শাসনের সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে জরুরি মনে হয়েছিল। অথচ দেশীয়দের কাছে তখনো অচেনা হওয়ায় ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করার পরিবেশ তৈরি হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে শাসকপক্ষ বাংলার প্রতি মনোযোগী হন। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ রচনার মধ্য দিয়ে এই মনোযোগের বাস্তবায়ন শুরু হয়। বাংলায় আইনের অনুবাদ হতে থাকে। রচিত হয় আরো কটি ব্যাকরণ-অভিধান। চলতে থাকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন।

বাংলা ব্রিটিশ-ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কখনোই গৃহীত হয়নি। উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে প্রজাদের ক্ষমতাবান অংশটি ইংরেজির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে ১৮৩৫ সালে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু তার আগের অন্তত পাঁচ দশক সাহেবরা বাংলা ভাষার চর্চা করেছিলেন। ছাপার হরফে গদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা – বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আগে না-হওয়া এসব কাজ বাংলাকে একদিকে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত করে; অন্যদিকে বিভাষীদের চর্চাজনিত নানা অসঙ্গতিরও কারণ হয়। অসঙ্গতির মূল কারণ আগের গদ্যধারার সঙ্গে সামগ্রিক বিচ্ছেদ। পুরোনো বাংলাচর্চার সঙ্গে নতুন চর্চাকারীদের স্বভাবতই কোনো পরিচয় ছিল না। আবার এই বিচ্ছেদ ঔপনিবেশিক শাসনের মূলতত্ত্বের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ।

৯.২

কলকাতার প্রাচ্যবাদীচর্চা আর সাহেবদের সংস্কৃত ‘আবিষ্কার’ বাংলা ভাষার উপনিবেশায়নপর্বে খুব প্রভাবশালী ঘটনা। প্রাচ্যচর্চায় ধ্রুপদী গ্রন্থগুলোর পঠন-পাঠন শাসকপক্ষের কাছে ভারতের এক ধরনের পরিচয় তৈরি করছিল, যা শাসক হিসাবে তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। পাশাপাশি বিধিবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণিত সংস্কৃতের সঙ্গেও তাঁদের

পরিচয় ঘটে। বাংলা ভাষা ঔপভাষিক বৈচিত্র্য এবং সুশৃঙ্খল মানরূপের অভাবের কারণে বিদেশিদের জন্য সহজগম্য ছিল না। অথচ ব্যবহারিক কারণে বাংলার একটি মানরূপ তৈরি করে দ্রুত আত্মস্থ করে নেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় সংস্কৃতের ছাঁচে বাংলাকে ঢেলে সাজানো ভাষাটি রপ্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায় বলে গণ্য হয়। সমকালীন ভাষাবিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি বিশেষত 'ভাষা-পরিবারে'র ধারণা এ কাজের তাত্ত্বিক ভিত্তি জুগিয়েছিল। আর পুরো প্রক্রিয়ার সহায়ক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা।

ভারতীয় সমাজ-কাঠামোয় ব্রাহ্মণশ্রেণির পূর্বতন আধিপত্য ইংরেজরা নষ্ট করতে চায়নি; বরং নিজেদের প্রয়োজনে এই আধিপত্যকে যথাসম্ভব ব্যবহার করতে চেয়েছে। প্রাচ্যবাদীচর্চায় প্রাচীন ভারত ও সংস্কৃত ভাষার যে মহিমা ঘোষিত হয়েছিল, তা সাধারণভাবে হিন্দুসম্প্রদায়ের এবং বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করেছিল। সংস্কৃতচর্চার ব্যাপারে প্রাচ্যবাদীরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। বাংলা ভাষা-প্রশ্নেও তাঁদের মতের মিল ঘটে যায়। কারণ, বাংলার ব্রাহ্মণরা ঐতিহাসিকভাবেই সংস্কৃতবহুল বাংলা ব্যবহার করতেন। লোকপ্রচলিত বাংলার প্রতি তাঁদের ঘৃণার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফলে সংস্কৃতযোগে বাংলাকে শুদ্ধ করার একটা অস্পষ্ট প্রকল্প তাঁদের থাকাই স্বাভাবিক। সাহেবদের চাহিদার মধ্যে সেই অস্পষ্ট প্রকল্প স্পষ্ট আকার পেতে থাকে। উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার মধ্যে সাহেব-পণ্ডিত যৌথতায় বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়নের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়া কার্যকর হয় ব্যাকরণ-অভিধান প্রণয়নে, আইন ও অন্য নানাধরনের রচনার অনুবাদে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যগ্রন্থমালায়, পাঠ্যপুস্তক রচনায়। পুরোনো গদ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে শুরু হয় ঔপনিবেশিক গদ্যের নতুন ধারা।

বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতের মতো ইংরেজির ভূমিকাও প্রবল। এই ভূমিকার একদিক উপাদানগত। নতুন গদ্যে শব্দ, বাগ্‌ভঙ্গি আর পদক্রমের দিক থেকে ইংরেজির প্রভাব পড়ছিল। তবে এই উপাদানগত প্রভাবের চেয়ে ব্যাপক ছিল ভাষায় প্রতিফলিত জীবন-জগৎ-দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ। উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বভাবতই হীনমন্যতার বোধ প্রবল হয়। শাসকের জীবনবোধের অনুকরণই শাসিতের পরম আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় বাংলা গদ্যে চর্চিত হতে থাকে এমনসব ভাবনাচিন্তা, যার সঙ্গে স্থানীয় বাস্তবতার বিশেষ সম্পর্ক নেই। ভাষা গভীরভাবে জীবনবিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হতে থাকে। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে প্রভুভাষা ইংরেজির চাপে বাংলা ভাষা স্বভাবতই মর্যাদার সংকটেও পড়েছিল। রাষ্ট্রীয় মর্যাদা না পাওয়ায় এর সামাজিক মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হয়। বাংলা ভাষা যে রাষ্ট্র-পরিচালনা বা উচ্চশিক্ষার ভাষা না হয়ে চর্চিত হয়েছে প্রধানত সাহিত্যের ভাষা হিসাবে, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির চাপই তার মুখ্য কারণ।

৯.৩

কোনো সমাজের শিক্ষিত ও প্রভাবশালী অংশই সাধারণত ভাষার মানরূপ আর চর্চার ধরন নিয়ন্ত্রণ করে। উপনিবেশিত বাংলায় সমাজের এ অংশ ছিল আকারে ছোট এবং প্রকারে জনবিচ্ছিন্ন। মর্যাদায় তাঁদের কাছে বাংলার বিশেষ স্থান ছিল না। ফলে সর্বস্তরে বাংলা-ব্যবহারের চেষ্টা তাঁরা করেননি। কিন্তু সাহিত্য বা সংস্কৃতিচর্চার অংশ হিসাবে বাংলার চর্চা হয়েছে। এ চর্চায় তাঁদের শ্রেণিগত বাস্তবতা প্রত্যক্ষভাবে বাংলা ভাষার রূপ ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। বাংলাভাষী উপনিবেশিত অভিজাত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য হল – ধর্মের দিক থেকে তাঁরা উচ্চবর্ণের হিন্দু, শিক্ষায়

ইংরেজিশিক্ষিত, উৎপাদন-সম্পর্কের দিক থেকে জমিদার ও চাকুরিজীবী। ফলে পশ্চিমা বিষয়-আশয় সংস্কৃতায়িত অভিজাত ভাষায় প্রকাশ করা একালের ভাষাচর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল মানুষের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছিন্নতা যেমন অনিবার্য ছিল, সাধারণ মানুষের ভাষার সঙ্গেও তাঁদের চর্চিত ভাষার বিচ্ছেদ ছিল দুরপনেয়। উপনিবেশিত মানুষ হিসাবে আত্মমর্যাদাবোধের অভাববশত নিজেদের মুখের ভাষাকেও এই শ্রেণিটি যথার্থ মূল্য দিতে পারেনি। ফলে লেখ্য-বাংলার কৃত্রিমতা আরো বেড়ে যায়।

শ্রেণিগত 'অপরতা'র সঙ্গে যুক্ত হয় সম্প্রদায়গত 'অপরতা'। ঔপনিবেশিক ইতিহাসতত্ত্ব স্বভাবতই পুরোনো মুসলমান শাসকদের বিরোধিতায় তৎপর ছিল। মুসলমান শাসনামলের নেতিবাচকতার ব্যাপারে কলকাতার হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যেও বিরল ধরনের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষার ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গির ফল হয়েছে মারাত্মক। 'মুসলমানি উপাদান' বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা নষ্ট করছে – ঔপনিবেশিক ভাষাদৃষ্টিতে এই মনোভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ ও উপাদান বিতাড়নের যজ্ঞ চলে। রচিত হয় অসংখ্য আরবি-ফারসি অভিধান – যেন ভাষা থেকে এ জাতীয় শব্দ বাদ দেওয়া যায়; অসংখ্য সংস্কৃত শব্দের অভিধান – যেন সেগুলো শুদ্ধরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ অনেক লেখকের গদ্য থেকে আরবি-ফারসি উপাদান সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়ে। অথচ এ উপাদানগুলো চালুবাংলার আবশ্যিক উপাদান। এভাবে উপনিবেশের সমাজের বিশিষ্ট গড়ন শ্রেণিগত ও সম্প্রদায়গত 'অপরতা'র হিসাব-নিকাশ থেকে একদিকে তদ্ভব শব্দ ও প্রচলিত বাকরীতি পরিহার করে, অন্যদিকে প্রচলিত আরবি-ফারসি উপাদান সাধুগদ্যের বাইরে রেখে দেয়। তৈরি হয় সংস্কৃতবহুল কৃত্রিম গদ্য। ব্যাকরণ-অভিধানের চর্চাও এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই চলছিল।

৯.৪

উপনিবেশিত বাংলা ভাষাচর্চার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় উনিশ শতকের শেষদিকে। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বলা যায় এ ধারার সূচনাকারী। ওই শতকের শেষ দশক আর বিশ শতকের প্রথম দশকে মূলত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নেতৃত্বে এ ধারায় ব্যাপকভাবে লিপ্ত হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। এঁদের দাবি ছিল বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করা, যা উপনিবেশিত বাংলাচর্চায় ছিল না। ভাষার চালুরূপ ও ব্যবহারগত বিস্তারের দিকে এঁরা মনোযোগ দেন। বাংলার ওপর সংস্কৃতের আধিপত্যের বদলে দাবি করেন সহায়ক-ভূমিকা। সামগ্রিকভাবে এঁদের রচনা ও চর্চাকে বলা যায় বাংলা ভাষার বি-উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া।

এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিস্তার ও গভীরতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বাংলা ভাষাচর্চার একটি বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনামূলক ধারা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিলেন। চেয়েছিলেন আরোপিত তত্ত্ব ও প্রণালি-পদ্ধতির বদলে বাংলা ভাষা বিশ্লেষিত হোক অভ্যন্তর-বৈশিষ্ট্য আর নিজস্বরীতি অনুসারে। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের কাজের সাফল্যও প্রায় সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা ভাষার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য তাঁর হাতেই প্রথম ও শেষবারের মতো বিশ্লেষিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের হাতে বাংলা ভাষাচর্চায় যে প্রগতি সাধিত হয়েছিল, উত্তরকালে তা খুব একটা অনুসৃত হয়নি। ব্যাকরণ, অভিধান, পরিভাষা, বানানরীতি ইত্যাদি প্রণয়নে বা মানবাংলা নির্ধারণে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অদ্যাবধি বাস্তবায়িত হয়নি। এর এক কারণ বিশ শতকের ত্রিশের দশকের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা।

উপনিবেশিত ভাষাদর্শনের শিকড় এত গভীরে ঢুকে গেছে যে, রবীন্দ্রনাথদের কার্যকর বিরোধিতার পরেও বা উপনিবেশ আমল শেষ হওয়ার পরেও বাংলা ভাষাচর্চায় তার জের কাটেনি।

৯.৫

বস্তুত উপনিবেশ-আমলে জাত ক্ষমতা-সম্পর্ক আর মতাদর্শের প্রতাপের কারণেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী ছক থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বাংলা ভাষার প্রশ্নে এ সত্য প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। স্বাধীন বাংলাদেশে বা ভারতীয় বাংলায় উপনিবেশিত ভাষাদর্শনের প্রতাপ টের পাওয়া যায় বাংলা ভাষার 'দুর্বলতা'-সম্পর্কিত প্রচারণায়। একদিকে সংস্কৃত-জ্ঞানকে বাংলাচর্চার ভিত্তি হিসাবে দেখার প্রবণতা এখনো প্রবল; অন্যদিকে সর্বস্তরে প্রচলনের দিক থেকে বাংলা ক্রমবর্ধমান হারে ইংরেজি ভাষাকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদের কাছে পরাস্ত হচ্ছে। দুই ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক হীনমন্যতা নয়া-ঔপনিবেশিক আধিপত্যের ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে।

গত দুশ বছরে সাহিত্যিক বাংলা ভাষার সমীহ-জাগানো উন্নতি হয়েছে। সে সঙ্গে ব্যবহারিক দিক থেকে বাংলা ভাষার নানা সীমাবদ্ধতাও উল্লেখযোগ্য। দেবেশ রায় বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের উৎকর্ষ আর সামগ্রিক দৈন্যের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:

> আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে গত প্রায় দুশো বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের একটি হল এই বাংলা গদ্য। সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের জন্ম তো বঙ্কিমচন্দ্রে, মাত্র সোয়াশো বছর আগে। আজ সে গদ্যের ধারণক্ষমতা, নমনীয়তা, রূপবৈচিত্র্য এমন যে মনন ও কল্পনার, অনুভব-উপলব্ধির ভুবনের কোনো কিছুই তার প্রকাশক্ষমতার অতীত নয়।
> কিন্তু শব্দের অর্থের নির্দিষ্টতা, বাক্যের গঠনের নির্দিষ্টতা, এমনকি যতিচিহ্নের ব্যবহারবিধির নির্দিষ্টতার অভাবে বাংলা ভাষায় মননের জটিলতা, বস্তুর প্রত্যক্ষতা সমতুল্যভাবে প্রকাশিত হতে চায় না। এ অভাব পরিভাষার অভাব নয়। কর্মের বৈচিত্র্যে ব্যবহৃত হলে ভাষায় যে বৈচিত্র্যের ধারা আসে, যাঁরা সে ভাষায় কথা বলেন তাঁদের সকলের আত্মসম্মানের সঙ্গে জড়িত হলে ভাষার যে নিশ্চয়তাবোধ আসে, সকলের পক্ষে বিকল্পহীন হলে ভাষার যে বহুলতা আসে – বাংলা গদ্যভাষা তার সব-কিছু থেকেই বঞ্চিত। (দেবেশ ১৯৯০: ৩-৪)

জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বহু মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য এই ভাষাকে সর্বগামী করে তোলা যায়নি। উচ্চশিক্ষা বা রাষ্ট্রীয় কায়কারবারে বাংলার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত না করে ভাষাপ্রশ্নে আত্মতৃপ্তি প্রমাণ করে, বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী গভীরভাবে হীনমন্যতায় আক্রান্ত। এ থেকে আরো বোঝা যায়, 'ভাষাপ্রেম' আর 'ভাষা-ব্যবহার' – এ দুইয়ের কোনো সন্তোষজনক সমন্বয় বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী করে উঠতে পারেনি। অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দরকার ভাষাবোধে বৈপ্লবিক পরিবর্তন – একদিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভাষার 'স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসন' নিশ্চিত করা, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ব্যবহারিক উপযোগিতার নিরিখে নমনীয় ও গণতান্ত্রিক 'মানরূপ' স্থির করা; অন্যদিকে উচ্চশিক্ষা ও অফিস-আদালতের মতো ক্ষমতা-সম্পর্কের স্পর্শকাতর ক্ষেত্রগুলোতে বাংলার গতিবিধি অবারিত করা। শেষোক্তটি অবশ্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার এবং ক্ষমতা-সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভাষা-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

বি-উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা-বিষয়ক রচনাবলির পাঠ থেকে মনে হয়, তত্ত্বীয়-পদ্ধতিগত-ব্যবহারিক – তিন দিক থেকেই এ রচনাগুলো বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর গভীর হীনমন্যতার প্রতিষেধক হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. বাংলা বই

অপূর্বকুমার রায় ১৯৭৬, *উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য: ইংরেজি প্রভাব*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা

অমলেন্দু দে ১৯৭৪, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, রত্না প্রকাশন, কলিকাতা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ১৩৭৯, *উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস-চর্চা*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ২০০৬, *রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অরুণকুমার বসু (সম্পাদিত) ১৯৯২, *বাংলা গদ্যজিজ্ঞাসা*, ৩য় মুদ্রণ, সমতট প্রকাশন, কলকাতা

অরুণ নাগ (সম্পাদিত) ২০০৮, *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা*, ২য় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৫, *ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য*, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ১৯৯১, *আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ২০০৩, *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন*, বাংলা আকাদেমি সংস্করণ, কলকাতা

আনিসুজ্জামান ১৯৮২, *আঠারো শতকের বাংলা চিঠি*, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

আনিসুজ্জামান ১৯৮৪, *পুরোনো বাংলা গদ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আনিসুজ্জামান ২০০১, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্যাপিরাস, ঢাকা

আবু তাহের মজুমদার ২০০৬, *স্যার উইলিয়াম জোন্স: জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আলি নওয়াজ (সম্পাদিত) ১৯৬৯, *বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, বাংলা প্রকোষ্ঠ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

আহমদ শরীফ ১৯৯২, *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা

ইরফান হবিব ১৯৯৯, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা*, তৃতীয় মুদ্রণ, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২০০১, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, নতুন সংস্করণ, তীর্থপতি দত্ত সম্পাদিত, তুলি-কলম, কলকাতা

এস. এম. লুৎফর রহমান ২০০৪, *বাঙালীর লিপি-ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ধারণী সাহিত্য-সংসদ, ঢাকা

এস. এম. লুৎফর রহমান ২০০৫, *বাঙালীর লিপি-ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ধারণী সাহিত্য-সংসদ, ঢাকা

কৃষ্ণা দাশ ১৯৮৭, *বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ*, দে বুক স্টোর, কলকাতা

খগেন্দ্রনাথ মাইতি ১৯৯৫, *ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্য-নকশা: সমাজ-সমালোচনা ও গদ্যরীতির বিশিষ্টতা*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

গোলাম মুরশিদ ১৩৯৯, *কালান্তরে বাংলা গদ্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

গোলাম মুরশিদ ১৯৮৪, *সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

গৌতম ভদ্র ১৯৯৪, *ইমান ও নিশান*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

গৌতম ভদ্র ২০১১, *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?*, ছাতিম বুক্স্, কলকাতা

গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ২০০১, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, ৩য় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

জ্যোতিভূষণ চাকী ২০০১, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, ২য় সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ২০১১, *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, ১০ম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

তুষারকান্তি মহাপাত্র (সম্পাদিত) ২০০৫, *ভাষাভাবনা* (বাংলা ভাষা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক), অবভাস, কলকাতা

দীনেশচন্দ্র সেন ২০০২, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

দীনেশচন্দ্র সেন ২০০৬, *বৃহৎবঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

দীনেশচন্দ্র সেন ২০০৮, *ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য*, পড়ুয়া, ঢাকা

দীপঙ্কর ঘোষ (সংকলিত) ২০০৭, *ভাষা-ভাবনা: উনিশ-বিশ শতক*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৮, *আত্মজীবনী*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

দেবেশ রায় ১৯৭৮, *রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য*, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা

দেবেশ রায় ১৯৮৭, *আঠার শতকের বাংলা গদ্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা

দেবেশ রায় ১৯৯০, *উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা

দেবেশ রায় ১৯৯১, *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

দেবেশ রায় ২০০৩, *অপর ভাষা*, অক্ষর পাবলিকেন্স, আগরতলা, ত্রিপুরা

দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো ১৯৩৭, *ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ*, সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩১৪, *বিশ্বকোষ* (অষ্টাদশ খণ্ড), বিশ্বকোষ প্রেস, কলকাতা

নরহরি কবিরাজ (সম্পাদিত) ১৯৯৭, *উনিশ শতকের বাঙ্‌লার জাগরণ: তর্ক ও বিতর্ক*, ২য় প্রকাশ, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা

নাজিরুল ইস্‌লাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, মুদ্রণসাল নেই, *বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, ছায়াবীথি, ঢাকা

নির্মল দাশ ২০০০, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, ২য় সংস্করণ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

নিশীথরঞ্জন রায় ও অশোক উপাধ্যায় (সম্পাদিত) ১৩৯০, *প্রাচীন কলিকাতা*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা

নীরদচন্দ্র চৌধুরী ১৪০৮, *বাঙালী জীবনে রমণী*, চতুর্দশ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

নীরদচন্দ্র চৌধুরী ১৪১৫, *আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ*, অখণ্ড সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

নেপাল মজুমদার ১৯৮৩, *ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নেপাল মজুমদার (সম্পাদিত) ১৯৯৭, *বানান বিতর্ক*, ২য় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

পবিত্র সরকার ১৪১২, *ভাষা, দেশ, কাল*, ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা

পবিত্র সরকার ১৯৯৯, *ভাষামনন: বাঙালি মনীষা*, ২য় সংস্করণ, পুনশ্চ, কলকাতা

পবিত্র সরকার ২০০৩, *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পবিত্র সরকার ২০০৪, *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ১ম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ১৯৮০, *শব্দের জগৎ*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

প্যারীচাঁদ মিত্র ২০০৩, *প্যারীচাঁদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রবাল দাশগুপ্ত ১৯৮৭, *কথার ক্রিয়াকর্ম*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

প্রবোধচন্দ্র সেন ২০০৩, *ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ*, ২য় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

প্রফুল্লকুমার পান ২০০৬, *বাংলা বর্ণপরিচয়ের দুশো পঁচিশ বছর*, সাহিত্যলোক, কলকাতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৭২, *রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা

প্রমথ চৌধুরী ২০০৯, *প্রবন্ধসংগ্রহ*, ৩য় মুদ্রণ, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা

প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত ১৯৬০, *বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা

প্রশান্তকুমার পাল ২০০৭, *রবিজীবনী*, প্রথম খণ্ড, ৫ম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

ফরহাদ মজহার ২০০৮, *রক্তের দাগ মুছে রবীন্দ্রপাঠ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৯, *রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রফুল্লকুমার পাত্র সম্পাদিত, পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলকাতা

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৯৭৭, *বাগর্থ*, ৩য় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৯৮৫, *বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত) ১৯৬২, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ১ম খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

বিনয় ঘোষ ১৯৮৪, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ৩ খণ্ড একত্রে, পুনর্মুদ্রণ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা

বিনয় ঘোষ ২০০০, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, ৪র্থ সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা

বিনয় ঘোষ ২০০৪, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*, অখণ্ড, ৫ম সংস্করণ, বাক্‌সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা

বিনয় সরকার ২০০৩, *বিনয় সরকারের বৈঠকে*, ১ম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বিমান বসু (সম্পাদিত) ১৯৯১, *প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর*, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, কলকাতা

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ১৩৩৯, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-মন্দির, কলিকাতা

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ১৩৪০, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-মন্দির, কলিকাতা

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ১৯৮৫, *অপরাধ জগতের ভাষা*, ২য় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৮, *বাংলা গদ্যের আদিপর্ব*, নয়া প্রকাশ, কলকাতা

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৩, *কলিকাতা কমলালয়*, পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বাংলা আকাদেমি সংস্করণ, কলকাতা

মনসুর মুসা ১৯৯১, *ভাষাচিন্তা: প্রসঙ্গ ও পরিধি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মনসুর মুসা (সম্পাদিত) ১৯৯৪, *বাঙালির বাঙলাভাষা চিন্তা*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৪০৯, *বাংলা বানান*, দে'জ ৪র্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

মনোমোহন ঘোষ ১৯৪১, *বাংলা গদ্যের চারযুগ*, ২য় সংস্করণ, দাশগুপ্ত এন্ড কোং লি., কলিকাতা

মনোয়ারা হোসেন ১৯৯৬, *বাংলা শব্দের শ্রেণীবিচার ও প্রয়োগ বিশ্লেষণ: প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মানোএল দা আসসুম্পসাঁও ১৩৪৬, *কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ*, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস, কলকাতা

মানোএল দা আসসুম্পসাঁও ১৯৩১, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

মিতালী ভট্টাচার্য ২০১০, *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন*, পুনর্মুদ্রণ, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা

মুনীর চৌধুরী ১৯৭৬, *বাঙলা গদ্যরীতি*, ২য় মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুরারিমোহন সেনশাস্ত্রী ১৯৮৯, *ভাষার ইতিহাস*, প্রথম পর্ব, ৫ম সংস্করণ, এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, কলকাতা

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত) ১৯৭৬, *উচ্চশিক্ষা এবং ব্যবহারিক জীবনে বাংলাভাষার প্রয়োগ*, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মুহম্মদ আবূ তালিব ১৯৭৯, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা: সাধুতা বনাম অসাধুতা*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৯৪, *রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৬৭, *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৯৩, *রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৪, *শহীদুল্লাহ্-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৫, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ সিদ্দিক খান ১৯৬২, *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী-যুগ*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মুহম্মদ সিদ্দিক খান ১৩৭১, *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ১৯৮৩, *মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ১৯৮২, *রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মোবারক হোসেন (সম্পাদিত) ২০১১, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত) ১৯৮৫, *মুহম্মদ এনামুল হক স্মারকগ্রন্থ*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

মোহিতলাল মজুমদার ২০০৫, *রবীন্দ্রনাথ*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৩১১, *প্রবোধচন্দ্রিকা*, বঙ্গবাসী-স্টীম-মেসিন-প্রেস, কলকাতা

রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত) ২০১১/১, *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত) ২০১১/২, *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, *বাংলা শব্দতত্ত্ব*, তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, (আঠার খণ্ড) ৩য় মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ঢাকা

রাজনারায়ণ বসু ১৪০২, *সে কাল আর এ কাল*, নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা

রাজনারায়ণ বসু ১৯৬১, *আত্মচরিত*, ৪র্থ সংস্করণ, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলিকাতা

রাজনারায়ণ বসু ১৯৭৩, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা*, গ্রন্থন, কলকাতা

রাজশেখর বসু ১৩৬৩, *বিচিন্তা*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

রাজশেখর বসু ১৩৮০, *চলন্তিকা*, একাদশ সংস্করণ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

রামগতি ন্যায়রত্ন ১৯৯১, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব*, নতুন সংস্করণ, সুপ্রিম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা

রামমোহন রায় ১৯৯৮, *রচনাবলী*, তৃতীয় সংস্করণ, অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩৫৬, *রামেন্দ্র-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা

লঙ, রেভঃ জেম্স্ ১৯৮৮, *আদিপর্বে বাংলা প্রকাশনা ও সাংবাদিকতা*, মুহম্মদ হাবীবুর রশিদ অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শিবনাথ শাস্ত্রী ১৯৫৭, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, ২য় সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

শিশিরকুমার দাশ ১৪১৭, *ভাষাজিজ্ঞাসা*, ৪র্থ সংস্করণ, প্যাপিরাস, কলকাতা

শিশিরকুমার দাশ ১৯৯৯, *মোদের গরব মোদের আশা*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৬৬, *বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ*, গ্রন্থ-ভবন, কলিকাতা

শ্রীপান্থ ২০০১, *কলকাতা*, ২য় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সজনীকান্ত দাস ১৩৫৩, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: গদ্যের প্রথম যুগ*, মিত্রালয়, কলকাতা

সবিতা চট্টোপাধ্যায় ১৯৭২, *বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক*, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা

সব্যসাচী ভট্টাচার্য ১৩৯৬, *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (১৮৫০ – ১৯৪৭)*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা

সরস্বতী মিশ্র ২০০০, *বাংলা অভিধানের ক্রমবিকাশ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৮, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, ২য় দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সিরাজুল ইসলাম ২০০২, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, ৩য় মুদ্রণ, চয়নিকা, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২০০৩, *উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ*, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

সুকুমার সেন ১৪০৩, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সুকুমার সেন ১৯৯৮, *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সুকুমার সেন ১৯৯৮ক, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৬২, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, ৭ম সংস্করণ, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-বোম্বাই-দিল্লি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৭২, *মনীষী স্মরণে*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৯, *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে*, ২য় প্রকাশ, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড, কলকাতা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৯/ক, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পুনর্মুদ্রণ, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা

সুনীতি কুমার ঘোষ ২০০৫, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি*, সাহিত্যিকা, ঢাকা

সুনীল সেনগুপ্ত ১৯৮৯, *রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান*, নয়া প্রকাশ, কলকাতা

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৮৫, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী)*, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত ১৪০৯, *ভারতীয় মুসলমানদের সংকট*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

সুরেন্দ্রনাথ সেন ১৯৪২, *প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সুশীলকুমার দে ১৯৫৪, *নানা নিবন্ধ*, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা

স্বপন বসু ২০০০, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, ৩য় সংস্করণ, পুস্তক বিপনি, কলকাতা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২০০০/বি, *রচনা-সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯৮৯, *রচনা-সংগ্রহ*, চতুর্থ খণ্ড, সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০১, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী

হুমায়ুন আজাদ ১৯৮৮, *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৪, *বাক্যতত্ত্ব*, ২য় সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৯, *বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র*, ২য় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত) ২০০২, *বাঙলা ভাষা*, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ: ২য় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত) ২০০১, *বাঙলা ভাষা*, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ ২০০৪, *সীমাবদ্ধতার সূত্র*, ২য় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

হোসাইন রিদওয়ান আলী খান ২০০৭, *বাংলা শব্দ বর্ণ বানান*, নালন্দা, ঢাকা

খ. বাংলা প্রবন্ধ, সংকলনগ্রন্থ ও পত্রিকা

অজরচন্দ্র সরকার ১৯৯৭, বাঙ্গালা টাইপ ও কেস, *বানান বিতর্ক*, নেপাল মজুমদার সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

অনিন্দিতা ঘোষ ২০১১, বটতলার বইবাজার ও তার সামাজিক ইতিহাস, *অনুষ্টুপ*, সম্পাদক: অনিল আচার্য, বটতলা বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা

অনুরাধা রায় ২০০১, জাতিসৃজনের জটিলতা: উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মুসলমান-ভাবনা, *আকাদেমি পত্রিকা* ১৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

অমিতাভ চৌধুরী ১৯৯২, ভাষা-ভাবনা, *বাংলা গদ্যজিজ্ঞাসা*, অরুণকুমার বসু সম্পাদিত, ৩য় মুদ্রণ, সমতট প্রকাশন, কলকাতা

অম্লান দত্ত ১৯৯২, উনিশশতকী বাংলার নবজাগরণের গৌরব ও অপূর্ণতা, *জিজ্ঞাসা*, সংকলন/ সম্পাদনা: শিবনারায়ণ রায়, প্যাপিরাস, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯২

অসিতকুমার সেন ১৯৮৬, মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে উনিশ শতকের চিন্তাভাবনা, *শতপত্র*, শতবার্ষিকী স্মারক সংকলন, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

আনিসুজ্জামান ১৩৭৩, গ্রন্থ-পরিচয়, *সাহিত্য পত্রিকা*, মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত, দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঋষি দাস ১৯৮৬, বাংলা অভিধান প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য, *প্রসঙ্গ বাংলাভাষা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

কাজী দীন মুহম্মদ ১৯৬৫, ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ, *সাহিত্য-সম্ভার*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

কেতকী কুশারী ডাইসন ২০০৫, বৈদগ্ধ্যের সপক্ষে, *ভাষাভাবনা* (বাংলা ভাষা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক), তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

জ্যোতিভূষণ চাকী ২০০৫, প্রবর্তক-নিবর্তক-সংবাদ, *ভাষাভাবনা* (বাংলা ভাষা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক), তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

দেবপ্রসাদ ঘোষ ১৯৯৭, বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান, *বানান বিতর্ক*, নেপাল মজুমদার সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৬, এই যে আমার রক্তাক্ত শরীর – ব্যাকরণ!, *প্রসঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ* ২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

নীলাদ্রিশেখর দাশ ২০১০, ব্যবহারভিত্তিক বাংলা ব্যাকরণ: সম্ভাব্যতার বাস্তবতা, *আলোচনাচক্র* ২৮, অতিথি সম্পাদক: প্রবাল দাশগুপ্ত, কলকাতা

নৈঋতা ভট্টাচার্য ২০১০, ব্যাকরণের রকমভেদ, ব্যাকরণের ভিন্নতা, *আলোচনাচক্র* ২৯, সম্পাদক: চিরঞ্জীব শূর, অতিথি সম্পাদক: প্রবাল দাশগুপ্ত, আগস্ট ২০১০, কলকাতা

পবিত্র সরকার ১৯৮৮, স্কুল-পাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ: ব্যাধি ও প্রতিকার, *আকাদেমি পত্রিকা* ১, মে ১৯৮৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

পবিত্র সরকার ১৯৯২, বাংলা গদ্য: রীতিগত অনুধাবন, *বাংলা গদ্যজিজ্ঞাসা*, ৩য় মুদ্রণ, অরুণকুমার বসু সম্পাদিত, সমতট প্রকাশন, কলকাতা

পবিত্র সরকার ২০০০, বাংলা গদ্যের আদর্শায়ন, *আকাদেমি পত্রিকা* ১২, মে ২০০০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

পল্লব সেনগুপ্ত ১৯৮৬, লৌকিক কোষ: সমস্যা ও সম্ভাবনা, *প্রসঙ্গ বাংলাভাষা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ২০০১, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, ৩য় মুদ্রণ, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

পূর্ণেন্দুনাথ নাথ ১৯৮২, বাংলা গদ্য পুঁথি – একটি সমীক্ষা, *বাংলা গদ্য পুঁথি*, শ্রীরামপুর কলেজের আলোচনা সভায় পঠিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন, কেরী গ্রন্থাগার, শ্রীরামপুর কলেজ

প্রবাল দাশগুপ্ত ১৩৯৪, লোহারাম শিরোরত্নের ‘বাঙ্গলা ব্যাকরণ’, *জিজ্ঞাসা*, শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত, অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যা, কলকাতা

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ১৯৬৮, রবীন্দ্রনাথের ভাষা, *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯৮৬, বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে, *প্রসঙ্গ বাংলাভাষা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৯৯৭, চ'ল্‌তি ভাষার বানান, *বানান বিতর্ক*, নেপাল মজুমদার সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৯৯৭/১, বাংলা বানান সমস্যা, *বানান বিতর্ক*, নেপাল মজুমদার সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৯৯৭/২, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও বানানবিধির গোড়ার কথা, *বানান বিতর্ক*, নেপাল মজুমদার সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

ব্যোমকেশ মুস্তফী ১৯৮৭, বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত, *বিতর্ক: বাংলা ব্যাকরণ*, সরস্বতী মিশ্র সম্পাদিত, ওরিয়েন্টাল, কলকাতা

মনসুর মুসা ২০১১, রবীন্দ্রনাথের ভাষা-চিন্তা, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, মোবারক হোসেন সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মনিরুজ্জামান ১৯৯৪, বাঙালীর ব্যাকরণ চিন্তা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, *বাঙালির বাঙলাভাষা চিন্তা*, মনসুর মুসা সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

মনিরুজ্জামান ১৪১৯, ব্যতিক্রমী ভাষাচিন্তক রবীন্দ্রনাথ, *সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ*, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

মহাম্মদ দানীউল হক ১৯৯৪, বাঙালির বাংলা উচ্চারণ সংক্রান্ত চিন্তা: ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, *বাঙালির বাঙলাভাষা চিন্তা*, মনসুর মুসা সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

মৃণাল নাথ ১৯৯৪, বাঙালীর ভাষাচিন্তায় চলিত-সাধুর দ্বন্দ্ব, *বাঙালীর বাঙলাভাষা চিন্তা*, মনসুর মুসা সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

রণজিৎ গুহ ২০০১, নিম্নবর্গের ইতিহাস, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৩য় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

রাজশেখর বসু ২০০১, সাধু ও চলিত ভাষা, *বাঙলা ভাষা*, ২য় খণ্ড, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১, ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি ও আধুনিকতার পাঠ, *আকাদেমি পত্রিকা* ৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ১৯৮৬, সভাপতির মন্তব্য: লিপিসংস্কার প্রসঙ্গে, *প্রসঙ্গ বাংলাভাষা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ২০০৮, মুখের বাংলা ও লেখার বাংলা, মোহাম্মদ আজম অনূদিত, *জাতীয় সাহিত্য*, সম্পাদক: সাখাওয়াত টিপু, ১লা কিস্তি, ঢাকা

সামসুন নাহার গফুর ১৯৯৪, বাঙলাভাষার শব্দ সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, *বাঙালির বাঙলাভাষা চিন্তা*, মনসুর মুসা সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

সিরাজুদ্দীন আমেদ ২০০৬, বাংলা ব্যাকরণের সমাজতত্ত্ব, *প্রসঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ* ২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

সিরাজুল ইসলাম ১৯৮৫, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ, *মুহম্মদ এনামুল হক স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১, বটতলার 'দোভাষী' সাহিত্য – সেকাল ও একাল, *অনুষ্টুপ*, সম্পাদক: অনিল আচার্য, বটতলা বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা

সুরেন্দ্রনাথ সেন ১৯৯৯, দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা পত্র, *ভারতবর্ষ*, প্রবন্ধ-সংকলন, সম্পাদনা: বারিদবরণ ঘোষ, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা

সুশীল চৌধুরী ১৯৯২, নবাবী আমলে অর্থনৈতিক অবস্থা, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ২য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৮৮, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, *আকাদেমি পত্রিকা* ১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

প্রসঙ্গ বাংলাভাষা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬

প্রসঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ ২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৬

বাংলা গদ্য পুঁথি/ শ্রীরামপুর কলেজের আলোচনা সভায় পঠিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন, কেরী গ্রন্থাগার, শ্রীরামপুর কলেজ, ১৯৮২

আকাদেমি পত্রিকা ১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম সংখ্যা, মে ১৯৮৮, সম্পাদকমণ্ডলির সভাপতি: অন্নদাশঙ্কর রায়

আলোচনাচক্র ২৯, সম্পাদক: চিরঞ্জীব শূর, অতিথি সম্পাদক : প্রবাল দাশগুপ্ত, আগস্ট ২০১০, কলকাতা

ভাষাপত্র, নেয়ামাল বাসির স্মারক-সংখ্যা, বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি, মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্ সম্পাদিত, চতুর্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, ঢাকা

সাহিত্য পত্রিকা, সম্পাদক: মুহম্মদ আবদুল হাই, দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৩৭৩, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গ. ইংরেজি গ্রন্থ

Anderson, Benedict 1983, *Imagined Communities*, verso, London

Arnold, David and Hardiman, David 2005, edited, *Subaltern studies viii : Essays in Honour of Ranajit Guha*, 5th impression, Oxford University Press, New Delhi

Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth and Tiffin, Helen 2007, edited, *The Post-Colonial Studies Reader*, 2nd edition, reprint, Routledge, London and New York

Aspinall, A. 1987, *Cornwallis in Bengal*, reprint, Uppal Publishing House, New Delhi

Bagchi, A. K. 1972, *Private Investment in India 1900-39*, University Press, Cambridge

Dhaka University Institutional Repository

Baugh, Albert C. and Cable, Thomas 2002, *A History of English language*, reprint, Routledge, London

Bayly, C. A. 2002, *Rulers, Townmen and Bazaars*, Oxford University Press, New Delhi

Bhabha, Homi K. 2006, *The Location of Culture*, reprint, Routledge, London and Newyork

Bloomfield, Leonard 1967, *Language*, George Allen and Unwin Ltd, London

Bose, Sugata and Jalal, Ayesha 2002, *Modern South Asia : History, Culture, Political Economy*, 4th impression, Oxford University Press, New Delhi

Carey, W. 1825, *Dictionary of the Bengalee Language*, V. i, Serampore Mission-Press, Calcutta

Cesaire, Aime 2000, *Discourse on Colonialism*, Translated by Joan Pinkham, Monthly Review Press, New York

Chandra, Sudhir 1975, *Dependence and Disillusionment: Emergence of national consciousness in later 19th century India*, Manas publications, New Delhi

Chatterjee, Partha 1993, *National thought and the Colonial World: A Derivative Discourse*, 2nd impression, University of Minnesota Press, Minneapolis

Chatterjee, Partha 1998, *The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism*, Oxford University Press, Oxford India Paperbacks

Chatterji, Suniti Kumar 2002, *The Origin and Development of the Bengali Language*, 3rd impression, Rupa & Co, New Delhi

Childs, Peter and Williams, Patrick 1997, *An Introduction to Post-colonial Theory*, Person Education Limited, England

Das, Sisirkumar 1966, *Early Bengali Prose: Carey to Vidyasagar*, Bookland Private Ltd., Calcutta

Dasgupta, Subrata 2007, *The Bengali Renaissance, Identity and creativity from Rammohun Roy to Rabindranath Tagore*, Permanent Black, Delhi

De, Amalendu 1974, *Roots of Separatism in Nineteenth Century Bengal*, Ratna Prakashan, Calcutta

De, Sushil Kumar 1962, *Bengali literature in the nineteenth century (1757-1857)*, 2nd edition, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta

Fanon, Frantz 1963, *The Wretched of the Earth*, Translated by C. Farrington, Grove Press, New York

Fanon, Frantz 1968, *Black Skin White Masks*, Translated by Charles Lam Markmann, Evergreen Black Cat edition, 9th printing, Grove Press, Inc., New York

Forster, H. P. 1799, *Vocabulary in two parts – English and Bongalee and vice versa*, Ferris and Co, Calcutta

Ghosh, Suresh Chandra 1998, *The British in Bengal/ A study of the British society and life in the late eighteenth century*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi

Grierson, G. A. 1903, Collected and Edited, *Linguistic Survey of India, vol. v, Indo-Aryan Family, Eastern Group, part I*, Motilal Banarsidass, Delhi, Varanasi, patna

Griearson, Sir George 1912, *The Indian Empire*, Calcutta

Guha, Ranajit 1963, *A Rule of Property for Bengal, An essay on the idea of Permanent Settlement*, Mouton & Co, Paris

Guha, Ranajit 1988, *An Indian Historiography of India: A nineteenth-Century Agenda and its Implication*, K P Bagchi & Company, Calcutta, New Delhi

Halhed, Nathaniel Brassey 1980, *A Grammar of the Bengali Language*, Ananda Publisher Private Limited, Calcutta

Hockett, Charles F. 1968, *A Course In Modern Linguistics*, 13th printing, The Macmillan Company, New York

Hussain, A. T. M. Azfar 2003, *The Point is to (ex)change it: Toward a political Economy of Land, Labour, Language, and the Body*, Ph d dissertation, Washington State University, Department of English, Manuscript microfilmed by UMI

Joshi, V. C. 1975, edited, *Rammohun Roy and the Process of Modernization in India*, Vikas Publishing House Pvt Ltd, Delhi

Kamal, Abu Hena Mustafa 1977, *The Bengali Press and Literary Writing*, University Press limited, Dhaka

Khan, Gholam Hossein 1926, *Seir Mutaqherin* (English translation), vol. iii, R. Cambray & Co, Calcutta, Madras

Kopf, David 1969, *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835*, University of California Press, Berkley and Los Angeles

Kulke, Hermann and Rothermund, Dietmar 1999, Reprinted, *A History of India*, 3rd edition, Routledge, London and New York

Kumar, Ravinder 1983, *Essays in the Social history of Modern India*, Oxford University press, Delhi

Lenin, V. I. 1947, *Imperialism, The Highest Stage of Capitalism*, Foreign languages Publishing House, Moscow

Long, J. 1868 (ed), *Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Behar*, Home Secretariat Press, Calcutta

Loomba, Ania 2001, *Colonialism / Postcolonialism*, reprint, Routledge, London and New York

Majumdar, R. C., Raychaudhuri, H. C. and Datta, Kalikinkar 1970, *An Advanced History of India*, 3rd edition reprint, Macmillan, London

Mannan, Qazi Abdul 1966, *The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal (Upto 1855 A. D.)*, Department of Bengali and Sanskrit, University of Dhaka, Dhaka

Mcleod, John 2007, *Beginning Postcolonialism*, First South Asia Edition, Manchester University press, Manchester

Memmi, Albert 1976, *The colonizer and The Colonized*, Translated by Howard Greenfeld, Beacon Press, Boston

Muir, Ramsay 1923, *The Making of British India 1756-1858*, The University of Manchester, London

Nandy, Ashis 1989, *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under colonialism*, 2nd impression, Oxford University Press, Delhi

Philipson, Robert 2003, *Linguistic Imperialism*, 6th impression, Oxford University Press

Qayyum, Muhammad Abdul 1982, *A Critical Study of the Early Bengali Grammar*, The Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka

Roy, Raja Rammohun 1906, *English Works*, The Panini Office, Allahabad

Said, Edward W. 1994, *Culture and Imperialism*, Vintage, London

Said, Edward 1995, *Orientalism*, Penguin Books

Sapir, Edward 2004, *Language, An Introduction to the Study of Speech*, Dover Publications, Inc., Mineola, New York

Sarkar, Sir Jadunath 1972, *The History of Bengal, v 2*, reprint, Dhaka University

Sarkar, Sumit 1997, *Writing Social History*, Oxford University Press, New Delhi

Sarkar, Sumit 2000, *A Critique of Colonial India*, 2nd edition, Papyrus, Calcutta

Sarkar, Sushovan 1981, *Bengal Renaissance and Other Essays*, 2nd print, People's Publishing House, New Delhi

Sen, Asok 1977, *Iswar Chandra Vidyasagar and his elusive milestones*, Riddhi-India, Calcutta

Sen, Dinesh Chandra 1921, *Bengali Prose Style (1800-1857)*, University of Calcutta

Sinha, Narendra Krishna 1996, *The History of Bengal 1757-1905*, 2nd edition, University of Calcutta, Calcutta

Spear, Percival 2004, *The Oxford History of Modern India 1740-1975*, 2nd edition, 21st impression, Oxford University Press, New Delhi

Spear, Percival 1951, *The Twilight of the Mughals*, Cambridge, England

Srinivas, M. N. 1972, *Social Change in Modern India*, Orient Longman, India

Eric Stokes 1959, *The English Utilitarians and India*, Oxford, Great Britain

Thiong'o, Ngugi Wa 2007, *Decolonising the Mind*, Worldview Publications, Delhi

Thomas, Nicholas 1994, *Colonialism's Culture*, Polity Press, UK

Viswanathan, Gauri 2009, *Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India*, Oxford University Press, New Delhi

Walder, Dennis 1998, *Post-Colonial Literature in English: History Language Theory*, Blackwell Publisher

Young, Robert J. C. 2003, *Postcolonialism: An Historical Introduction*, reprint, Blackwell Publishing Ltd.

ঘ. ইংরেজি প্রবন্ধ ও কোষগ্রন্থ

Arnold, David 2005, The Colonial Prison: Power, knowledge and Penology in Nineteenth-Century India, *Subaltern studies viii: Essays in Honour of Ranajit Guha*, 5th impression, Edited by David Arnold and David Hardiman, Oxford University Press, New Delhi, (First published 1994)

Bishop, Alan J. 2007, Western mathematics: the secret weapon of cultural imperialism, *The post-colonial studies reader*, Edited by Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, 2nd edition, reprint, Routledge, London and New York

Bhattacharya, Pradyumna 1975, Rammohun Roy and Bengali prose, *Rammohun Roy and the Process of Modernization in India*, Edited by V. C. Joshi, Vikas Publishing House Pvt Ltd, Delhi

De, Barun 1976, The Colonial Context of Bengal Renaissance, *Indian Society and the Beginning of Modernisation c. 1830-1850*, C. H. Philips and Mary Doreen Wainwright (ed.), SOAS, London

Dirks, Nicholas B. 2007, Colonialism and Culture, *The post-colonial studies reader*, Edited by Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, 2nd edition, reprint, Routledge, London and New York

Ganguli, Syamacharan 1990, Bengali Spoken and Written, *Akademi Potrika* 3, Poshcimbongo Bangla Akademi, Calcutta

Marx, Karl 1979, The British Rule in India, *Karl Marx Frederick Engels Works, V. 12*, Progress Publishers, Moscow

Nandy, Ashis 1975, Sati: A nineteenth century tale of woman, violence and protest, *Rammohun Roy and the Process of Modernization in India*, Edited by V. C. Joshi, Vikas Publishing House Pvt Ltd, Delhi

The New Enclopaedia Britanica 2010, volume 3, (Fifteenth edition), Micropaedia, USA